ঠাকুর শ্রীশ্রী জিতেন্দ্র নাথ

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথের শ্রীমুখনিঃসৃত

অমৃত বাণী

প্রথম ভাগ

(তৃতীয় সংস্করণ)

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

[প্রকাশক কর্ত্তৃক
সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[এই পুস্তকের বর্ত্তমান মূল্য]
৬॥০ মাত্র

The right of Translation, Reproduction, Adoptation, Publication and all other rights are reserved by Sri Anath Nath Basu, the only authorised publisher and an humble devotee of Sri Sri Thakur Jitendranath, or his (the Publisher's) authorised Commitee or Person.

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের শ্রীমুখনিঃসৃত

অমৃত বাণী

প্রথম ভাগ

প্রকাশক—
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু
৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই পুস্তকের সকল স্বত্ব
শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রকাশক কর্ত্তৃক
সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান—
'অমৃতবাণী কার্য্যালয়'
৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট ও
'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির'
১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট

মুদ্রাকর—
শ্রীসুনীলকুমার বসু
"অমৃতবাণী প্রেস"
৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট

শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদান

প্রেমাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর যে অংশ এ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে নিম্নে নিবেদন করিতেছি। **অমৃত বাণী** চারিভাগ মধ্যে ১ম ও ২য় ভাগ ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে লিপিবদ্ধ করেন আমাদের পরম প্রিয় অজাত শত্রু ব্রহ্মচারী গুরু ভাই ৺সত্যেন্দ্র নাথ কুণ্ড। অমৃত বাণী ২য় ভাগে ত্রিংশ হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরম ত্যাগী, সংযমী ও আদর্শ ভক্ত জীবনের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, জীবন্মুক্ত-সাধু ও পরম ভাগবত আমাদের প্রিয় শিবুদা (খিদিরপুরের সাধু শিবকৃষ্ণ রায়) স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেন।

অমৃত বাণী ১ম ভাগটী মোট ৪০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে মধুর সুর, প্রাণস্পর্শী ৫৫টী গান, জীবন গঠনের বিশেষ সহায়ক সরস উপদেশ পূর্ণ ৭৪টী গল্প এবং সংসারীর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবন-গঠনমূলক সরল সহজ ভাষায় বহু উপদেশাবলীতে পূর্ণ।

অমৃত বাণী ২য় ভাগ ৪৮৬ পৃষ্ঠায় বহু গল্প গান ও মনপ্রাণ আকর্ষণ কারি বিশিষ্ট ও তত্ত্বপূর্ণ উপদেশে ভরা।

অমৃত বাণী ৩য় (ও ৪র্থ ভাগ) শ্রীশ্রীঠাকুরের নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক ও আমাদের অতি প্রিয় মান অভিমান শূন্য অমায়িক গুরু ভাই শ্রীযুক্ত অভয়কালী ঘোষ, এম্, এস্, সি, লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী ৩য় ভাগ ৫১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই ভাগে তত্ত্বপূর্ণ ৩৩টী গল্প, ৬৮টী অমৃত মধুর সঙ্গীত ও প্রত্যক্ষ আদর্শ জীবন গঠন উপযোগী অমৃতময় সরল উপদেশাবলী বদ্ধ সংসারীকে পবিত্র, সাধককে সিদ্ধ এবং সিদ্ধকে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভার্থে শক্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রেরণা দানে সক্ষম।

অমৃত বাণী ৪র্থ ভাগ অতুলনীয় অমৃত উপদেশে পূর্ণ। বর্ত্তমানে যন্ত্রস্থ। দুই মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে আশা করি।

অমৃত গীতি ১ম ও ২য় ভাগ শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্র নাথের স্বরচিত ২০২ খানি অতুলনীয় অমৃতে ভরা গানে পরিপূর্ণ। **ভাদুড়ী লেনস্থ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীরামপুর মঠে** বর্ত্তমানে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত এই সকল অমৃত মধুর সঙ্গীত দ্বারা সুধা কণ্ঠ ভক্তবৃন্দ পূজা আরাধনা করিয়া থাকেন। **৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীটে** প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সমুদয় সঙ্গীত দ্বারা পূজার্চ্চনা ও আরাধনায় সৎসঙ্গ করিয়া থাকেন। সজ্জন সাধকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল গানের সুর এই দুই স্থান হইতে শিখিবার সুযোগ পাইতে পারেন।

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত তিন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ ও দুইটী স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা আছে। যথা :—

(১) শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ মঠ—১০।১ হরিশ মুখার্জ্জী রোড। এই মঠের ভারপ্রাপ্ত সেবক—শ্রীঅভয়কালী ঘোষ।

(২) শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ মঠ—ভাদুড়ী লেন, শ্রীরামপুর। শ্রীশ্রী মা ও দিদি এই স্থানে আছেন। শ্রীকৃষ্ণবিহারী শীল ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শীল এখানের ভারপ্রাপ্ত সেবক।

(৩) শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ মঠ—অমৃত কুটীর, ভূতেশ্বর, কাশীধাম। শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এখানের ভারপ্রাপ্ত সেবক।

(৪) শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রম—সিদ্ধেশ্বরীতলা, রাণাঘাট। শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য এখানের আশ্রম সেবক।

(৫) শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন—পশুপতি ভবন। "অমৃত সঙ্ঘ"। ৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

"প্রকাশক-প্রসঙ্গ"

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন **ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর** "কথামৃতের" **সদৃশ** সকলের পরম আপন **প্রেমব্রহ্ম জগৎগুরু ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথ ও তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত "অমৃত বাণী"।**

'অমৃত বাণী' অমৃতে ভরে দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। অমরত্ব অভিলাষী মর জগতের মানুষ 'অমৃত বাণী'তে তা পাবেন।

মানুষের মনের মোড় ঘুরিয়ে, জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী করার সঠিক সহজ সিদ্ধান্ত পূর্ণ তত্ত্ব 'অমৃত বাণী'তে আছে।

ঠিক পথিকের পক্ষে 'অমৃত বাণী'ই প্রত্যক্ষ পথ ও পথের সহায়ক।

মনের,—সত্ব-শান্ত-বিবেকি-ত্যাগী-নিস্পৃহ-নির্লিপ্ত-নিশ্চিন্ত-অবিচল অবস্থা লাভের সহজ উপায় 'অমৃত বাণী'তে আছে। আরো আছে সদগুরুর অপূর্ব্ব আপনত্ব ও সৎসঙ্গের বিশুদ্ধ মাধুরী।

ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদর্শ সংসার তত্ত্বের, অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বের, বদ্ধ সংসারী—জীবন্মুক্ত তত্ত্বের, প্রবর্ত্তক-সিদ্ধেরসিদ্ধ তত্ত্বের সমন্বয়ে 'অমৃত বাণী'র অমৃত উপদেশ সর্ব্ব সজ্জন বৃন্দের প্রাণপ্রিয় সামগ্রী।

জীবাত্মাকে আত্মস্থ, সংসারীকে সাধু, স্বার্থপরকে মুক্ত হস্ত, মায়াবদ্ধকে চৈতন্যের অধিকারী কোরতে, এবারেও স্বয়ং পুরুষোত্তম জিতেন্দ্রগণের নাথ এলেন। ১৯৪৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সহজ ভাবে তাঁর শ্রীমূর্ত্তীর অদর্শন ঘটলেও, তাঁর নিত্য সঙ্গ ও অমৃত পরশ অনন্ত কাল ধ'রে অফুরন্ত ভাবে শুদ্ধ স্মরণাগত প্রার্থীদের ঈশ্বর লাভের গচ্ছিত পাথেয় অমৃত ধারায় প্রদান ক'রবে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত 'অমৃত বাণী'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে ও ভবিষ্যতে হবে তার লভ্যাংশ আমার অথবা শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনো শিষ্য ভক্তের নিজস্ব পার্থিব সম্পদ নয়। সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ও মদিয় আপন ৺ক্ষেমেন্দ্র মোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ সহোদর আমাদের পরম প্রিয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তি পরায়ণ সেবক মহারাজা প্রবীরেন্দ্র মোহন ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যসেবক মধ্যে শ্রীযুক্ত অভয়কালী ঘোষ (ভবানীপুর), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিহারী শীল (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় (ঢাকা), শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (কাশী), শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দে (ভবানীপুর) ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সেবকগণের মধ্যে শ্রীমান সুনীল কুমার বসু (ধ্রুব) ও শ্রীমান সমীর কুমার বসু (জয়) মোট এই আট জন সদস্য সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্মরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও পুস্তকাদি প্রকাশের মুদ্রন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য নিয়মিত ও সুচারু রূপে নির্ব্বাহনার্থে **'অমৃত সঙ্ঘ'** গঠন করিলাম।

এই সঙ্ঘের যাবতীয় পরিচালনা কার্য্য ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী ও পুস্তকাদি মুদ্রন, প্রকাশ ও তৎসমুদয়ের সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ভার উক্ত সঙ্ঘের সদস্যদের উপর অর্পন করিলাম।

উক্ত সঙ্ঘের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিগৃহ ৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ ভরসায় সংস্থাপন করা হ'ল। সদস্য পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন প্রভৃতির ক্ষমতা উক্ত সঙ্ঘ-সদস্যদের উপর ন্যস্ত করিলাম। সদস্য সমিতির আহুত সভায় উক্ত উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অমৃত সঙ্ঘের যাবতীয় কার্য্য স্থিরিকৃত ও সুপরিচালিত হ'তে থাকবে।

শ্রীশ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্।

বিনীত

'প্রকাশক'

[স্বাক্ষর—শ্রীঅনাথ নাথ বসু (কালী)]

বাং ২৬।৩।৫৬

ইং ১০।৭।৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ

"অমৃতবাণী কার্য্যালয়"
৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৩

পরম আরাধ্যা স্নেহময়ী মা জননী,

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী যাহা পুস্তকে প্রকাশিত ও বর্ত্তমানে অপ্রকাশিত আছে তৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ আপনার সুগোচরার্থে পুনঃ নিবেদন করিলাম।

(১) '***অমৃত গীতি*** ১ম ও ২য় খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রতিবার ১ হাজার কোরে বই ছাপান হবে এবং খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত অংশ থেকে ১ হাজার বই ছাপানর খরচ রেখে বাকী অর্থ দ্বারা মঠের যে সব মেয়েরা আমার নির্দ্দেশ মত নিয়ম অনুসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন কোরবে তাদের প্রয়োজনে ঐ টাকা ব্যয় করা হবে।'

(২) '***অমৃতবাণী*** বই-এর অর্থ দিয়ে ***অমৃতবাণীই*** ছাপান হবে।'

(৩) 'অন্যান্য যে সব বই আছে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রয়োজন মত বই ছাপান ও বাকী টাকা বই-এর প্রচার কাজেই লাগবে।'

(৪) 'কালী—তোমার ওপর এ সব কাজের ভার রইল।'—(নিজেকে এই গুরুভার বহন করিবার অযোগ্য ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করি—ঠাকুর, আমি একা পারবো ত? শ্রীশ্রীঠাকুর গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন) "যারা গুরুগত প্রাণ প্রয়োজন মত তারা সবাই তোমায় সাহায্য কোর্‌বে। তুমি স্থির বিশ্বাস রেখো। যাঁর কাজ তিনি ঠিক করিয়ে নেবেন ও তোমায় সেইমত, শক্তি ও বুদ্ধি যোগাবেন। স্থির জেনো গুরু আজ্ঞা পালন করার নামই গুরু সেবা।"

ইতি— সেবকাধম 'কালী'

১৫ই আষাঢ় ১৩৫৬ সাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

'শ্রীরামপুর মঠ'
১৭-৩-১৩৫৬

স্নেহের কালীবাবু—

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ-পত্র এই সাথে দিলাম। মা, আমার ও মঠের সকলের যে কি আনন্দ এই 'অমৃতবাণী' প্রকাশের কথা শুনে তা লিখে জানাতে পারছি না। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাকে খুব শক্তি ও উদ্যম দিন তাঁর শ্রীচরণে এই নিবেদন।

আপনার চির স্নেহের
দিদি 'অন্নপূর্ণা'

'মায়ের আশীর্ব্বাদ'

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

'শ্রীরামপুর মঠ'
১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৬

পরম স্নেহের বাবা কালী ও আমার সন্তানগণ—

শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আমার সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করি। কালীর উপর ঠাকুর তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত সমস্ত পুস্তকের ও তাঁর বাণী প্রকাশ ও প্রচারের সকল ভার দিয়েছেন। এই কাজে বাবা কালীকে তোমরা সবাই সহায়তা কোর্‌বে। ইহা কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের 'অমৃতবাণী' প্রকাশ ও প্রচার।

এই 'অমৃতবাণী' ভবিষ্যতে ঘরে ঘরে বিশেষ শান্তি দেবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা শ্রীমুখে বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্ব্বস্ব এইভাবে যে যত ভালবেসে তাঁকে আপন কোর্‌তে পারবে তার মানব জীবন তত পূর্ণ ও সহজে ধন্য হবে। এর চেয়ে সহজ উপায় এ যুগে আর কিছু আছে বোলে আমার জানা নেই। এই জন্যেই তো ভগবান্ ভক্ত বৎসল রূপ ধ'রে শ্রীশ্রীগুরুরূপে নিরুপায় অসহায় সন্তানদের জন্যে এলেন।

বাবা, তোমাদের সকলের ঠাকুরের চরণে খুব ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভরতা হোক, তাঁর শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা করি। 'অমৃতবাণী প্রেসের' সকলকে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি—

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা
ওঁ তৎ সৎ

পরম প্রিয় ভাই কালীদা (শ্রীঅনাথনাথ বসু)
সমীপেষু—

৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিরআপন ভাই কালীদা,

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময়ী 'অমৃতবাণী ৪র্থ ভাগ' (নূতন) ও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ভাগ—(মোট ৪ খণ্ডে) প্রকাশ করছ শুনে কত আনন্দ যে হ'লো তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। বাগবাজার মঠে ১৯৪৪ সালে বসন্ত পঞ্চমীর আগের দিনের কথা আমার মনে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত সমস্ত পুস্তকের ভার তোমাকে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন "এখন আর আমার ও সম্বন্ধে কোন চিন্তাই নেই, কালী যা হয় ব্যবস্থা করবে"। এই গুরুদায়িত্ব বহন করা সম্বন্ধে তুমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে যে কৃপা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আমার স্মরণে আছে যথা :—

(১) 'অমৃতগীতির' (১ম ও ২য় ভাগের) বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রতিবার এক হাজার ক'রে বই ছাপান হবে এবং খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত অংশ থেকে এক হাজার বই ছাপানর খরচ রেখে বাকি অর্থ দ্বারা মঠের যে সব মেয়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মত নিয়মানুসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করবে তাদের প্রয়োজনে ঐ টাকা ব্যয় করা হবে।

(২) 'অমৃতবাণী' বইএর অর্থ দিয়ে 'অমৃতবাণীই' ছাপান হবে।

(৩) অন্যান্য যে সব বই আছে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রয়োজন মত বই ছাপান ও বাকি টাকা বইএর প্রচার কার্য্যে লাগবে। শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেছিলেন তোমার ওপর এইসব কার্য্যের ভার রইল * * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণী ঘরে ঘরে পঠিত হবে, কত সংসারীর তাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি এনে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার নির্দ্দেশ দিলেন না। তাঁর অতুলনীয় অমৃতবাণী, অমৃতগীতি এখনও তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গ দান করছে ও চিরদিন করবে। তাঁর ভাবধারায় মঠ ঘরে ঘরে গড়ে উঠবে, পুস্তকাকারে তাঁর অমৃতধারা বাণী প্রচারের গুরুভার তিনি তোমাকে দিয়ে গেলেন। ভাই তুমি ধন্য।

তাঁর পরম আপনদের ভিতর পরম প্রিয় একজন তুমি। তাই আমাদের কাছে তাঁর অমৃতবাণী মন্ত্র, প্রত্যেক দিনের ঘটনা যখন পড়ি ধ্যানের কাজ হয়ে যায়। কি আশ্চর্য্য! আধ্যাত্মিক পথের এমন কোন জটিল সংশয় নেই যা ঐ চারি খণ্ড অমৃতবাণী সহজে দূর করতে না পারে। একথা ভাবালুতা বা অতিরঞ্জিত উক্তি নয়।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি—একমাত্র পুত্রের শোকে সন্তপ্তা জননী অমৃতবাণী পাঠে শান্তি পেয়েছে। যখন সংসারের নিষ্পেষণে মানুষ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছে, সমস্ত বায়ু যার কাছে বিষিয়ে উঠেছে অমৃতবাণীর মধ্যে সে পেয়েছে আশা ও শান্তির আলো, অমৃতের সন্ধান, দাঁড়াবার ভিত্তি। হবে নাই বা কেন? এবার তিনি এসেছিলেন কাল-প্রপীড়িত তাঁর শরণাগত সংসারীদের উদ্ধার করবার জন্য। অন্যান্য বারের মত শীল সাধন, যোগ, প্রাণায়াম বা পৃথক কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা তিনি করেন নি। বলতেন "গুরুতে বিশ্বাস রেখে ঠিক ঠিক তাঁকে ভালবাসলে তিনি নিজে তার সকল ভার বহন করেন। এই ঘোর কলিযুগে মানব জীবন ধন্য করার সবচেয়ে সহজ উপায় গুরুনিষ্ঠার দ্বারা তাঁকে আপন ভাবা ও তাঁর হওয়া। সদ্‌গুরুকে সন্দেশ খাওয়ালে বা অর্থ সম্পদ ভেট দিলে গুরুসেবা হয় না। দেহ-মন-প্রাণে, ভালবাসার টানে, তাঁকে পরম আপন-সর্ব্বস্ব জ্ঞানে গুরুআজ্ঞা পালন কবার নামই গুরুসেবা"।

তিনি নিজেই আমাদের ভালবেসে গেলেন। যো সো করে যে-ই তাঁর সঙ্গ করেছে সেই তাঁর কৃপা পেয়েছে। এখনও তাঁর আশ্রিতরা দৈনন্দিন জীবনে তাঁর পরশ পাচ্ছে। এতো আর কথার কথা নয় ভাই এ প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা যখন তাঁর সঙ্গ করেছি কত ভাবের কতকথাই না হয়েছে, আর কি সুন্দর সহজ ভাবেই না তার মীমাংসা তিনি করেছেন ও অন্তরে তা গেঁথে দিয়ে গেছেন। অতি সাধারণ বদ্ধ সংসারীর দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার কথা থেকে এ যুগে ঈশ্বর লাভের সহজ উপায় সম্বন্ধে তাঁর মীমাংসা ও নির্দ্দেশ অতুলনীয়। একমাত্র যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যে গোপনে ধরায় পুনরাবির্ভাব হয়েছিল যারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ লাভ করেছে—তাদের আর এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

বহু ভাগ্যে তাঁকে আমরা দেখেছি, তাঁর পরশ পেয়েছি, তাঁর কথা শুনেছি, তা না হলে এ রকম বিরাট আপনত্বের মহান মূর্ত্তী জাগতিক বুদ্ধি তত্ত্বের দ্বারা নাগাল পেতো না। চার ভাগ অমৃতবাণীতে মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েক মাসের অমূল্য উপদেশাবলী লেখা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অফুরন্ত কৃপা তাঁর আশ্রিত সকলের ওপর বর্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই কাজ তিনি নিজেই করেন—তোমায় যার জন্য তিনি উপলক্ষ্য করেছেন ও যাদের এই কাজে তোমায় সহায়তা করবার প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমি একবাক্যে আবার বলি তারা সবাই ধন্য। শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্।—ইতি

২৭শে জুন, ১৯৪৯ — শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত

"অমৃত কুটীর" — তোমার চির আপন

২৫নং ছুটে — অপূর্ব্ব

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা
শ্রীরামপুর মঠ
১৭।৩।১৩৫৮

স্নেহের কার্ত্তিবাবু

শ্রীশ্রীমায়ের আশির্ব্বাদ
পত্র এই মাত্র দিলাম।
মা, আমার ও মঠের
সকলের যে কি আনন্দ
এই অমৃত বাণী প্রকাশের
কথা শুনে তাহা লিখে
জানাতে পারছিনা। শ্রীশ্রী
ঠাকুর আপনাকে খুব শক্তি
ও উদ্যম দিন তাঁর শ্রীচরণে
এই নিবেদন। আপনার চির
স্নেহের দিদি অন্নপূর্ণা

শ্রীশ্রী ঠাকুর ভরসা

শ্রীরামপুর মঠ

১৭ আষাঢ় ১৩৫৬

পরম স্নেহের বাবা কালি ও আমার
সন্তান গণ,

শ্রীশ্রী ঠাকুরের ও আমার
সন্তানদের আশির্ব্বাদ করি। কালীর উপর
ঠাকুর তাঁর শ্রীমুখ নিসৃত সমস্ত পুস্তকের
ও তাঁর বাণী প্রকাশ ও প্রচারের সকল
ভার দিয়েছেন। এই কাজের বাবা কালী
কালীকে তোমরা সবাই সহায়তা
কোরবে। ইহা কাহারও নিজের
সম্পত্তি নয়। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রী
ঠাকুরের অমৃত বাণী প্রকাশ ও প্রচার।
এই অমৃত বাণী ভবিষ্যতে জগৎকে খুব
বিশেষ শান্তি দিবে শ্রীশ্রী ঠাকুর

স্বয়ং ইহা শ্রীমুখে বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্ব্বস্ব — হিসাবে যে যত ভাল বেসে তাঁকে আপন কোরতে পারবে তার মানব জীবন তত পূর্ণ ও মহত্ত্বোদীপ্ত হবে। এর চেয়ে সহজ উপায় মুক্তো আর কিছু আছে বোলে আমার জানা নাই।

এই জন্যেই তো ভগবান ভক্ত বৎসল রূপধরে শ্রীশ্রীগুরুরূপে নিরুপায় অসহায় সন্তানদের জন্যে এসেছেন।

বাবা, তোমাদের সকলের ঠাকুরের চরণে খুব ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভরতা হোক, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি। অমৃতবাণী প্রেসের সকলকে আমার শুভ আশির্ব্বাদ দিও। ইতি

তোমাদের চির স্নেহময়ী মা।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ গুরুদেব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের

শ্রীচরণকমলে,-

দেব,

তোমারি সৃজিত তরু, তোমারি সৃজিত ফুল,
তোমারি চরণে দিতে, আনিয়াছি সেই ফুল।

তোমার পূজার মন্ত্র, তোমারি 'অমৃতবাণী',
তাই দিয়ে করে পূজা আপনারে ধন্য মানি।

আমিও তোমারি, যেন এই কথা রাখি মনে,
জীবনে মরণে প্রভু, রহিব তোমারি সনে।

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত

গ্রন্থকার।

তোমার অমৃতকথা, শ্রবণে জুড়ায় ব্যথা,

তৃষিত হৃদয়ে ঢালে শান্তির অমৃতবারি ;

করে দুঃখ মোহ নাশ, কাটে করম পাশ,

অকুল দুস্তর ভব-সাগর-তারণ-তরী ।

ভূমিকা।

যাঁহার অপার করুণা এবং অলৌকিক শক্তিতে এই পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব হইয়াছে আমার সেই পূজ্যপাদ গুরুদেবের চরণে প্রণাম। তাঁহার কথাগুলি তাঁহারই শক্তিতে আমি লিখিয়া লইয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। তবে তিনি আমার দ্বারা এ কার্য্য করাইয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা।

কথোপকথনের সময়েই এই সকল কথা যথাযথ লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে হইয়াছে, সেজন্য মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কিছু আছে; আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রথম সংস্করণে সে সকল দোষ গ্রহণ করিবেন না।

ঠাকুর স্থানে স্থানে যে সকল শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নাম-ধামের উপর অতটা লক্ষ্য রাখেন নাই; ভাবের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। কাজেই সকল জায়গায় নাম-ধাম ঠিক্ নাও থাকিতে পারে।

বইএতে অনেকের নাম সংক্ষেপে দেওয়া আছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য তাঁহাদের পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এই পুস্তক লিখিতে ও প্রকাশ করিতে আমার গুরুভ্রাতাদিগের যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। সেজন্য আমি তাঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু (কালাবাবু) এই পুস্তক প্রকাশকের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায় মুদ্রণ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরদেব

গঙ্গোপাধ্যায় এবং গণদেব গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁহাদের প্রেসে বই ছাপাইতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা ও সাহায্য না হইলে দুই মাসের মধ্যে এত বড় বই প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক্তার সাহেব) ও হরিকেশব মিত্র (ইঞ্জিনিয়ার সাহেব) প্রুফ সংশোধন করিতে আমার খুব সহায়তা করিয়াছেন। এই কার্য্যের ভার একরকম ডাক্তার সাহেবের উপরই ছিল। তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও বিশেষ উৎসাহের সহিত সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও কালীবাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

ঠাকুরের কথা যাহা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে, এ খণ্ডে তাহার কতক অংশ মাত্র ছাপান হইল। বেদান্তমত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, রামচরিত্র, কৃষ্ণ-চরিত্র, সমাজনীতি, ইত্যাদি বহু বিষয়ের সুন্দর সুন্দর কথোপকথন দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপান হইতেছে। সে খণ্ডও শীঘ্রই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা হইবে।

আশ্বিন, ১৩৩৩ বাং;
ভবানীপুর, কলিকাতা।

নিবেদক—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।

অমৃতবাণী প্রথম ভাগ

গানের সূচি

অমৃতবাণী প্রথম ভাগ

উপদেশপূর্ণ গল্পের সূচি

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের ৪৪শং জন্মতিথি উপলক্ষে গৃহীত ফটো হইতে

(অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ১ পৃষ্ঠার সম্মুখে)

Emerald Ptg. Works, Calcutta

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের

অমৃতবাণী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত।

জন্মস্থান ও পূর্ব্বপুরুষ।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত, মাঝেরগ্রামের প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

মাঝেরগ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ বহু প্রাচীন এবং সেখানকার প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন জমিদার। ঐশ্বর্য্য ও মান-সম্মান তাঁহাদের প্রচুর পরিমাণে ছিল। নিজেরাই শুধু সম্পদ লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, এ ভাব তাঁহাদের ছিল না। গ্রামের সকল প্রজা এবং প্রতিবেশীও যেন সুখে শান্তিতে সংসার পরিচালনা করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় ও যত্নে গ্রামটি খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। প্রায়ই শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। দূরদেশ হইতেও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইত; বিচার হইত। সে সব জায়গা এখনও আছে। গ্রামের প্রান্তে বড় বাজার ছিল। সেখানে দূরদেশীয় পথিকদিগের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। একদিকে যেমন শাস্ত্রচর্চ্চা হইত, তেমনি আবার গান-বাজনা, খেলাধূলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদেরও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়া থাকেন,—

মাঝেরগ্রাম।

"গ্রামটী বড় সুন্দরভাবে সাজান ছিল; সব রকম লোকের বাস ছিল; প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিষই পাওয়া যেত; শাস্ত্রালোচনা, গান-বাজনায় সব সময় মুখরিত থাকত। একটা যেন আনন্দের মেলা ছিল। জায়গায় জায়গায় গান, বাজনা, খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে।"

মুখোপাধ্যায়দের খুব বড় পরিবার। জ্ঞাতি দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনে গ্রাম পরিপূর্ণ। খুব বড় বাড়ী; এখনকার প্রায় ধ্বংসাবশেষ অবস্থা দেখিলেও মনে হয়, এক কালে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ী; অনেক অংশই পড়িয়া গিয়াছে। এই বাড়ী দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসের তের পার্ব্বণের আনন্দে মুখরিত থাকিত। তাহা ছাড়া অন্যান্য সময়েও গান-বাজনা, খাওয়া দাওয়া প্রায়ই চলিত। গ্রামস্থ সকলের সুখে আনন্দের দুঃখে শান্তির ও বিপদে আশ্রয়ের স্থান ছিল এই বাড়ী। তাঁহাদের দ্বারা বহু লোক প্রতিপালিত হইত। এখনও বাড়ীতে দোল ও শ্যামাপূজা করা হয় এবং সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। যখনই যে কোন অতিথি আসে তাহার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্ম্ম-পরায়ণতা, অতিথিসৎকার ও পরোপকার এই পরিবারের সকলেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। সম্পদ এবং ধর্ম্মভাব দুইই বিশেষ পরিমাণে থাকার দরুণ তাঁহাদের দ্বারা বহু লোকের উপকার হইত। হাতী, ঘোড়া, লোকজন, বহুমূল্য আসবাবপত্র প্রভৃতি সেকালের জমিদারের প্রয়োজনীয় সকল জিনিবই প্রচুর পরিমাণে ছিল।

মুখোপাধ্যায় পরিবার।

এই বংশের স্বর্গীয় যদুবর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঠাকুরের পিতামহ। তিনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ তেমনি সকল সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, উদার, পরোপকারী ও সদা আনন্দময় ছিলেন। গান বাজনাএবং লোককে খাওয়ান দাওয়ানতে তাঁহার খুব আনন্দ ছিল। নিজেও গান বাজনায়

পিতামহ।

পারদর্শী ছিলেন এবং বেশ আহার করিতে পারিতেন। বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলকে যেমন আদর যত্ন করিতেন, সেই রকম গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলেন, "ঠাকুরদা সকালে জল খেতে বসতেন, বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বউ, ঝি, সকলকেই আসতে হবে। খুব বড় কেট্‌লীতে চা হচ্ছে, প্রকাণ্ড সন্দেশের তাল ও মুড়ির স্তূপ আছে। নিজেও খাচ্ছেন, অপর সকলেও খাচ্ছে। তারপর নিজের লাঠিটে নিয়ে গ্রামে বেরুলেন। দেখতেও সুপুরুষ ছিলেন; গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, অতি সুন্দর চেহারা ছিল। ঘুরে ঘুরে সব বাড়ীতে যাচ্ছেন; তাদের সকলকে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করছেন।"

তাঁহার আর এক বড় ভাই ছিলেন, স্বর্গীয় কাশীবর মুখোপাধ্যায়। তিনি খুব বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। তাঁহাকে সকলে ভয় করিত ও সম্মান করিত। তাঁহার দুই পুত্র, অম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ খুব বুদ্ধিমান ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। অম্বুজনাথের দুই পুত্র, মণীন্দ্রনাথ ও তারানাথ মুখোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র, অমূল্যনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারাই এখন সেই বাড়ীতে বাস করেন। সুরেন্দ্রনাথের এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন, নাম কুমুদবালা দেবী। তিনি ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন ও ভালবাসেন; মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন।

ঠাকুরের পিতামহী বহুসদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন; খুব ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন এবং তাঁহার অদ্ভুত সঙ্গীতশক্তি ছিল। তিনিও আনন্দময়ী ছিলেন; সকলকে লইয়া আনন্দ করিতেন। কাহাকেও একলা থাকিতে দিতেন না। বলিতেন, 'একলা থাকলে নানান চিন্তা আসে।' তিনি একজন পাকা গিন্নী ছিলেন। কিভাবে সংসার চালাইতে হয়, সংসারে কি কি জিনিষ আবশ্যক, সব তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এদিকে

পিতামহী।

খুব শিক্ষিতা ছিলেন; ভাল সংস্কৃত জানিতেন; রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য পড়িতেন। তাঁহার শাসন খুব কড়া ছিল; আবার সকলকে ভালবাসিতেন। কাজেই সকলে যেমন তাঁহাকে ভালবাসিত, তেমনি তাঁহার ভয়ে কোন নীতির ব্যতিক্রম করিত না।

পিতা।

যদুবর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পিতা। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার খুব নীতিবল ছিল। সময় এবং নীতির উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গান বাজনায় তাঁহারও খুব অনুরাগ ছিল। ইহা তাঁহাদের বংশগত। নিজেও খুব ভাল গান করিতে পারিতেন। কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর ছিল। গান বাজনা এবং খাওয়ান দাওয়ান তাঁহার খুব ছিল; কিন্তু নিজের খাওয়া দাওয়ার উপর খুব একটা ঝোঁক ছিল না।

মাতা।

ঠাকুরের মাতা স্বর্গীয়া কিরণশশী দেবী শান্তিপুরের দত্তপাড়া গ্রামের স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাসম্পন্না ও দেবী-স্বভাবা ছিলেন। দত্তপাড়ার ঘোষাল পরিবারও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষাল মহাশয়ের আরও দুই ভাই ছিল, শশিভূষণ ও রামকৃষ্ণ ঘোষাল। কালীপ্রসন্নের তিন কন্যা ও এক পুত্র। বড় কন্যাই ঠাকুরের মাতা। পুত্রটি মারা যায়। সেই সম্পত্তি ঠাকুর পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার ব্যবহার করেন নাই।

জন্ম ও শৈশব

জন্ম।

এই প্রকার ঐহিক এবং স্বর্গীয় সম্পদে বিভূষিত পিতৃমাতৃকুল উজ্জ্বল করিয়া ঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ১২৮৯ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথিতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র-

নাথ ভূমিষ্ঠ হন। জিতেন্দ্রনাথের উদয়ে দিননাথ লজ্জায় মুখ লুকাইল; শুভ অমানিশার প্রারম্ভে মহামায়ার সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নবজাত শিশু বাড়িতে লাগিল। তিনমাস মাত্র মায়ের কাছে ছিলেন। ঠাকুরমা লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার আদরে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। জগতে অসাধারণ ভাব লইয়া যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের জীবনের আরম্ভ হইতে সকল কাজ, খেলাধূলা পর্য্যন্ত, সাধারণ হইলেও তাহাতে একটা বিশেষত্ব থাকে। তবে সকল সময় তাহা সকলের চোখে পড়ে না। সেই শৈশবকালেও ধর্ম্মভাব ঠাকুরের সকল কাজের মধ্যে দেখা যাইত। নিজেই বলিয়াছেন,—

শৈশব।

"জ্যেঠাইমা বলতেন, যখন জ্ঞান হয়নি, ছোটবেলা, কালী ঠাকুর গড়ে পূজা করছি। আবার ধুলো কাদা মেখে সাপ ধরে খেলা করছি, সকলকে ভয় দেখাচ্ছি; নিজের ভয় টয় বড় ছিল না।"

ধর্ম্মভাব।

সাধারণ না চিনিলেও সাপ ঠিক্ চিনিয়াছিল; তাই পরজীবনেও দুইবার আসিয়া পদস্পর্শ করিয়া গিয়াছিল।* গানের শক্তিও তখন হইতে দেখা গিয়াছে। তিন চার বৎসর বয়সে মেয়েরা সাজাইয়া দিত, নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেন।

বাল্য-জীবন।

বাল্য-জীবনেও সে ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। ধর্ম্মপ্রাণতা, দয়া, পরোপকারেচ্ছা, ত্যাগের ভাব তখন হইতেই বিশেষভাবে দেখা যায়। আবার ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ও তেজীয়ান ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠরাও ভয় করিত। ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;—

---

* ১১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

"সঙ্গীদের নিয়ে সাপ ধরে পাখী ধরে বেড়াতুম। কখনও হয়ত কাপড়টা কাকেও বিলিয়ে দিয়ে নেংটা হয়ে বাড়ী আসতুম। আবার এমন গোঁ হ'ত, একজনকে মেরে শেষ করে দিতুম; তাকে দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে। বার বছর পর্য্যন্ত ভয়ানক হাত ছুটত; রেগে চারিধারে ইট ছুঁড়ছি, বাড়ীতে সব দোর দিয়ে বসে আছে। ঠাকুরমা তাই রাগ করে বলতেন, 'শান্তিপুরের ঘোষালে গোঁ এসেছে।' ছোটবেলাও এটা ঠিক্ ছিল, পূজার ঘরে ঢুকে হু'তিন ঘণ্টা বসতুম। পিতা ঠাট্টা করে বলতেন, 'এ যে এতক্ষণ বসে আছে, ভাল জামা ভাল জুতা যাতে হয় তাই বলছে; ও ঠাকুরের কি বোঝে'?"

খেলাধূলা ও পূজা-আহ্নিক।

খেলাধূলা, গান প্রভৃতি নানা ভাবে তখনই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলকে আনন্দ দিতেন। বাড়ীর ও গ্রামের পুরুষ নারী সকলেই ভালবাসিত। ধর্ম্মপরায়ণতা, গান-বাজনায় অনুরাগ, তেজস্বিতা এবং আহারপ্রিয়তা এই কয়টী তাঁহাতে বিশেষভাবে দেখা যায়। এ সকল গুণের পরিচয় সেই বাল্যজীবনেই পাওয়া গিয়াছিল।

এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পাড়ার মেয়েরা বড্ড ভালবাসত। ওদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় যেতুম, যা হয় একটা খাবার করে রাখত; হয়ত হুটো একটা গান শোনাতুম, আর ওই খাবার খেয়ে আসতুম। কোন দিন না গেলে দৌড়ে আসত। কেউ আবার একটা কাঁটাল কি নারকল চাইলে তা লুকিয়ে চুরিয়ে দিয়ে দিতুম। বাবাকে যা একটু ভয় করতুম, আর বড় কাকেও গ্রাহ্য করতুম না। তারাও খুব ভালবাসত। যেদিন যা, খাবার করে রাখত। কুলের আচার করে রাখত (গ্রামে কুলচুর বলে)। দুধ খেতে পারতুম না বলে সর করে রাখত। সকালে কি বিকালে একবার যেতেই হবে।"

পাড়ার মেয়েদের আদর যত্ন।

ছোট বেলা থেকেই মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা ছিল। মায়ার আকর্ষণ

তখনও বড় ছিল না। নয় বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। মাতার বাঁকিপুরে মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন, "মা বাঁকিপুরে ছিলেন ; ওখানেই মারা যান। আমি খেতে বড় ভালবাসতুম। মা ভাল খাবার করতে পারতেন। সে অসুখ অবস্থায়ও উঠে খাবার করে দিতেন। বারণ করলেও শুনতেন না। মৃত্যুর সময় আমায় বলছেন, 'আমি ত যাচ্ছি, তোমার দুঃখ হচ্ছে না ?' আমি বললুম, না। মায়া-টায়াগুলো ছোটবেলা থেকেই কম ছিল। ঠাকুর-মার কাছেই থাকতুম, মার কাছে ত বড় থাকতুম না।" ঠাকুরের মৃণালবালা দেবী নামে এক ছোট ভগ্নী ছিল। তাঁহার অতিশয় শান্ত প্রকৃতি ছিল এবং ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি ছিল। তিনিই মার কাছে থাকিতেন।

মাতৃবিয়োগ।

নয় বছর বয়সে কালীঘাটে উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে পড়িতেন। তখন পাখী ধরা, পোষা ও ঘোড়ায় চড়ার খুব সখ ছিল। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

উপনয়ন ও বিদ্যারম্ভ।

"ঘোড়ায় চড়তে খুব ভাল বাসতুম। কোনদিন হয়ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতুম। রস্কে (রসিক ডোম) * সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত। এক একদিন দেরী হয়ে যেত ; দুটোর সময় হয়ত ফিরছি। চারিদিকে লোক সব খুঁজতে বেরিয়েছে। বাড়ীর কেউ খায়নি, বসে আছে। পাখী আর জীবজন্তু খুব পুষতুম। নানারকম পশুপক্ষী, জীবজন্তুতে বাড়ী ভর্ত্তি থাকত ; বেড়ালও খুব ছিল। আনতুম, পুষতুম ; তবে বিশেষ লক্ষ্য রাখতুম না। কিছুদিন পরে একবার সব তাড়িয়ে দিলুম।"

ঘোড়ায়চড়া, পাখী পোষা।

---

* রসিক ডোম ঠাকুরের একান্ত প্রিয় অনুচর ছিল। তাহাকে ছেলের মত ভালবাসিতেন। সেও তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত। দ্বারিক রুদ্র নামে এক লেঠেল তাঁহাদের দরজায় থাকিত। সে ও তাহার স্ত্রী ঠাকুরকে মানুষ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রীকে 'আই' বলিয়া ডাকিতেন।

কৈশোর ও যৌবন।

গান-বাজনা আর পোষাক-পরিচ্ছদের খুব সখ ছিল। খুব বাবু ছিলেন। দামী কাপড়, জামা, জুতা ছাড়া পরিতেন না। তাঁহার ঠাকুরমা, পিতা ও তিনি একসঙ্গে বসিয়া গান করিতেন। বাড়ীতে গান বাজনার চর্চ্চা ছিল, তাহাতেই শিখিয়াছেন।

গান বাজনা।

তারপর কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসেন। যেখানেই যান, তাঁহার গুণে সহজেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; সেখানে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। তাঁহাকে ঘেরিয়া কলিকাতায়ও একটি দল গড়িয়া উঠিল। সমস্ত ছেলেরা তাঁহাকে ভাল বাসিত এবং মান্য করিত। সেখানেও খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা প্রায়ই হইত। আবার নানারকম ব্যায়াম এবং খেলার ব্যবস্থা ছিল। সে সব সঙ্গীরা ছুটীর সময় তাঁহার সঙ্গে মাঝেরগ্রামে গিয়া একমাস দেড়মাস করিয়া থাকিত। পনের বছর বয়সে ঠাকুরদার মৃত্যু হয়। তাঁহার কলিকাতায়ই মৃত্যু হয়।

কলিকাতায় অধ্যয়ন।

কুড়ুলগাছির বিখ্যাত মজুমদার বংশের স্বর্গীয় ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীশ্রীপ্রভাসিনী দেবীর সহিত ঠাকুরের বিবাহ হয়। তখন ঠাকুরের বয়স সতের বৎসর। কুড়ুলগাছির মজুমদারেরাও খুব ক্ষমতাবান, সম্মানী, সম্পদশালী জমীদার।

বিবাহ।

দীক্ষা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন, "কুলগুরুর নিকট দীক্ষা হয়, বোধ হয়, সতের বৎসরে। ঠাকুরমার সঙ্গে ভাটপাড়া গেছি, তিনি (কুলগুরু) দেখে বললেন, একে বড় ভাল দেখছি। আমি দীক্ষা দিই। আজ দিনও ভাল।" সেই দীক্ষা হ'ল। তাঁর বড় শান্ত স্বভাব ও দেবমূর্ত্তি ছিল।"

কুলগুরুর দীক্ষা।

পিতামাতা হইতেও ঠাকুরমার সঙ্গেই বরাবর তাঁহার বেশী সম্বন্ধ ছিল। ঠাকুরমারও তাঁহার উপর অসীম ভালবাসা ছিল। ঠাকুরমাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন। বাড়ীর অন্যান্য সকল নাতীরাও তাঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিত। ঠাকুরদা এত ভালবাসিতেন যে, যখন যাহা চাহিতেন তখনই তাহা দিতেন।

ঠাকুরমার ভালবাসা।

ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ঠাকুরমা আমায় এত ভালবাসতেন যে, না দেখে থাকতে পারতেন না; না দেখলে আহার করতেন না। একবার সমস্ত বাড়ী ভেঙ্গে গেছে; আমরা সকলে কলকাতায় এসে আছি। একদিন পিতার সঙ্গে কথায় কথায় একটু বচসা হয়; সেই রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। তখন বয়স সতের বৎসর। পালিয়ে মামার বাড়ী যাই। এদিকে ঠাকুরমা সকালে উঠে পাগলের মতন হয়ে গেছেন। চারদিকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। বাড়ীতে রান্না খাওয়া বন্ধ। ঠাকুরমা তিন দিন জল পর্য্যন্ত খাননি। 'গতি' জ্যেঠা ম'শায় (রামগতি মুখোপাধ্যায়) আমায় মানুষ করেছেন, আমাদের বাড়ীতে থাকতেন; তাঁকে আমি 'বাবু' বলতুম, তিনিও আমাকে 'বাবু' বলে ডাকতেন; তিনি খবর পেয়ে মামার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুরমার কথা বললেন যে, 'তিনি অন্নজল ত্যাগ করেছেন।' আমাকে তখনই যেতে হবে। আমিও ঠাকুরমার কথা শুনে আর থাকতে পারলুম না; চলে এলাম। আমায় দেখে তবে ঠাকুরমা জল খেলেন।"

পলায়ন।

উনিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরমা এবং পিতা দু'জনেরই মৃত্যু হয়। এই সম্বন্ধে ঠাকুরের মুখে এইরূপ শুনিয়াছি;—"ঠাকুরমা মানুষ করেছিলেন; ঠাকুরমা মলেন। পিতাও মলেন। সকলে ভেবেছিল, ঠাকুরমার বেলা খুব কষ্ট হবে, কিন্তু কিছুই হ'ল না। তাঁরা সব কলকাতাতেই মারা গেলেন। বাবার হঠাৎ মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত ছিলুম।"

ঠাকুরমা ও পিতার মৃত্যু।

২

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সম্পূর্ণ ভার ঠাকুরের উপর পড়ে। পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি ও চাল তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন। বাড়ীতে লোকজন খাওয়ান দাওয়ান, গান-বাজনা, আমোদ-উৎসব রাতদিন লাগিয়া থাকিত। বাড়ী এবং সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক ছিলেন ঠাকুর। সাংসারিক সমস্ত ভার, লোকজনের আদর-অভ্যর্থনার ভার তাঁহার উপরই ছিল। দেশ বিদেশ হইতে বড় বড় গায়ক আসিত। অপরাপর লোকজনও যে যখন আসিত, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেন।

সংসারের ভার।

শুনিয়াছি, একদিন রাত্রি বারটার সময় পথ ভুলিয়া প্রায় দশ বারজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা কাকুতি মিনতি করিয়া রাত্রে থাকিতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা এত কাকুতি মিনতি করছেন কেন? ভদ্রলোকের বাড়ী এসেছেন; ভয় কি? বসুন।" তখনই নানারকম রন্ধন হইতে লাগিল। তাঁহাদের আহারের পর শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরদিন আবার গন্তব্য স্থানে গরুর গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

অতিথিসেবা।

শুধু নিজ গ্রামবাসী নয়, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরাও ঠাকুরকে খুব ভালবাসিত। গরীবপুরের স্বর্গীয় কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার খুব আলাপ ছিল। ঠাকুর বলিয়াছেন,—"তাঁর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি ব্রহ্মানন্দস্বামী নাম নিয়েছিলেন। পঞ্চমুণ্ডির আসন করেছিলেন; মা কালীর মূর্ত্তিও স্থাপন করেছিলেন। শুনেছি সে সব এখনও আছে। বড় ভাললোক ছিলেন। আমার সঙ্গে খুব সদ্ভাব ছিল। তিনি আমার একটা ফটো নিয়েছিলেন। একদিন বললেন, 'তোমার একটা চেহারা আমার কাছে থাক।' তারই এক কপি

স্বর্গীয় কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বাবস্থার ছবিটি) আমায় দিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন ও খুব উদার মন ছিল। তিনি দেহ রক্ষা করেছেন। তাঁর সদ্ব্যবহার ও ভালবাসা আমার সর্ব্বদা মনে আছে। তাঁকে দেখলে আমার বড়ই আনন্দ হ'ত।"

এ সব কার্য্যের মধ্যেও ঠাকুরের নীতিবল খুব ছিল। নিজের যখন যেটী করিবার, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। সকালে সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। দুই তিন ঘণ্টা পূজায় আহ্নিকে কাটিয়া যাইত। ইহার কিছুতেই ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। ঠাকুরের তখনকার দৈনিক কার্য্য সম্বন্ধে সামান্য আভাস শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদারের (মাতাঠাকুরাণীর ছোট ভাই) নিকট যাহা শুনিয়াছি, লিখিলাম।

দৈনিক কার্য্য পদ্ধতি।

"তখনই খুব ভোরে উঠে ঘরে যে সব দেবদেবীর ছবি থাকত, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একে একে সে সব দেখতেন, প্রণাম করতেন। সে সময় কাছে কেউ গেলেও বোধ থাকত না।" এ সম্বন্ধে সুরেন চাটুয্যে মহাশয়ও বলিয়াছেন, "ঠাকুর পাঁজি হাতে করেছেন, তাতে যে সব ছবি আছে একে একে দেখছেন, প্রণাম করছেন। রোজ এ রকম করতেন। পাঁজি হাতে করলেই প্রত্যেক ছবিটি দেখা চাই, প্রণাম করা চাই।" শ্রীযুক্ত কিরণবাবু বলিয়াছেন,—"তারপর হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরে যেতেন। দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা সেখানে থাকতেন। বেরিয়ে এসে কেশবিন্যাস করতেন। তারপর বেশ ভালরকম জলযোগ হ'ত। পরে ডাক্তার ম'শায়ের সেখানে যেতেন।

ডাক্তার মহাশয়।

"ডাক্তার ম'শায়ের খুব কাছেই বাড়ী; তিনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মহাপুরুষ ছিলেন। ডাক্তারী করতেন বলে ঠাকুর ডাক্তার ম'শায় বলে ডাকতেন। তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তিনিও খুব ভালবাসতেন। ডাক্তার ম'শায়ের সেখানে শুধু ধর্ম্মালোচনা হ'ত। ডাক্তার ম'শায় কোন কোন দিন ছানা গুড় আর যা থাকত খেতে দিতেন।

"তারপর নীচের কাছারীতে এসে কিছুক্ষণ বসতেন। জমিদারীর কাজ দেখতেন; প্রজা কিংবা অপর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতেন। দশটা এগারটায় চান করে আহার করতেন। খেয়ে এসেই খানিকক্ষণ পায়চারী করতেন। সামান্য বিশ্রাম করতেন; বড় ঘুমাতেন না। তিনি ডাব খেতে ভালবাসতেন, বিকালে প্রায়ই ডাব খাওয়া হ'ত। তারপর বড় রকমের জলখাবার হ'ত। আবার ডাক্তার ম'শায়ের সেখানে যেতেন। সেখান থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ বেড়াতেন। সন্ধ্যায় হাত মুখ ধুয়ে আবার পূজা আহ্নিক করতেন। পূজার পর বাইরের ঘরে আসতেন।"

গান বাজনা।

"গান বাজনা চলছে, নিজে খুব ভাল গাইতে পারতেন; তবলা বাজাতে পারতেন। রাত্তিরে দশটায় খেতেন; নিজে খেতে বসতেন, যারা যারা সঙ্গে থাকত তারাও বসত। লুচি, ঘি-ভাত কিংবা পোলাও হ'ত; রাত্রে ভাত খেতেন না। মাছ মাংস প্রচুর পরিমাণে চাই। আহারের পর আবার বাইরে আসতেন। রাত একটা পর্য্যন্ত গান বাজনা চলত। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (ঠাকুরের মামা), মন্মথ বাঁড়ুয্যে, সুরেন চাটুয্যে ম'শায় এঁরা সব গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন। বিদেশ থেকেও বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে আসত। আর যেই একটা বাজল অমনি উঠে শুতে চলে গেলেন। এ নীতির একচুল এদিক ওদিক হ'ত না। পোষাকের খুব জাঁগজমক ছিল। দামী পাম্প-সু, ভাল ধুতি, ভাল জামা গায়ে থাকত। হাতে দুই তিনটী আংটী থাকত। ছড়ি নিয়ে চলতেন। সাধারণ, তাঁর বাইরের চালচলন দেখে ভেতরের ভাব বুঝতেই পারত না। আর আমায় খুব ভালবাসতেন; সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন।"

ঠাকুরের কথিত পূর্ব্বকথা হইতেও তাঁহার আহার ও পোষাক প্রিয়তার এবং চরিত্রের দৃঢ়তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। খানিকটা উদ্ধৃত করিলাম।

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বাবস্থা)

(অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; [১১] পৃষ্ঠার সম্মুখে)

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

"বরাবরই আহারপ্রিয় ছিলুম। মাছ মাংসের ওপর খুব ঝোঁক ছিল। খেতেও পারতুম খুব। তবে মুরগী ফুরগী খেতে কখনও প্রবৃত্তিই যায়নি। গয়াতে একবার মুরগী খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। সেই গয়া ত্যাগ করেছিলুম। পড়বার সময়ও Feastএ (ভোজএ) মুরগী হ'ত, আমি খাইনি। পান, তামাক, সিগারেট, কোন নেশাই করতুম না। পিতা বলতেন, 'দু'বেলা ভাত খেয়ে দু'টি পান খেও।' তা কখনও খাইনি; ইচ্ছাই হ'ত না। আগে চা খেতুম। একদিন পিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চা তৈরী হয়েছে শুনে, কথাটা শেষ না করেই বাড়ীর ভেতর চলে গেছি। আস্‌লে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' বললুম, 'চা খেতে বাড়ীর ভেতর গিয়েছিলাম।' বললেন, 'এত চাএর নেশা করেছ, কথাটা শেষ না করেই চলে গেলে?' সেই থেকে ছেড়ে দিলুম। পরে সবাই বললে, বাবাও বললেন, 'হঠাৎ ছেড়ে দিলে কষ্ট হবে।' আমি বললুম, 'চা না খেলে আবার কি কষ্ট হবে?'

আহারপ্রিয়তা।

"অনেক মাতাল-বেষ্টিত হয়েছি, কেউ এক ফোঁটা মদ ছোঁয়াতে পারেনি। নিয়মই ছিল, যা প্রবৃত্তি হবে না, খাব না; কেউ খাওয়াতে পারবে না। প্রবৃত্তি এলেই হবে। কোন দোষ জ্ঞান করে যে খাইনি, তা নয়; বৃত্তিই ওঠেনি। যে দিকে বৃত্তি যেত, যেমন খাওয়া দাওয়া, সে কেউ নিবৃত্তি করতে পারবে না। ডাক্তার ম'শায় অনেক সময় বলতেন, 'অত খরচ করছ, সংসারী হয়ে, ভবিষ্যৎ ভাবা উচিত।' তা হাতে যতক্ষণ টাকা থাকবে, ততক্ষণ কোন দিকেই তাকাব না। খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, এ সবেই ব্যয় করতুম। কখনও অভাব হয়নি; ঠিক্ এসে জুটত। লোকজন অতিথি ত লেগেই আছে; বাড়ী ভর্ত্তি থাকত। পোলাও হচ্ছে, মাছ মাংস হচ্ছে; সব ঝঞ্ঝাটই আমার মাথায়।"

"খুব বাবু ছিলুম। ভাল দামী কাপড়, জামা থাকত। তবে দেব-

মন্দিরে ঐ কাপড়েই বসে আছি। কাদায়ও জুতো পরেই চলেছি। অত তোয়াজ ছিল না। কুড়ুলগাছির ওখানে একপো দূরে কালীমন্দির। সব ঘিরে বসে আছে, গল্প হচ্ছে, গান হচ্ছে; ঠিক্ সন্ধ্যার সময় উঠে সেখানে গেছি। ওরা মনে করলে, 'হয়ত বাইরে গেছেন, এখনিই আসবেন।' রাত্রি সাড়ে ন'টা দশটায় ফিরলুম।"

পোষাকপ্রিয়তা।

ঠাকুর যেমন খাইতে ভালবাসিতেন, মাও নানা রকম উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ঠাকুর বামুনের রান্না খাইতেন না; মা নিজে রান্না করিতেন। অনেক সময় রাত বারটায় হয়ত ঠাকুরের কিছু খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, মা তখনই তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। হয়ত বেশী রাত্রে বহু লোক অতিথি আসিয়াছে, মা সে সময়েই নানারকম খাবার তৈরী করিয়া দিতেন।

মাতাঠাকুরাণী।

ঠাকুরের দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বড় মেয়ে ৮।৯ বৎসর বয়সে কাশীতে মারা যান। তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ ও দেবদেবীর ওপর অসীম ভক্তি ছিল। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"নেংড়ীর (বর্ত্তমান মেয়ে) চেয়ে বড় মেয়ে ছিল; কাশীতে ম'ল। ক'দিনই ওরা সব রাত জেগে পাহারা দিচ্ছিল। শেষদিন আমি দেখলুম, নাড়ী নেই। আমি বললুম, আজ বেশ ভাল আছে, তোমরা শোওগে, আজ আমি পাহারা দিচ্ছি। সারারাত 'বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা', 'বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা' জপ করেছে। তার স্বভাব ছিল, দেবমন্দিরে গিয়ে বসে থাকত। আট নয় বছর বয়স। এই নেই; কোথায়, তালাস করছে; দেখে, কোন দেবমন্দিরে গিয়ে বসে আছে। বলত, 'আমি কাশী ছেড়ে যাব না।' শেষ রাত্তিরে আমায় বললে, 'বাবা, দেখছি যেন একটী সন্ন্যাসী এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছে।' আমি বললুম, 'বেশ, তুমি তাই দেখ, অন্য কিছু ভেব না।' তার পর মৃত্যু হ'ল। যেমন নিয়ম, ডান কান উঁচু করে ম'ল। তারপর এঁদের

বড়মেয়ের মৃত্যু।

(মাকে) ডেকে দিলুম ; কাঁদতে লাগলেন। শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে আমি গঙ্গা নেয়ে বিশ্বনাথ বেরিয়ে গেলুম।"

আর এক মেয়ে আছেন। তিনি ঠাকুরের কাছেই থাকেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠাচার, কঠোরতা এবং ঠাকুরের উপর অসাধারণ ভক্তি ভালবাসা—শুধু পিতা হিসাবে নয়, পরন্তু ভগবান হিসাবে—অতুলনীয়। একাগ্রচিত্তে ঠাকুরের সেবা করেন। কঠোরভাবে, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ধর্ম্মনীতি সব পালন করেন। দিদির মতন দেবী স্বভাবের মেয়ে আজকাল চোখে পড়ে না। আবার রান্না ইত্যাদিতে মার মতন। ঠাকুরের ও মার বহু গুণ দিদির চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান মেয়ে।

অতুল ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়-পরিজন, যশ-মান প্রভৃতি পার্থিব সুখ ভোগের কোন জিনিষেরই ঠাকুরের অভাব ছিল না ; এবং সবল, সুস্থ ও বলিষ্ঠ যুবকের ভোগ করিবার ক্ষমতাও পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু যাঁহারা অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়া দুঃখসন্তপ্ত জগতে অনন্ত শান্তি বিলাইতে আসেন, নশ্বর সম্পদ তাঁহাদিগকে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। শিশুকাল হইতেই সাধারণ জগতে তাঁহারা সাধারণ মানুষের মত বিচরণ করেন, কিন্তু তারই মধ্যে সর্ব্বদা নিজের ভাব ঠিক্ রাখিয়া চলেন। যখন সময় আসে, তখন এ সব সুখ-সম্পদ পদদলিত করিয়া প্রস্থান করেন। গৃহত্যাগের পূর্ব্বের মনের অবস্থা একটা ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

"আমাদের গ্রামের আধক্রোশ দূরে একটী গ্রামে যাত্রা হচ্ছে। তারা এসে আমায় ধরলে যে, 'আপনাকে যেতে হবে' ; তারা অনেকজন এসেছে ; বললে, 'আপনার জন্য আলাদা জায়গা করেছি, আপনি চলুন।' আমি বললুম, 'আমি কোথাও বড় যাই না ; আমাকে আর কেন নিয়ে যাবে ?' তারা ছাড়বে না। বললে, 'আমরা সব এসেছি, আপনি গেলে আমাদের বড়ই আনন্দ হবে।' তারা পূজো করেছিল ; তারপর যাত্রা হচ্ছে। বেদি গেঁথে রেশমী

কাপড়-চোপড় দিয়ে আমার বসার জন্য আলাদা জায়গা করেছে। কি করি; বললুম, তোমাদের যদি এতই আনন্দ হয়, যাব। তা সম্মানের সহিত যেতে হবে ত, পাল্কী চাই। আধকোশ হেঁটে ত বেড়াতেও যাই, সেদিন পাল্কীতে যাচ্ছি। লেঠেল সব সঙ্গে চলেছে। আর একটা মাঠ পেরিয়ে সে গ্রাম। সে মাঠে আসতে হঠাৎ আমার মনে হ'ল, 'কি আশ্চর্য্য! এতটা সম্মানের দাস? এই সব নিয়ে পাল্কী চড়ে যেতে হবে? আমি হেঁটে যেতে পারব না? সম্মানকে এত বড় করেছি?' তখনই সেখানে নেমে পড়লাম। বেহারা, লোকজন, যারা সব ছিল, তাদের বললুম, তোমরা সব ফিরে যাও। তারা ভাবলে, 'বাবুর কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি?' আমাকে ভয় করত, কিছু বলতে পারলে না। সবাই ফিরে এল; কিন্তু রসুকে ছাড়লে না। সে দূরে দূরে আমার পেছন পেছন যেতে লাগল। আমি গিয়ে সেখানে একা উপস্থিত। আমাকে একা দেখে তারাও অবাক। সেদিন থেকে মনে একটা কি রকম ভাব হ'ল। সেটা কাকেও জানতে দিইনি। সেদিন থেকে সম্পত্তি আর বড় দেখতুম না। কাগজ প্রভৃতি জমাখরচ আর ভাল দেখতে পারতুম না, কষ্ট হ'ত। তা তাদের জানতে দিইনি। তার কিছুদিন পরেই বেরুই। বললাম, আমার শরীর খারাপ, দিন কতক ভাল জায়গায় থাকতে হবে। প্রথম জামুই যাই, আবার আসি। তারপর কাশী যাই—প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে আসতুম।

যাত্রা শোনার ঘটনা।

"তারপর সেবার (কয়েক বৎসর আগে) সেখানে (গ্রামে) খালি পায়ে, খালি গায়ে গেলুম। যেখানে বাবুগিরি করেছি, যারা সেভাবে দেখেছে, তাদের কাছে আবার খালি গায়ে, খালি পায়ে গেলুম। মান-সম্মান-বোধ নষ্ট করতে হবে ত? ঝুলিটাও নিজে ষ্টেশন থেকে নিয়ে গেলুম।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

ঠাকুরের ৪৪শং জন্মতিথি উপলক্ষে গৃহীত ফটো হইতে।

অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ১৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে)

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

গৃহত্যাগ ও কাশী গমন।

ঠাকুর চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রথম বাড়ী ত্যাগ করেন। কিন্তু আগেও যেমন কেহই তাঁহার ভাব ধরিতে পারিত না, এই সময়েও কেহই বুঝিতে পারিল না যে, তাহাদের 'মেজদা' তাহাদের ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। প্রথম হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবার কথা বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হন।

গৃহত্যাগ।

প্রথমবার একা যান। কিছুদিন পরে বাড়ী একবার আসেন। দ্বিতীয়বার যাইবার সময় মা, দিদি ইঁহারা সঙ্গে যান। সেবারও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্যই যাইতেছেন বলিয়া সকলে জানে। কাশীতেই গেলেন; মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় একটা ঘটনা হয়; তাহাতে ঠাকুরের মনের অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ঠাকুরের মুখে এইরূপ শুনিয়াছি :—

কাশীতে।

"একবার কলকাতায় একজনার বাড়ী এসে আছি। সে বাড়ীতে দু'জন ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছেন। আমায় বললেন, 'চলুন, বেড়াতে যাই।' আমিও বললুম, 'আচ্ছা, চল যাই।' বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে একটা দোতলা বাড়ীতে উঠল।

"গিয়ে দেখি কতকগুলো মেয়ে সেখানে। তারা মদ আনালে; গান বাজনা হচ্ছে। মেয়েদের এরা কত সাধাসাধি করলে, আমাকে মদ খাওয়াতে। তারা বললে, 'বাবা! ওঁকে বলতে পারব না।' এরা যত বলে, কিছুতেই ওদের সাহস হ'ল না। এদিকে রাত হয়ে উঠল। এরা মদ খেয়ে পড়ে আছে। যাদের বাড়ী এসেছি তারা সব আমার জন্য ভাবছে; আমারও এস্থান অসহ্য হয়ে উঠছে। বসতে বসতে ভাল লাগল না; আমি উঠলুম। মেয়েদের বললুম, 'দেখ মা লক্ষ্মীরা, আমি যাব, তোমরা আমায় রাস্তাটা দেখিয়ে দাও দেখি।' তারা আমায় 'বাবা' বলে সম্বোধন করলে। রাস্তা দেখিয়ে আমায়

মনের দৃঢ়তা—
কলিকাতার ঘটনা।

নামিয়ে দিয়ে গেল। আমি একটু এসেছি; দেখি একটা ভদ্রলোক, কালাপেড়ে কাপড় পরা, পাঞ্জাবী গায়ে, পাম্প-সু পায়ে, বেশ বলিষ্ঠ, আমায় এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি ওদের ওখানে কেন গিয়েছিলেন?' আমি বললুম, 'দু'টী ভদ্রলোক আমায় এখানে নিয়ে এয়েছিল।' সে বললে, 'আপনি ত মদ টদ খেলেন না।' আমি বললুম, 'আমি ত ওসব খাই না।' লোকটী বললে, 'আমিও সে বাড়ীতে অপর ঘরে ছিলুম। আপনার ওপর লক্ষ্য রাখছিলুম। তারা আপনাকে মদ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল; যদি জোর করত, আমি ওদের মারতুম। তা আপনি রাত্রে একা বেরিয়েছেন, এ জায়গা বড় খারাপ; বড় ভয়ের জায়গা।' আমি বললুম, 'বাপু, আমার কাছে ত কিছু নেই, কিসের ভয়? আমার আর কি করবে?' সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি মুসলমানকে ঘৃণা করেন?' আমি বললুম, 'ঘৃণা করব কেন?' তখন বললে, 'সে কিছু দিলে আপনি খেতে পারেন?' বললুম, 'কখনও ত খাইনি। যদি তার কোন উপকার হয় তবে খেতে পারি। শুধু শুধু খেয়ে কি হবে? তারই বা কোন স্বার্থ ছাড়া আমাকে খাইয়ে কি লাভ? আর আমি যাদের বাড়ীতে এসেছি তারাও আমার জন্যে ভাবছে, খাবার নিয়ে বসে আছে।' তখন বলে, 'দেখুন, আমি মুসলমান, আমার ইচ্ছা হয়েছে আপনাকে কিছু খাওয়াই; আপনি মহৎ আশ্রমে থান।' আমি বললুম, 'হোটেল মোটেলে আমি খাই না।' সে ছাড়ে না, বলে, 'আপনি একটা হিন্দুর দোকানে খান। আমার বাড়ী নিকটে; নতুন বিছানা আছে, শুয়ে থাকবেন।' আমি বললুম, 'দেখ, সে জন্য নয়, যাদের ওখানে এসেছি, আমি না গেলে তারা সারারাত ভাববে। তারা ত জানে না কোথায় গেছি।' তা বললে, 'চলুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আপনি এত রাত্রে রাস্তা চিনতে পারবেন না।' আমি বললুম, 'ঠিক্ চিনে যেতে পারব।' সে শুনলে না; আমায় সঙ্গে করে সে বাড়ীতে এল; এসে তাদের ডাকলে। তারা নেমে এলে তবে সে গেল।"

সাধনা ও সিদ্ধি।

ঠাকুরের সাধনার কথা আমরা এক রকম কিছুই জানি না। তিনিও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করেন নাই। বাহিরের অবস্থার কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। আমাদের মনে হয়, বাড়ী ত্যাগ করিবার সময়ই ঠাকুর সাধনায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কাশীতে অল্পদিনের মধ্যেই অনেক উপলব্ধি হয় এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

কাশীতে প্রথম ঠাকুর সাধারণভাবে থাকিতেন; পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং খাওয়া দাওয়া সবই ছিল; কিন্তু সব সময় ধর্ম্মকার্য্য লইয়া এবং নানা দেবদেবীর মন্দিরে গান করিয়া কাটাইতেন। তখন তাঁহার নিয়ম ছিল, ভোর রাত্রে উঠিয়া হাত মুখ ধোওয়ার পর অনেকক্ষণ পূজা আহ্নিক করিতেন। তারপর দেবস্থানে বাহির হইয়া যাইতেন। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি নানান দেবদেবী দর্শন করিয়া কেদারে আসিতেন। কেদারের ভোগ আরতি শেষ হইলে, বেলা প্রায় বারটা একটার সময় বাড়ী আসিতেন। স্নান আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার তিনটার সময় কিছু জলযোগ করিয়া দেবস্থানে বাহির হইয়া যাইতেন। সন্ধ্যায় কেদারের আরতি দেখিয়া অন্নপূর্ণার বাড়ী যাইতেন; সেখানে শয়ন আরতি দেখিয়া রাত এগারটা বারটায় বাড়ী আসিতেন। রাত্রে আহারের পর ছাতে চলিয়া যাইতেন। এই নীতি প্রত্যহ পালন করিতেন। মন্দিরে মন্দিরে গান করিতেন; ঠাকুরের মধুরকণ্ঠের গান যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

কাশীতে দৈনিক কার্য্য পদ্ধতি।

শুনিয়াছি, দশাশ্বমেধ কালীমন্দিরে দাঁড়াইয়া গান ধরিলে রাস্তায় ভিড় জমিয়া যাইত। কেদারে যখন দুইটার সময় যাইতেন, তখন তাঁহার গান শুনিবার জন্য ততক্ষণ পর্য্যন্ত সব লোক বসিয়া থাকিত। সাধনা সম্বন্ধে যাহা সামান্য বলিয়াছেন, উদ্ধৃত করিলাম।

"বাড়ীতে কত অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে, সে সব ব্যক্ত করবার নয়। তবে যাতে তোমাদের উপকার হতে পারে সে সব সামান্য বলছি। ছোটবেলা থেকে কোন শক্তি যেন আমায় ধরে আছে, আমি বেশ বুঝিতে পারতাম; আপনি এসে আমায় নিয়ে চলেছে। আমার বার বৎসর যখন বয়স, আমি গৌরীশালের মাঠ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছি, সঙ্গে রস্‌কে ছিল; সে মাঠে একটা শক্তি এসে আমায় গোটাকতক কথা বলে দিয়ে, বললে, 'এটা জপ করো'।"

বাল্যে অলৌকিক দর্শন ও দীক্ষা।

মাঝের গ্রাম ষ্টেশন হইতে ঠাকুরদের বাড়ী যাইতে এই স্থান পথে পড়ে।

"কাশীতে যখন আমি থাকি, তখনও সর্ব্বদা একটা শক্তি আমার কাছে থাকত। আমাকে ঘুমাতে দিত না। সর্ব্বদা কাছে রয়েছে; সে সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। ভয়ানক খাটিয়ে নিত; সারারাত সে ভাবে বসিয়ে রেখে দিত। থাকতে হবে; যেই একটু ঘুম এসেছে অমনি তুলে দিয়েছে। বসিয়ে রেখেছে; মহাশক্তি সর্ব্বদা কাজ করেছে; এ আছে, এ জন্য তোমাদের এত বোঝাই।

কাশীতে শক্তির সাহায্যে সাধনা।

"একবার রাস্তায় যেতে যেতে আমার পা ফসকে গেল। সেখান থেকে যদি পড়ি, আমার মাথা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়। তা আমায় নিয়ে আর এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে।

"আর একটা ঘটনা হয়। পচুর মা, শিবপুরের সুরেন চাটুয্যে ওরা তখন মানমন্দিরের ওখানে এক বাড়ীতে ছিল। সেখানে পূজা করলে। আমি যেতাম। একদিন আসতে একখানা পাথর, ছাতের ওপর থেকে একটা বাঁদর ফেলে দিলে, ঠিক্ আমার মাথার ওপর। সেটা হাত দিয়ে ধরে নিলে, একটু ফুলল না, ব্যথা হ'ল না। সকলে 'আহা আহা' করতে লাগল,

অলৌকিক ঘটনা।

'এখনই মাথা ফেটে যাবে'; তা একটুও লাগল না; একটা চাপ প'ল মাত্র বুঝতে পারলাম।

"অনেক ঘটনা ঘটেছে। নানারকম সাধনা করিয়েছে। সে সব সাধনা গুপ্ত জিনিষ, ব্যক্ত করবার নয়। সাধারণ নীতি, কঠোরতা যা তোমাদের দরকার সে সবই বলছি।

"জীবনে কষ্টের ত ইতি নেই। কত সুখের দেহ ছিল, জুতো ছেড়ে পা দিয়ে ভাতের আসনে বসতে পারতুম না। দু-পা যেতে হবে; তাও হ'ত না। জুতোয় এক পা, এক পা আসনে, এই ছিল। পায়ের নীচে একটু কাঁকর সহ্য হ'ত না। তারপর দেখ, সে পায়ে কত চলেছি। শরীরে কত জ্বালা থাকত। আবার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব এই দেহের ওপর দিয়ে চলে গেছে। আহারের একটু ত্রুটি হলে

কঠোরতা।

মহামুস্কিল; খেতুম কত, মাছ মাংস প্রচুর চাই; শক্তিও ছিল। এক টাকা পাঁচসিকার পানতোয়া বিকালে জলখাবার ছিল। তারপর সব গেল। পয়সা আনতে হলে সম্পত্তি দেখতে হবে। তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তারা বলত, 'আপনি আসুন, আপনি না দেখলে হচ্ছে না।' দেখলাম, এ ত মহামুস্কিল। তখন ঠিক্ করলুম পয়সার আবশ্যক নেই। তাঁর শক্তি না হলে কি টেঁকা যেত? বিদেশ জায়গায়, নিরাশ্রয়, উপোস করে ঘরে দুয়োর দিয়ে যদি মরে যাই, তবু কেউ জিজ্ঞাসা করবার নেই। তাঁর ভেতর দিয়ে তাঁর শক্তি না হলে কি করে গতি করলুম?

"বেশ আনন্দের ওপর ছিলাম, কোন দুঃখই এল না; কে সহ্য করিয়ে দিলে? তাঁর শক্তি না হলে, তিনি না দেখলে কি হয়? কত জায়গায় নিয়ে গেছে; কত নির্জ্জন স্থানে কত রাত কেটেছে ঠিক্ আছে কি?

"আমাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে পিতৃপুরুষেরা কি কম চেষ্টা

পিতাকে দর্শন।

করেছেন? একদিন পিতাকে দেখি, আমায় বলছেন, 'তুমি বাড়ী ফিরে এস।' আমি বললুম,

না ; আমি যেতে পারব না। বললেন, 'তুমি এস ; যেও না, বড় কষ্ট হবে।' আমি বললুম, 'না ; আর ওর মধ্যে যেতে পারব না।' তারপর দেখলাম ; একটা প্রকাণ্ড জলাশয়, তার ওপর দিয়ে আমি হেঁটে চলে গেলুম। পিতা যেতে পারলেন না ; সেখানে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলেন।

"চিরকালই গোঁয়ার ছিলুম। টাকা আসবে না ? আচ্ছা, খাওয়াই বন্ধ করে দেব ; হয় তাঁকে ক্ষুধা তুলে নিতে হবে, নয়ত আহার দিতে হবে। তা তিনি আহারটাই তুলে নিলেন।"

এই সময় ঠাকুরের একবার খুব অসুখ হয়। আট মাস প্রায় একজ্বরী ছিলেন। সে সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

"আমি দু'বার খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি। একবার আট মাস ; শুধু হাড় ছিল, তাতেও শুয়ে পড়িনি। আর একবার বাংলা থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে যাই। কাশীতে আছি, গঙ্গা-স্নান করছি, দেবস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেবারও কেবল হাড় ছিল। কেউ কেউ বললে 'Pthisis (যক্ষ্মা) হয়েছে, চিকিৎসা করান।' এঁরা (মা) ভয় পেলেন ; আমি বললুম, দেখ, তোমরা ভয় খেওনা। তা ওষুধ খাইনি। আট মাস পরে একদিন হঠাৎ এমন হ'ল যে, আর নড়তে পারি না। আমার নিয়ম ছিল, বিশেষ অসুখ হলে দোর বন্ধ করে দিই, ঘরে কাকেও ঢুকতে দিই না। অতি কষ্টে প্রস্রাব বাহ্যি করতুম। তিনদিন পরে এ রকম বলছেন শুনলুম, 'মাঝেরগাঁয় যাও, সেরে যাবে।' আমি বললুম, 'সে জায়গায় কি করে যাব ? আমি নড়তে পারছি না। সেখানে যেতে ট্রেণ বদলাতে হবে ; নামতে উঠতে হবে।' তা বললেন, 'কাল ঠিক্ পারবে।' সকালে উঠে দেখি, বেশ চলতে পারছি, কিছুই নেই। আমি বললাম, 'মাঝেরগাঁয় যাব।' এরা সব বললে, 'সে কি, এ শরীর নিয়ে কি করে যাবেন ?' আমি বললুম, 'যেতে হবে, একাই যাব।' বীরেশ্বর বাবু আমায় একখানা টিকিট কিনে দিলেন।

অসুখ ও দৈব উপায়ে আরোগ্য।

"ট্রেণে উঠলুম। সেখানকার এক পুলিস ইনস্পেক্টর (অমূল্যনাথ সেন) আমায় দেখে বললেন, 'আপনি এ শরীর নিয়ে একা কি করে যাবেন?' আমি বললুম, 'তাতে কি? যেতে পারব।' তা সে ছাড়লে না; বললে, 'আমি মোগলসরাই পর্য্যন্ত পৌঁছে দিই;' মোগলসরাই এসে ট্রেণে তুলে দিয়ে গেল। তারপর রাণাঘাটে নেমে এক ক্রোশ দূরে কালীমন্দির ছিল, বেশ হেঁটে দর্শন করে এলুম। আবার ট্রেণে উঠলুম। তারপর মাঝেরগাঁ যাব; সেখানে ট্রেণ থেকে নেমেই মাটীতে বসে পড়েছি। আর এক পা নড়বার শক্তি নেই। ট্রেণ চলে গেল। ষ্টেশন মাষ্টার আমায় চিনত; কিন্তু আমার চেহারা এমন হয়ে গেছে, কাছ দিয়ে যাচ্ছে তবু চিনতে পারছে না। আমি তাকে ডাকলুম। কাছে এসে চিনলে; বললে, 'আপনার এ রকম চেহারা হয়েছে! চিনতেই পারচি না।' আমি বললুম, 'একটু অসুখ হয়েছে; তা তুমি আমায় ধর, আমি ষ্টেশন ঘরে যাই।' সেখানে গিয়ে, বসে তাকে বললুম, 'বাড়ীতে খবর দাও।' বাড়ী থেকে গাড়ী পাঠিয়ে দিলে। যেমন সে গ্রামে গেছি, আর কোন গণ্ডগোল নেই। তারপর সারতে আরম্ভ করলুম; খুব ক্ষিদে হতে লাগল; খেয়ে দেয়ে সেরে গেলুম।"

এ প্রসঙ্গে ঠাকুর অন্যবার বলিয়াছিলেন যে, মা তখন কাশীতে ছিলেন। ডাক্তার ম'শায় তাঁহাকেও আনিবার জন্য বলিলেন। লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যেদিন মাদের নিয়ে কাশী হইতে আসার কথা ছিল, ঠাকুর যেন শুনিলেন বলছে, 'সেদিন বেরুতে বারণ কর।' তাই বারণ করিলেন। ডাক্তার ম'শায় সে সব মানিলেন না। তবুও যিনি যাইতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে বারণ করিয়া দিলেন। পরে দেখা গেল, যেদিন আসার কথা ছিল, সেদিন কাশীতে হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া গেল; দিনের বেলা খুব অন্ধকার; খুব কাছের মানুষও দেখা যায় না। মাদের যে ট্রেণে আসিবার কথা, সে ট্রেণ অন্ধকারের দরুণ চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রথম প্রথম কাশীতে বাড়ী হইতে টাকা যাইত। পরে কিছু গোলমাল হওয়ায় তিনি টাকা পাঠাইতে বারণ করিয়া দেন। বাড়ী হইতে টাকা আসাও বন্ধ হইয়া গেল; আবার ঠাকুর কাহারও কাছে চাইবেনও না; দিতে গেলেও নিতেন না। কাজেই এ অবস্থায় কি রকম কঠোরভাবে ছিলেন, সহজেই বুঝা যায়। সঙ্গে আবার মা ও দিদি ছিলেন। এই সময়ে পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাওয়া ক্রমে ছাড়িয়া দেন। খুব কঠোরতা করিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন;—

সাধনার কঠোরতা।

"আমার কি অবস্থা গেছে! একটী পয়সা কি হাতে ছিল? এখন না হয় ভক্তরা এসেছেন; তখন ত কেউ ছিল না। কি রকম কঠোর-ভাবে কেটেছে! আধ পয়সার ছাতু খেয়ে কাটিয়েছি; বেলপাতা খেয়ে দু' তিন দিন কাটিয়েছি। বহুদিন এ রকম ছিলুম। কোন দিন বেলপাতা, কোন দিন ছাতু, কোন দিন হয়ত দুটো কুল। এ যে ইচ্ছা করে, তা নয়। এমন এসে পড়ল, যে এ ভিন্ন আর গতি নেই। অবশ্য অভিমানকে নষ্ট করবার জন্য দু'একদিন ভিক্ষাও করেছি। আমার ভাব ছিল, নিজে কারও মুখাঁপেক্ষী হব না। শরীর যে পর্য্যন্ত দুঃখ পায় দেখা যাক। নিজে স্বাধীন থাকব, দেহকে বড় করব না। আমাকে অনেকেই দিতে এয়েছিল, বহুলোক সাহায্য করতে চেয়েছিল, তা নিইনি। যেখানে বসেছি, পয়সার স্তূপ পড়ে যেত; পাণ্ডারা সব নিয়ে নিত। কেউ আবার খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যাদের কখনও দেখিনি তারা সাহায্য করতে এয়েছিল; আমি নিইনি। পরে খাওয়া উঠিয়ে দিলুম; খেতেই পারতুম না, আধ পয়সার ছাতুতে দু' তিন দিন যেত।"

কাশীর ভীষণ শীতে এক কাপড়ে রাতদিন কাটাইয়া দিতেন। রাত্রে ছাতে শুইয়া থাকিতেন। বর্ষায় ও শীতকালে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে দেবস্থানে যাইতেন। যেখানে সেখানে ধূলাকাদায়

বসিতেন। ওই এক কাপড় পরিধানে থাকিত। আবার গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে, দুপুর বেলা ছাতে বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, সবকে জয় করিয়াছিলেন। সাধনার সম্বন্ধে আর একদিন কথায় কথায় আভাস দিয়াছিলেন :—

"বহু বাধার মধ্য দিয়ে গেছি। নির্জ্জন স্থানে কত কাটিয়েছি। শ্মশান প্রভৃতি স্থানে, নানা জায়গায় কত রাত কেটেছে, ঠিক্ আছে কি ? কত রকম সাধন করিয়েছে ; সে সব ব্যক্ত করবার নয়।"

মাও অনেক কষ্ট কঠোরতা সহ্য করিয়াছেন। তিনি বড়লোকের মেয়ে ; শৈশব হইতেই সে ভাবে লালিত পালিত। আবার বড়ঘরের বধূ। কাজেই দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁহাকে যাইতে হয় নাই।

মাতাঠাকুরাণী।

কিন্তু ঠাকুরের সাধনার সময় মাও কাশীতে সে ভাবে ছিলেন। ঠাকুর নিজের কাজে থাকিতেন ; সংসারের উপর কোন লক্ষ্যই ছিল না। বাড়ী হইতেও টাকা আসিত না। সে সময় আহার, পোষাক ইত্যাদি ত্যাগ করেন। কাজেই মা ও দিদিকে তখন কি রকম কঠোর ভাবে থাকিতে হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহারা সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত ছিলেন না। অতি আনন্দের সহিত সেই ভাবে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা ও সাধনার সহায়তা করিয়াছেন।

ঠাকুরের উপলব্ধি সম্বন্ধে আমরা একরকম কিছুই জানি না। মাঝে মাঝে সামান্য যাহা আভাস দিয়াছেন, লিখিলাম।

"ডাকলে তিনি আসেন। ছেলের দুঃখ তিনি দেখতে পারেন না। আমি এইভাবে চলেছি, এইভাবে উপকার পেয়েছি ; তাই তোমাদের

উপলব্ধি।

বলছি, তোমরা নির্ভরসা হয়োনা। আমি এ ভাবে ফল পেয়েছি। যে কোন ওপর শক্তি আছেন, তিনি এসে কাজ করে দেন। সন্তানের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনাহারে কষ্ট পেলে তিনি এসে খাইয়ে দেন। এমন অবস্থা গিয়েছে, অনাহারে কষ্ট পেয়েছি, মা এসে খাইয়ে দিয়েছেন।"

কাশীতে থাকিতে প্রথম জিতেনের (শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় D. S. P.) সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ঠাকুরের বাল্যবন্ধু ছিলেন। সেখানে তাঁহার সঙ্গে আবার দেখা হয়। তিনি অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তারপর বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ক্রমে খুব আপনত্ব হয়। পরমহংসদেবের শিষ্য ভূপতি মহারাজ; তাঁহার শিষ্য বীরেশ্বরবাবু; ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; খুব ত্যাগী, কঠোরী ও সাধু পুরুষ। সেই সূত্রে ভূপতি মহারাজ, লাটু মহারাজ, রাখাল মহারাজ, হরি মহারাজ, ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। ঠাকুর কথায় কথায় বলিয়াছেন, "ভূপতি মহারাজের বড় সরল ভাব, যেন বালকের মতন। তাঁকে দেখলে প্রাণের মধ্যে একটা শান্তি ও আনন্দের উদয় হ'ত। সর্ব্বদাই তাঁর ভাবে থাকতেন।"

জিতেন ও বীরেশ্বরবাবু।

শ্রদ্ধাস্পদ বীরেশ্বরবাবুর মুখে ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, লিখিলাম।

"তাঁর সাধনার কথা এখনও প্রকাশ করবার সময় আসেনি। তবে তাঁর সাধারণ চরিত্রের মধ্যে দুটি জিনিষ খুব বিশেষভাবে দেখেছি। একটি, মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা। বহু প্রলোভনের মধ্য দিয়ে গতি করেছেন, কিন্তু সে সবকে গ্রাহ্যই করেন নি। আর ভগবানে নির্ভরতা। টাকা পয়সা, নিজের আহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন চিন্তা তাঁর মধ্যে দেখিনি। অনেক সময় আমাদের আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন, টাকাকড়ি কি আছে, না আছে, তার খবরই রাখেন নি; কিন্তু তাঁর কৃপায় আমরা বেশ উত্তমরূপে আহার করলাম। অহল্যাবাঈএর ব্রহ্মপুরীতে থাকতে এক বার তিনি নিয়ম করেছিলেন, তাঁর ঘরে direct যে জিনিষ আসবে,—তিনি চারতলায় একটা ঘরে থাকতেন, একেবারে সোজাসুজি সেই ঘরে বা'র থেকে জিনিষ আসবে,—তাই শুধু খাবেন; বাড়ীর জিনিষ খাবেন না। আমি ২টার সময় যেতাম। প্রায়ই আমাকে

বীরেশ্বরবাবুর কথা।

সে ঘর থেকে খাবার খেতে দিতেন। সেখানেই প্রত্যহ জিনিষ আসত।

"তাঁর স্ত্রীরও খুব শক্তি। তিনি তাঁর কার্য্যে খুব সহায়তা করেছেন। স্ত্রী, মেয়ে, দু'জনকেই তিনি তাঁর ভাবে গড়েছেন।. নিজেদের কামনা বাসনা বিন্দুমাত্রও নাই। তাঁরা তাঁর কাজই করেন। খুব ধর্ম্মপ্রাণা। তাঁর সেবা, তাঁর কাজ ছাড়া তাঁদের অন্য চিন্তা নাই। আজ কালকার দিনে এ রকম দেখা যায় না। নিজের অস্তিত্বকে একেবারে শেষ করে দিয়েছেন।"

এইভাবে কাশীতে থাকিতেন। দেবদেবীর মন্দিরেই প্রায় সব সময় গান করিতেন বা বসিয়া থাকিতেন। কেহ বা পাগল মনে করিত; কেহ হয়ত সাধু মহাত্মা বলিয়া ভক্তি করিত; আবার কেহ অপমান-সূচক ব্যবহারও করিত। আবার অনেকে হিংসাবশতঃ বিষ খাওয়াইতেও চেষ্টা করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন;—"এক জায়গায় খেতে বলেছিল; যাচ্ছি; বাড়ীর কাছে গেলে আদেশ হ'ল, 'খেওনা, ফিরে যাও।' তাই ফিরে এলুম। পরে জানলুম, বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল।" আবার কেহ ভক্তি করিত, খাবার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;—

লোকের হিংসা ও বিষ খাওয়াবার চেষ্টা।

"প্রথম কাশীতে একা এসে সোনারপুরা উঠেছিলাম। পরে মেয়েরা এলে অহল্যাবাঈএর ব্রহ্মপুরীতে ছিলাম। একদিন কেদারে বসে আছি, দুটো তিনটে বেজে গেছে; একটী মেয়ে খাওয়ার জল আর একটু মিষ্টি নিয়ে এসে, খেতে বললে। আমি ত খেতে পারি না; তার ভেউ ভেউ করে কান্না, খেতে হবে। পাণ্ডারা বললে, 'আপকো প্রেমসে দেতা হ্যায়, কেঁও নেহি খাতেহেঁ?' আমি ভাবলুম, যথার্থই ত, আমি না খেলে ওর কি? এত কাঁদছে কেন? ভালবেসে দিচ্ছে, খেতে দোষ কি? একটু নিয়ে মুখে দিলুম। বেশী ত খেতে পারি না।"

লোকশিক্ষা

এই সময় হইতে ভক্তসমাগম ও ঠাকুরের লোকশিক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয়। ঠাকুরের কার্য্যের একটা বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধু মহাপুরুষেরা সমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বাস করেন, সংসারী লোকেরা তাঁহাদের কাছে মাঝে মাঝে যায়, উপদেশ গ্রহণ করে, সাধকেরাও সেখানে গিয়া থাকে। এজন্য সংসারীদের অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সংসার হইতে দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু আজকাল সমাজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এ সামান্য সময়টুকুও সংসারের কাছ ছাড়া হইতে পারে না। তাই ঠাকুর নিজে, একরকম তাহাদের সংসারের মধ্যেই বাস করিতেছেন। খাওয়া দাওয়া, গান, গল্প প্রভৃতি তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে যোগদান করিয়া, তাহাদের ভাবে মিশিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ভালবাসা দ্বারা মন জয় করিয়া, তাহাদের বদ্ধ সংস্কার দূর করতঃ সৎ সংস্কার ঢুকাইয়া দিতেছেন। শুধু যে ভক্তদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত হন, তাহা নয়; তাহাদের সাংসারিক সব কার্য্যের উপরও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। সব কার্য্যের মধ্যে তিনি তাহাদের চালাইয়া নিতেছেন। এই জন্য ঠাকুর বিভিন্ন স্থানে যাইয়া নানা উপায়ে ভক্তদের আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনিই ভক্তদের খুঁজিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন; ভক্তরা তাঁহার কাছে জ্ঞানার্থী হইয়া বড় যায় নাই।

প্রথমতঃ খিদিরপুরের দেওয়ান্‌জীর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়। ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—"তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি বললেন, 'তুমি আমার ছেলে; আমি তোমার মা।' আমি বললুম, 'সবই ত মা'; তখন থেকে তাঁকে 'মা' বলে ডাকি। তিনি আমাকে অনেক যত্ন করেছেন, আদর করেছেন। তাঁর ছেলেরাও আমায় অনেক যত্ন করেছে। এখনও আমাকে দেখতে ছুটে আসেন।"

তারপর একদিন চৌষট্টি মন্দিরে গান করিতেছেন, খিদিরপুরের

পচুর মার (ঠাকুর তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন) সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুরকে দেখিয়া, তাঁহার গান শুনিয়া, তিনি মুগ্ধ হন। তিনিই খিদিরপুর আসিতে বলেন। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

"এই দেখা না কেন, কাশীতে ছিলুম পাগলা মতন ; কোথা থেকে পচুর মার সঙ্গে দেখা হ'ল ; তার কি একটা ভালবাসা পড়ে গেল, নিয়ে এল খিদিরপুরে। তাও সে কি ; তখন না জানি ট্রেণ, না জানি কিছু। একখানা টিকিট করে দিলে, সকাল বেলা একটা ট্রেণে । সেটা মোকামা এসে থেমে রইল ; সেটার নাকি সেখানেই শেষ। সেখানেই নেমে পড়লুম। তখন রাত আটটা। সে সময় একটা সুবিধা ছিল, কিছু খাই না। ঝোলাতে ক'টি কুল দিয়েছিল, তারই দু'তিনটী খেলুম। খেয়ে ঝোলাটী মাথায় দিয়ে প্ল্যাটফরমে শুয়ে পড়লুম। রাত দশটার সময় একটী ভদ্রলোক পেঁড়া, মালাই, আরও কিছু খাবার, এক ঘটি জল নিয়ে হাজির ; বললে, 'আপনাকে এ খেতে হবে।' আমি বললুম, 'কেন আপনি আমায় খাওয়াচ্ছেন ? আপনি আমায় চেনেন ?' তিনি বললেন, 'না, চিনি না ; তবে আমার কেমন ইচ্ছা হ'ল আপনাকে খাওয়াতে।' আমি বললুম, 'আমার খাওয়ার শক্তি উপস্থিত নেই ; তবু আপনি এনেছেন, একটু খাচ্ছি।' একটু মুখে দিলুম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন ?' আমি বললুম, 'হাবড়ায় যাব ; ভোরে ট্রেণ।' তিনি বললেন, 'রাত এগারটায় ট্রেণ আছে। তবে সে এক্সপ্রেস (Express) ; আপনার টিকিটে হবে কিনা দেখি ?' টিকিটটা দেখে বললেন, 'এতে হবে না।' আমি বললুম, 'থাক, ভোরেই যাব, এখন বরং ঘুমিয়ে নিই।' তিনি বললেন, 'তা কেন ? আমি টিকিট ঠিক্ করে দিচ্ছি।' সেই টিকিটটাই এক্সপ্রেসের করে দিলেন। সে ভদ্রলোকও এলেন ; তিনি বর্দ্ধমানে নামলেন। আমি হাওড়া এসে পৌঁছালুম। ষ্টেশনে কেউ আসেনি ; তারা ত জানত না কোন্ ট্রেণে আসছি। খিদিরপুর যাব ; কোথায় যাব, বাড়ীর নম্বর

খিদিরপুরে আগমন।

টম্বর কিছুই জানি না। ট্রামে যেতে হয় জানা আছে; পয়সাও নেই; হেঁটে যাব ভাবছি। বেলা দশটা সাড়ে দশটা হয়েছে, এমন সময় দুটী ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাবেন?' আমি বললুম, 'খিদিরপুর যাব।' বললে, 'চলুন না, আমরাও যাচ্ছি, ট্রামে যাব।' আমি বললুম, 'আমার কাছে পয়সা নেই, হেঁটেই যাব।' তারা বললে, 'কেন, আমরা পয়সা দিচ্ছি, চলুন না।' আমি বললুম, 'থাক, আমি গঙ্গা নেয়ে যাব।' তা শুনলে না; বললে, 'আমাদের সঙ্গেই চলুন।' ট্রামে উঠেছি; খানিক দূর এসে বলে, 'আপনার ঝুলিটাতে কি আছে?' আমি বললুম, 'কি আছে না আছে, অত আমার মনে নেই, তোমরা দেখ, নাও'; বলে ঝুলিটা দিয়ে দিলুম। তা কি ভেবে আর দেখলে না; ফিরিয়ে দিলে।

"খিদিরপুরে কোথায় বাড়ী আমার জানা নেই। কেবল পচুর মা, আর রামকমল মুখুয্যের ষ্ট্রীটে বাড়ী এই মনে ছিল। ট্রাম যেখানে এসে থামল, সেখানে নামলুম। দেখি, সেইখানেই দুটী ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, ওর মধ্যে একটী পটল। পচুদের কথা বলতেই তারা বললে, 'এই যে আমাদের বাড়ীর কাছে, আসুন।' ঐ ভদ্রলোক দু'টী বললে, 'আমরা বাড়ী খুঁজে দিতুম, তা হয়ে গেল; এখন যাই।' তারা চলে গেল। পচুদের সেখানে উঠলুম, পচুর মা কত যত্ন করেছে; নিজের ছেলেকেও লোকে অত যত্ন করে না। ছোট ছেলের মতন আমার গা মুছিয়ে দেওয়া, আমার গায়ে তেল মাখিয়ে দেওয়া, যেমন ছোট ছেলেকে আদর করে, যে রকম উনি আমার আদর যত্ন করেছেন। আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকি। কালু, বিজয়, এরাও কত যত্ন করেছে। সাতু, কালুর মা, এরা ছেলের চেয়েও যত্ন করেছে। মেলা লোক তখন আসত; বেশীর ভাগই হাত দেখাতে আর ওষুধ নিতে। যখন দেখলে, আমি কোনটাই জানি না, তখন কমে গেল।

পচুর মা।

"খিদিরপুরে তখন কিছু খেতুম না। চান করতে বেরতাম; সন্ধ্যা

বেলা হয়ত ফিরে এলুম। মনসাতলার সব মেয়েরা গঙ্গার ঘাটে আসত; অনেকে খাবার করে নিয়ে আসত; বসে আছে। আমি তা খেতে পারতুম না, একটু একটু করে মুখে দিতুম। আগে কালীবাড়ীতে বড় কেউ যেত না। বাজারের মধ্যে ছিল; ভদ্রলোক কেউ যেত না। আমি যেতে, সব যেতে লাগল। আগে ভোরবেলা গঙ্গার ধারে যেতুম। সেখান থেকে আমায় মনসাতলা নিয়ে যেত। সেখানে বহু লোক জড় হ'ত; খুব গান করতুম। একদিন ১৭।১৮ বাড়ীতে নিমন্ত্রন্ন করেছে। তখন 'কালমেয়ে' (বিনোদিনী) আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। আমি ত কিছু খাই না। বলে দিতুম, এক একটা ডাব রেখে দিও। ওই ১৭।১৮ বাড়ীতে ডাব খেয়ে এলুম। আমার ত খাওয়া ছিল না। বিজয় একেবারে না ছোড় হয়ে ধরলে, খেতে হবে। প্রথম প্রথম মাছ টাছ সব গন্ধ লাগত। পচুর মা, মামী (পচুর মামী) নানারকম রাঁধত। কিছুতেই ছাড়বে না; খেতে হবে। একটু একটু মুখে দিতুম। মামা (পচুর মামা), ভোলানাথ, এরা সব আমায় খুব যত্ন করেছে। পটল, পটলের দিদিমা, এরাও কত আদর যত্ন করেছে। বিজয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল! সে মঠ করলে। সেখানেই সব আসত।

খিদিরপুরের কার্য্য।

"বিজয়ের এমন ভাব হ'ল, আমার কাছ থেকে নড়বে না; রাত ২টা, ৩টা পর্য্যন্ত বসে থাকত। জোর করে বাড়ী পাঠাতুম আবার ভোরে উঠে আমার কাছে আসত, ঘুমাত না। বাড়ীতে মাটিতে পড়ে থাকত, খাটে শুত না। আমি কত তাড়া দিতুম, ওসব করো না; তোমরা সংসারী, তোমরা কেন ওসব করবে? আমি ফকির মানুষ, আমার অবশ্য সে ভাবে থাকতে হবে। কাশীতে কোন জিনিষ খেতে ইচ্ছা হয়েছে এরূপ ভাবছি, বিজয় কলকাতা থেকে সেটা নিয়ে গিয়ে উপস্থিত। বললে, 'আপনার না এটা খেতে ইচ্ছা হয়েছে?' কলকাতায়

বিজয়।

একদিন আমাকে বাগবাজারে মদনমোহন দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। এক-জনার বাড়ী যাব; ট্রামে যাচ্ছি; ট্রাম থেকে নেমে একটা খাবারের দোকানের বারান্দায় বসেছি। তার অপর পাশে নবীন ময়রার দোকান; নানা রকম খাবার করে রেখেছে; খেতে ইচ্ছা হয়েছে। তা সেখানে হ'য়ে উঠেনি; মঠে এসেছি। বিজয় আমার সঙ্গে বসে গল্প করছে। গল্প করতে করতে টপ করে উঠে গেল। ও রকম মাঝে মাঝে যায়। ভাবলুম, বাড়ী গেছে। খানিক পরে সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে এসে উপস্থিত; বললে 'নবীন ময়রার দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে এসেছি।'

"তারপর শ্রীরামপুরে; নীরন প্রথম সেখানে নিয়ে যায়; প্রসাদ লাহিড়ীর বাড়ীতে উঠি। শ্রীরামপুরে কি কম খেটেছি! একমাস ঘুমুইনি। ভোর থেকে রাত তিনটা পর্য্যন্ত লোক থাকত। কিছুদিন পরে মৃত্যুনের সঙ্গে দেখা। দেখার পরই খিদিরপুর এল। বললে, 'আমার একটা ছোট বাড়ী আছে যদি সেখানে যান'; ওর বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেই মঠ হ'ল। ওদের রাঁচীতে ব্যবসা ছিল। ওর সেখানে যাবার কথা, যাবে না। আমি তাড়া দিলাম, 'ব্যবসা নষ্ট করবে কি?' তা গেল; গিয়েই তারপর দিন পালিয়ে এল; থাকতে পারলে না। দু'তিন বার পাঠিয়ে দিলুম; তবু চলে এল।

শ্রীরামপুর।

"শ্রীরামপুরে একমাস ঘুমুইনি। চব্বিশ ঘণ্টা বকছি। সকালে ভোর থেকে রাত্তির তিনটে পর্য্যন্ত ছেলেরা সব বসে থাকত। এক একদিন এমন হয়েছে যে কেউ খায়নি, ভুলে গেছে। রাত তিনটে হয়ে গেছে, তবে হুঁস হয়েছে। তবে জলখাবার খুব আসত। এক একদিন পঞ্চাশ ষাট দফা খাবার আসত। আর এক এক বারে অনেক রকম। ঘর ভরে গেছে। একটু খেয়ে সব বিলিয়ে দিচ্ছে, আবার আসছে। রাত তিনটার পর মৃত্যুন আমার কাছ থেকে উঠত। মৃত্যুনকে উঠিয়ে

শ্রীরামপুরের কার্য্য।

দিতুম, তার পরই ভোর হয়ে যেত। দুপুর বেলা আবার মেয়েদের দল আসত, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসত। কোন্ সময় আর বিশ্রাম করব? আবার পেটের অসুখ চলছে। ত্রিশ বত্রিশ বার পায়খানা হচ্ছে। তার ওপর নগরকীর্ত্তন; তিন চার শত ছেলে বেরত। কীর্ত্তন করতে করতে এক একদিন এক এক বাড়ীতে যাওয়া হ'ত। তারা নানারকম ভোগের ব্যবস্থা করত। শেষে দেখি যাদের অবস্থা ভাল নয় তারাও ধার করে করতে লাগল, তাই বলে দিলুম যে বাড়ীতে কীর্ত্তন হবে পাঁচ পো বাতাসার বেশী কেউ দিতে পারবে না।

"এসব দেখে একটী উকীলের ভয়ানক হিংসা হ'ল। তার বেশ বয়স হয়েছে। সব আসে দেখে তার হ'ল রাগ। তাদের যা তা বলে, 'এরা সব নষ্ট হয়ে গেল। কোথাকার কে একটা এসেছে, তার কাছে গিয়ে সব পড়ে আছে।' তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তাঁকে দেখেছেন?' বললে, 'নাই বা দেখলুম; দেখিনি বলে কি বুঝতে পাচ্ছিনি?' (সকলের হাস্য)। ওরা আমায় এসে বললে, 'এ রকম যা তা বলে।' আমি বললুম, 'বাপু, ওর একটা ভাব এসেছে, বলছে। বুঝলেই চলে যাবে।' পরে সেও এসেছিল। আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। বললে, 'আমায় মাপ করুন, আমি বুঝতে পারিনি। আমি যখনই আহ্নিক করতে বসি, আপনাকে সামনে দেখি।' আমি বললুম, 'তাতে কি? তোমার একটা ভাব এসেছে, বলেছ। তুমি কেন ভাবছ? তাঁকে ডাক।' পরে প্রায়ই আসত।

"খিদিরপুরেই কি? লোকজন খুব মঠে আসে দেখে অন্নদা খুব গালাগাল দিত। এরা আমায় এসে বলত, 'দেখুন, যা তা রটাচ্ছে।'

অন্নদা ও তাহার ছেলে জিতু।

আমি বললুম, 'তার একটা ভাব এসেছে, বলছে। তোমরা তাতে কেন দুঃখিত হবে?' তারপর তার ছেলের হ'ল বসন্ত। একটি ছেলে, ভয়ানক বসন্ত হ'ল। কিছুতেই কিছু হয় না। একেবারে অচৈতন্য, চিকিৎসক সব ছেড়ে দিয়েছে। এমন সময়, ছেলেটী অজ্ঞান অবস্থায়

আমার নাম করে বলছে, 'মা বলছেন, তোমরা তাঁকে গিয়ে ধর, তবে আমি বাঁচব, তা নইলে বাঁচব না। তারা আমার কাছে এল, পুত্র-মায়া, তখন আর মান অভিমান নেই; স্বামী স্ত্রী এসে কেঁদে পড়ল। 'আমাদের অপরাধ হয়েছে, বুঝতে পারিনি, আপনি ক্ষমা করুন', এ সব বলতে লাগল। আমি বললুম, 'তোমার ভাব, তুমি বলেছ তাতে কি? আচ্ছা, তোমার ছেলে ত গেছেই, ওর ত নাড়ী নেই; ডাক্তারেরা ছেড়ে দিয়েছে, ও ত গেছেই; তা ছেলেটী যদি আমায় দিয়ে দাও, তবে বাঁচতে পারে।' তা বললে, 'দেব।' আমি বললুম, 'ঠিক্ দিয়েছ ত?' বললে, 'হ্যাঁ, আপনাকে দিলুম।' তারপর চরণামৃত নিয়ে গেল, তাতেই সেরে গেল। তখন তার খুব ভক্তি। অপর কেউ আমায় কিছু বললে, তাকে রুখে ওঠে। (সকলের হাস্য)। আমার নিন্দা সহ্য করতে পারে না। তাকে বললুম, 'দেখ, ছেলে নিয়ে আমি আর কি করব? তবে তাঁর দিকে মন রাখিও। ছেলেটাও খুব ভাল।'"

ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের ভক্তদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এখানে লিখিলাম;—

"মৃত্যুনের আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। আমার কাছে প্রায়ই থাকে। মাঝে মাঝে আবশ্যক হলে বাড়ী যায়; সেখানকার কাজ কর্ম্মও দেখে। সেবা করবার শক্তি তার খুব আছে; তা সে আনন্দচিত্তে করে। চরিত্রবান; এবং ধর্ম্মে নিষ্ঠা আছে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি নীতিতে থাকবার চেষ্টা করে। আমাদের না দেখলে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে সংসারের কাজে ব্যাপৃত থাকে বটে, আবার ছুটে আসে আমাদের দেখতে।

শ্রীরামপুরের ভক্তগণ।

"অশ্বিনীরও আমার ওপর খুব ভক্তি বিশ্বাস। সেখানকার মঠের যা কিছু দেখা শোনা কার্য্যের ভার, তার ওপর। সে ভক্তিপূর্ব্বক সে সব কাজ করে।"

"কেষ্ট আমায় না দেখে থাকতে পারে না; আমার ওপর খুব ভক্তি

বিশ্বাস এবং সরল ভালবাসা। মাঝে মাঝে ছুটে আমায় দেখতে আসে; শ্রীরামপুরে গেলে, যেখানে যে ভাল জিনিষটি পাবে, আমার জন্য নিয়ে আসে। প্রচুর অর্থ আছে, কিন্তু অর্থের একটা অহঙ্কার নেই; আমাকে দেখবার জন্য কাশীতে পর্য্যন্ত ছুটে যায়।

"মনোরঞ্জন খুব ধীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান ছেলে। আমাকে খুব ভক্তি করে। ছুটে ছুটে আমায় দেখতে আসে। শ্রীরামপুরে কোন ভাল জিনিষ নতুন উঠলেই আমার জন্য নিয়ে আসে। তার স্ত্রীও অতি লক্ষ্মী মেয়ে; আমার ওপর একটা অগাধ ভক্তি বিশ্বাস।"

খিদিরপুরে থাকিতে অনেক স্থানে তাঁহার ভক্ত হয়। শিবপুরেও চুণী, সুরেন প্রভৃতি অনেকে ভক্ত হয়। তারপর ভবানীপুরে আসেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর আগে ঠাকুর প্রথম ভবানীপুরে আসেন। অশোক তাঁহাকে খিদিরপুর হইতে লইয়া আসে; তাহার নিজের বাড়ীতে রাখে। সেই বাড়ীতে ভক্ত ও অন্যান্য লোকের ভিড় জমিয়া যাইত; ঠাকুরের উপদেশ, গান ও কীর্ত্তনে দিবারাত্র সেই বাড়ী মুখরিত থাকিত। আজকাল ঠাকুর বৎসরে প্রথম ছয় মাস ভবানীপুরে আসিয়া থাকেন। তারপর কাশী যান। ভবানীপুরে

ভবানীপুর।

ভক্তেরা ছয়মাসের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া মঠ করে। সেখানে ঠাকুর থাকেন; ভক্তেরা সকলে আসে। এই বৎসর ডাক্তার সাহেব কয়েক বৎসরের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া মঠ করিয়াছেন। ভবানীপুরে প্রথম আসা ও সেখানকার ভক্তদের সম্বন্ধে ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছি, লিখিলাম;—

"অশোক প্রথম আমায় নিয়ে আসে; তার বাড়ীতে রাখে। সে, তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা আমার খুব সেবা করেছে; আমায় খুব ভক্তি করে, ভালবাসে। অশোক মুক্তহস্ত; তার মন খুব উচ্চ; টাকা দিতে আত্মপর জ্ঞান করে না। তাদের যত্ন ভালবাসার কথা ভোলবার নয়। অজয়, অজয়ের স্ত্রীও আমায় খুব ভালবাসে, ভক্তি

করে; আমায় দেখে শোনে। সোমদেব, সোমদেবের স্ত্রীরও আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। সোমদেবের স্ত্রী বড় লক্ষ্মী মেয়ে; তার সুন্দর স্বভাব। রাজেন, রাজেনের স্ত্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। রাজেনের মঠের ওপর খুব লক্ষ্য। অশোক, অজয়, সোমদেব, রাজেন, শশী, এদের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারাই আমার ভবানীপুরে থাকা হয়।

ভবানীপুরের ভক্তগণ।

"কানাইও আমায় খুব ভালবাসে। তার মা ও স্ত্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা; কাশীতে আমার কাছে অনেকদিন ছিল; আমার খুব সেবা করেছে। কলকাতার যতীন বোস, যতীনের স্ত্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা; আমাকে দেখতে প্রায়ই ছুটে আসে; যেখানে যা ভাল পায়, আমি খেতে যা ভালবাসি, সব খোঁজ করে নিয়ে আসে।

"কালী, ডাক্তার সাহেবের ত কথাই নেই। তারা ত এখন সবই করছে। কালীর স্ত্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা; বড় সৎ মেয়ে; স্বামীর ওপরও তার খুব ভক্তি। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীও বড় ভাল মেয়ে; আমায় খুব ভালবাসে, যত্নপূর্ব্বক আমার সেবা করে। অসিতা, জিতেন, এদেরও আমার ওপর খুব ভালবাসা। অসিতার স্ত্রী, জিতেনের স্ত্রী আমায় খুব ভালবাসে; মাঝে মাঝে আমায় দেখতে আসে।"

কলিকাতা হইতে ঠাকুর দুইবার গৌহাটি গিয়াছিলেন। সেখানেও মহাদেব, তারক, মহম্মদ, কেষ্ট প্রভৃতি অনেকে ঠাকুরের ভক্ত হয়।

ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নে কিছু লেখা হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভক্তদের শিক্ষার্থ কিরূপ কঠোর নীতি তিনি পালন করেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবন গঠন করেন।

কাশীতে নিজের কার্য্য শেষ করিয়া প্রায় ৪৷৷টা ৫টার সময় একটি গান করেন।

জাগ জাগ মা কুল-কুণ্ডলিনী, আমার দিন গেল মা ;
মম চতুর্দ্দল হৃদাব্জ-মণ্ডলে, কত নিদ্রা যাও মা নিদ্রারূপিণী ॥
শম্ভুসহ কত নিদ্রা যাও মা, ভক্তের যোগে জাগে জাগ মা একবার,
আমার গেল কুদিন, এল সুদিন, এ দীনের দুঃখ রবে না আর ;
যেথা আছ নারী, পরম সূক্ষ্ম মধ্যে,
কবে দেখা দিবি মা সহস্রদল পদ্মে,
মা তোর পাদপদ্মে, ভক্তের হৃদয়পদ্মে,
পদ্মে পদ্মে মিলন হবে গো জননী ॥

গান শুনিয়া মঠে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা উঠিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করেন। তারপর ৭॥টা পর্য্যন্ত ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ থাকে। ৭॥টার সময় দরজা খোলা হইলে ভক্তরা নিজেদের সাধন ভজনের জন্য এক একজন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে। তারপর ৯টায় ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে লইয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান। স্নানের পর দেবদর্শন করিতে বাহির হন। ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে যান। দশাশ্বমেধ কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন। সেখান হইতে, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ, চৌষট্টি মা প্রভৃতি দেব-স্থানে প্রায়ই যান। দেব-স্থানে ঠাকুর যে সকল গান ও স্তব আবৃত্তি করেন, তাহার কয়েকটা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কে জানে তোমারি মায়া, মহামায়া স্বরূপিণী।
বিরাজ সর্ব্বভূতে, ওমা বিশ্বব্যাপিনী ॥
প্রথমে মহাকালী, দ্বিতীয়ে তারা,
তৃতীয়ে ষোড়শীরূপ ধরিলে ত্রিপুরা ;
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, অপরূপ রূপ মাধুরী,
হলে মা বিচিত্রা নারী, হরচিত্তহারিণী ॥
পঞ্চমে পরমেশ্বরী, ভৈরবী আকার,
বিভূতিভূষিত অঙ্গে, শিরে জটাভার ;
নিরখি রূপ অদ্ভুত, ভূতনাথ অভিভূত,
চিত ভীত সশঙ্কিত হলেন, শিব শূলপাণি ॥

ষষ্ঠে ছিন্নমস্তারূপ ধারণ করিলে,
স্বীয় মুণ্ড খণ্ড করে করেতে ধরিলে,
রক্ত উঠে তিন ধার, তার একধার করিলে আহার,
আর তার দুই ধার পিয়ে দুই যোগিনী ॥
সপ্তমেতে ধূমাবতী, অষ্টমে বগলা,
ললাটফলকে বদ্ধ তারা অর্দ্ধচন্দ্রকলা ;
কে জানে তোমার মর্ম্ম, তুমি যোগীর যোগধর্ম্ম,
ইচ্ছারূপে কর কর্ম্ম, তারকব্রহ্ম সনাতনী ॥
নবমে মাতঙ্গী অঙ্গ, দশমে কমলা,
কি বর্ণে বর্ণিব মাগো, তুমি বর্ণমালা ;
আসা যাওয়া বারে বারে, আর সহে না শরীরে,
এইবার দীনেরে দুস্তরে তার তারিণী ॥

২। ভুলি নাই মাগো তোমারি চরণে,
জন্মে জন্মে তুমি অনাথ-শরণ,
তোমারি লাগিয়া ভ্রমি অনুক্ষণ,
নগর, কান্তার, কানন, গিরি।
কেহ নাহি যার, তুমি আছ তার,
তোমারই লাগিয়া আছে মা সংসার,
ত্বরা করে এসে, ওমা শিবরাণী,
ওই শুন কাঁদে অনন্ত পরাণী,
দাও ভালবাসা, প্রাণভরা আশা,
এই আশায় মাগো জীবন রয়।
আর কতকাল কত জন্ম হবে,
মিছে ঘুরিফিরি, বহুরূপী সাজে,
ও রাঙ্গা চরণ কবে মা রাজিবে,
কবে মা ছিঁড়িবে করমডুরি।

খেলাতে এনু মা সাধ করে হেথা,
চোখে আসে জল ভাবিলে সে কথা,
ললাট-লিখন কে করে অন্যথা,
তবু মা দেখিব পারি কি হারি।
বুকে দাও বল, জীবনে বিশ্বাস,
হৃদয়-মাঝারে হও মা প্রকাশ,
তোমারই কৃপায়, তোমারি এ দাস,
শ্রীপদে বাঁধিবে জীবন-তরী॥

৩। হরহৃদিহ্রদেপদ, কোকনদ-শোভা জিনি,
কালরূপে আলো করে, কালী করালবদনী
ঘোররূপা ভয়ঙ্করা, এলোকেশী উলাঙ্গিনী,
মুখোজ্জ্বলা, সুধাঢালা, মুণ্ডমালা বিভূষিণী,
বামরুদ্ধ করাম্বুজে অসিমুণ্ড বিধায়িনী,
দক্ষিণ দুই করে, নরে বরাভয়-প্রদায়িনী।
পীনোন্নত পয়োধরা, ঘোর জলদবরণী,
বরনর-করচয় কটিতে শোভে কিঙ্কিণী,
ভয়ঙ্করী, মহারুদ্রী, শ্মশানালয়-বাসিনী,
বালার্কমণ্ডলাকারা, আরক্তিম ত্রিনয়নী।
শবরূপ মহাদেব-হৃদয়পর-বাসিনী,
বিপরীত রতাতুরা, সুখে প্রসন্নবদনী,
তাই কয় দক্ষিণাকালী, যে ভাবে দিবারজনী,
(তার) ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ ফল, অয়ি মোক্ষদায়িনী॥

৪। মা তোর কোলে লুকায়ে থাকি।
চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা, 'মা, মা' বলে ডাকি॥
ডুবে চিদানন্দরসে, মহাযোগনিদ্রাবেশে,
হেরি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি॥
দেখে শুনে ভয় করে, প্রাণ কেঁদে ওঠে ডরে,
রাখ আমায় বুকে ধরে, স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি॥

৫। শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা।
ডমরু-পিণাক-ধারী গলে রুণ্ডমালা॥
সদা সম্বিতপানে, বৃষাসনে ঈশানে,
ত্বং হি কৃপানিদানে, শোভিত কণ্ঠনীলা॥
ভূতেশ ভূতনাথ, নহি ছোড়ে তেরি সাথ,
ত্বং হি কৃপা-পদ, জটাজুট ভালা।
সদা ভস্মঅঙ্গরাগে, বিভূষণ-নাগে,
জগতবিরাগে, মরি নয়ন বিশালা,
যোগীবর, যজ্ঞেশ্বর, স্মর, হর শঙ্কর,
হর হর গঙ্গাধর, পিয়ানে বাঘছালা॥

৬। আমার হৃদ্‌কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ওমা॥
ইড়াপীঙ্গলানামা, সুষুম্না মনোরমা,
তারি মাঝে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে হায়,
কামাদি মোহ যায়, হেরিলে তখনি ওমা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোল মারা বাণী শ্যামা॥

দেবস্থানে ঠাকুরের বড় সুন্দর ভাব হয়। আমরা মৃন্ময়ী মূর্ত্তিটাই দেখি; তিনি যেন চিন্ময়ী মার সঙ্গে আলাপ করেন; মাকে গান শোনান। অপরূপ রূপ দর্শনে চোখ মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত আর এক রকম হইয়া যায়। কিসের নেশায় যেন ভরপূর; আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। আসিবার সময় বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকান ও 'মা মা' বলিয়া ডাকেন; ছোট ছেলে যেমন মার কোল ছাড়িয়া আসিবার সময় ব্যাকুল ভাবে মাকে বার বার ডাকে, করুণ নয়নে মার দিকে তাকায়; আসিতে যেন ইচ্ছা করিতেছে না; জোর করিয়া সে আনন্দ ছাড়িয়া আসিতেছেন।

প্রায় ১১টার সময় মঠে ফিরিয়া আসেন। কয়েক মিনিট পরে আহার করিতে বসেন। আহার করিতে করিতেও ভক্তদের সঙ্গে গল্প করেন; দিবারাত্র, প্রায় সব সময়ই ঠাকুর ভক্তদের নিজের সঙ্গে রাখেন। নানা ভাবে, গল্পে, গানে, কথায় তাহাদের সঙ্গে আনন্দ করেন। যেন তাহারা কিছু সময়ও সংসার হইতে তফাৎ থাকিতে পারে। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা (যাঁরা মঠে থাকেন) প্রসাদ পাইতে যান। ঠাকুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। কোন দিন হয়ত দূর হইতে কোন ভক্ত আসেন; তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বিশ্রামের সময়-টুকুও কাটাইয়া দেন। ৩টার পরে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হয়। তখন গান করেন।

ব্যাকুল হয়ে মা বলিয়ে, ডাক মন, হৃদি ভেদিয়ে,
তবে ত আলু থালু বেশে, আমার মা আসিবেন আকুল হয়ে।
জননীর তরে, করুণস্বরে, কাঁদ মন হৃদি ভাসায়ে,
শুনি সে ধ্বনি, আসি জননী, দিবেন আঁখিনীর মুছাইয়ে॥
কোথা জননী, দীন-তারিণী বলে কাঁদরে ভূমে লুটায়ে,
দেখিবি তারা, আসিবেন ত্বরা, লইবেন তোরে কোলে তুলিয়ে।
মায়ের স্বভাব পূরায় অভাব, মা নামের কলঙ্ক ভয়ে,
ও তোর মায়ের অভাব, তাইতে এ দীন ডাকতে বলে মা বলিয়ে॥

গানের পর ঠাকুর জলযোগ করেন। ৪॥টা হইতে ভক্তরা আসিতে থাকেন; রাত দশটা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে। তাহার পরও বারটা পর্য্যন্ত, যাঁহারা মঠে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা হয়। বৈকালে ৫টার সময় আবার গান করেন।

১। মন সদা ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে।
আর গুরুদত্ত রত্ন কালী, নিশিদিন জপ না রে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় মাকে কর ধ্যান,
তুমি নগর ফের, আর মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥

যত শুন কর্ণপুটে, সকলি মার বর্ণ বটে,
মা যে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, (আমার) মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
তুমি আহার কর আর মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা মারে॥

২। আপনাতে আপনি থেকো মন, যেওনাক কারও ঘরে,
যা চা'বি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন সেই পরশমণি, যা চা'বি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥

৩। ভবে সেই সে পরমানন্দ, যেজন জগদানন্দময়ী মারে জানে।
সে না যায় তীর্থ-পর্য্যটনে, কালীনাম বই না শুনে শ্রবণে।
সন্ধ্যাদি পূজা কিছুই না মানে, থাকে সদা শ্রীগুরুর চরণ ধ্যানে॥

৪। জপ রে মন কালী তারা, দিবানিশি জপ না রে।
যে জন 'মা মা' বলে সদাই ডাকে, কি ভয় আছে এ সংসারে॥
মনে প্রাণে ঐক্য করে, তুমি ভাব না সেই তারা মারে,
(তাঁরে) ভাবিলে হয় ভাবের উদয়, আনন্দে প্রাণ যায় রে ভরে॥
ছেলের ডাক শুনলে পরে, মা কি কভু থাকতে পারে,
মা যে ছুটে এসে লয় গো কোলে, কত রাখে আদরে॥
দীনের ভাব বুঝবে কেটা, তোদের মাকে ভুলে এতই সেটা,
নইলে কি গো মাকুর মতন এত গুঁতো খেতে হয় রে॥

৫। চিন্তয় মম মানসে হরি, চিদ্ঘন নিরঞ্জন।—ইত্যাদি।

তারপর উপদেশ, কথোপকথন ইত্যাদি চলিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় আলো জ্বালা হইলে, আবার আহ্নিকের পূর্ব্বে গান করেন।

১। ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। (রামপ্রসাদী সঙ্গীত)

২। এই দয়া চাই তোমার।
যেন অন্তিমকালে তারা, সদয় ভাবে একবার
উদয় হয়ো, হৃদয়-পদ্মে আমার।

কর্ম্মসূত্রে গাঁথলেম অধর্ম্মরূপ মালা,
পেলেম ব্রহ্মময়ী, মর্ম্মে কত জ্বালা,
আর যেন যাতনা না পাই গিরিবালা,
নিকটে কালান্ত দুরাচার ॥
ভবে আসাবধি, আশা নিরবধি, বধিব কামাদি ছয় জন,
(কিন্তু) স্বজনসঙ্গমে, অসৎ-সঙ্গপ্রেমে রঙ্গরসে কাটালেম জীবন ;
অকরুণা যদি হও মা তাই বলে,
ফেলে দিও দুর্গে, স্বপত্নীর কোলে,
অন্তর্জল যেন ঘটে গঙ্গাজলে,
ভবজলে তারা, ত্বরা হব পার ॥
দেহ নির্ম্মূলন কালে মূলমন্ত্র যোগে, মূলাধারে তত্ত্ব না দেই যদি,
কুলকুণ্ডলিনী তখন, নিজগুণে চেতন হবে মা, চরণে সাধি ;
ওমা, হংসে ভর করে যাবে ব্রহ্মধামে,
বসিবে মা শিবে, পরম শিবের বামে,
তা হ'লে এ দীনের প্রতি ওমা উমে,
রবে না আর কারও অধিকার ॥

৩। তাই মা তোরে ভালবাসি।
আমার মনের কথা কই মা আসি ॥
মা নামে কতই গুণ বলব কারে, নিজেই বসি
যখন ডাকি তোরে 'মা মা' বলে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥
'মা মা' বলে ডাকলে পরে কর্ম্ম যত যায় মা খসি,
তখন তোমায় আমায় ভেদ থাকে না, হয়ে যায় মেশামেশি ॥
এই ঘটে রিপু ক'জন যে যার ঘরে থাকে বসি,
দীন বলে মা ভবানন্দে থাকি যেন দিবানিশি ॥

৪। তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে,
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা।
(রামপ্রসাদী সঙ্গীত)

৫। তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমন্মোহিনী এলোকেশী ॥

কালোর গুণ জানে ভাল, শুক শম্ভু দেব ঋষি,
কালের কাল মহাকাল, কালোরূপ তার হৃদ্‌বিলাসী ॥
কালো বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী,
হলেন কৃষ্ণকালী বনমালী, বাঁশী ছেড়ে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, সকলই ত এক বয়সী,
তার মাঝে বিরাজে আমার কেলে মা পূর্ণিমার শশী ॥
প্রসাদ ভণে, অভেদ জ্ঞানে কালোয় কালোয় মেশামিশি,
ওরে একেই পাঁচ, পাঁচেই এক, মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী ॥

গানের পর আহ্নিক করেন। আহ্নিক শেষ হইলে ঠাকুর ও ভক্তেরা সমস্বরে মায়ের নাম করেন। তারপর আবার কথাবার্ত্তা, উপদেশ চলিতে থাকে। ৯॥টা বাজিলে দূরের ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করেন। ১০টার পর ঠাকুর আরতি করেন। আরতির পর ১০॥টায় আহার করিতে বসেন। আহার শেষ হইলে শুইবার কিছু আগে স্তব পাঠ করেন। ১২ টার সময় ছাতে শুইতে যান।

কলিকাতায়, সকালে ৫॥টায় গঙ্গাস্নান করিতে যান। আসিতে পথে একটি ছোট কালীবাড়ীতে মাকে দর্শন করিয়া আসেন। মঠে আসিয়া কিছুক্ষণ পরে আহ্নিক করেন। তারপর ভক্তেরা এক একজন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। ৯॥টার পর কালীঘাট যান। সেখানে নকুলেশ্বর শিব, মা-কালী ও লক্ষ্মীনারায়ণাদি দেবদেবী যথারীতি দর্শন করেন, ও গান এবং স্তব আবৃত্তি করেন। প্রায় ১১টার সময় ফিরিয়া আসিয়া আহার করিতে বসেন। তারপরের কার্য্য-পদ্ধতি কাশীর মত।

মঠে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের এ নীতি অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। ঠাকুরের সেবার জন্য মৃত্যুন প্রায় সব সময়ই ঠাকুরের কাছে থাকে। তাহার ঠাকুর ও মার উপর অসীম ভক্তি ভালবাসা। একাগ্র চিত্তে ঠাকুরের সেবা করে। মঠের প্রায় সমস্ত কার্য্যের ভার তাহার উপর। সে তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে। ধীরেনও মাঝে মাঝে

ঠাকুরের কাছে যাইয়া থাকে। সেবা করার ক্ষমতা তাহার অসীম। ঠাকুরের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সে অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন করে। কাশীতে অন্যান্য ভক্তরাও মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন। কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব প্রায়ই যাইয়া থাকেন ও ঠাকুরের সেবা করেন। মেয়ে ভক্তদের মধ্যে ভালবাসাদিদি, বিন্দুদিদি, সর্ব্বদা মঠে থাকিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত ঠাকুরের সেবা করেন। দিদির ঠাকুরের উপর অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি, তাঁহার বড় সুন্দর পবিত্র ভাব। খুব নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করেন। আর মার উপর ত মঠের আভ্যন্তরীণ সমস্ত কার্য্যের ভার। ঠাকুরের বহু ভাব; সে অনুযায়ী মা যখন যাহা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা অতি সুন্দর রূপে করেন। আবার ভক্তদিগকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভাল বাসেন। নানা রকম আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া আনন্দ লাভ করেন; নিজে হাতে পরিবেশন করেন। বাস্তবিক মার স্নেহ ভালবাসার তুলনা নাই। এ মায়ের মধ্যে আমরা পার্থিব মা এবং ঈশ্বরীয় মা দুইই একাধারে পাইয়াছি। পার্থিব মায়ের আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা রহিয়াছে; আবার ঈশ্বরীয় মায়ের করুণা ও মহত্ব রহিয়াছে। ঠাকুর ও মার অসাধারণ ভালবাসার আকর্ষণেই ভক্তরা সংসারের প্রবল আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাদের কাছে থাকেন।

ঠাকুর ভালবাসায় যেমন সকলকে বদ্ধ করিয়াছেন, আবার সামান্য অন্যায় বা নীতির একটু ব্যতিক্রম হইলে কঠোর শাসনে তাহা সংশোধন করেন। সেই তীব্র শাসনের ভয়ে কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক নীতির এক চুল এদিক ওদিক করিতে সাহস পায় না।

মানুষের চিত্তজয়ের ঠাকুরের আর এক উপায়, সঙ্গীত। সঙ্গীত স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে, চোখ মুখের ভাবে এবং লীলায়িত হস্ত ভঙ্গীতে যে রকম জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, সে রকম আর কোথাও দেখি নাই। গান করিতে করিতে তিনি যেন শ্রোতার

পঙ্কিল হৃদয়ের সমস্ত ময়লা দূর করিয়া তাহাকে দেবভাবে রঞ্জিত করিয়া দেন। এই ভাবে যখন দেবদুর্লভ কণ্ঠে গাহিতে থাকেন,—

"আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা,
দেখিলেরে তোদের আনন্দে বিভোর, হই রে আপন হারা ;
তোরা আমার বড়ই আপন।"

তখন মনে হয়, এই দুঃখ যন্ত্রণা-পূর্ণ নশ্বর সংসারেও অবিনশ্বর শান্তি আনন্দের উপলব্ধি করা যায় ; অনন্ত প্রেম ও ভালবাসা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছেন ; আর তিনি আমাদের 'বড়ই আপন।'

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের

অমৃতবাণী

প্রথম ভাগ—প্রথম অধ্যায়

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ বাং ; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ইং ;
সোমবার, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী।

কাশীধাম।

ঠাকুরের চতুর্শ্চত্বারিংশৎ জন্মতিথি উৎসব।

নানাস্থান হইতে ভক্তদের আগমন—কাশীর মঠ—মঠ-বাড়ী সাজান—ঠাকুর ও মাকে মালা-চন্দন দ্বারা সাজান—ভক্তদের বন্দনা—ঠাকুরের গান ও আশীর্ব্বাদ—ঠাকুরের ভোগ ও ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ—অপরাহ্নে কালীতলায় মাকে দর্শন—সন্ধ্যায় ঠাকুর ও মাকে মালা-চন্দন প্রদান—ভক্তদের বন্দনা—ঠাকুরের কীর্ত্তন গান—বিখ্যাত গায়কদের গান—ভক্তদের অভিনয়।

আজ ঠাকুরের জন্মতিথি। বারাণসীর মঠে আজ ভক্তরা ঠাকুরের পূজা অর্চ্চনা করিবে, ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ উৎসব করিবে। প্রায় একমাস আগে হইতে সব ব্যবস্থা হইতেছে। নানাস্থানের ভক্তদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে কালীবাবু সদলবলে আসিয়াছেন। তাঁহার বাটীর গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ গোস্বামী ও বাদক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সরকার সঙ্গে আসিয়াছেন, নৃপেন আসিয়াছে। ঢাকা হইতে ধীরেন আসিয়াছে।

কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সত্যেন, প্রভাস, অশ্বিনী, ডাক্তার (মতিলাল), আশু, জন (জনাইএর) আছে। খিদিরপুরের অচ্যুত ও পচু আছে। শ্রীরামপুরের মৃত্যুান, গোকুলবাবু আছে। ডাক্তার সাহেবের খুব অসুখ, একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও আসিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার শরীর এই সময়ে ঠাকুরের আরাধনায় ও তোমাদের উৎসবে যোগদান করিতে না পারিলেও মন সেখানে পড়িয়া থাকিবে।" বাস্তবিকও তাই। কারণ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি ও তাঁহার নাম করিতেছি। ঠাকুরও বারবার তাঁহার কথা বলিতেছেন। পুত্তু, অসিতাবাবু, সোমদেব, শ্রীরামপুরের অশ্বিনী, কেষ্ট, রক্ষিলাল, গতিকৃষ্ট, মনোরঞ্জন, কলিকাতার সুরথ, রাজেন, শিবপুরের চুণী প্রভৃতি আসিতে না পারিলেও তাহারা পত্রদ্বারা তাহাদের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়া আমাদের উৎসবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। কাশীর বীরেশ্বরবাবু, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, নরেন, সুরেন, অপূর্ব্ব, তারাপদ, কেষ্ট, বিশু, মন্নুলাল, আশু, চণ্ডীবাবু, ঋষিবাবু, চরণবাবু প্রভৃতি আছেন। খিদিরপুরের ঠাকুর-মা (পচুর মা, ঠাকুর তাঁহাকে মা বলেন) আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ, প্রভাস, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, চরণবাবু, চণ্ডীবাবু, তুলসীবাবু ও অবিনাশবাবুর বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। দেওয়ানজীর স্ত্রী (ঠাকুর তাঁহাকেও মা বলেন), নফরের মা, আরও বহু মেয়ে-ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন।

কাল হইতে মঠ-বাড়ী সাজান হইতেছে। কাশীর মঠ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে, কালীবাড়ীর খুব নিকটে অবস্থিত। সুন্দর তেতলা বাড়ী, তিনতলায় দুইখানি ঘর আছে। সিঁড়িতে উঠিয়াই সম্মুখের বড় ঘরে ঠাকুর থাকেন। দক্ষিণদিকে ঠাকুরের আসন। ওপরে কুলুঙ্গীতে সিংহাসনে পরমহংসদেব ও মা-কালীর ছবি। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে দুই পার্শ্বে ঠাকুরের দুইখানি ছবি আছে। উত্তরদিকের দেওয়ালে ঠাকুরের পূর্ব্বাবস্থার (সংসারে থাকা সময়ের) একখানা বড় বাষ্ট (bust) ফটো আছে। পূর্ব্ব-

দিকের দেওয়ালে দক্ষিণধারে ঠাকুরের বড় ফটো, উত্তরধারে ছোট ছবিতে মা ঠাকুরকে অঞ্জলি দিতেছেন। ঐ ঘরের উত্তরে ছোট ঘরে মা থাকেন। পূর্ব্বদিকে বড় ছাত। এই ছাতে ঠাকুর রাত্রে শয়ন করেন। এই ছাত হইতে পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা দেখা যায়; গঙ্গার পরপারে, বিস্তীর্ণ শুভ্র বালুকা-সৈকতের সীমান্তে, সবুজ বৃক্ষশ্রেণীর শোভা অতি মনোরম। প্রভাতে তরুণ সূর্য্যের রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত হইয়া গঙ্গার নীলজল, শুভ্র সৈকত ও সবুজ বৃক্ষরাজি অতি সুন্দর দৃশ্য ধারণ করে। ঠাকুর এই ছাতে দাঁড়াইয়া সে শোভা দর্শন করেন, সূর্য্যপ্রণাম করেন এবং গঙ্গাদর্শন করেন। দোতলার ঘরে বিন্দুদিদি, ভালবাসাদিদি এবং কালদিদি থাকেন। তাঁহারা ঠাকুরের সেবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকেন ও খুব ভক্তিপূর্ব্বক ঠাকুর এবং মার সেবা করেন।

এই মঠ-বাড়ী ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া সাজান হইয়াছে, ঠাকুরঘরের প্রত্যেক দেওয়ালে গাঁদাফুলের আঁকাবাঁকা রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ছবিকে ফুলের মালায় সজ্জিত করা হইয়াছে। ঠাকুরের আসনের দুই ধারে ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছে। অপূর্ব্ব উপরে দেওয়ালে ছোট ছোট ফুল দিয়া অতি সুন্দর ওঁকার রচনা করিয়া দিয়াছে। আসনের চারি কোণে ফুলদানিতে ফুলের স্তবক শোভা পাইতেছে। মার ঘরের দেওয়ালও সে রকম ফুলের মালায় সাজান হইয়াছে, ছবিতে মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরের সম্মুখের বারান্দা হইতে ফুলের ও দেবদারু-পাতার ঝালর সিঁড়ি দিয়া বরাবর নামিয়া বাড়ীর সম্মুখের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াছে। মাঝে মাঝে দেওয়ালে পুষ্পগুচ্ছের মাঝখানে ঠাকুরের ছবি শোভা পাইতেছে এবং স্বস্তি ও ওঁকার অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের ফটক ফুল ও পাতায় সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। সেখানে হইতে বাড়ীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের দেওয়াল ঘিরিয়া ফুলের ও দেবদারু-পাতার ঝালর চলিয়া গিয়াছে।

আজিকার ঊষা নবীন আলোক লইয়া আসিয়াছে, আজিকার মলয়-পবন নবীন পুলকের সঞ্চার করিতেছে, আজিকার সূর্য্য নব জ্যোতিতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যূষে ভৈরব-রাগে সানাই বাজিয়া দিকে দিকে এই উৎসবের কথা ঘোষণা করিয়া দিল ও সঙ্গে সঙ্গে ভক্তহৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

সকালে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইলে ঠাকুরকে নববস্ত্র পরান হইল। শুভ্রবস্ত্রাবৃত আসনে শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত ঠাকুরের তপ্তকাঞ্চনসদৃশ দীপ্ত মূর্ত্তি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। মেয়েরা মাকেও নববস্ত্র পরিধান করাইয়া মার ঘরে সুন্দর আসনে বসাইয়াছেন। ধূপ-ধুনা ও ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। ভক্তেরা ঠাকুরকে চন্দন পরাইয়া দিলেন, একে একে সকলে ঠাকুরের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। তার পর মাকে চন্দন পরান হইল। ভক্তেরা মার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। মালায় ঠাকুর ও মার শরীর আবৃত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের ও মার অপূর্ব্বমহিমামণ্ডিত দীপ্ত বদন ও করুণা-মাখা ভাব ভক্তহৃদয়ে অননুভূত আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। আজ যেন বিশ্বনাথের রাজ্যে জগৎপিতা এবং জগজ্জননী মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া ভক্তদের আনন্দদান করিতেছেন।

ভক্তেরা সমস্বরে গাহিল :—

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ১ ॥
যংব্রহ্মা বেদান্তবিদো বদন্তি পরংপ্রধানং পুরুষং তথান্যে
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা, তস্মৈ নমোবিঘ্নবিনাশনায় ॥ ২ ॥
পরানন্দরসাপূর্ণং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদল শোভিতম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্ ॥ ৪ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৫॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তদ্পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৭॥

মিলিতকণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনিতে দিগ্বিদিক মুখরিত হইতেছে। আবার গাহিতেছে ঃ—

ভবসাগর-তারণ-কারণ হে।
রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে॥
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে।
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে॥
পরমব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

মনোবারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে।
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুস হে॥
গুণ গান পরায়ণ দেবগণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

কুল-কুণ্ডলিনী ঘুম-ভঞ্জক হে।
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে॥
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে।
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে॥
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে।
অতি হীন জনে তুমি রক্ষক হে॥
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

তব নাম সদা শুভদায়ক হে।
পতিতাধম-মানব-পারক হে॥
চিত সঞ্চিত বঞ্চিত ভক্তিধনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে।
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে॥
মম মতি যেন রহে শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

তারপর এই উপলক্ষে রচিত গানটী গাহিল :—

সুন্দর পুরুষ, অপরূপ বেশ, *
আগত বারাণসী পুর মে।
মনোহর রূপ, নয়ন-বিমোহন,
অনুপম ভাতি বদন মে।
বিশ্বনাথ আওর অন্নপূর্ণা,
কেদার, চৌষট মাইকী করুণা,
বহতি হৃদে শ্যাম, শ্যামা,
জাহ্নবী-করুণা শিরমে।
কভু গভীর ধ্যান নিরত,
কভু প্রেম-বিহ্বল চিত,
কভু গাওত মধুর গীত,
ঢারত সুধা শ্রবণ মে।
ভকত লাগি সরব ত্যাগী,
ভকত লাগি করম ভোগী,
দীন ভকত করুণা মাগি,
দেহি শরণ চরণ মে।

* সত্যেন (লেখক) কর্ত্তৃক রচিত।

ভক্তদের বন্দনা শেষ হইলে ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন তোরা।
দেখিলেরে তোদের আনন্দে বিভোর হইরে আপনহারা॥
তোরা আমার বড়ই আপন,
(তোরা মায়া-ঘোরে চিনতে নারিস্)
(তোরা আর পর ভাবিস্ নারে)
নানা ভাবে সব আসি এক ঠাই আপনে মিশিয়া যায়,
(আর) দু'এ এক হ'লে আনন্দসাগরে প্রেমের লহর বয়।
প্রেম-নিধি প্রেম-নিধি বলে,
(আয় আয় কে আপন আছিস্)
(তোরা আমার বড়ই আপন)
(তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন ক'রে)
আয় আয় বলি, দিয়ে করতালি, ছুটিছে দয়াল প্রভু,
ঘরে ঘরে ধায়, লাজ নাহি তায়, ভয় আর নাহি কভু।
বলে, তোরা আমার বড়ই আপন,
(তোরা মায়া-ঘোরে চিনতে নারিস্)।
(তোরা আর পর ভাবিস্ নারে)
এ সুখ, সম্পদ, দেহ, চিরদিন নহে কেহ,
সময় থাকিতে কেন তাঁহারে ভজ না?
এখনও সময় আছে,
পারে যাবার উপায় আছে,
(আয় আয় কে আপন আছিস্)
এখনও তরী আছে, পারে যাবার উপায় আছে,
(ডাকে, আয় আয় কে আপন আছিস্)
(সে যে বড় আপন তাইতে ডাকে)
সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধন ভজন,
ইহাতে লভিবে জীব শান্তি নিকেতন।
শান্তি হবে,
(সাধুসেবায়)
(গুরুসেবায়)

জীবের একমাত্র গতি ইহা, সাধুসেবায় শান্তি হবে।
ভাবিয়ে তোদের দুঃখ কালী হ'ল অঙ্গ,
ছাড়িয়ে অসার সুখ কর সাধুসঙ্গ,
নইলে গতি নাই,
আনন্দ পাবার গতি নাই।

এই গানটী ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অসীম ভালবাসা ও অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তরা আনন্দিত হইল, কাহারও বা পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গান শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—

তোমরা সব আপন, সন্তান। তোমাদের দেখলে কত আনন্দ হয়। তোমাদের এভাব বড়ই সুন্দর। তোমাদের আনন্দ দেখে, তোমাদের ভাব দেখে, প্রাণে কি যে আনন্দ হয় তা বল্‌বার নয়। তোমাদের ভালবাসা আমায় পাগল করে দেয়। তাই তোমাদের ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ডাকি, তোরা সব আয়, তোরা যে আমার আপন।

বলিতে বলিতে আবার গান ধরিলেন:—

আয়রে তোরা, আমার যারা, আয়রে আমার কাছে।
ভালবাসা, আনন্দ, প্রেম তোদের জন্যে রাখা আছে॥
বড়ই আপন হ'সরে তোরা, তোদের বড়ই ভালবাসি,
তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে, তাইতে ছুটে আসি।
তোদের মূর্ত্তিগুলো আনন্দেতে আছে হৃদয়-মাঝে।
কভু মাতা, কভু পিতা, কভু ভক্তভাবে আসি,
(তখন) তোমায় আমায় ভেদ থাকে না হয় যে মেশামিশি।
তোদের ভালবাসা হৃদয়-মাঝে সদাই গাঁথা আছে॥
একসূত্রে গাঁথা তোরা তাইতে তোরা ভাবিস্,
আর) আমার কথা মনে হ'লে অমনি ছুটে আসিস্।
(ওরে) তোরা বিনা বল দেখিরে আমার আর ত কেবা আছে॥

তোরা আমার বড়ই আপন,
(তোদের ছাড়া জানিনা রে)
(তোরা পূর্ব্বজন্মে আপন ছিলি)
(তাইতে তোরা ছুটে এলি)
তোরা আমার বড়ই আপন।

গান শেষ করিয়া 'মা, মা', 'আনন্দম্, আনন্দম্', বলিতে বলিতে ঠাকুর অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইলেন। বার বার সন্তানদের দেখিতেছেন, আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভক্তদেরও আনন্দে রোমাঞ্চ হইতেছে।

তারপর ঠাকুর ও মার ছবি তোলান হইল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। স্নানের পর মা-কালীকে দর্শন করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মা ও দিদি ভোগ রান্না করিতেছেন। বিন্দুদিদি ও অন্যান্য মেয়ে-ভক্তরা সাহায্য করিতেছেন। কাশী ও কলিকাতায় যত রকম উৎকৃষ্ট আহার্য্য পাওয়া যায় ভক্তরা সবই সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কালীবাবু মাছ, মিষ্টি, ফল ও অন্যান্য বহু জিনিষ আনিয়াছেন। তাঁহার জমিদারী হইতেও অনেক মাছ আসিয়াছে। অন্যান্য অনেক ভক্তরাও ঠাকুরের ভোগের জন্য নানান জিনিষ পাঠাইয়াছেন। মা রন্ধনে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। পোলাও কালিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া খাজা, গজা, জিলিপি, লেডিকেনি পর্য্যন্ত চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সকল রকমের খাবার অতি সুন্দর তৈরী করিয়াছেন। আরও পঞ্চাশ ষাট রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে। ঠাকুরের ভোগ হইবে।

আহারের পূর্ব্বে ঠাকুরমা ঠাকুরকে লালপেড়ে ধুতি পরাইলেন। কালীবাবু বহুমূল্য শাল আনিয়া দিয়াছেন, সেটাও গায়ে দিলেন। ঠাকুরমা আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "সেদিন লালপেড়ে ধুতি পরতে হবে, যা বলব শুনতে হবে, নয়ত মারব।" ঠাকুর সাধারণতঃ

সাদা ধুতি পরেন আর গায়ে কোন জামা বা চাদর রাখিতে পারেন না, গা জ্বালা করে। সেদিন কিন্তু কোন আপত্তি করিলেন না। ভক্তদের আনন্দের জন্য নিজের কষ্ট হইলেও সারাদিন ঐ শাল গায়ে রাখিয়াছিলেন।

গোগেনবালা (ডাক্তার সাহেবের ভগ্নী) আসিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরের জন্য নিজের হাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মখমলের আসন তৈরী করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঠিক সেই সময়ে সেটা আসিয়া পৌঁছিল। সে আসন পাতিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর আহার করিতে বসিলেন, ঠাকুরমা বসিয়া দেখিতেছেন, ভক্তরা এবং মেয়ে-ভক্তরাও বসিয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর রান্নার খুব প্রশংসা করিতেছেন। নানা কথায় সকলের মনোরঞ্জন করিতে করিতে আহার করিতেছেন। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। উৎসব উপলক্ষে অনেক ভক্ত এবং কাশীর বহুলোক আসিয়াছেন। বারান্দা, ঘর, সব ভরিয়া গিয়াছে। মা নিজে সকলকে দিতেছেন, আরও কয়েকজন মেয়ে-ভক্ত সাহায্য করিতেছেন। অন্ন-ব্যঞ্জন হস্তে মায়ের আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল যেন জগজ্জননী নিজের ছেলেদের আহার করাইতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। কাহাকে কি রকম দিতে হইবে দেখাইয়া দিতেছেন। লালপেড়ে ধুতিপরা আর ধূসর রংএর শাল গায়ে ঠাকুরকে বেশ নূতন রকম দেখাইতেছিল।

আহারের পর ঠাকুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ৩টার পর সকলে আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর মা-কালী দর্শন করিতে যাইতেছেন। মা ও ভক্তরা সঙ্গে যাইতেছেন। কালীবাড়ীর বৃদ্ধ সেবক শ্রীযুক্ত,রামানন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে ছেলের মতন ভাল-বাসেন। প্রত্যহ ঠাকুর আসিলেই মা-কালীর সব রকম প্রসাদ দেন। ঠাকুর খাইতে না পারিলেও জোর করিয়া খাওয়ান। যে সময় যা ভাল জিনিষ আসে ঠাকুরের জন্য মঠে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুরের ওপর তাঁর খুব ভালবাসা। তিনি ভক্তদেরও ভালবাসেন। খুব যত্নের

সহিত মা-কালীর সেবা করেন। নব্বই বৎসর বয়সেও নিজে মাকে পরিষ্কার করা, পোষাক পরান, মালা দিয়া সাজান, সব করেন। মায়ের নানারকম গহনা গড়াইয়া দিয়াছেন। মাঝে মাঝে দীন-দুঃখীদের খাওয়ান ও বস্ত্র দান করেন। ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে বলেন "ইনি মার এত সেবা করেন তাই মা এঁকে এতদিন রেখেছেন।" ঠাকুর ও মাকে নূতন পোষাকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিজে মালা ও সিঁদুর পরাইয়া দিলেন।

কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর ও ভক্তদের একসঙ্গে ছবি তোলান হইল। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি আর শাল গায়ে দিয়াই বসিয়াছেন। তারপর মার ও মেয়ে-ভক্তদের ছবি তোলা হইল।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন, মায়ের নাম শেষ করিয়া ঠাকুর আবার গাহিতেছেন :—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি—ইত্যাদি। (৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তারপর ভক্তরা ঠাকুরকে ও মাকে মালা পরাইলেন। এখন কীর্ত্তন হইবে। ভক্তরা—'জয় জগবন্দন' স্তোত্রটী গাহিলেন :—

জয় জগবন্দন, চিত্তমন-নন্দন, *
রবিসুত-বন্ধন-হারী।
মায়ামোহ-মর্দ্দন, ভকতি-বিবর্দ্ধন,
ত্রয়তাপ-খণ্ডনকারী॥
বরবপু-ধারক, ভবব্যাধি-হারক,
গতিহীন-জন-সন্ত্রাতা।
মধু-মধু-ভাষণ, গুরুদুঃখ-নাশন,
জয় জয় শান্তি বিধাতা॥
সুরনর-বন্দন, মহেশ-নিকেতন,
বারাণসীপুর অধিবাসী।

* খিদিরপুরের শিবকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক রচিত।

তপজ্যোতি উজ্জ্বল, বদন সুনির্ম্মল,
জীব-হৃদিধ্বান্ত-বিনাশী॥
শ্রবণ রসায়ন, গীতসুধা সিঞ্চন,
হৃদি-উন্মাদন-কারী।
হরিপ্রেম অমৃত, হৃদয় প্রপূরিত,
জয় জয় যোগ-আচারী॥
প্রলোভন-বেষ্টিত, বিকার-বিবর্জ্জিত,
জিতকাম কাঞ্চন সঙ্গ।
শম্ভুসমাহিত, অহিকুল-মণ্ডিত,
(তবু) দংশন-বিরহিত অঙ্গ॥
দ্বন্দ্ব-বিরহিত, ত্রিগুণ তিরোহিত
সুখ দুঃখ স্বপ্ন বিজয়ী।
লোকহিত কারণ, ভুবন বিচরণ,
বিষয়ানুরাগ বিলয়ী॥
চির শুভকারক, নাবিক সুপারগ,
ভ্রমময় সংসার ঘোরে।
সংশয় ভঞ্জন, বিমল জ্ঞানাঞ্জন,
বিতরিছ অন্ধ আতুরে॥
সুখময় নির্ভয়, নিখিল গুণাশ্রয়,
নিরমল অন্তরচারী।
জয় "জিত-ইন্দ্রিয়", জয় ভবানী-প্রিয়,
বন্দিছে পদে নরনারী॥

ভক্তদের স্তোত্র শেষ হইলে ঠাকুর স্বরচিত গোবিন্দ নাম সঙ্কীর্ত্তন * আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের সময় ঠাকুর গায়ের কাপড় খানি কোমরে জড়াইয়া রাখিলেন। উজ্জ্বল স্বর্ণাভ-মণ্ডিত দেহে শ্বেতপুষ্পের মালা দুলিতেছিল; দীর্ঘ হস্তের লীলায়িত ভঙ্গী, করুণামাখা বদনে মৃদুমৃদু হাসি ও মধুর কণ্ঠস্বর অপূর্ব্বভাবের সৃষ্টি

* ৬৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত "ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখনিঃসৃতম্ গোবিন্দনাম সঙ্কীর্ত্তনম্" পুস্তিকা দেখুন।

করিতেছিল; মাদল ও করতালের ধ্বনিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে ঠাকুর সেই (সুন্দর পুরুষ) গানটী আবার গাহিতে বলিলেন। "সুন্দর পুরুষ, অপরূপ বেশ" গানটী হইল।

তারপর ঠাকুর গাহিলেন :—

তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন,
তোরা আমার, আমি তোদের, এভাব বুঝেরে কয়জন ॥
দূরে গেলেও দেখে আঁখি, তিলেক ছাড়া নাহি থাকি,
তোরা হাসলে হাসি, কাঁদলে কাঁদি, সঙ্গে থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥
দূরে গেলে ডাকি আয়রে কাছে, সংসার-মায়ায় ভুলিস্ পাছে,
তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে, সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ ॥
তোরা পূর্ব্ব-জন্মে আপন ছিলি, তাই দেখামাত্র আপন হ'লি,
নইলে কেন ছুটে এসে করিস্‌রে যতন ॥
তোদের বড় ভালবাসি, তাইত ছুটে দেখতে আসি,
তোদের না দেখলে প্রাণ কররে কেমন ॥
বড়ই আপন হ'স্‌রে তোরা, তাই থাকিনেরে তোদের কাছ ছাড়া;
তোরা আমার ধ্যান, জ্ঞান, দেহ, বুদ্ধি, মন ॥

এ গানটীও ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন, সকলে বিমুগ্ধ-হৃদয়ে গান শুনিতেছেন। পরে এই উপলক্ষে রচিত আর একটী গান হইল।

এস আমার প্রাণের ঠাকুর, এস কৃপা বিতরিয়ে। *
জীবন সফল করি, ওই রাঙ্গাপদ পরশিয়ে ॥
অজ্ঞান আঁধারে নাথ,
আবরিত মম চিত,
পরাণ কাঁদিছে সদা প্রেমরূপ না হেরিয়ে ॥
অকৃতী অধম ব'লে,
দিওনা চরণে ঠেলে,
(এই) মোহনিশা ঘুচিয়ে দাও, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিয়ে ॥

---

* সত্যেন কর্ত্তৃক রচিত।

বারেক পরশ পেলে,
দুঃখতাপ যাবে চ'লে,
বহিবে আনন্দ-ধারা দেহমন পুলকিয়ে॥

তারপর কাশীর গায়ক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং কালীবাবুর গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ গোস্বামী ইঁহারা সকলে ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি নানারূপ গান গাহিতেছেন। বটকৃষ্ণ সরকার পাখোয়াজ ও বাঁয়া-তবলা বাজাইতেছেন। গায়ক এবং বাদক দুই পক্ষই খুব শিক্ষিত। গান বেশ জমিয়াছে। শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১০টায় ঠাকুর আরতি করিলেন, আরতির পর ভক্তরা বিদায় লইলেন। সকলের প্রাণেই আজিকার আনন্দের কথা জাগিতেছে।

বুধবার—

দুইদিন পরে উৎসব উপলক্ষে মঠে থিয়েটার হইতেছে। ঠাকুর গতবারে মঠে ছেলেদের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছেন। ভক্তরা নিজেদের মধ্যে নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিবে ও ঠাকুর ভক্তমুখে পবিত্র ভাবে অভিনয় শুনিবেন বলিয়া ধর্ম্মমূলক নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতা এবং শ্রোতা সবই ভক্তদের মধ্যে। বাহিরের লোকের কোন সংস্রব নাই। নিজেদের দৈনন্দিন নীতি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করিয়া শুধু অবসর সময়ে অভিনয় লইয়া আনন্দ করে। গত বৎসর পূজার সময় নরমেধ-যজ্ঞ হইয়াছিল। বড়দিনে হরিশ্চন্দ্র নাটক হইয়াছিল। হরিমোহন প্রধান অভিনেতা ও উদ্যোগী ছিল। এইবার উৎসব উপলক্ষে বিল্বমঙ্গল হইতেছে।

হরিশ্চন্দ্র নাটকে এবং বিল্বমঙ্গল নাটকে ঠাকুর ভাল ভাল গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য নিজের প্রেসে সে সব গান ও প্রোগ্রাম ছাপাইয়া দিয়াছে।

এইবার কালীবাবু বিল্বমঙ্গল সাজিয়াছেন। জনাইএর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্) চিন্তামণি সাজিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, পাগলিনী, থাক, এসব অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে। অপূর্ব্ব খুব ভাল অভিনয় করিয়াছে। সকলের অভিনয়ই বেশ হইয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন; সকলকে প্রশংসা করিতেছেন। বীরেশ্বরবাবু এবং অন্যান্য শ্রোতৃবর্গও মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং; ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং;
সোমবার, শুক্লা-চতুর্দ্দশী।

কলিকাতা।

ঠাকুরের কাশী হইতে কলিকাতা আগমন—ভবানীপুরে নূতন মঠে—কালীঘাটে মা-কালী দর্শন—বৈকালে মঠে উপদেশ—গোপেনের সঙ্গে কথা—ভগবদ্ভাব না থাকিলে অর্থাদি সুখের হয় না—সুন্দরী কন্যার গল্প—ভগবদ্ভাব-শূন্য ভালবাসা দেহের উপর—গুরু এবং শিষ্যের গল্প—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের আকর্ষণ—প্রকৃত দুঃখ তিনটি, ক্ষুধা, রোগ ও লজ্জা-নিবারণের অভাব—সংসারে কর্ত্তব্য—রাবণ-চিত্রাঙ্গদার কথা—শক্তি নিয়ে সংসার করা।

আজ ঠাকুর ৺কাশীধাম হইতে পাঞ্জাব-মেলে কলিকাতায় আসিবেন। পাঞ্জাব-মেল সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে হাওড়া পৌঁছে। ভক্তেরা আগেই ষ্টেশনে গিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব, অশোক, অজয়, রাজেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু ও সত্যেন প্রভৃতি ভবানীপুরের ভক্তেরা গিয়াছে। খিদিরপুর হইতে বিজয়, কালু ও অচ্যুত আসিয়াছে। শিবপুরের চুনীও আসিয়াছে। কালীবাবু ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ৺কাশীধাম হইতে আসিতেছেন। শ্রীরামপুরের মৃত্যুন সঙ্গে আছে। মা, দিদি এবং কয়েকজন মেয়ে-ভক্ত যাঁহারা ঠাকুরের সেবায় তাঁহার কাছে সর্ব্বদা থাকেন তাঁহারও আসিতেছেন।

আজ সকলের মনেই আনন্দ, ছয় মাস পরে আবার ঠাকুরকে দর্শন করিবেন, আবার তাঁহার মধুমাখা কথা শুনিবেন। এবার ভবানীপুরে নূতন বাড়ী বেশীদিনের জন্য ভাড়া লইয়া স্থায়ী মঠ করা হইয়াছে। ঠাকুর নূতন মঠে পদার্পণ করিবেন, মাতা-ঠাকুরাণী আসিবেন, ভক্তেরা সব আসিবে। সকলের মিলনে মঠ-বাড়ী পবিত্র ও আনন্দপূর্ণ হইবে।

ঠাকুরের অমৃতমাখা কণ্ঠের গীত-সুধাপানে ভক্তহৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে, গম্ভীর 'মা' 'মা' ধ্বনিতে মঠের আকাশ বাতাস মুখরিত হইবে, পবিত্র হইবে; ভক্তেরা নবজীবন লাভ করিবেন। সকলের মনে তাই এত আনন্দ।

কতক্ষণে গাড়ী আসিবে, সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘড়ীর দিকে দেখিতেছেন। পাঞ্জাব-মেল প্রায়ই নাকি কিছু দেরীতে আসে। আজ ঠাকুরের পদস্পর্শে পবিত্র, এবং ভক্তদের আনন্দ ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই যেন পাঁচ মিনিট আগে আসিয়া পড়িল। সকলে ঠাকুর ও মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। ঠাকুর সস্নেহ সম্ভাষণে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটা কথা উঠিল। ঠাকুর বরাবর কাশী হইতে আসিয়া প্রথমতঃ খিদিরপুর যান। কালুর বাড়ীতে দুই এক দিন থাকিয়া ভবানীপুর আসেন। এবারও তাহাই করিবেন কথা ছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ভয়ানক ভাবে চলিতেছে। খিদিরপুরেও কাল রাত্রে গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় খিদিরপুর যাওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। এমন সময় খিদিরপুর হইতে কালু ও বিজয় আসিয়া পড়িল। তাহারাও বলিল সেখানে খুব গোলমাল চলিতেছে। বিজয় সেখানে যাইতে স্পষ্টই বারণ করিল। কালুও লইয়া যাইতে সাহস করিল না। কাজেই ভবানীপুরের মঠে আসাই স্থির হইল। খিদিরপুরের ভক্তেরা একটু দুঃখিত হইলেন। ঠাকুরও অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। কারণ বরাবরই প্রথম খিদিরপুরে ঠাকুরমা ও সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসেন। এইবার তাহা হইল না। কিন্তু উপায় নাই। এই গোলমালে সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ঠাকুরকে লইয়া সকলে ভবানীপুরের মঠে আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর নূতন বাড়ীর ঘরগুলি এক এক করিয়া দেখিতে লাগিলেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। কিছুক্ষণ

বিশ্রামের পর ঠাকুর কালীঘাট গেলেন। সেখানেই স্নান করিয়া মা-কালীকে দর্শন করিবেন। কালী-মন্দিরের পুরোহিত ও পাণ্ডারা ঠাকুরকে বহুদিন পরে আবার দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মালা, চন্দন ও সিঁদুর নিজহাতে পরাইয়া দিল। আনন্দময়ের আগমনে সবদিকই আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডাদের ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাদিগকে গান শুনাইলেন। যথারীতি দর্শনের পর মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈকালে ভক্তরা সকলে একে একে আসিতেছেন। ভবানীপুরের অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে মা-মণি, কালীবাবু আসিয়াছেন। কয়েকজন মেয়ে-ভক্তও আসিয়াছেন। গোপেন ও তপেন আসিয়াছে। খিদিরপুর হইতে শুধু অচ্যুত আসিয়াছে। খিদিরপুর ও কলিকাতার ভক্তরা দাঙ্গার জন্য আসিতে পারেন নাই।

বহুদিন পরে ঠাকুরের ও মাতা-ঠাকুরাণীর দর্শনলাভে ও ভক্তদের মিলনে সকলের মনেই আজ আনন্দ। ডাক্তার সাহেবের খুব আনন্দ। তাহার বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় এই নূতন মঠ হইয়াছে। অজয়, রাজেনও খুব খাটিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুরের ও ভক্তদের জন্য দীর্ঘ হল্ ঘরে জায়গা করা হইয়াছে। তাহার সম্মুখে বারান্দায় মার ও মেয়েদের বসিবার জায়গা। বহু দেবদেবীর ছবিতে, পরমহংসদেব ও ঠাকুরের ছবিতে হল্ ঘর সজ্জিত করা হইয়াছে। বিজলী বাতীর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ঘরটী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। গোবিন্দ * ধূপ-ধূনা দিয়া গেল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। ভক্তরা সকলে ধ্যান করিতেছেন। মায়ের নামের পর ঠাকুর গান ধরিলেন :—

---

* গোবিন্দ মঠের অতি পুরাতন ভৃত্য। ঠাকুরের উপর তাহার খুব ভালবাসা। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ঠাকুরের সেবা করে। ঠাকুর কলিকাতায় না থাকিলে বাড়ীতে থাকে, অন্য কোথাও কাজ করে না।

কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চির-মগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি, তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয়ে হে।
কি ছার শশাঙ্ক-জ্যোতি দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ উদয় না হয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেম-মণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণ বিষ-ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ-পরমাদে নাথ, তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে,
তুমি আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দ-নিলয় হে।

আবার গাহিতেছেন ঃ—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা।

(৭ পৃষ্ঠা)

শেষের গানটী ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। অনেকবার ঠাকুরের মধুর-কণ্ঠে এই প্রেমপূর্ণ গান শুনিয়া ভক্ত-হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছে। পরে ঠাকুর ও মাকে মালা পরান হইল। ঠাকুরের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে রচিত আবাহন-গীতি ভক্তরা সকলে মিলিয়া গাহিলেন। ৺কাশীতে ঠাকুরের চতুর্শ্চত্বারিংশৎ জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে রচিত গানটীও গীত হইল।

১। নবীন বরষে, নবীন আবাসে, *
এস হে দেবতা করুণা করিয়া।
এস গো জননী, এস স্নেহময়ী,
ডাকিছে সন্তান আশীষ মাগিয়া।

* সত্যেন কর্ত্তৃক রচিত।

তব প্রীতি কামনায় এ গেহ গড়িয়া,
ভকতি-চন্দনে রেখেছি মাখিয়া,
হৃদয়-আসন রেখেছি পাতিয়া,
আশা-পথ পানে আছি নিরখিয়া।
রুদ্ধ দুয়ার তব আগমনে
যাউক খুলিয়া পদ-পরশনে,
হৃদি ভ'রে যাক প্রেম-সমীরণে,
গীত-সুধা-পানে জুড়াক এ হিয়া।
শত বরষের তম দূরে যাক,
সত্য-আলোকে মোহ ঘুচে যাক,
পুলক-অশ্রু যাক ব'য়ে যাক,
তোমারি চরণ-কমল চুমিয়া।

২। সুন্দর পুরুষ, অপরূপ বেশ,
আগত বারাণসী পুর মে।

(৬ পৃষ্ঠা)

গান শুনিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

পরে ঠাকুর উপদেশ দিতে লাগিলেন। "কি সুখ জীবনে মম" গানটী ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ঠাকুর। এ গানটিতে সুন্দর ভাব দিয়েছে। **ভগবৎপদে মতি** না থাকলে, ও প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর অনুভূতি না হ'লে, ধন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়, পরিজন কিছুতেই সুখ হয় না। ধর্ম্মে মতি না থাকলে অর্থ কামনা বাসনা পূরণের জন্যই খরচ করা হবে। তাতে স্থায়ী সুখ হয় না। **বাসনার শেষ নাই।** একটা পূরণ করলেই আর একটা উঠ্‌ছে। এর আর ইতি নাই। পাঁচ টাকা যার আছে সে দশ চায়, দশ হ'লে বিশ চায়, বিশ হ'লে পঞ্চাশ, তারপর এক'শ, দু'শ, হাজার, লাখ, এ চল্‌ছেই। এর আর শেষ নাই। কাজেই কামনা-বাসনার পূরণও হয় না, তাতে সুখও হয় না। আর চন্দ্রমার জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ, বড়ই মনোরম

তাঁর ভাব না থাকলে তাতেও শান্তি হয় না। এই চাঁদের আলোকে চোর, দস্যু প্রভৃতি কুকর্ম্মরত ব্যাক্তিরা কত পাপ কাজ করছে। তাতে অশান্তিই আস্‌ছে। আর তাঁর দিকে মন থাকলে তাঁর সুন্দর সৃষ্টি তাঁরই উদ্দীপন করে।

এর একটী গল্প আছে। একটী ঘরের বারান্দায় এক পরমা সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। আর সব লোক হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে তাকে দেখ্‌ছে। রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। যে যার কাজ ফেলে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। বাজার কত্তে যাচ্ছে, না গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপিসে যাবে, ঠিক্ সময়ে হাজ্‌রী দিতে হবে, নয়ত সাহেব বকবে, চাকরী যেতে পারে, সব ভুলে ওই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। ছেলের অসুখ, ওষুধ আনতে যাবে,—আপন সন্তান বড় প্রিয়, তার মাথা ধরলে মন কেমন করে, সে ছেলের অসুখ,—ডাক্তার বলেছে এখনই ওষুধ দিতে হ'বে, তাই ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু ঐখানে এসে সব ভুল। হাঁ করে মেয়েটীকে দেখ্‌ছে। রূপের এমনি আকর্ষণ! মেয়েটী ভাবলে, "এ ত বেশ, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমায় দেখে সব লোক যার যার কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে রইল! ছেলের অসুখ, আপিস, বাজার, সব ভুল!" এই ভেবে সে ঘরের ভেতর চলে গেল। যেতেই, সব আবার কাজে ছুট্‌ছে। রূপের নেশা, কেউ তাকে ভালবেসে দাঁড়ায় নি ত, যেই সরে গেছে নেশাও ছুটে গেছে। সব চলে গেছে। কেবল একটী লোক দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। মেয়েটী সব দেখ্‌লে। সে ভাবলে "এ আবার কি রকম, সব চলে গেল, ও কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কাঁদছেই বা কেন? দেখি জিজ্ঞাসা করে।" এই ভেবে তাকে ডাক্‌লে। সে এলে বললে, "অচ্ছা, সবাই আমাকে দেখ্‌ছিল, তুমিও দেখ্‌ছিলে, আমি স'রে যেতে সব যার যার কাজে চলে গেল, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাঁদছই বা কেন?" লোকটী বললে, "মা, আমি ত তোমায় সে ভাবে দেখিনি, আমি ভাবছিলুম, তোমার ঐরূপে

যদি এত লোক মুগ্ধ হয়, তা হ'লে তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তোমার ন্যায় শত সহস্র রমণী যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রূপ না জানি কত সুন্দর, তাঁকে দেখ্‌লে বুঝি এ বিশ্ব-সংসার ভুল হ'য়ে যায়। আমি তোমায় দেখে তাঁরই মহিমার কথা, সৃষ্টির কথা ভাবছিলুম আর আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।"

কাজেই তাঁর দিকে মন না থাক্‌লে তাঁর সৃষ্টির আনন্দও ঠিক্ ঠিক্ নেওয়া যায় না। আর দিয়েছে, 'সুকুমার কুমার মুখ' বড় সুন্দর, ছেলের নির্ম্মল কোমল মুখ বড়ই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাতে তাঁর ভাব না থাকলে সেও দুঃখের হয়। ভগবানের দিকে মন না থাকলে সে কুকর্ম্ম করবেই। তার তাতে দুঃখ বাড়বে। আপন সন্তান, আত্মজ, স্বতঃই তাতে ভালবাসা হয়, তার দুঃখ হলেই নিজেরও অশান্তি। ভালবাসার ধর্ম্মই এই। মনের সঙ্গে সম্বন্ধ। একের সুখ দুঃখ অপরে এসে লাগে। তাই দিয়েছে, এমন যে প্রিয় সন্তান, তাতেও ধর্ম্মভাব না থাকলে সেও দুঃখের হয় ও পুত্রেতে তাঁর অনুভূতি না হলে বদ্ধ মায়ায় আবদ্ধ করবে, ঠিক্ ঠিক্ কর্ত্তব্য পালনের শক্তি থাকবে না। আর 'সতীর পবিত্র প্রেম', সতীর প্রেম বড় পবিত্র, এর মত জিনিষ নেই, একে নিষ্ঠা, সর্ব্ব সমর্পণ। এ ভালবাসার তুলনা জগতে নেই। কিন্তু তাও মলিনতাময় যদি তাঁর ভাব সে প্রেমে না থাকে। ভগবদ্ভাব না থাকলে কামনা-বাসনা যায় না। কামনা থাকতে ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসা আসে না। **কামনার ভালবাসা দেহের উপর,** বাসনা-পূরণের জন্য, ভোগসুখের জন্য, তার এদিক ওদিক হলেই ভালবাসারও এদিক ওদিক হয়। একটী গল্প আছে।

একজনের এক সাধু গুরু ছিলেন। গুরু একদিন শিষ্যকে বল্‌লেন, "দেখ, সংসার ছাড়, সংসারে সুখ নেই, কেন দুঃখের সাগরে ভাস্‌ছ, এস ভগবানকে ডাক।" শিষ্যটী বললে, "সে কি বলছেন গুরুদেব? সংসার ছাড়ব কি? আমার মা রয়েছেন, সতী স্ত্রী

রয়েছে, তার ভালবাসার তুলনা নেই। এ সব ছেড়ে মিছামিছি কোথায় যাব?" গুরু বললেন, "তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, এ সব ভালবাসা কিছুই নয়। তারা তোমায় ত ভালবাসে না, তোমার ঐ দেহটাকে ভালবাসে, নিজেদের ভোগসুখের জন্য। ওই দেহটা চলে গেলেই দেখবে ভালবাসারও শেষ হয়েছে। তাই বলছি এস, ভগবানকে ডাক।" লোকটা বললে, "না গুরুদেব, আপনি জানেন না, আপনি ত্যাগী সন্ন্যাসী মানুষ, মার স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসার কথা কি বুঝবেন? তারা আমাছাড়া জানে না, আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী; আমি কি তাদের ছাড়তে পারি?" সাধু বললেন, "দেখবে তারা তোমায় কত ভালবাসে? পরীক্ষা করবে?" শিষ্য বল্‌লে, "কিরূপে হবে বলুন?" তখন গুরু বল্‌লেন, "তোমায় এই একটা যোগের সামান্য ক্রিয়া দিচ্ছি, কাল সকালে এটা করো, তাহ'লে তুমি মড়ার মত হয়ে যাবে। একেবারে নির্জীব অসাড়। ডাক্তার এসেও তোমার কিছুই পাবে না, বলবে—মরে গেছে। কিন্তু তোমার ভেতর জ্ঞান থাক্‌বে, কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত শুনতে পাবে। আর আমি যতক্ষণ গিয়ে না বলি ততক্ষণ উঠো না, চুপ ক'রে পড়ে থাকবে। তবেই তোমার মার, স্ত্রীর ভালবাসা টের পাবে।" শিষ্য বল্‌লে, "আচ্ছা তাই হবে।" গুরু আবার সাবধান ক'রে দিলেন, "দেখ, মার, স্ত্রীর কান্না শুনেই যেন উঠে পড়ো না, আমি না যেতে উঠে পড়ো না।" "না গুরুদেব, উঠবো না" বলে শিষ্য চলে গেল। পরদিন সকাল বেলা সেটা করেছে, আর মড়ার মতন একেবারে নিস্পন্দ। স্ত্রী দেখ্‌লে স্বামী এত বেলা হ'ল উঠচে না, ডাকাডাকি করলে, সাড়া নেই। গা ছুঁয়ে দেখে ঠাণ্ডা, অসাড়; নিঃশ্বাসও পড়ছে না। 'কি হ'ল গো' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল। মাও কাঁদতে লাগল। ডাক্তার এসেও দেখলে, হার্ট এগ্‌জামিন (হৃদয়-পরীক্ষা) করলে, কোন সাড়া নেই। বললে ম'রে গেছে। সবাই কাঁদতে আরম্ভ করল। মা, স্ত্রী বুক চাপ্‌ড়ে

মাটীতে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে লাগল। এমন সময় গুরুদেব এসে উপস্থিত। বললেন, "কি মা, তোমরা এরকম করে কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমাদের?" মা বললে, "আমার ছেলে কেমন হয়েছে গো, কাল শুলে, সকালে আর সাড়া নেই।" স্ত্রী বললে, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।" গুরু বললেন, "মা, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমি দেখছি।" মা, স্ত্রী বললে, "দেখ বাবা, একটু দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আর আমাদের কেউ নেই।" গুরু একটু দেখে বললেন, "দেখলাম, এখনও একেবারে মরে নি, আশা আছে। তবে একটি কাজ করতে হবে।" তারা বললে, "কি কাজ করতে হবে বল। যা চাও দেব বাবা, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।" সাধু বললেন, "দেখ, যদি এর পরিবর্ত্তে আর একজন প্রিয় কেউ প্রাণ দেয়, তবে এ আবার জীবন পেতে পারে। তা তুমি মা, তোমার চেয়ে প্রিয় আর কে আছে? আর তোমার বয়েসও ত হয়েছে, তুমি যদি রাজী হও তবে তোমার ছেলে বাঁচতে পারে।" মা বললেন, "তা তা কি করে হবে, আমি বুড়ো মানুষ, কি করে যাব। আর এ ত গেছেই, বাঁচবে কি না কে জানে? আর ক'দিনই বা থাকব। তার চেয়ে বরং বৌমাকে বল, সে যদি রাজী হয়।" সাধু বললেন, "হঁা, তাও হতে পারে, স্ত্রী খুব প্রিয়, সে যদি রাজী হয় ত হতে পারে। কি বল মা, তোমার স্বামীকে পেতে পার যদি তোমার প্রাণটী দাও।"

বৌমা বললে, "সে কি রকম করে হয়। এ সংসার ছেড়ে কি করে যাই। তিনি ত গেছেনই, আমিও যদি যাই, এই ছেলে-মেয়েদের কে দেখ্‌বে? এদের মানুষ করতে হবে।" সাধু বললেন, "তিনি ত আবার বাঁচবেন।" স্ত্রী বললে, "তা কি বলা যায়। তিনি গেছেন আর কি করব, আমাকে এদের মানুষ করতে হবে।" গুরু তখন শিষ্যকে বললেন, "এইবার ওঠ।" শিষ্য লাফিয়ে উঠে বললে, "বুঝেছি গুরুদেব, মার, স্ত্রীর ভালবাসা বুঝেছি, আর আমি সংসারে থাকব না।" এই বলে বেরিয়ে গেল।

তা দেখ, ভগবদ্ভাব না থাকলে সতীর প্রেমও মলিনতাময়, স্বার্থপূর্ণ। "হ্যাঁ আছে, কোন কোন স্ত্রী আছে, স্বামীর জন্যে সব করতে পারে। (মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন) আবার মেয়েদের দিকেও ত একটু বলতে হবে। না হলে তারা আবার রাগ করবে (সকলের হাস্য)। যাদের ধর্ম্মভাব আছে তারা কেউ কেউ আছে, তবে সাধারণ ওই, স্নেহের ভালবাসা।

গোপেন। কি করব, সংসারের দায় ছেড়ে যাওয়া ত যায় না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তা বললেই হয় না; সংসারের মায়ার আকর্ষণ বড় প্রবল; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর্ষণ বড় ভয়ানক। এর একটী প্রবল হলেই রক্ষে নেই। তাইত আছে, পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হয়। তার রূপের নেশা খুব। তাই আলো দেখেই ছুটে যায়। তাপ লাগে তবু ছুটছে। আগুনে পুড়ে মরছে, তবু আলো দেখলেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। রূপের মোহই হ'ল তার মৃত্যুর কারণ। আর আছে রস। ভ্রমর রস-পিপাসু। পদ্মে ব'সে মধুপানে মত্ত হয়ে আছে। পদ্ম যে মুদে যাবে সে দিকে খেয়াল নেই। মধু পান করছে, আর পদ্ম বন্ধ হয়ে গেল। তার ভেতর ম'রে রইল। রসস্পৃহা মৃত্যুর কারণ। হরিণ স্বর শুনে পাগল। তাই ব্যাধেরা বেণু বাদন করে। মিষ্টি স্বর শুনে কাছে আসে। তার শত্রু যে এখনই মারবে, সে জ্ঞান নেই। মোহিত হয়ে বাঁশীই শুনছে। ব্যাধের শরের আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে, এ দেখছে, তবু সুরে এমনি মুগ্ধ হয়ে আছে, কেউ নড়তে পারছে না। গন্ধ হ'ল মাছের, মাছ গন্ধে খুব আকৃষ্ট হয়। তাই পুকুরে চার ক'রে ছিপ ফেলে মাছ ধরে। মসলার গন্ধে মাছ আসে, টোপ খায়, গালে বঁড়সী গেঁথে যায়। টেনে ওপরে তোলে। এ দেখছে আবার আস্‌ছে। হয়ত ছিঁড়ে পালিয়ে গেল, গালে বঁড়সী গেঁথেই রইল; আবার গন্ধে ভুলে আস্‌ছে। ঘ্রাণ-লোভেই তার মৃত্যু। আর করীর হচ্ছে স্পর্শ। স্পর্শ-সুখেই সে অন্ধ। তাই বুনো হাতী ধরবার জন্যে একটী মেয়ে হাতী নিয়ে যায়। বুনো হাতীটী কাছে আসে, শুঁড়ে

শুঁড়ে স্পর্শ ক'রে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর করিণীর পেটের নীচে মাহুত থাকে শেকল নিয়ে। শেকলের একদিক বড় গাছে বাঁধা, আর একটা দিক হাতীর পায়ে পরিয়ে দেয়। হাতী সব ভুলে আছে। টেরও পায় না, আর বাঁধা পড়ে। পরে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়। মাহুত মাঝে মাঝে করিণীটাকে নিয়ে যায়। একবার এর পীঠে চড়ে, আবার ওর পীঠে চড়ে, এ ভাবে পোষ মানিয়ে নিয়ে আসে। এতবড় জানোয়ারও বদ্ধ হয়ে গেল।

এর এক একটি প্রবল থাকাতেই এদের বিপদ, আর মানুষের এই পাঁচটীই প্রবল। এর হাত থেকে কি রক্ষে আছে? তাই দিয়েছে সাধু-সঙ্গ, সদ্‌-গুরু-সঙ্গ। সেখানে আস্‌লে তাঁর শক্তি কাজ করে, ভেতরের শক্তি বাড়ে, বাসনা-কামনার হ্রাস হয়। ইচ্ছে না থাক্‌লেও তিনি জোর ক'রে, ভালবাসা দিয়ে করিয়ে নেন। নইলে কি মানুষের শক্তি আছে এর হাত এড়াতে পারে? তাই গুরুতে নিষ্ঠা রাখবে। তাঁকে ভালবাসবে, তাঁর কাছে আসবে। তবেই সব হবে। আর সংসারে মেলা মন দেবে না। কড়া হয়ে থাক্‌বে, যা দরকার করে যাবে। অর্থ চাই, তা খাওয়া-পরার জন্যে যতটুকু দরকার রোজগার করবে, মেলা 'টাকা টাকা' করতে নেই।

গোপেন। তা কুলোয় কই। য়ার মাইনে তিরিশ টাকা তার হয়ত বহু পোষ্য, তিরিশ টাকায় কি করে হবে?

ঠাকুর। তোমার বাড়ীর চাকরটীর কি করে হয়? তারও ত স্ত্রী-পুত্র আছে। তাদেরও ত খেতে দিতে হয়। সে ক'টা টাকাই বা পায়; তাতেই বেশ আনন্দ কর্‌ছে।

গোপেন। সে ত চাকর, আমি যে মুনিব।

ঠাকুর। সেই জ্ঞান রেখেছ বলেই ত যত দুঃখ। নয়ত দুঃখ কিসের? প্রকৃত দুঃখ তিনটী। এক হ'ল ক্ষুধা। এ স্বাভাবিক, শিশু পেট থেকে পড়েই হাঁ কর্‌ছে। কাজেই ক্ষুধার জন্যে কিছু পেটে দিতে হয়। তাও ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যে, রসনা তৃপ্তির জন্যে নয়।

যাতে তাতে পেট ভরিয়ে নিতে হয়। আর হ'চ্ছে লজ্জা নিবারণের যন্ত্র। তা সামান্য হলেই হয়। মেলা জাঁক-জমকের পোষাকের কি দরকার? শরীরটাকে একেবারে সুটকেস্ (Suit-case) করবে কেন? আর রোগ, রোগের যন্ত্রণা সহ্য করা কষ্টকর বটে। তবে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় আছে। সে একটু অসাধারণ, সাধারণের জন্যে নয়। সাধারণের ঐ তিনটীই দুঃখ। তা ছাড়া আর যত সব ধার করা।

গোপেন। নিজে কঠোরভাবে থাক্‌তে চাইলেও কি হবে? আর যারা আছে তারা যদি তাতে না মানে? এই দেখুন, কোন এক-মহারাজা, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল নেই। তিনি এক বড় দোকান থেকে বহু টাকার পোষাক ইত্যাদি কিনে অপর একটা স্ত্রীলোককে দিলেন। আর মহারাণী তাই শুনে সে দোকান থেকে বহু টাকার জিনিষ কিনে বিলটা (Bill) রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা বল্‌লেন, "আমার অনুমতি ছাড়া রাণীকে কোন জিনিষ দেবে না।" দোকানের মালিক বল্‌লেন, "আমরা মহারাণীকে ত disoblige (অসন্তুষ্ট) করতে পারি না, টাকা আপনাকেই দিতে হবে।" তা দেখুন, ইচ্ছা করলেও হয় না।

ঠাকুর। তুমি একটা বদ্ধ জীবের উদাহরণ দিলে। রাজাটা যা খুসী তাই, রাণী কোত্থেকে ভাল হবে। রামা মেথরের জন্যে কি আর সীতা হ'বে? সীতা রামের জন্যেই হয়। একি একটা উপমা? আমি একটা বল্‌ছি শোন।—

রাবণ বীরবাহুকে যুদ্ধে পাঠাবেন ঠিক্ করেছেন। এমন সময় চিত্রাঙ্গদা, তিনি গন্ধর্ব্ব-কন্যা, রাবণের রাণী, বীরবাহুর মা, এসে করজোড়ে রাজাকে বল্‌লেন, "রাজা! আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি, আমায় আজ আমার পুত্র ভিক্ষা দাও। আমার একমাত্র পুত্র। সে গেলে আমি বাঁচব না।" রাবণ বল্‌লেন, "দেখ রাণী! তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমায় প্রথম বার ক্ষমা কর্‌লাম। আর

এমন কথা মুখে এনো না, যাও।" রাণী শুনলে না, ছেলের মায়া! আবার বল্‌ছে, "রাজা, আমায় এই ভিক্ষা দাও, আমার পুত্র দাও। তোমার রাজ্য, রাজ-ঐশ্বর্য্য চাই না; আমার একমাত্র পুত্র, আমি তাকে নিয়ে পিতৃরাজ্যে চলে যাব।" রাবণ বল্‌লেন, "রাণী, আবার তোমায় ক্ষমা করলাম, এ কথা মুখে এনো না। এই যুদ্ধে কত শত পুত্রহারা জননী কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে, কত প্রজাকে আমি পুত্রহীন করেছি, আর নিজের পুত্রকে ঘরে রেখে দিয়ে অধর্ম্ম করব? তা হবে না। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের ন্যায় থাক; রাজকার্য্যে বাধা দিও না, রাজকার্য্যে বিঘ্ন করা বড় দোষ। রাণী, তোমায় বড় ভালবাসি তাই এবারও ক্ষমা করলাম, আর একথা শুন্‌লে বড় কঠোর শাস্তি পাবে। রাজাজ্ঞা পালন কর, যাও।" কিন্তু মায়ের অবোধ মন, পুত্র-মায়ায় অন্ধ। ভাবলে, আবার চাইলে রাজার মন গল্‌বে। আবার চাইতেই রাবণ বল্‌লেন, "তুমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা, রাজ-কর্ত্তব্য জান না। পুত্র-মায়ায় অন্ধ হয়ে বারবার আমার কথা অবহেলা করছ। এ অপরাধের সমুচিত দণ্ড বিধান করছি।" এই ব'লে আদেশ করলেন, "একে এই মুহূর্ত্তে কারাগারে আবদ্ধ কর।" তাই বল্‌ছি, কর্ত্তব্য কত কঠিন। কর্ত্তব্য করতে হলে কত শক্তি চাই। তোমরা অবশ্য অতটা পারবে না। তবে কিছু শক্তি নেবে, নয়ত সংসারে ঠিক্‌ থাকতে পারবে না। শক্ত হয়ে থাকলে তারাও বুঝে সে ভাবে চলবে। গাছে না ফল্‌লে কি করবে; হয় গাছের পাতা খাবে নয়ত গাছ কাম্‌ড়াবে।

রাত প্রায় নয়টা হইল। দূরের ভক্তরা উঠিয়া গেলেন। দাঙ্গার জন্য সকলেই একটু সকাল সকাল যাইতেছেন। নানা কথার পর ঠাকুর দশটার সময় আরতি করিলেন, পরে সকলেই বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—তৃতীয় অধ্যায়।

১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২৭শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং ;

মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

কলিকাতা।

বিকালে মঠে উপদেশ—বাসনা-কামনা গেলে তাঁকে (ভগবানকে) পেয়েছ—তাঁর সঙ্গে ভাব থাকলে ভাবনা থাকবে না—তীর্থবাস মন নিয়ে করবে—জানা বিদ্যা আর শোনা বিদ্যা—কর্ত্তা ও কর্ত্তৃত্ব—গোপীর প্রেম—গুরুতে বিশ্বাস—গুরু ও ছিটের ব্যবসায়ী শিষ্যের গল্প।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ। জ্বরভাব বোধ হইতেছে। ঠাকুরের শরীর প্রায় ১০।১১ মাস হইল খারাপ হইয়াছে। প্রত্যহ বৈকালে জ্বর হয়। আগে জ্বর দেখা হইত। ১লা বৈশাখ হইতে ঠাকুর বারণ করিয়াছেন। তাই এখন আর দেখা হয় না। এই কয়দিনের মধ্যে আজ একটু বেশী খারাপ বোধ হইতেছে। জ্বর দেখিতে চাহিলে বারণ করিলেন। শরীর অসুস্থ হইলেও ঠাকুরের বিশ্রাম নাই। নীতি ঠিক্ চলিয়াছে, যখন যাহা করিবার ঠিক্ করিতেছেন। মুখেরও বিশ্রাম নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেশ দিয়া যাইতেছেন।

এখনও কলিকাতায় দাঙ্গা খুব চলিতেছে তাই অনেকে আসিতে পারেন নাই। ভবানীপুরের ভক্তরা আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কেবল কালীবাবু ও তাঁহার বন্ধু মণিবাবু আসিয়াছেন। খিদিরপুরের কেহ আসে নাই।

দাঙ্গার কথা, আরও নানা কথা হইতে লাগিল। কাল খিদিরপুরে যাইতে পারেন নাই। আজ সকালে গিয়াছিলেন। খিদিরপুরের ভক্তরা সব দুঃখিত হইয়াছেন। ঠাকুরও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

ঠাকুর। খিদিরপুরে কাল গেলেই হ'ত। আমার অন্যায় হয়ে গেল; আর ওরাও (কালু, বিজয়) বারণ করলে। তারা বড় দুঃখিত হয়েছে। কালুর মা ত কাঁদতে লাগল। তিনটের সময় খেয়েছে। তারা রান্না করেছিল। যেতে পারি নি, বড়ই দুঃখিত হয়েছে। বরাবরই ওদের ওখান হয়ে আসি।

কয়েকটি নূতন মেয়ে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর। তোমরা কোথায় থাক ?

মেয়েটী। এই এখানে; খড়দায় আমাদের গুরুপাঠ।

ঠাকুর। তা বেশ, তাঁতে বিশ্বাস রাখবে। তাঁকে ডাকলে হবেই। তাঁর নাম বৃথা যায় না। ধৈর্য্যই প্রধান জিনিষ। খুব ভক্তি রাখবে। গুরুতে নিষ্ঠা রাখবে, তবে ত মঙ্গল হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ ?

মেয়েটী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর। তবেত ভাল। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছ, খুব সৌভাগ্য। খুব তাঁকে ডাক্‌বে, তাঁর ভাবে থাক্‌বে।

মেয়েটী। আমাদের বাসনা-কামনা গেছে, এখন গোবিন্দচরণ দর্শন হলেই হয়।

ঠাকুর। ঐতেই ত ভুলিয়ে দেয়। বাসনা-কামনাতেই ত ভুলিয়ে দেয়। বাসনা-কামনা গেলে ত তাঁকে পেয়েছ। একটী ঘর, তার অনেক দরজা, সব বন্ধ হয়ে গেলে একটী রইল, সেটী দিয়ে যেতেই হবে। সব বাসনা-কামনার দরজা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঐ গোবিন্দ-চরণের দরজা দিয়ে যেতেই হবে। ঐ ছাড়া ত গতি নেই, আর ত কিছু নেই।

মেয়েটী। আমাদের সদ্বংশে জন্ম।

ঠাকুর। ঘর বংশ নিয়ে শুধু হয় না। ঐ তো বন্ধন। ঘর বংশ কাকে বলে ? যে বংশের লোক তাঁর দিকে গতি করেছে, সেই পবিত্র বংশ। তাতে জন্মালে কাজ হয়, পূর্ব্ব-পুরুষের আশীর্ব্বাদে

তাঁর দিকে গতি করে। আবার সদ্বংশে জন্মেও যা খুশী তাই করে। খুব তাঁকে ডাক, ডাকা চাই। না হলে শুধু সদ্বংশে জন্মালে কি হবে?

বাসনা যদি না থাকে, তবেত গোবিন্দ পেয়েই আছ।

বল আর নাই বল, গোবিন্দ পেয়ে আছ। গোবিন্দচরণ ত অতটুকু নয়, সে যে জগৎময়। কামনা-বাসনা সব ছেড়ে গেলে আর কোথায় থাকবে? বল আর না বল আসে যায় না। আর মন চারিদিকে থাকলে বললেও হবে না। বাসনা-কামনা থেকে নিষ্কৃতি পেলেই তাঁকে পাবে। আর উপায় নেই।

মেয়েটী। তবে টাকাটা আস্‌টার জন্যে ভাবনা, কোথায় থাকব, কি খাব?

ঠাকুর। কি খাব, কোথায় থাকব, ভাবনা কিসের? তাঁকে তুমি ভাবছ, তিনি একটু কি মস্ত? খানসামার রাজার সঙ্গে ভাব থাকলে কি আর ভয় থাকে? লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করেন, কুবের যাঁর ভাঁড়ারী, তাঁকে ডেকে কি খাব কোথায় থাকব ভাব্‌বে? যা দেবেন তাই খাবে, এর জন্যে ভাবনা কেন?

তাহার পর তাঁহারা কাশী যাইবার কথা বলিলেন।

ঠাকুর। সৎস্থানে যাওয়া ভাল, কিন্তু মন নিয়ে যাওয়া চাই, কাশী গেলেই হবে না। ঠিক্ ঠিক্ কাশী যাওয়া চাই।

"মনে একান্ত বাসনা, ছেড়ে বিষয়-কামনা
পুণ্য বারাণসীধামে চরমে বিশ্রাম করি,
সিদ্ধিদাতা মহেশ্বরে, সর্ব্ব সমর্পণ ক'রে,
নিশ্চিন্ত নিঃসঙ্গ হ'য়ে ভবলীলা সাঙ্গ করি।"

নিশ্চিন্ত নিঃসঙ্গ না হলে দুঃখ ঘুচবে না। চিন্তা কিসের? যার বাসনা আছে, তারই চিন্তা, তারই ভয়। কেবল যে সন্দেশই খেতে হবে তারই বা কি মানে আছে। তাঁর সঙ্গে ত এমন ভালবাসা নয় যে

শুধু সন্দেশই খেতে দেবেন, নয়ত ভালবাসা থাকবে না! যা পাঠান তাই খাব। ভেবে চিন্তে কি করব? তাঁতে **বিশ্বাস** থাকলে আর চিন্তা থাকে না। চিন্তা কখন করবে? যখন ঠিক্ বিশ্বাস আসছে না। মুখে বলছি, কিন্তু ভাবছি 'কি জানি কি হবে'; এ বিশ্বাস নয়। ঠিক্ বিশ্বাস না এলে বুঝবে বাসনা ছাড়ে নি।

মেয়েটী। তাইত ভাবি, কাশী থাকব, যদি টাকা না পাঠায়।

ঠাকুর। ঐ ত সর্ব্বনাশ। তাঁতে বিশ্বাস না থাকলে সে ভাবনা হবে। আর যেখানেই থাক তিনি আছেনই। তাঁর রূপ কি একটা? **তাঁর অনন্ত রূপ**। এক এক জায়গায় এক এক ভাবে আছেন। কোন জায়গায় দেবীভাবে পূজো গ্রহণ ক'রছেন, কোথাও বা স্বামীর ঘরে যাচ্ছেন। যেখানে যেমন, তাঁর খুসী, ইচ্ছা। যেখানে থাক ক্ষতি নেই। তাঁকে ডাকলেই হ'ল। তাঁতে মন রাখতে হয়, নয়ত ভাবনা এসে জোটে।

মেয়েটী। জানি ত তিনি সব করেছেন, তবু ভাবনা হয়।

ঠাকুর। ও জানা নয়, ও শোনা বিদ্যে। যদি জান ছেলে খেতে দেয়, তবে কি আর ভাবনা থাকে? **জানা বিদ্যে** আর **শোনা বিদ্যে** আলাদা। শোনা বিদ্যের ওপর দাঁড়ান কঠিন। জানা বিদ্যের ওপর দাঁড়ান যায়। কাজেই শোনা বিদ্যে ছেড়ে দিতে হয়। এ জন্যেই সাধনা। তাঁকে ডাক। ডাকতে ডাকতে মনের ময়লা যাবে, গুরুতে বিশ্বাস হবে। বাসনা থাকলে ডাকাও যায় না। গুরুতে ভক্তি চাই। তাঁর শক্তি ছাড়া গতি নেই। তাঁতে ভক্তি থাকলে শক্তি আসবে। নয়ত ডাকতে পারবে কেন? বসবে মালা হাতে নিয়ে, মালা ঘুরছে, কিন্তু মন ঘুরছে না। তাতে কি হবে, হাতে ঘোরালে হবে না। মনে ঘোরান চাই। গুরু-সেবাই প্রধান। যত তাঁতে থাকবে তত লাভ লোকসান চিন্তা কমে যাবে। তাই গুরুতে নির্ভরতা, তাঁতে বিশ্বাস।

মেয়েটী। কর্ত্তা বোধ আছে বলেই ও সব হয় মা।

ঠাকুর। কর্ত্তা হওয়া ভাল। তবে ঠিক্ ঠিক্ কর্ত্তা হওয়া চাই। ঠিক্ কর্ত্তা সকলের জন্যে ভাবেন। কর্ত্তা যদি কেবল নিজের স্বার্থটা বোঝেন তা'হলে ঠিক্ কর্ত্তৃত্ব হ'ল না। এই জন্যেই কর্ত্তা হওয়া বড় জ্বালা। এমনি থাকা ভাল। তাঁকে কর্ত্তা করা ভাল। তা'হলে কোন চিন্তাই থাকে না। স্বার্থপর কর্ত্তায় চলবে না। চারিধারে নজর থাকলে তবেত কর্ত্তৃত্ব। চাকরদের ঠিক্ ঠিক্ খাটাতে হবে। চাকরের হুকুমে চললে হবে না। চাকর হচ্ছে রিপুরা, তাদের নিজের হুকুমে চালাতে হবে। আর তাদের হুকুমে নিজে চল্‌লে সে কি রকম কর্ত্তা? চাকররাই খাটিয়ে মারছে।

পয়সার বেলা কর্ত্তা হলে চলবে না। ঠিক্ ঠিক্ কর্ত্তা হও, চাকর সম্মান করবে; চাকরকে সম্মান করলে চলবে না। তা তোমরা কি রকম কর্ত্তা বুঝে নাও। কর্ত্তা ত মন, চাকর রিপুরা। মনের হুকুমে রিপু চললে ক্ষতি নেই, কিন্তু রিপুর হুকুমে মন চললে কি রকম কর্ত্তা হ'ল? কর্ত্তা হও ত ঠিক্ ঠিক্ হও। নয়ত সব গুরুতে অর্পণ কর। দুইই ভাববার দরকার নেই। কর্ত্তা অকর্ত্তা দুইই নেই। উত্তম, অধম দুইই ভাবতে নেই। অধমই বা ভাববে কেন? উত্তম ভাবলে অহঙ্কার হয়, অধম ভাবলে নীচু হয়ে গেল। দুইই ভেব না। গুরুতে সব সমর্পণ কর। গুরু-সেবা কর, তাঁকে ভালবাস। ঠিক্ ভালবাসা, যা তা নয়, তিনি ছাড়া জানে না। তাঁকে না দেখলে থাকতে পারে না। নিজের ভালমন্দ দুইই জানে না। কিসে তাঁর শান্তি এই চিন্তা, এই ঠিক্ ভালবাসা।

মেয়েটী। তা ত আছে, গোপীর প্রেম ব্রজের ভজন।

ঠাকুর। গোপীর ছোট বড় দুই জ্ঞান ছিল না। কৃষ্ণে সব সমর্পণ। সব কৃষ্ণময়, কৃষ্ণ ছাড়া জানে না, ছোট বড় জ্ঞান নেই। পায়ের ধূলো দিলে। পায়ের ধূলো দিলে যদি তিনি ভাল থাকেন, তাতে আমার কি হবে, পাপ হবে কি পুণ্য হবে, এ সব ভাবনা আসে না। কৃষ্ণের যখন ব্যাধি হয়, বৈদ্য বললে, "পায়ের ধূলো দিলে ভাল হবে।"

প্রথম দেবতাদের কাছে গেল। তাঁরা বললেন, "আমরা পায়ের ধূলো দেব কি? কৃষ্ণ হলেন অবতার, তাঁর জন্যে পায়ের ধূলো? আমাদের অমঙ্গল হবে যে। সে আমরা পারব না।" তখন গোপীদের কাছে গেল। তাদের শুনেই আনন্দ। পায়ের ধূলোয় কৃষ্ণ সারবে, এই আনন্দ। নিজের কি হবে সে ভাবনা নেই। তাদের কাছে কৃষ্ণই সর্ব্বস্ব। অত বিচার নেই। পায়ের ধূলো দিলে। দেবতাদের নিজের সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, বোধ আছে। গোপীদের তা নেই। কৃষ্ণের ভালই ভাল। পূর্ণ ভালবাসা। এ বড় কঠিন। তার আগে দাস্য ভালবাসা। যত এগোবে তত ভাবের দৃঢ়তা হবে। তা ভিন্ন হবে না। চট্ করে তা হয় না। তাই সৎসঙ্গ, গুরুতে বিশ্বাস, তাঁতে ভক্তি। ঠিক্ ঠিক্ ভক্তি চাই, নইলে হবে না।

সেই একজন কাপড়ের ব্যবসা করত। তার গুরুর ছিটের কাপড়ের দরকার। পুঁথি বাঁধবে, একটু ছিটের কাপড় চাই। তাই ভাবলে, শিষ্যের ত ছিটের কাপড়ের দোকান রয়েছে, একটু চেয়ে নিই। সেখানে গিয়ে বললে, "বাপু! আমার একটু ছিটের কাপড় চাই। কোথায় আর কিন্‌তে যাব, তুমিই একটু দাও।" শিষ্য বললে, "আপনাকে একটু ছিট দেব তার আর কি? কিন্তু ঠাকুর মহাশয়, সব ছিট ফুরিয়ে গেছে। অমুক দিন অমুক নিয়ে গেছে, অমুক দিন অমুক নিয়ে গেছে। তা আপনি রোজ খবর নেবেন, যখন আসবে, আপনাকে দেব।" গুরুঠাকুর ফিরে গেলেন। দোকানটি ছিল বাড়ীতে, তার স্ত্রী ভেতর থেকে কথাটা শুনেছে। রাত্রি ১০টা ১১টার সময় দোকান পাট বন্ধ করে, বাক্সে বেশ করে চাবি দিয়ে, সে খেতে ঘরে এসেছে। তখন স্ত্রী বল্লে, "দেখ, আমার দুই থান ছিট চাই। এখনই চাই।" সে বল্লে, "সে কি? এখন কি করে হবে? দোকান সব বন্ধ করেছি, আবার খুলতে হবে, কাল দিলে হবে না?" "না, এখনই চাই। শীগ্‌গীর নিয়ে এসো।" এ ত আর গুরুঠাকুর নয়, গুরুর গুরু! (সকলের হাস্য) এ যে স্ত্রীর দাবী, অবহেলা করবার যো নেই। কাজেই

ফিরে গিয়ে, চাবি খুলে, তুই থান ছিট বার করে স্ত্রীকে এনে দিলে। মেয়েটার গুরুতে নিষ্ঠা ছিল, সে গুরুকে ডেকে পাঠালে। ছিট তু'থান দিয়ে বললে, "ছিট চেয়েছিলেন এই নিন। আর যখন দরকার হবে আমাকে বলবেন, বাইরে ওকে বলবেন না।"

মেয়েদের খুব সরল ভাব; সহজেই গুরুতে ভক্তি বিশ্বাস আসে। সন্তান প্রতিপালন তাদের কার্য্য; সেবা ও ভালবাসা তাদের ভেতর পূর্ণমাত্রায় থাকে। এজন্য স্ত্রীলোক গৃহের শোভা। অনেকস্থানে যা কিছু ধর্ম্ম-সংস্কার তাদের ভেতরই বেশী প্রকাশ দেখা যায়। তাই স্ত্রীলোক মাতৃরূপা; অনেক স্ত্রীলোককে দেখলে সেই ব্রহ্মময়ী মায়ের উদ্দীপনা হয়।

গুরুতে বিশ্বাস বললেই হবে না, ঠিক্ থাকা চাই। মন যতখানি দেবে ততই কাজ হবে। বললেই ত হবে না। গোপীরা কৃষ্ণকে দেখে ম'জল; জটিলা কুটিলা রইল। ব্রজে থেকেও তাদের কিছুই হ'ল না। বললেই ত হবে না। এক ভাব ত নয়। বহু ভাব। যার যার ভাবে গতি করবে।

মেয়েটা। শ্রীমতীর সব ভাব, শ্রীমতীতে পঞ্চরস।

ঠাকুর। হ্যাঁ, শ্রীমতীতে পঞ্চরস। আর সব এক এক রস। আর কিছু ত নয়। কৃষ্ণ থেকেই সৃষ্টি, আবার কৃষ্ণেই লয়। গোপী তাঁরই অঙ্গ। আধা রাধা—হ্লাদিনী শক্তি। ভাগবতে রাধা আলাদা নেই, প্রধানা গোপীকা। তাঁতে ঠিক্ প্রেম আস্‌লে অপর কিছু বোধ থাকে না।

ঠাকুর গান ধরিলেন :—

তোমার প্রেম-পাথারে যে সাঁতারে,
ভবের ভয় তার কি আছে।
ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান, সকলি সে সায় করেছে॥

পাগল নয় সে পাগল পারা,
তার দু'নয়নে বহে ধারা;
যেন সুরধুনীর ধারা, ত্রিধারায় ধারা মিশে গেছে॥
না জানে সে কোন ধর্ম্ম,
বেদ বিধি কোন কর্ম্ম;
তার তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তোমার চরণ
সার করেছে॥

আবার গাহিতেছেন:—

হরি, তুয়া পদ সার করি, জাতিকুল পরিহরি,
লাজভয় দিয়ে জলাঞ্জলি—
এখন কোথায় বা যাই নাথ, (পথের পথিক হ'য়ে)।
আর হাম তুহার লাগি, হইনু কলঙ্ক ভাগী,
গঞ্জে লোকে কত নিন্দা করে॥
কত নিন্দা করে নাথ, (তোমায় ভালবাসি বলে)॥
সরম ভরম মোর, সকলি হইল তোর,
রাখ বা না রাখ তব দায় হে।
তুমি হে হৃদয়-স্বামী, তব মানে মানী আমি,
কর নাথ যেই তুঁহে ভায়॥
ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি,
দিও তবে শ্রীচরণে স্থান।
অনুদিন প্রেম-মধু পিয়াও পরাণ বঁধু,
প্রেমদাসে কর পরিত্রাণ॥
(তোমার নিজগুণে নাথ) (আমি ভজন সাধন জানি না (হে)
(তোমার নিজগুণে দীনে রাখতে হবে নাথ)॥

সকলে বিমুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের গান শুনিতে লাগিলেন। মেয়েটী কাঁদিতে লাগিলেন।

ঠাকুর গান শেষ করিয়া "মা মা", "আনন্দম্ আনন্দম্", "ওঁ তৎসৎ" ধ্বনি করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইলেন।

আবার গান ধরিলেন :—

মন করিস্ না রে গণ্ডগোল।
ত্যজে খুঁটিনাটি, ময়লা মাটী, মনটী খাঁটি করে তোল॥
কালো ধলো যত দেখ, একই জেন সেই সকল,
(পুরুষ নারী যত দেখ)
(যেমন) নানান বুলি বাজায় ঢুলি, বাজে কিন্তু একটী ঢোল॥

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন, "নৃপেন, একটী গান কর।" নৃপেন গাহিল :—

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা
করেছ কি।
লোকে বলে চিন্তাময়ী, ব্যবহারে মা
তা নাহি দেখি॥
প্রভাতে দাও মা অর্থ-চিন্তা,
মধ্যাহ্নে দাও অন্ন-চিন্তা,
শয়নে দাও অশেষ চিন্তা, বল মা তোরে
কখন ডাকি॥
দিয়েছ যে মায়ার চিন্তা,
সদাই করি মা তারি চিন্তা,
চিন্‌তে নারি মা তোমারে, চিন্তাকূপে
ডুবে থাকি॥

আবার গাহিল :—

কালীনাম কর সাধনা।
যে নামেতে দুঃখ হরে, ঘুচে যম-যাতনা॥
কালীনাম ধ্যান কর, কালী বল বদনে,
কালীনাম জপ কর, শান্তি পাবে মরণে;
ভুলেও ভুল না যেন, ঐ রাঙা চরণে
কোটী শশী বিরাজিত, জেনেও কি জান না॥

দুর্ল্লভ জনম পেয়ে কি কার্য্য করিছ,
আনন্দময়ীরে ভুলে নিরানন্দে ভাসিছ,
জন্মিলে মরিতে হবে, তার উপায় কি করেছ,
এই বেলা ডাক তারে, নইলে তারে পাবে না॥

গান শেষ হইল। নৃপেন সুকণ্ঠ গায়ক। গান শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ১০টার পর ঠাকুর আরতি করিলেন। আরতি শেষ হইলে ভক্তেরা বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—চতুর্থ অধ্যায়।

৫ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং; ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং;

বুধবার; কৃষ্ণা প্রতিপদ।

কলিকাতা।

প্রকৃতি হিসাবে ব্যবহার—সংসার মরুভূমি বা প্রকাণ্ড জলাশয়—তাঁকে ধরলে সব হয়—ঠাকুরের অসুখ ও চিকিৎসার কথা,—সময় না হলে কিছু হয় না—সিদ্ধরাজা ও ঔষধের গল্প—যা হবার হবেই—জ্যোতিষী ও বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতার গল্প—প্রারব্ধ ও স্বাধীনতা—সুখ দুঃখ জগতের নিয়ম, মন তৈরী না হলে সুখ হয় না—জীবন্মুক্তের সংসার—স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী—স্বর্গসুখ—অনিত্যই দুঃখ—ভগবান্, নারদ, ধনী, ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্প—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

আজ ঠাকুরের শরীর একটু ভাল আছে। জ্বরভাব সে রকম নেই। বৈকালে ভক্তরা সব একে একে আসিতেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে কথা উঠিল। প্রকৃতিবিশেষে কি রকম ব্যবহার করিতে হয়, ঠাকুর সে সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। এক রকম আছে প্রকৃতিগত সৎ। পূর্ব্ব-সুকৃতি-বশতঃ সৎ হয়; অপরের দুঃখ কষ্ট দেখে দুঃখ আসে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ, ভাল মন্দ বিবেচনা আসে। সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ প্রকৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নেই। হতে পারে ভাল, হতে পারে মন্দ। কিন্তু **প্রকৃতি ঠিক্ ধরতে না পারলে তা নিয়ে ব্যবহার করতে নেই।** বাঘের প্রকৃতি মানুষ খাওয়া, আহা করলে কি হবে। জু-গার্ডেনে (Zoo-Garden) গিয়ে দেখলে খাঁচায় বাঘ বদ্ধ রয়েছে, তোমার

দেখে কষ্ট হ'ল, আহা বেচারী বন্ধ রয়েছে! তুমি ছেড়ে দিলে। তাতে যে অনেকের অনিষ্ট হবে, বহুর প্রাণ যাবে। এ "আহা" দয়া নয়। প্রকৃতি থাকল, তুমি দড়ী কাটলে, তাতে কি হবে? অপকারই হবে। বেড়াল কুকুরের গলার দড়ি কাটা হ'ল, তারা বিশেষ ক্ষতি করলে না। সে উপমা নিয়ে যদি বাঘের গলার দড়ি কাট তা'হলে যে সর্ব্বনাশ হবে। সব প্রকৃতি ত এক নয়। তাই প্রকৃতি ধরতে না পারলে প্রকৃতি নিয়ে ব্যবহার করতে নেই। সে জন্য সাধুরা প্রকৃতিবিশেষে ব্যবহার করেন। সাধুদের স্বভাব দিয়েছে "বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি" বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। যে সময় যে কার্য্য। কঠোর কর্ত্তব্যের সময় তাঁরা বজ্রের চেয়েও কঠিন হন। আবার এত কোমল হতে পারেন যে সাধারণে তা পারে না। যেখানে যে রকম। সৃষ্টি জগৎ ত এক নয়, তা'হলে আর ভাবনা থাকত কি?

কৃষ্ণকে দেখে গোপীরা ম'জল, নন্দ, যশোদা, গোপবালকেরা মোহিত হ'ল। কই জটিলা, কুটিলা, আয়ান, কংস প্রভৃতি তারা ত হ'ল না। তাদের জন্যে যুদ্ধসজ্জা করে বধের ব্যবস্থা। পঞ্চপাণ্ডবেরা কৃষ্ণের ওপর সব নির্ভর করলে, কুরুরাও ত করলেই পারত। তাদের জন্যে এত কাণ্ড কারখানা কেন? দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন, মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কি ভাবে জিজ্ঞেস করতে। তিনি সরলভাবে বলে দিলেন, "উলঙ্গ হয়ে যাও"। তাঁর ভাবনা কি? তিনি কৃষ্ণে মন রেখেছেন, তাঁর সরল প্রাণ, বলে দিলেন। এখন কৃষ্ণ বুঝুনগে। কৃষ্ণ দেখলেন, ইনি ত সরলভাবে বলে দিলেন—মার সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে দেখা কর, বলেই খালাস। কিন্তু শেষে ঠেকাতে হবে যে আমায়। আমার ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ। যদি প্রকৃতি বুঝে কাজ না করি, তবে ত মুস্কিল। আমায় বধ করতেই হবে। তাই তিনি বললেন "ল্যাঙ্গট পরে যাও।" যুধিষ্ঠিরকেও

বাঁচিয়ে গেলেন, নিজের কাজও ক'রে গেলেন। উলঙ্গও বটে, তবে একটা ল্যাঙ্গট পরা ভাল।

বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তাঁর বেশী ভাবনা। এমনি যিনি থাকেন তার কি? তিনি দাতা হ'তে পারেন। যে আস্‌ছে বললেন, "এ দাও, সে দাও," ফস্. করে দাতা। মুস্কিল যিনি আনবেন তাঁর। তাঁরই চিন্তা। তিনি দেখলেন,—ইনিত বেশ দাতা হচ্ছেন, কিন্তু না থাকলে আমাকেই যোগাতে হবে। তাই বললেন 'না বাপু, এ রকম চালে হবে না, এই রকম কর।' তাই প্রকৃতির সঙ্গে কাজ। কৃষ্ণ চারিধার বজায় রেখে কাজ করতেন। প্রকৃতিগত না হলে সাধারণ উপদেশ নিয়ে কাজ হয় না। শুধু লড়লে হবে না। আবার বাঁচবার পথ রাখতে হবে। ব'লে দিতে পারি 'লড়', আর বিপদ আসলে 'বাপু, আমি কি করব', তা হবে না, দু'দিক রেখে লড়তে হবে।

গোপেনের আত্মীয়রা আসিয়াছেন, বাড়ীর মেয়েরাও আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ঠাকুর। এসো, এসো, ভাল আছ?

ঠাকুরের এই শব্দগুলি—আসিবার সময় 'এসো অমুক এসো, ভাল আছ?' আর যাইবার সময় 'উঠছ, আচ্ছা' এই ছোট ছোট কথাগুলির অদ্ভুত শক্তি। ঠাকুর যেন তাঁহার অনন্ত হৃদয়ের অনন্ত করুণা ও মাধুর্য্য ঐ ছোট কথার ভিতর দিয়া আগন্তুকের হৃদয়ে ঢালিয়া দেন। তাঁহার সে সময়ের চোখ মুখের করুণামাখা ভাব, হাত তুলে আশীর্ব্বাদ, ভক্ত-হৃদয়ে চিরদিনের জন্য গাঁথা থাকে। ঐ ব্রহ্মাস্ত্রে ঠাকুর অনেক নবাগতকেই জয় করেন। লেখকও ঐ দুটী কথার জন্যই প্রথম ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইত। প্রথম ছয়মাস ঠাকুরের গান উপদেশ কিছুর দিকেই তাহার নজর ছিল না। ঐ দুটী কথার মাধুর্য্য তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। যদিও আজ মনে হয়, তাঁহার প্রতি কথা অমৃতময়, গূঢ় অর্থপূর্ণ, প্রতি স্বর করুণামাখা, প্রতি সুর সুধাবর্ষিণী, প্রতি পদবিক্ষেপ জগতের মঙ্গলের জন্য; কিছুই ব্যর্থ নয়।

তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

ঠাকুর। সংসার কি জান? ও একটা মরুভূমি বললেও পার, প্রকাণ্ড জলাশয় বললেও পার। জলাশয় থেকে দু'ঘড়া জল তোল বা তাতে ঢাল, টেরই পাবে না; মরুভূমিতে দু'ঘড়া জল ঢাল আর না ঢাল, কিছুই টের পাবে না। সংসারও সেই রকম। এর গোছান শেষ করা যায় না। যত গোছাবে ততই দেখবে, এটা রয়েছে, সেটা রয়েছে; ইতি বলে জিনিষ নেই। মনকে যেদিন গোছাবে, সেদিন হবে। বাইরের সংসার শেষ হয় না। মনকে শেষ করে নিলেই বাইরের সংসার শেষ হবে।

সংসারীর সুখ দুঃখ বোধ হচ্ছে, সাধারণ। কি রকম জান? শুনেছে ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়; ঠাণ্ডা দেখ্‌লেই ভয় হচ্ছে। আবার ঢের দেখ্‌বে ঠাণ্ডায় কিছুই হয় নি। এই আইন ধ'রে সংসার করলে ভয়, অশান্তি আসে। কিছুই নয়, ভয় মাত্র। মন শক্ত করলে দেখবে সংসারও ঠিক্ যাচ্ছে, তুমিও ঠিক্ আছ। প্রালব্ধ নিয়ে সংসার। ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতা, সব যার যার প্রালব্ধ নিয়ে আসে; যার যার প্রালব্ধ ভোগ করে। শান্তি বললেই ত হয় না। যার যার ভোগ।

তবে মায়ার আকর্ষণ। মানুষ ভাবে এই ক'রে হবে, সেই ক'রে হবে; কিন্তু জিনিষ তা নয়। একটা যায় আর একটা আসে। শাস্ত্রেই ত উদাহরণ রয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব, যত ভাল তাদের ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায়, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির মত মহাবীর পাঁচ ভাই, স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, দেবী,; অথচ দেখ কি রকম দুঃখ ভোগ করতে হ'ল। এত থাকতে রাজ্য ছেড়ে বনে বাস, বিরাটগৃহে দাস্যবৃত্তি, দ্রৌপদীর দাসীবৃত্তি; মহাবীর পুত্র অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘিরে অন্যায় যুদ্ধে মারলে, পাঁচ পাঁচটী ছেলে গুপ্তহত্যায় গেল।

একেই বলে প্রালব্ধ। এ এমন জিনিষ; এত থাকতেও

কাজ করে। তবে এই, কৃষ্ণের শরণাগত ছিল বলে, কৃষ্ণ সহায় ছিলেন, তাই শেষ মঙ্গল। আর কুরুরা কৃষ্ণকে ছেড়ে দিলে, প্রথম ভোগ, শেষ দুঃখ। প্রারব্ধ কর্ম্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

তাঁকে ডাক। মন তৈরী না করলে সুখ হয় না। অর্থে সুখ হয় না। তাহ'লে ত বড় বড় রাজারা সুখী হ'ত। অর্থ না হয় কারও কম আছে আর কারও বেশী আছে। যার বেশী আছে সেও যদি দুঃখ পেল, তবে কম যার আছে তার আর কি ?

এজন্যে তাঁকে ধরা। সংসারে ভয় খাবে না। এ সুখের জায়গা নয়। একটা হ'ল আর একটা গেল। এ অভাব সে অভাব লেগেই আছে। মন তৈরী না হলে দুঃখ যাবে না। তবে কর্ম্ম ক'রে যাও। একটা কিছু ত করতে হবে। কিন্তু মন তুলে নিতে হবে।

গোপেনের ভাইপোকে বলিতেছেন—

ঠাকুর। উকিল হবে ?

গোপেনের ভাইপো। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর। তা বেশ, উকিল ভাল। উকিল হ'তে খুব বুদ্ধি চাই। তাঁতে মন রাখবে। খুঁটো ধ'রে ঘুরবে, তবে মঙ্গল। কিছু সময় স্থিরভাবে তাঁর চিন্তা করবে। স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, সব তিনি। চণ্ডীতে আছে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মেধারূপেণ সংস্থিতা।

তাঁকে ধরলে সব হয়। যা কিছু সব তিনি। তাঁকে ধরলে সব আসবে। তবে তারি মধ্যে যে যেটা চায়। যার যা প্রিয়। মূল কিন্তু শান্তি। মানুষ চেষ্টা করছে কিসে শান্তি হয়। ঠিক না ধরলে কি করে পাবে ? আগুনে হাত দিলে জ্বলবে না, এ কি হয় ? দেখতে বেশ ভাল হতে পারে, কিন্তু তার দাহিকাশক্তি কাজ

করবে। খুব তাঁতে লক্ষ্য রাখতে হয়। তবে কর্ম্মক্ষয় হয়। গ্রহক্ষয় হয়। শান্তি আপনিই আসবে।

তিনিই সব করাচ্ছেন। গীতাতে দিয়েছে, "লুকায়িত থাকি জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পরে।" তাঁকে ধরলে সব হয়।

রাজেনের নাত্নীরা আসিয়াছে। ঠাকুর তাহাদের সঙ্গে, 'আনা'র (ডাক্তার সাহেবের মেয়ে) সঙ্গে ফষ্টি নাষ্টি করিতেছেন, "তোমার কাপড়টা বেশ হয়েছে। খুব পড়ছ ত? খুব পড়বে, বেশ।"

ঠাকুরের অসুখের কথা হইতেছে। ঠাকুরের ধাত অদ্ভুত রকমের। সাধারণ নিয়ম খাটে না। জ্বর হউক, যাহাই হউক, কাজ সব ঠিক্ চলিতেছে; গঙ্গাস্নান, রীতিমত খাওয়া-দাওয়া, দেবদর্শন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল উপদেশ দেওয়া, এর বিশ্রাম নাই।

কালীবাবু। আপনার সব উল্টো করলেই সেরে যায়। শ্রীরামপুরে পেটের অসুখ হ'ল, কচুরী খেয়ে সেরে গেল। ছ'মাস জ্বর, ঠাণ্ডা ব্যবহার চল্‌ছেই। কাশীর সেই ডাক্তার বল্‌লে, "এত বড় পিলে কখনও দেখি নি। কি করে বাঁচতে পারে? যৌগিক দেহ না হলে থাকতেই পারে না।"

অনুকূল। চিকিৎসা করলে হয় না?

ঠাকুর। কি চিকিৎসা করবে?

অনুকূল। ডাক্তারী কি যা হয়।

ঠাকুর। এ্যালোপ্যাথি (Allopathy)? ডাক্তার ওষুধ দিয়ে পালাবে না ত? ডাক্তারকে ধ'রে রাখতে হবে, তিনি ওষুধ দিয়ে দৌড় মারলেন, একটা কিছু হ'লে সামলাবে কে?

আমার কি চিকিৎসা করবে? ছ'মাস জ্বর। তার ওপর বিষ্ণুতেল, ডাব, মিশ্রির জল, গঙ্গাস্নান, তেঁতুল গোলা, চল্‌ছেই। জ্বর বাড়েও না, কমেও না। ফুঁড়ে (injection) কি হবে? আমি ত তার নিয়মে থাকব না। সেই ক্লাসকে (class শ্রেণীকে) পারে যারা তার কথা শুনবে। এখন আমাকে বলবে—ঠাণ্ডা লাগিও না। আমার ত তা

চলবে না। আর ঠাণ্ডা গিয়ে ত গরম এল, তাতেই বা কি হ'চ্ছে? ওষুধে ত উল্টো হয়। ডাক্তার ত আমায় ফুঁড়ে গেলেন। শেষকালে একটা কিছু হ'লে তিনি কি করবেন? বড় জোর বলবেন, "বড় স্যরি (Sorry দুঃখিত), কি করব মশাই, কি রকম হ'ল।" তিনি ত স্যরি (Sorry) ব'লেই খালাস, আমার যে প্রাণ যায়। মিছিমিছি সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কি হবে?

সোমদেব, তপেন, গোপেন আসিল।

ঠাকুর। এস, বস, এই আমার চিকিৎসার কথা হচ্ছিল।

গোপেন। হ্যাঁ, চিকিৎসা হওয়া উচিত।

ঠাকুর। কি চিকিৎসা হবে? সাধারণ ধাতে হতে পারে। একটা ফুঁড়লে কিছু হ'ল না; শেষকালে একটা হার্টের (Heart) রোগ হ'ল, কি কিছু হ'ল। কাল খুব জ্বর,—

ডাক্তার সাহেব। একশ তিন ডিগ্রি।

ঠাকুর। আজ গঙ্গা-নেয়ে সেরে গেল। যা খাবার সবই খেলুম, বাড়ল না। ওষুধে কি হবে? ওষুধ ত বইতে আছে, ধাতটা বোঝা দরকার।

গোপেন। রোগীর একটু বিশ্বাস থাকা দরকার।

ঠাকুর। আমার বিশ্বাসও নেই, আবার আপত্তিও নেই। তবে ধাতের জন্যে এ্যালোপ্যাথিতে (Allopathy) ভয় খাই।

গোপেন। দেহের ধর্ম্ম, রোগ হয় আবার সারে।

ঠাকুর। দেহের ধর্ম্ম যদি হয় তবে সারবেই। রোগ হ'লে ত সারে। সবই ধর্ম্ম। সবই অনিত্য; রোগ, দেহ, সবই অনিত্য। রোগ নিত্য হ'লে ডাক্তার কি করবে? যদি অনিত্য হয় সারবে।

গোপেন। উপশমও ত হ'তে পারে?

ঠাকুর। হ'তে পারে, না'ও হ'তে পারে। আমার বিশ্বাস নেই। তবে ডাক্তার ভোগে কেন? তার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ভোগে কেন?

গোপেন। রোগ হয় ত ঠিক্ নির্ণয় হয় নি।

ঠাকুর। আমারটী কি করে হবে ?

গোপেন। ডাক্তার আরোগ্য করে, তাও ত দেখেছেন।

ঠাকুর। করেন নি তাও ত দেখেছি। দু'টো দেখেই সন্দেহ। তুমি দেখলে একজন সাধু, আবার সে চুরি করে, কোন্‌টা বিশ্বাস কর ?

গোপেন। আমি শেষেরটা বিশ্বাস করি (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। আবার দেখলে উল্‌টো (হাস্য)।

গোপেন। রোগীর বিশ্বাসে আসে যায় না। ডাক্তারের বিশ্বাস আছে ত।

ঠাকুর। আমার বিশ্বাসের কথাই বল্‌ছি। ডাক্তারের ও বিশ্বাস নয়, পরীক্ষা। পরীক্ষা করতে যে প্রাণ যায়। ঢের হয়েছে, আর পরীক্ষা করাতে রাজী নই। দেহের ওপর ত অত ভয় নেই, যে প'ড়ে প'ড়ে পরীক্ষা করব। এ দেহ একদিন যাবেই। তবে একে নিয়ে এত পরীক্ষা কেন ? যা হবার তা ত হবেই, এর ওপর থাকা ভাল।

প্রভাস আমার চিকিৎসা করবে। তার নিজের 'চিলি' (Chill) আর 'গিডিনেসে'র (giddiness) ঠেলাতেই অস্থির।

পায়ে বাত হ'ল। অমিয় মাধব মল্লিক চিকিৎসা করতে এল। মেডিকেল কলেজের চারু, সুবোধ এরা দেখলে, বললে, না, এবার আপনাকে আমাদের কথামত চলতে হবে। নইলে চলবে না। সাবধানে থাকতে হবে। তারপর কথায় কথায় চারু বললে, আপনার কাছে আস্‌তে পারি নি, বুকে প্যাল্‌পিটেসন্‌ (Palpitation হৃৎকম্প) হয়, সিঁড়ি উঠতে পারি না। আমি বললাম—তোমারও প্যাল্‌পিটেসন্‌ (Palpitation) হ'ল ? তুমি ত সাবধানের কিছু কম কর নি। এত সাবধানে থেকেও তোমার যদি প্যাল্‌পিটেসন্‌ (Palpitation) হয়, তবে আমি আর সাবধানে থেকে কি করব ? যদিও বা থাকতুম, এখন আর থাকছি না। তাই বললে, "ডক্টর হিল দাইসেল্‌ফ (Doctor heal thyself, ডাক্তার নিজেকে সারাও)"।

ওষুধে কি হবে? প্রভাস একদাগে ভাল করবে, তা দু'দাগ, তিনদাগ, কিছুই হ'ল না, বেড়েই চলল।

মাখম সিংহ কাশীতে গিয়েছিল। ওষুধ দিতে চাইলে। বললাম, মিছিমিছি কেন তোমার ওষুধ নষ্ট করবে? থাকলে অপরের কাজে আসবে। সে বললে "হ্যাঁ আপনার পাগলা ধাত। তবে আমি ভগবানের নাম ক'রে দেব"। বললুম, আচ্ছা দাও। বড় কিছুই হ'ল না। তবে ওর ওষুধে ক্ষণিক উপকার হয়।

গোপেন। ক্ষণিকও ত হয়।

ঠাকুর। তা এমনিও হচ্ছে। কাশীতে আর একটী ডাক্তার আছেন, তিনি নাড়ী ধরে চিকিৎসা করেন। বল্লেন, "আপনাকে বাঁদরে কামড়েছিল, বাঁদরের বিষ রয়েছে।" তা ওষুধ দিলেন, কিছুই হ'ল না। শেষে পিলে দেখে ভয় খেলেন।

গোপেন। আপনার শরীরে কোন গ্লানি মনে হয় না?

ঠাকুর। হয়; সময় সময় দুর্ব্বলতা মনে হয়। আবার খুব সবল হই। এখনও ত দুর্ব্বল শরীর, কিন্তু এরা আমার সঙ্গে চলুক দেখি।

গোপেন। আমি ত কাশীতে পারি নি। আচ্ছা আয়ুর্ব্বেদ কি রকম?

ঠাকুর। হ্যাঁ, আয়ুর্ব্বেদ ঋষিবাক্য। কিন্তু জানা লোক নেই। ওষুধও চেনে না, ব্যবহারও জানে না। সাধন না ক'রে শুধু প'ড়ে হবে না। ঋষিরা সাধন ক'রে ঐ সব ওষুধ পেয়েছেন। সাধন না করলে হবে না। বইপড়া বিদ্যে সাধারণ বিদ্যে।

গোপেন। একবার কবিরাজি দেখ্‌লে হয়।

ঠাকুর। কবিরাজের ওপর আমার বড় বিশ্বাস নেই। আমায় দুবার দেখেছে। কিছু করতে পারে নি। ছ'মাস সুজির রুটি খাইয়ে রেখেছিল। যামিনী কবিরাজ তিন মাস চিকিৎসা করলে। কিছুই হ'লনা। স্নান করলুম, ডাব খেলুম। প্রবল জ্বর। আট দিন একাজ্বরি। আট

দিনের পর জ্বর আপনি ছাড়ল। খুব ক্ষিদে, ভাত খেলুম। সেরে গেল। তখন কটকিনা করেছি, এখন তা করবো না।

সেবার ডেঙ্গু হ'ল। গঙ্গা-নেয়ে এলুম। ইরাপ্‌সন্ (Eruption) বেরুল। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। গঙ্গা-নেয়েই সেরে গেল। (মাকে লক্ষ্য করিয়া) আর যাঁরা সাবধানে ছিলেন তাঁদের একমাস চিকিৎসা হ'ল। চিৎকারের ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত (হাস্য)।

শ্রীরামপুরে অসুখ হ'লে সবাই বললে—স্নান বন্ধ করুন। আমি বললুম—দেখ, বুঝতে পাচ্ছ না, আমার ধাত সে নয়। স্নান না করলে বাড়বে। তা কবিরাজ বল্‌লেন—ও আপনার একটা ম্যানিয়া (Mania)। তিনি সেখানকার প্রধান প্রাচীন কবিরাজ, আমার ভক্ত। তাই করলুম, স্নান একদিন বন্ধ করলুম। তারপর মাথার যন্ত্রণা, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। বললুম—কবিরাজ, এবার বন্ধ কর। কি আর করবে, বল্‌লে, তাই ত আমি ত বুঝতে পারি নি। তেঁতুল গোলা খেয়ে আর স্নান ক'রে সারল। দেখ, যে পরিমাণ heat (গরম) আছে, তাকে ঠাণ্ডা করতে হলে সেই পরিমাণ Cold (ঠাণ্ডা) দিতে হবে ত ?

গোপেন। আমি বেশী দেব।

ঠাকুর। কি পরিমাণ আছে, আগে দেখতে হবে। ধাত না জানলে কি করে হবে ? সাধারণ-বোধে ত হবে না। খড়ের আগুন এক ঘটী জলে নিবেছে; গুঁড়িকাঠের আগুনেও তাই দিচ্ছে। সে কি নিভবে না জ্ব'লে উঠবে ?

সময় না হলে হয় না। এক রাজার বড় ব্যামো হয়। কিছুতেই সারছে না। ডাক্তার কবিরাজ কেউ কিছু করতে পাচ্ছে না। রাজ্যে প্রচার করে দিলে, যে রাজাকে সারাতে পারবে, এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। বৈদ্য সব আসতে লাগ্‌ল। এখন রাজা ছিলেন সিদ্ধ। ওষুধকে কথা কওয়াতে পারতেন। বৈদ্য ওষুধ দিলেই জিজ্ঞেসা করতেন, আমি তোমায় খেলে সারব ? ওষুধ বলত, 'না'।

অমনি তুলে রেখে দিতেন। যে আসে তারই ঐ রকম হয়। ওষুধ সব জ'মে গেল। সারি সারি সাজান রয়েছে। একবছর পরে এক বৈদ্য এসে বললে, "মহারাজ! আমার ওষুধ খেলে নিশ্চয়ই সারবেন।" রাজা বললেন, "আচ্ছা দাও।" নিয়েই ওষুধকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমায় খেলে সারব?" সে বললে, "হ্যাঁ।" অমনি তাকের সব ওষুধ বলে উঠল, "আমায় খেলে সারবেন।" এ বলছে, "আমায় খেলে সারবেন," ও বলছে, "আমায় খেলে সারবেন।" রাজা বললেন, "কি রকম! তোমরা আগে বললে, 'না', এখন বলছ, 'আমায় খেলে সারবেন', একি?" তারা বললে, "এখন সময় হয়েছে কিনা, যাতে তাতেই সারবেন।" (সকলের হাস্য)।

চট্ করে কি কিছু হয়? তা'হলে নিজের বাড়ীতে কি কেউ ত্রুটী করত?

একজনা মেয়ের বে দেবে। মেয়েটী বিবাহযোগ্যা হয়েছে। ভাল দিন দেখে সৎপাত্রে দেবে। তাই পাঁজি দেখাতে পণ্ডিতের কাছে গেছে। বলছে, "পণ্ডিত মশাই, আমার মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে, পাত্রস্থ করব, একটি ভাল দিন দেখে দিন।" পণ্ডিতটী বললেন, "আচ্ছা বস বাবা, এখনি দেখে দিচ্ছি।" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, চাকর বাকর ত বাড়ীতে নেই। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। তাকেই ডেকে বললেন, "মা, পাঁজিটি দিয়ে যাও ত।" মেয়েটি দিয়ে গেল। সে ছিল বিধবা। যে লোকটী পাঁজি দেখাতে গিয়েছিল, সে তাকে দেখেই বললে, "পণ্ডিত মশাই, এটী কে?" তিনি বললেন, "এটী আমার মেয়ে।" "এ বেশ কেন?" "কি বলব বাবা, আমার কপাল। মেয়েটি বিয়ের রাত্রেই বিধবা হয়েছে।" লোকটি বললে, "থাক পণ্ডিত মশাই, আর পাঁজি দেখতে হবে না। আপনার মেয়ের বিয়েতে নিশ্চয়ই আপনি পাঁজি দেখতে ত্রুটী করেন নি। খুব ভাল দিন দেখেই দিয়েছিলেন। তাতেও যখন আপনার মেয়ে বিধবা হ'ল, তা আমি আর পাঁজি দেখিয়ে কি করব? যে দিন আমার হাতে

টাকা হবে, সেই দিনই বিয়ে দেব। মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।*

যা হবার তা ঠিক্‌ই হয়। মানুষ ভয়ে প'ড়ে নানা রকম করে। জ্যোতিষী সব লোকের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, নিজের ব্যবস্থাটা আর করতে পাচ্ছে না। টাকার জন্যে এর তার খোসামোদ ক'রে মরছে। হোম করে সকলের গ্রহশান্তি করছেন, এদিকে নিজে বেচারীর প্রাণ যায়। নিজের গ্রহগুলির শান্তি করলেই পারে। যাঁর জগৎ, তাঁতে যত মন দেবে, ততই শান্তি পাবে।

গোপেন। প্রালব্ধ মনে করে ত বসে থাকি না, আমরা রোজ কাজ করি। আমাদের স্বাধীনতা ব'লে জিনিষ আছে। নয়ত প্রালব্ধই বা কোথেকে আসবে?

ঠাকুর। প্রালব্ধ বলেই কিছু স্বাধীন। নইলে স্বাধীনতা কোথায়? হাত নেড়ে ভাত খেলেই ত স্বাধীনতা হয় না। স্বাধীনতা তাকে বলে, একটা নীতি নিয়েছি, যাই হ'ক, আজন্ম করব। ভগবানের নাম করছি, রোগ শোক যা আসুক, মরলেও ছাড়ব না। তাকে বলি স্বাধীনতা।

গোপেন। আমরা ত জড় নই, চলছি, ফিরছি।

ঠাকুর। জীবের স্বভাব মোশন (Motion গতি), তাঁরি দেওয়া। স্বেচ্ছায় যদি হয় তবে গতি ব্যাধি হ'য়ে বন্ধ হয় কেন? ইচ্ছা ক'রে তখন করুক ত?

কলের পুতুল, দড়ী ধরে নাচাচ্ছে, সেও নাচ্ছে। পুতুল ভাবলে, নিজেই সব করছে। দড়ি ছেড়ে দিলেই প'ড়ে গেল। তিনিই সব করাচ্ছেন।

গোপেন। তিনি এরকম পক্ষপাতিত্ব করলেন কেন? কা'কেও ধনী, কা'কেও দরিদ্র।

ঠাকুর। পক্ষপাতিত্ব কোথায়? সবই যে তাঁর সৃষ্টি। দুই থাকবে, এই সৃষ্টি। দুই না থাকলে সৃষ্টি হয় না। গরীব ধনী ব'লে ত জিনিষ

নেই। তুলনা করছ কার সঙ্গে? তোমার ঘর। তুমি এখানে এ ছবি, ওখানে সে ছবি, নিজের পছন্দসই সাজালে। সবই তোমার কাছে সমান। পরখ করছ কার সঙ্গে?

গোপেন। আমরা ত জড় নই, চিন্তাশক্তি রয়েছে।

ঠাকুর। জড় ত রয়েছ, যখন নিদ্রা যাও কোন চিন্তাই থাকে না।

গোপেন। জীবের গতিবিধি ত আছে।

ঠাকুর। তিনি দিয়েছেন যেটুকুন। গীতাতে দিয়েছেন—"লুক্কায়িত থাকি জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পরে।" আমিই মন, আমিই বুদ্ধি। চণ্ডীতে বল্‌লেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

সবই তিনি। যাকে যতটুকু দিয়েছেন। তোমার যদি থাকে হয় না কেন? ইচ্ছে করলেই করতে পার না কেন?

গোপেন। তবে "লীলাপ্রসঙ্গে" যে আছে, গরু ও খোঁটার কথা।

ঠাকুর। হ্যাঁ, সেখানেও আছে, গৃহস্থ দড়ী যতটুকু দিয়েছে। গরুর স্বাধীনতা আর কোথায়? গৃহস্থ ইচ্ছে করলেই দড়ী খাট ক'রে দিতে পারে; চার হাত, তিন হাত, যতটুকু ইচ্ছে। তারই মধ্যে গরু ঘুরতে পারে, তার বেশী নয়। সব তিনি দিলেন, ব'লে দিলেন, এইটুকু খরচ কর, সেইটুকুই খরচ করতে পার। সে কি স্বাধীনতা হ'ল? বাড়ীর ম্যানেজার টাকা খরচ করে। সে কি স্বাধীন? হুকুমে চলেছে। মনিব বললেন, এই খরচ কর। তাই করছে।

গোপেন। তা'হলে "তুমি জানাও যারে সেই জানে" এই ঠিক্?

ঠাকুর। তবে এরি মধ্যে আছে। তাঁর শরণাগত হ'লে, তাঁর ওপর নির্ভর করলে কিছু হয়। তাই বলছেন, অর্জ্জুন, তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় শোক-মোহের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেব।

সাধারণ আছে আবার শরণাগত আছে। কাল দু'টী মেয়ে এসেছিল, বৈষ্ণব। বলছিল, আমাদের বাসনা-কামনা গেছে, গোবিন্দচরণ দর্শন হলেই হয়। আমি বললুম, বাসনা-কামনা গেলে ত গোবিন্দচরণ পেয়েছ। আর ত কিছু রইল না।

আবার বললে, "খাওয়া পরার জন্যে একটু চিন্তা হয়।" আমি বললুম, সে কি? তাঁকে ভালবাস, যা দেবেন তাই খাবে। বাপকে ভালবাস, তাঁর বাক্সে যা আছে তাই নেবে। হীরে, মাণিক, টাকা, পয়সা, সব আছে। সব আনন্দে নিতে হবে। শুধু হীরেটুকু নেবার বেলায় আনন্দ, সে কি রকম ভালবাসা? আবার বলে, "কর্ত্তাভিমান আছে।" আমি বললুম, "বেশ ত, কর্ত্তা হও ত ঠিক্ ঠিক্ কর্ত্তা হও। চাকরকে খাটাও। চাকরের হুকুমে চললে হবে না। চাকর হচ্ছে রিপুরা, তাদের হুকুম চালাও। নিজে তাদের হুকুমে চললে কি রকম কর্ত্তা হ'লে। কর্ত্তা হও ত ঠিক্ ঠিক্ হও। নয়ত দুটো ভাষার মার-প্যাঁচে কি হবে? আর নয়, সব তাঁতে সমর্পণ কর। তাঁর শরণাগত হও। কর্ত্তা, অকর্ত্তা, দুইই ভাববার দরকার নেই। নানা চালে গতি হবে না, এক চাল ধর।"

সদসৎ জগতের নীতি। কি হিসাবে বাঁচবে? মানুষ যেটা ভাল লাগে তাই ধরতে যায়, আর অশান্তি ভোগ করে। ন্যায্য জিনিষ ধর, শান্তি কেন আসবে না?

তাই মা লক্ষ্মীদের বলছিলুম, সংসারটা মরুভূমি বা প্রকাণ্ড জলাশয়। দু'ঘড়া জল নাও আর দাও কিছুই আসে যায় না। কেউ কারও ভাল করতে পারে না। তবে মানুষ ভয়ে, বাসনার তাড়নায় যা তা করছে। ভাবছে, খুব ভালই হচ্ছে।

একটা সৎ-নীতি নাও। তাঁর কৃপা না হলে কিছু হতে পারে না। নিজের চালে চল। পরেরটা নিয়ে দুঃখ পাবে কেন? রাজা ক'রে থাকেন হও রাজা, নয়ত যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক। রাজাকে বড় ক'রো না, তুমি যে রাজার রাজা। সেটা ছেড়ে উপাধি নিয়ে ভুলছ.

কেন? নিজেকে ছাড়বে কেন? তুমি তাঁতে ঠিক্ থাকলে অশান্তি আসতে পারে না। আর একটা ভেবে অশান্তি আন।

তাই দিয়েছে সাধুসঙ্গ। তাঁদের সঙ্গে আপনি সৎবুদ্ধি আসে। সংসার ভয়ানক স্থান। এখানে লড়তে হ'লে কত বড় যোদ্ধা হওয়া চাই। দুর্ব্বলের কাজ নয় সংসার করা। নিজের দুর্ব্বলতা ছাড়ছে না, অথচ সংসার ঘাড়ে করেছ। শক্তি চাই। তাই সৎসঙ্গ। তাতে বুদ্ধি খোলে, সংস্কার ভাঙ্গে। অমুক কি বলবে, তমুক কি বলবে, তা ভাববে কেন? নিজের ত একটা যুক্তি আছে।

গোপেন। সে রকম সূক্ষ্ম বুদ্ধি কই?

ঠাকুর। সূক্ষ্ম না থাকে স্থূলও আছে ত? মোটামুটি একটা ধ'রে নিতে পার। দেবস্থানে যাবে, কে কি বলবে, ভাববে কেন? সংসারীর বাড়ী, ধর্ম্ম কর্ম্ম করছ, একদল হয় ত নিন্দা করবে। সে সব ভ্রূক্ষেপ করতে নেই।

গোপেন। সব সময় ত মনে থাকে না।

ঠাকুর। সংস্কারে গড়া মন বলে মনে থাকে না। সঙ্গ, স্থান, জায়গার শক্তিতে সংস্কার ভাঙ্গে। তাদের একটা কথা বলতে পার, তোমাদের কথা শুনে ত এতদিন চললুম্, তাতে কি হ'ল? তোমরা নিজেরই বা কি করলে? কোন শান্তি এনেছ? যা দুঃখ সে ত হচ্ছেই। তবে আর তোমাদের চালে চ'লে কি হবে? নিজের চালে চ'লে দেখি।

সুখ দুঃখ জগতের নিয়ম। পঞ্চ পাণ্ডব, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায়। তবু দুঃখের ইতি নেই। রাম, রাজপুত্র, কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু চোদ্দ বছর বনে বাস। নিজে মহাবীর, নিজের স্ত্রীকে রাবণ হরণ ক'রে নিলে। সীতা, রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ, তবু কাঁদতে কাঁদতে জন্ম গেল। নিজে তৈরী না হ'লে সুখ আসতে পারে না। সঙ্গই প্রধান, তাঁর ভাব না ঢুকলে শান্তি আসবে না। ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে কি হবে? যা ঘটবার ঠিক্ ঘট্‌ছে। সৎসঙ্গে কর্ম্মের ক্ষয় হয়। স্থান জায়গার শক্তি থাকে।

গোপেন। অসৎ কর্ম্মই শুধু ক্ষয় হয়, না সদসৎ দুইই ক্ষয় হয়?

ঠাকুর। সব কর্ম্মই ক্ষয় হয়। অসৎ গেলে সৎ থাকবে কোথায়? একটা ত থাকতে পারে না। অসৎ আছে বলেই সৎ আছে। অসৎএর ভাগ যত কমবে সৎএর ভাগ তত বৃদ্ধি পাবে। একটা ঘটাতে দু'টো জায়গা। একটীতে সাদা জল, অপরটীতে কাল জল। একটী যখন বাড়বে আর একটী তখন কমবে। তারপর সদসৎ দুই যাবে। অসৎ গেলে সৎ থাকে কি? দুঃখ আছে বলেই সুখ আছে। নইলে কোনটাই নেই। তখন সুখ-দুঃখের অতীত। অপার আনন্দ। অথচ সংসারও রয়েছে।

গোপেন। সে কি রকম সংসার?

ঠাকুর। সে পদ্মের পাতার মত; জলে আছে, জল লাগছে না। পাঁকাল মাছের মত; পাঁকে আছে, পাঁক লাগছে না। তেল জলের মত, একত্র থাকলেও মিশ খাবে না। তেল ওপরে ভাসবেই। সৎসঙ্গে থাকায় চিন্তা আসে না। চিন্তাই হ'ল যত দুঃখের; আবার চিন্তাই সুখের। সুষুপ্তিতে কোন চিন্তা নেই, উঠলেই সুখ দুঃখ এল।

তখন সবকে নিয়ে থাকতে পারে। সব কর্ত্তব্য করতে পারে। কর্ত্তব্য আরও বেশী করা যায়।

গোপেন। সব বিষয়ের জ্ঞান থাকে।

ঠাকুর। এই, জ্ঞান এবং শক্তি। তখন সংসার আনন্দময়। সকলকে ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসতে পারে। অথচ মন বদ্ধ হবে না।

গোপেন। আচ্ছা, গুণশূন্য আর গুণাতীত কি একই জিনিষ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, গুণাতীত; মনস্থির। সত্ত্বগুণও বন্ধন। লোহার খাঁচা, সোণার খাঁচা, দুইই বন্ধন। গুণমুক্ত, সত্ত্ব, রজ, তম তিনেরই ওপরে।

গোপেন। সে সংসার করবে কি ক'রে?

ঠাকুর। "হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাটিবি,
কভু না ছুঁইবি হাঁড়ী।"

জীবন্মুক্ত বলে। এক আছে দেহ অন্তে মুক্ত। আর দেহেতেই মুক্ত। গুণের কাজ থাকবে, বন্ধন থাকবে না। আগে বুঝবে না, না আসলে বুঝবে না।

গোপেন। সে রকম সংসারী কত পারসেণ্ট (Per Cent শতকরা ক'জন)? (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। তা হীরে কি রাস্তায় পাওয়া যায়? কাচ খুব পাবে।

গোপেন। খনি আছে ত।

ঠাকুর। আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে। যে কষ্ট ক'রে বার করে সেই পায়। খুঁজতে হয়। সহজে পেলে ত কাচের চেয়ে কম দর হ'ত। কষ্ট করতে হবে। খুঁড়তে হবে। দেখ, এমন যে ময়লা কয়লা, তাতেও হীরে পাওয়া যায়। যেমন কাকের বাসায় কোকিলের ছানা থাকে। পাথুরে কয়লার খনিতে খুঁড়তে খুঁড়তে হীরেও পাওয়া যায়।

একটু স্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রে দেখতে হয়, যা করলুম তাতে হ'ল কি? একটা নীতি ধরলে সংসার যায় না। আরও ভাল হয়। এতে কি সংসার হয়? বাসনা-কামনার তাড়নায় খ্যাপা কুকুরের মত। কখনো কাঁদছি কখনো হাসছি। কেবল সঙ্গ, সদ্‌গুরুর কৃপা। বালক সিঁড়িতে নাবতে গেলে প'ড়ে যাবে। বাপ-মা থাকলে হাত ধ'রে নাবায়। আর পড়ে না।

গোপেন। সঙ্গে জ্ঞান পরিষ্কার হয়।

ঠাকুর। হ্যাঁ, অজ্ঞান নষ্ট হবে, তার পর জ্ঞান আসবে।

"আচার্য্যের উপদেশে জনমে জ্ঞান।
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে পার্থ জনমে বিজ্ঞান॥"

যত ভাব আসবে তত সংসার ভিতর থেকে ছেড়ে যাবে।

গোপেন। সব ত আর জীবন্মুক্ত হতে পারে না। একজন না হয় হ'ল, কিন্তু পরিবারের আর সব?

ঠাকুর। দেখ, আলো যদি জ্বালতে পার যোগে যাগে, নিজে ত বই পড়বেই, তারাও পড়বে। যদি সে অবস্থা আসে, যারা সঙ্গে আসবে তারাও শান্তি পাবে।

শুনে কি হবে? সাধনা চাই। চৈতন্য-চরিতামৃত পড়লে, মুখস্থ হ'ল, তাতে ফল কি? পাঁজিতে লেখা আছে, দশ আড়া জল, তা নিংড়োও, এক ফোঁটাও পড়বে না। তাই কাজ করতে হবে। ভাষা বললে চলবে না।

আর স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্বধর্ম্মে ধর্ম্মী। যা তা জিনিষ নয়, স্বামীর ধর্ম্মের সহায়কারিণী। ভক্তিমতী না হলে মন নীচগামী হবে। অশান্তি ভোগ করবে। স্ত্রী যদি নীচগামী হয়, তুমিও উচ্চ না হ'লে বোঝাতে পারবে না। প্রধান জিনিষ তাঁর ভাবে ঠিক্ থাকা। ভেতরে জ্ঞান আসবে।

আর মেয়েদের মন কোমল। সহজেই ভক্তি আসে। চট্ ক'রে ধ'রে নেয়। অত বুদ্ধি মাথার মধ্যে রাখে না। খুব সরল। যদি সৎএর ওপর ভালবাসা আসে চট্ ক'রে কাজ হয়। আর বেটাছেলেদের অনেক বই পড়া থাকে কিনা, যা শোনে বইয়ের পাতার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করে। অনেক বিচার আসে। চট্ ক'রে কাজ হয় না। এ সব অবস্থার কথা, বই প'ড়ে কি বুঝবে?

সংসার, আত্মীয়তা, এ ক'টাই বন্ধতা। তাতে কি সুখ হয়? সঙ্গ চাই। তাতে বৃত্তি নরম হয়। সংস্কার ভাঙ্গে। কতক সংস্কার স্বতঃ, কতক দেখে, আর কতক অজ্ঞতাবশতঃ আসে। রাজার অর্থাদি, যশ, মান, বাহ্যিক সুখ দেখে সেই সব সংস্কার মন ধ'রে নিলে, ভেতরে যে কি আছে দেখলে না।

রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ হ'তে সবাই চায়, সীতা হ'তে কেউ চায় না।

যোগেন। সেটা রাবণের ভয়ে (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। সীতা যদি সুখে থাকত, সবাই তাই চাইত। কষ্ট

কেউ চায় না, আয়েস চায়, তাঁকে ডাকতে চায় না। সেই গান আছে না,—

"সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাই না"।

গোপেন। ঠিক্ গান। আচ্ছা, স্বর্গসুখ কি রকম?

ঠাকুর। স্বর্গসুখ আলাদা। যেমন রাজা রাজড়ারা ভোগ করে, তারই একটু ওপর। আবার মর্ত্ত্যলোকে আস্‌তে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে ভবন্তি" ও সংসারীয় সুখের একটু বেশী। স্বর্গেই বা সুখ কোথায়? ইন্দ্র ভয়ে পালাচ্ছে, রাবণ ধরলে, মেঘনাদ তাড়া করলে। শান্তি কোথায়? স্বর্গসুখের ক্ষয় আছে। আর শান্তি আলাদা কথা। ক্ষয় থাকলেই দুঃখ। ভোগে আসক্তি আছে, ভোগ শেষ হ'লেই দুঃখ।

আর শান্তি চিত্তের স্থিরতা; নিত্য জিনিষ। অনেক তফাৎ, তুলনাই হতে পারে না।

গোপেন। সর্ব্বদা শান্তি, সৎ, চিৎ, আনন্দম্।

ঠাকুর। একটা এলেই শান্তি থাকে। সৎ, চিৎ, আনন্দম্। সৎ—নিত্য, নিত্য যেখানে সেখানে শান্তি। অনিত্যই না দুঃখ। সে একটা গল্প আছে।

ভগবান্ একদিন নারদকে বললেন, "নারদ, চল বেড়াতে যাই।" নারদ বললে, "চলুন যাই।" দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। বেড়াতে বেড়াতে বেলা একটা, দু'টো বাজল। খুব গরম, গ্রীষ্মকাল। ভগবান্ বললেন, "নারদ, বড় জল-তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খেতে হবে।" নিকটে এক ধনীর বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। ভগবান্ বললেন, "চল ঐ বাড়ীতে যাই।" দু'জনে গিয়ে সেখানে উপস্থিত। ফটকে দারোয়ান পাহারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললেন, "আমরা দু'জন অতিথি, বড় জল-তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?" বাবু ওপরে ছিলেন, শুনেই বললেন, "এই, মেরে তাড়িয়ে দে, জোচ্চোর বেটারা, অতিথি এয়েছেন, মেরে তাড়া।"

ভগবান্ বললেন, "এ দুপুরে কোথা যাব? বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল আমাদের দাও।" বাবু বললেন, "তোমার দেখছি ভারি আস্পর্দ্ধা, দে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে।" অগত্যা, কি করেন, ফিরে আস্ছেন। একটু এসে আশীর্ব্বাদ করছেন—এর আরও ঐশ্বর্য্য বাড়ুক। নারদ শুনেই ভেতরে ভেতরে চ'টে গেছেন। এক গ্লাস জল দিলে না, যা তা বলে তাড়িয়ে দিলে, তাকে কিনা আশীর্ব্বাদ করলেন—ঐশ্বর্য্য বাড়ুক! কিছুই না বলে চলতে লাগলেন। খানিক দূর এসে বলছেন, "নারদ, আর ত পাচ্ছি না, কি করি, কোথায় যাই।" নিকটে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী আছে। ভগবান্ বললেন, "হ্যাঁ নারদ, মনে পড়েছে, এখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী আছে। সে আমার পরম ভক্ত। চল, তার কাছে যাই। আমরাই ভুল হ'ল, আগেই সেখানে গেলে হ'ত।" দু'জনে চললেন। গিয়ে দেখেন, একখানি ভাঙ্গা কুটীর; চাল বেড়া খ'সে পড়ছে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ব'সে আছে, কঙ্কালসার দেহ, পরিধানের কাপড় ছেঁড়া। "আমরা দু'জন অতিথি" বলতেই ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি এসে অভ্যর্থনা করলে, "আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পেয়েছি। কিন্তু আমার ত এমন জায়গা নেই আপনাদের বসাই, একখানি আসনও নেই যে আপনাদের বসতে দিই।" ভগবান্ বললেন, "সে জন্যে ভেব না, আমরা এখানেই বস্ছি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু নিয়ে এস।" ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়ে দেখে—দেবার কিছুই নেই। সে ভিক্ষে করে রোজ যা পায় তাই খায়। ভিক্ষায় বেরিয়ে দেখলে, কোথাও কিছু পেলে না। অন্যদিন এক মুঠো আধ মুঠো যা হোক কিছু পায়, এ দিন আর কিছুই পেলে না। ব'সে কাঁদছে, 'ভগবান্ কি করলে, ক্ষুধার্ত্ত দু'টী অতিথি ব্রাহ্মণ, অন্যদিন খাওবা দু'টি পেতুম, আজ কিছুই পেলুম না, কি করি?' বসে ভাবছে। এদিকে নারদ আর ভগবান্ অস্থির হয়ে পড়েছেন, বললেন, "কিহে ব্রাহ্মণ, কোথায় গেলে। আমাদের আগেই মানা করলে না কেন? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।" ব্রাহ্মণ কাঁপতে কাঁপতে এসে

জোড়হাত ক'রে বললে, "ঠাকুর, কি করব, আমি ত ব'সে নেই। ভিক্ষায় বেরিয়েও কিছু পেলুম না। অন্যদিন যাওবা পেতুম, আজ তাও জুটল না।" ভগবান্ বললেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ঘরে কিছুই নেই?" ব্রাহ্মণ বললেন, "কিছু নেই, আমি সত্যি বলছি।" "কিছুই কি নেই? দেখ দেখি খুঁজে।" বারবার বলতে ব্রাহ্মণের মনে পড়ল—"হ্যাঁ, এক পো দুধ আছে।" ব্রাহ্মণের একটী গরু ছিল, তার এক পো দুধ হ'ত। তাই সে খেত। ভগবান্ বললেন, "নিয়ে এস, তাতেই হবে।" ব্রাহ্মণ দুধ এনে দিলে। ভগবান্ বললেন, "তুমি অর্দ্ধেক খাও, আমরা দু'জনে অর্দ্ধেক খাচ্ছি।" বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক খেলেন। "ব্রাহ্মণ, বড় তৃপ্ত হয়েছি" ব'লে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন, "তোমার গরুটী ম'রে যাক।" নারদ আর থাকতে পারলেন না, বল্লেন, "ঠাকুর, তোমার সঙ্গে এই শেষ, আর যাচ্ছি নি। তোমার ঐ গলাধাকাই ঠিক্।" ভগবান্ বললেন, "নারদ, চটছ কেন? এস এস, এই গাছ থেকে বেলটী পাড় দেখি।" পাড়লে বললেন, "ভেঙ্গে দেখ"। নারদ দেখলেন ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠে আর ধনীটি সাজা ভোগ করছে। ভগবান্ বললেন, "দেখ নারদ, ধনীটি ঐশ্বর্য্যে এত ম'জে আছে যে ব্রাহ্মণ অতিথি, তাও বোধ নেই। গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা। ভোগ শেষ না হলে ত আমার দিকে মতি হবে না। তাই আশীর্ব্বাদ করলাম—আরও ঐশ্বর্য্য হোক। ভোগ শেষ হ'লে তবে আমায় ডাকবে। আর এই ব্রাহ্মণ আমার পরম ভক্ত। সব সময় আমার নাম করে। কেবল গরুটিকে সেবা করবার সময় আমায় ভুলে যায়। ঐ দুধটুকুর জন্য সেবা করে, ভাবে বুঝি ওরি ওপর বেঁচে আছে। আমি ইচ্ছা করলে যে বিনা দুধেও রাখতে পারি সে বোধ নেই। তাই বললুম গরুটি যা'ক। সেটি গেলে আমায় একমনে ডাকবে। নারদ! গরু শান্তি দিতে পারে না। আমায় ভুলে গরুতে মন দিয়েছে, তাই গরুটি যেন যায় এই আশীর্ব্বাদ করলুম।"

সেকালে জীবন্মুক্ত সংসারী ছিল। অম্বরীষ, মান্ধাতা, দিবোদাস প্রভৃতি জীবন্মুক্ত অবস্থায় রাজত্ব করে গেছেন।

গোপেন। তাঁদের সংখ্যা (Number) বাড়ছে, না কমছে ?

ঠাকুর। তা সেন্সাস্‌দের (census) জিজ্ঞেসা করগে (সকলের হাস্য) ; আমি ত আর সেন্সাস্ (census) নই।

সংসারের দারুণ আসক্তি ; আবার রাজাও কেঁদে মরছে। রাজা হ'লেই পার পাবেন না। জার্ম্মাণ কাইজার এত কাণ্ড ক'রে শেষকালে টেনে দৌড় মারলে। রাসিয়ান জার (Russian Czar) ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাল। রাজা হ'লেই কি হবে ? মানুষ ঘুমের ঘোরে সব রাস্তা দিয়ে ঢুস্ মারে। সঙ্গের গুণ এই, তাকে ঠিক্ পথে নিয়ে যায়। সঙ্গে চৈতন্য আসে।

গোপেন। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়। এর অর্থ কি ?

ঠাকুর। দেখ যদি ঘৃণা থাকে ত সঙ্গ করবে কি ক'রে ? আমি বড় লোক, সামান্য দরিদ্রের বাড়ী লোকজন না নিয়ে একা যাব ? এ সব ভাব ওঠে ; আবার এ রকম জায়গা, এ রকম আসন নইলে উপাসনা কি ক'রে করি ? এই সব চিন্তা আসে। এ হ'লে ত স্থানই পাবে না, উপাসনা করবে কি ? কাজেই ঘৃণা ত্যাগ করা চাই। আর মানুষকে ঘৃণা করো না, তার ভালটা দেখ, সেটার আদর কর। আবার ঘৃণা কাজও করে। যতক্ষণ অবস্থা না হয় ঘৃণাও দরকার। অসৎ কাজে ঘৃণা ; অন্যায় কাজে যেতে হ'লে তখন ঘৃণাই ফেরায়। ন্যায় কাজে ঘৃণা চলে না। সেখানে ঘৃণা বন্ধনের কারণ। লজ্জা দেখ, সৎসঙ্গে আসতে ইচ্ছা হ'ল, লজ্জা করলে, হ'ল না। কে কি বলবে! কি ক'রে যাই! হ'ল না। লজ্জা অসৎ কাজে করতে পারে, সৎ এ লজ্জা থাকে না।

গোপেন। ভয় কি রকম ?

ঠাকুর। পথে যাচ্ছ, দেবস্থান দেখলে, প্রণাম করতেও ইচ্ছা হ'ল। জুটো সঙ্গী দেখলে, তারা হয় ত বললে, "কি হে বড় ভক্ত হয়ে পড়েছ

যে, কি রকম ? অমনি ভয়, লজ্জা। ইচ্ছা থাকলেও হ'ল না। এসব কাজে ভয়, লজ্জা করতে নেই। ন্যায্য যা বুঝি ক'রে যাব। কাকে ভয় ? খারাপ কাজের বেলা সঙ্গী জোটে, ভালর বেলা এক জনও এলো না। তাদের কথা শুনবে কেন ? সাধুসঙ্গ,—পাছে সাধুসঙ্গে বা দেবস্থানে গেলে আবার position (মান) যায়, পাঁচজনে পাঁচ রকম বলে, ওসব শুনতে নেই। তাহ'লে এগোতে পারবে কেন ? লজ্জা, ঘৃণা, ভয় যত আসে, তত সৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

ঘৃণা লজ্জা ভয়, আর রিপু ছয়,
না হইলে জয়, এই নয় থাকিতে নয়।

এ ত আগেই যায় না। সঙ্গ করতে করতে যায়। রাতারাতি আর বুদ্ধ হওয়া যায় না। সঙ্গ মোড় বেঁকিয়ে দেয়; মনে সাহস আসে, শক্তি আসে। হাতে হাতে দেখবে, ও সব আর নেই। তাই তোমায় কাশীতে বলেছিলুম মঠে এসে থাকতে। সংস্কার সব আমার কাছে থেকে ভাঙ্গবে। তা ক'দিনেই ঢের ভেঙ্গেছিল। সংস্কার রাখবে না, লৌকিকতা রাখবে না; তাতে কি ভালবাসা হয় ? ভালবাসা না হ'লে কথা প্রাণে গিঁথবে কেন ? লৌকিকতা কার সঙ্গে ? অপরের সঙ্গে হয়। আপনের সঙ্গে লৌকিকতা থাকে না।

গুরু সব চেয়েও আপন। ভাগবতে আছে, পিতাকে ভক্তি করলে স্বর্গসুখ হয়, মাতাকে ভক্তি করলে সংসারসুখ হয়, স্ত্রীকে ভালবাসলে লক্ষ্মী প্রসন্ন থাকেন আর গুরুকে ভালবাসলে এ ক'টা ত হয়ই, কৈবল্য শান্তিও আসে। তাঁতে বিশ্বাস থাকলে সমস্ত হবে।

তাইত বলেছে—"গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বর।" গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু মানে আর কিছুই নয়, গুরুতে সব মেনে লওয়া। ঈশ্বর ত অসীম, অনন্ত। তাঁর ধারণা করার শক্তি কই!

স্ত্রীর শক্তিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, মহাশক্তিকে ধারণা করবে কি ?

তাই গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে সব ধারণা ক'রে লওয়া। সাধন কর আর না কর, বিশ্বাস ভক্তি থাকলে হবেই হবে। সাধন বললেই ত হবে না? এক বগ্‌গা না হলে সাধন হয় না।

৯৷৷৹টা বাজিল, কালীবাবু উঠিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "কালী উঠছ, সকালে আসবে না?"

কালীবাবু। সকালে আর কি ক'রে আসি?

ঠাকুর। আমি ভাবি, কালা সকালে আসবে বন্দুক নিয়ে, নাইতে যাই, কে আবার ছোরা মারবে!

কালীবাবু। আমিই ত আপনার ভরসায় সেই বাগবাজার থেকে আসি।

ঠাকুর। তোমরা পার, তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস। সেই দেখ না, রামকে বিশ্বাস ক'রে হনুমান এক লাফে সাগর ডিঙ্গিয়ে গেল। আর রামের সেতু বাঁধতে হ'ল।

আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। দেখ, শাস্ত্রেই দিয়েছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম্মের পর অর্থ। পরমার্থও বটে, এ অর্থও বটে। ধার্ম্মিক হয়ে যদি অর্থ হয় তবে ভাল হবে। তাই আগে ধর্ম্মনীতি। আগে রাজাদের ছিল; রাজপুত্ররা ঋষির আশ্রমে কঠোর নীতি নিয়ে থাকত, বিদ্যাভ্যাস করত, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে থাকত। তাতে শক্ত হ'য়ে তারপর রাজ্য নিত; সব দিক ঠিক্ চলত। ধর্ম্ম, অর্থ, তারপর দিয়েছে কাম। কাম হ'চ্ছে কামনা। ধর্ম্ম, অর্থের পর কাম হ'লে যা তা কামনা উঠবে না। সৎ কামনাই হবে। ধর্ম্মের ভিত, তারপর অর্থ, তারপর কামনা সৎই হবে। অর্থ তাকে নষ্ট করতে পারবে না, বরং আরও সৎএর সাহায্য করবে। তারপর মোক্ষ। ভোগ হয়ে গেল। আকাঙ্ক্ষা না গেলে ত মোক্ষ হবে না। তাই কামনা, বাসনা ভোগ হয়ে নিবৃত্তি হ'লে তারপর মোক্ষ।

গোপেন। ভোগে কি নিবৃত্তি হয়?

ঠাকুর। ধর্ম্ম-ভিত্তি আছে ব'লে। যা তা কামনা ত হ'তে পারে না। সৎ ইচ্ছাই হবে। ধর্ম্ম আছে ব'লেই ভোগ-নিবৃত্তি আসবে। তাঁকে চাওয়াও ত কামনা। অবশ্য আর এক অবস্থা আছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারটার একটাও চায় না।

প্রায় ১০টা বাজিল। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—পঞ্চম অধ্যায়।

১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং ;

বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া।

কলিকাতা।

দেবস্থানের শক্তি ও সেখানে যাবার প্রয়োজনীয়তা—এটর্ণি চারু বোস—গয়ায় রঘুনন্দনের পিতৃশ্রাদ্ধ—মেয়েরা ও মায়া—গোপেন, তপেন—কীর্ত্তন।

ঠাকুরের শরীর আজ একটু ভাল। বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুর গান করিতেছেন। ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। এটর্ণি চারু বোসের কথা উঠিল।

ঠাকুর বলিতেছেন।—

ঠাকুর। চারু বোস কাশীতে মঠে গিয়েছিল, গিয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "বিশ্বনাথ কি আছেন ?" আমি বললুম, "তোমার কি বোধ হয় ?" বললে, "ঠিক্ বুঝতে ত পাচ্ছি নি।" আমি বললুম, "আছেন বৈকি। নইলে এতলোক মানছে কেন ? এতলোক যাঁকে ডাকছে, কত আরাধনা করছে, রাশি রাশি ফুল বেলপাতায় যাঁর্ পূজো হ'চ্ছে, তিনি নেই ! তাও কি হয়।" গীতাতেই ত রয়েছে—

দশে, যারে মানে গণে, দশে যারে জানে,
তার ভিতরে তাঁর বিভূতি অধিক পরিমাণে।

চারু বোস বললে, "তাঁর কাছে যাবার দরকার কি ?" আমি বললুম, "যদি ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে ভাব হয়, যাবার দরকার নেই।" তবে স্থান জায়গা বিশেষে শক্তি থাকে। তাতে অনেক কাজ হয়। সাধুর কাছে লোক যায় কেন ? সাধুরও যে হাত-পা,

তোমাদেরও ত তাই। তবে কেন যাও? জায়গা বিশেষে শক্তি থাকে। মানুষ নিজে কি কিছু করতে পারে? মায়ায় বদ্ধ। তাঁদের কাছে গেলে, দেবস্থানে গেলে তাঁদের শক্তি কাজ করে।

চারু বোস বললে, "ঘরে বসে যদি তাঁর নাম করি?" আমি বললুম, "বেশ তাও কর। তাও কর, এও কর। সময় বেড়ে গেল। একঘেয়ে কেন হবে? ঘরে বসেও জপ কর, আবার দেবমন্দিরেও যাও। সব কাজ করছ, একটা নিয়ে ত বসে নেই। কত রকম করছ, আর দেবমন্দিরে যাওয়ার বেলাই বিচার।" পরমহংস দেবকে একজন জিজ্ঞেসা করলে, "দেবমন্দিরে যাবার দরকার কি? ঘরে বসে হয় না?" তিনি বললেন, "আমি একঘেয়ে কেন হব রে? আমি ঘরে ব'সেও জপ করব, মন্দিরেও তাঁকে ডাকব।"

সে বললে, এত লোক মান্‌ছে বলছেন, তাদের ভুলও ত হ'তে পারে।

তা আমি বললুম, এত লোকের যদি ভুল হয়, তাও সত্যি হয়ে যায়। সব লোকের ভুল আর তোমার একলার সত্যি? বহুলোকের ভুলও সত্যি। আর মহাপুরুষরা যা করেন সবই ঠিক্। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন গয়ায় পিণ্ড দিতে গেলেন। বিষ্ণুপদে পিণ্ড দেবেন। পাণ্ডারা দাবী ক'রে বসলো এত টাকা চাই; এখানে এত, ওখানে অত, লম্বা ফর্দ্দ। স্মার্ত্ত ফল্গুর তীরে বসে বললেন, তা কেন? আমি তোমাদের ওখানে দেব না। বিষ্ণুপদ ত এতটুকু নয়, ক্রোশব্যাপী বিষ্ণুপদ। আমি এইখানেই দেব। পাণ্ডারা দেখলে বিপদ। রঘুনন্দন বাঙ্গালার বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি এক জায়গায় কাজ ক'রে গেলে যত বাঙ্গালী সেখানেই করবে। তাদেরই ক্ষতি। তাই বললে, আচ্ছা, আপনি বিষ্ণুপদেই দিন, যা খুসী দেবেন্।

এক জায়গায় বহুলোক যা বলে ডাকুক, সেস্থান জেগে উঠবেই।

গান ধরিলেন :—

কাল বলে কালী-মাকে কাল মনে করো না।
সে ভাবে ভাবিলে কালী কালের ভয় ত যাবে না॥

এই জগত কালে মিশে কাল হয় মহাকালে লয়,
সে কালরূপ যাতে মেশে বেদে তারে কালী কয়;
কল্পান্তক বই মা ত সে রূপ ধরে না॥
বাকী তার দেখে বহুকাল, রুদ্ররূপী সে মহাকাল,
ত্বরায় স্থান দেহ বলে পদে পড়েছেন দেখনা॥
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, নানা বর্ণ কর রে এক,
সকল ঘুচে কালবর্ণ হয় কি না হয় একবার দেখ;
তা'হলে মা কাল কিসে যাবে রে জানা॥
এই যে বিচিত্র ভুবন, একত্রে হয় চূর্ণ যখন,
অন্ধকার প্রকৃতি তখন, তাই কালরূপ কল্পনা॥
অজ্ঞানীর তামস ধ্যানে মা মোর কাল-বরণী,
জ্ঞানীর চক্ষে রুদ্রাণী মোর শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপিণী;
'ক' রেফ্ ইকার বিন্দু যোগে কর রে সাধনা॥
নইলে রবি লোমকূপে যার, বর্ণ কি তার অন্ধকার,
জেনে শুনে এখনও তোর মনের বিকার গেল না॥

ডাক্তার সাহেব গোপেনের বাড়ী গিয়াছিলেন। সেই কথা বলিতেছেন। সেখানেও ঠাকুরের কথা হইতেছিল। গোপেনের ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি বিশ্বাস।

ডাঃ সাহেব। গোপেন বলছিল, ঠাকুর মেয়েদের বাড়িয়ে দেন কেন? ওদের বেশী বাড়াতে নেই।

ঠাকুর। ওদের একটু ভাল ব'লে আটকাতে হবে। নয়ত তোমাদের পাব কি ক'রে? ওরা কল টিপে দিলে কি আর আসতে পার? তোমাদের বল্লুম, এখান থেকে বেশ বুঝে গেলে। বাড়ীতে ওরা কল টিপে দিলে, আর এলে না (সকলের হাস্য); উপদেশ দেব কা'কে? ওরা মহামায়ার অংশ; ভুলিয়ে দেয়। ওদের আগে ঠিক্ করতে হবে।

ডাঃ সাহেব। হ্যাঁ, বীর জাতিও মেয়েদের কাছে নত। ঠাকুর বলছিলেন সেই ডেরাডুন যেতে গাড়ীতে সাহেব মেমের কথা।

ঠাকুর। হ্যাঁ, ডেরাডুন যাচ্ছি, সেই গাড়ীতেই একটা সাহেব আর তার মেম উঠেছে। তা সাহেব বেচারীর মেমটার তোয়াজ করতে করতে প্রাণ যায়।

এখানে ত প্রায় মেয়েরাই আগে এসেছে, তারপর বেটাছেলেরা এসেছে। এই ডাক্তার সাহেব আসবার আগে ইন্দু (ডাঃ সাহেবের স্ত্রী) এসেছে (সকলের হাস্য)।

আর ওদের মেলা কড়া বললে পারবে কেন? দড়ি কেটে যাবে যে। রয়ে সয়ে কাজ করতে হবে।

ডাঃ সাহেব। গোপেনের এদিকে চিন্তা বেশী।

ঠাকুর। হ্যাঁ, খুব। তপেনেরও বিশ্বাস খুব। তবে ভাব স্বতন্তর। তপেন একটু গম্ভীর। আর সংসার ত অত করে নি। গোপেন সংসারে অনেক পোড় খেয়েছে। তাই বুঝেছে জিনিষ কি। খুব দুঃখ পেয়েছে। গোপেনের মনটা ভাল। বিচারক মানুষ কিনা। উকীলের কথা শোনা আর রায় লেখা। মেলা মাথায় রাখে না। বেশ সরল। কাশীতে আমায় বললে—যারা হরিনাম করে তারাই ভাল। আমি বললুম—সরল ভাব ভাঙ্গা ভাল নয়। তবে সংসারী বলে আমার ভাঙ্গতে হ'চ্ছে। না হ'লে সকলকে বিশ্বাস করে কোথায় বিপদে পড়বে। সংসারীর লাভ লোকসান দুটো নিয়েই খেলা। সাধুর বেশ ধরলেই কি সাধু হয়? অনেকে সাধুর বেশে চুরি করে। ভেতরে নাম না করলে কি হবে? পাখীও ত খুব নাম করে—আঙ্গুল দাও, ঠোকা মারতে আসবে। বৃত্তি কোথায় যাবে? হরিনাম করতেই বিশ্বাস করলে, পরে হয়ত দেখলে সে চোর; তা'হলে যে হরিনাম করবে তাতেই অবিশ্বাস আসবে।

বেশ সরল ভাব নিয়ে আছে। তপেন তা নয়। সে চোর ধরছে, শাস্তি দিচ্ছে। দেখলে সব সমান নয়। যে যেমন কাজে আছে, তেমনি ভাব।

কিছুক্ষণ পরে কথায় কথায় বলিতেছেন—

মানুষ পয়সাটাকে এত বড় করে, মনুষ্যত্ব রক্ষা করে না। ভাবে, সৎ হলে বুঝি পয়সা পাবে না। তা নয়। মনুষ্যত্ব রক্ষা করলে পয়সা কমে না। পয়সা ত ভাগ্য। যা আসবার আসে। তা বোঝে না, পয়সার ওপর জোর দেয়। ভাগ্যানুযায়ী জিনিষ আসে, বেচারী মিছিমিছি কষ্ট পায়। সব অবস্থায় মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে হয়। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং"।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮৷৷টার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শরীর ভাল নয় বলিয়া ঠাকুর সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। অনেকে উঠিল।

প্রায় ১০টা হইল। আরতির পর ভক্তেরা বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং; ৩০শে এপ্রিল ১৯২৬ ইং;

শুক্রবার, কৃষ্ণা-তৃতীয়া।

কলিকাতা।

বিদ্যা ও অবিদ্যা পিতামাতা—বিশ্বাস—সিদ্ধগুরু ও রাজকন্যার গল্প—বুদ্ধের চারটি উপদেশ—কবীরের চারটি উপদেশ—মহম্মদের কথা—গুরুসঙ্গ, তাঁর বহুভাব—জনক ও শুকদেবের কথা—নির্জ্জন ও মৌনী—গুরুমন্ত্রের শক্তি—বিবেকানন্দের মার কাছে প্রার্থনা—গুরু ও ইষ্ট—ত্রিগুণ, গুণত্রধর্ম্ম—অর্জ্জুনের শোক, মোহ—তুলসীদাসের সত্যবচন, দীনভাব, পরধন উদাসের ব্যাখ্যা—সংসারে নীতিবল চাই—জ্ঞান ও ভক্তি—স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ—উত্তম, মধ্যম ও অধম গুরু—তিন প্রকার সাধনা, পশ্বাচার, বীরাচার, দেবাচার—স্ত্রীলোকের সাধনা—হিন্দু-মুসলমান—প্রাগন্ধ—৺পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী।

বৈকাল ৫টার সময় একে একে ভক্তেরা সব আসিতেছেন। একটী যুবক আসিয়া বসিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

ঠাকুর। তুমি কোথায় থাক?

যুবক। এই ভবানীপুরেই থাকি।

ঠাকুর। কি কর?

যুবক। আই-এস-সি (I. Sc.) পড়ি।

ঠাকুর। এই গোলমালে মন্দির টন্দির রক্ষা করতে গিয়েছিলে?

যুবক। হ্যাঁ, যেদিন কালীমন্দির আক্রমণের গুজব উঠল, সেদিন বেরিয়েছিলুম।

ঠাকুর। তা বেশ। আগে নিয়ম ছিল, রাজারা দেবমন্দির, স্ত্রীলোক, এদের রক্ষা করতো। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই ছিল এই।

আচ্ছা, তোমার কি ভাল লাগে? সংসার না ধর্ম্ম?

যুবক। সেটা মনে মনে রেখেছি, বলবো না। তবে সংসারে খুব মন নেই। ভোলানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি।

ঠাকুর। খুব ভাল। দীক্ষা নিয়েছ বেশ কথা। গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি রাখবে। তাঁর কাছে গিয়েছিলে?

যুবক। হ্যাঁ গিয়েছিলাম। আমরা তিন ভাইই দীক্ষা নিয়েছি।

ঠাকুর। খুব সাধুতে মন রাখবে। গুরুসেবা ভাল। বিশ্বাস রাখবে তবে মঙ্গল হবে।

যুবক। তাঁর কাছে শীঘ্রই যাব ভাবছি। তবে সুযোগ হয় না।

ঠাকুর। যাওয়া ভাল, তবে তাঁকে মনে মনে ভাবলেও গুরুর শক্তি কাজ করে।

যুবক। তবু কাছে যেতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুর। সে ত ভাল; তবে সংসারের কাজ, সব দিক বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। মনটা ত সব জায়গায় দেওয়া যায়, দেহটা নিয়েই না গণ্ডগোল।

যুবক। ক'দিন থেকেই যাব ভাবছি। বাড়ীর সব আপত্তি করে। আচ্ছা, পিতামাতা যদি ধর্ম্মে বাধা দেয়, তবে সেটা উপেক্ষা করা যায় না কি?

ঠাকুর। আছে, তাতে দোষ হয় না; তবে এই, সংসারে থাকতে গেলে একটা অশান্তি আসে। তাই সবদিক বাঁচিয়ে চলা। নয়ত আছে অবিদ্যা পিতামাতার কথা না শুনলে দোষ হয় না।

অবিদ্যা বলেছে, ধর্ম্মে বিঘ্নকারী হ'লে অবিদ্যা, আর যাঁরা ধর্ম্মে সাহায্য করেন তাঁরা বিদ্যা। তাতে দিয়েছে, সে জায়গায় নিষেধ না শুনলেও ক্ষতি হয় না। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু হরিনাম করতে বারণ করলেও শুনলে না। তাতে দোষ হয় না। মূল মঙ্গল থাকলে, সৎএ মন দিলে, দোষ হয় না। আত্মীয়-স্বজন সকলেরই তাতে মঙ্গল হবে। তবে অসৎএ গেলে গণ্ডগোল।

পুত্তু। বিদ্যার সংসার কি রকম ?

ঠাকুর। ভগবতে মন রেখে সংসার, **বিদ্যার সংসার**; রিপু নিয়ে সংসার, **অবিদ্যার সংসার**।

পুত্তু। বিদ্যার সংসারের নাশ নেই ?

ঠাকুর। বিদ্যার নাশ নেই; তবে আছে, এক ভাবে সব যাবে। গুরুতে বিশ্বাসে সব হয়। কবীর বলেছেন—

'গুরুতে বিশ্বাস কর। মন-প্রাণ সমর্পণ কর, সব হবে। আমি বিশ্বাস রেখেছি, মন-প্রাণ সব সমর্পণ করেছি, তাই সদাই অমরলোকের সঙ্গে বাস করছি।'

যুবক। যিনি বিশ্বাসের ওপর আঘাত করেন, মনে করুন, আমি বললুম—বিবেকানন্দ ভগবান্ বা ভগবান্ দর্শন করেছেন। যিনি সে বিশ্বাসে আঘাত করেন, তাঁকে ত মহাপুরুষ বলতে পারি না।

ঠাকুর। সে আলাদা কথা। তবে বিশ্বাস ভাঙ্গা উচিত নয়। যাকে যে শ্রদ্ধা করে সেটা ভাঙ্গতে নেই। তোমার না থাকতে পারে, অপরেরটা ভাঙ্গবে কেন? ফল ইতি বিশ্বাস সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। প্রহ্লাদের বিশ্বাস, স্ফটিক-স্তম্ভে হরি আছেন। ভেঙ্গে তাই দেখলে। তোমার বিশ্বাস, বিবেকানন্দ ভগবান্, তোমার কাছে তিনি ভগবান্। তবে এ ঠিক্ নয় যে তিনিই ভাল আর সব খারাপ, সে ভাল নয়। **বিশ্বাসে সবই হয়**। গল্প আছে।—

এক রাজকন্যা সাধু-গুরুর কাছ থেকে মন্তর নিয়েছে। গুরু বলেছেন, তিনি সর্ব্বময়, বিশ্বাস রেখ; আমাতে তিনি আছেন, বিশ্বাস রেখ। রাজকন্যা বললে, আমার সে বিশ্বাস আছে। গুরু বললেন, তোমার বিশ্বাস আছে আমি ভগবান্? সে বললে, হ্যাঁ আছে। গুরু জিজ্ঞেসা করলেন, আমি যা বলব করতে পারবে? রাজকন্যা বললে, হ্যাঁ পারব। একদিন গুরুদেব সন্ধ্যার সময় রাজকন্যাকে বললেন, একা আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারবে? সে বললে, হ্যাঁ পারব। গুরু বললেন, কাউকে সঙ্গে নিতে

পারবে না। রাজকন্যা বললে, আপনার সঙ্গে যাব, আবার কাকে সঙ্গে নেব? গুরু বললেন, আচ্ছা চল। এই বলে রাজকন্যাকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়েছেন। গল্প করতে করতে এক নিবিড় বনের মধ্যে অনেকদূর এসে পড়েছেন। হুঁস নেই। অন্ধকার রাত্রি। সামনে দেখেন একটা তেমাথা পথ। তিন দিকে রাস্তা। কোন্ দিকে যাবেন ঠিক্ করতে পাচ্ছেন না। পথ ভুল হয়ে গেছে। গুরু বললেন, দেখ রাজকন্যা, গল্প করতে করতে অনেক দূর এসে পড়েছি। পথ ভুল হ'য়ে গেছে। রাত্তিরও অনেক হয়েছে। তোমার অল্প বয়েস, গায়েও বহুমূল্য অলঙ্কার। এ বড় ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে আবার দস্যু-ভীতি আছে। রাজকন্যা ভাবলে, গুরুদেব আমায় এখানে নিয়ে এলেন, আমার গায়ে সব অলঙ্কার, আবার দস্যু-ভীতি বলছেন, সঙ্গে লোকজনও নেই। গুরুদেবেরও ভুল হ'ল। এমন সময় দেখেন গুরু কাছে নেই। যেই অবিশ্বাস অমনি আর কাছে নেই। মনেই ত সব? মনে অন্য চিন্তা করাতেই দেখে আর নেই। ভাবলে গুরুদেব আচ্ছা ত! আমায় একা ফেলে দৌড় মারলেন! ফিরে চেয়ে দেখে একটা মস্ত যোয়ান, মাথায় পাগড়ী বাঁধা, হাতে প্রকাণ্ড লাঠী, তার দিকে রুখে আসছে। রাজকন্যার মহাভয় হ'ল, 'গুরুদেব একি করলে?' বলে কেঁদে ফেললে। তখন হঠাৎ জ্ঞানের উদয় হ'ল। ভাবলে, গুরুদেবের সঙ্গে এসেছি, আবার ভয়? এই না বলেছি, তাঁকে বিশ্বাস করি; তিনি না সর্ব্বময়। তবে এই কি আমার মা? এই ভেবে সেই ভীষণ মূর্ত্তিটাকে বলছে, তুমি কি আমার মা এলে? যেই জ্ঞান এসেছে, অজ্ঞান দৌড় মেরেছে। দেখে, মা চতুর্ভুজা, বরাভয়করা, মুণ্ডমালাগলে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাঁর পাশেই গুরুদেব।

বিশ্বাসই প্রধান। গুরুতে বিশ্বাস চাই। শুধু মন্ত্র নিলেই হ'ল না। তিনিই সব। ভাগবতে আছে, পিতাকে ভক্তি করলে স্বর্গসুখ হয়, মাতাকে ভক্তি করলে সংসারসুখ হয়, স্ত্রীকে ভালবাসলে লক্ষ্মী

প্রসন্না হন আর গুরুতে নিষ্ঠা থাকলে এক'টা ত হয়ই আবার কৈবল্য সুখও হয়।

বিশ্বাস থাকলে পরের কথা শুনবে কেন? অন্যে যদি গালাগালই দেয়, তুমি বিশ্বাস হারাবে কেন? ওটা তাদের প্রকৃতিগত। তাদেরও ঘৃণা করতে নেই। বুদ্ধের কথা আছে, কাকেও ঘৃণা করো না, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়-চিন্তা করবে না, অর্থ থাকে ত দান করো, আর জ্ঞানীর কাছে পরামর্শ নিও। কবীরের চারটী উপদেশ আছে, অহঙ্কারে বিপদ আসে, পাপে দুঃখ আসে, দানে ঐশ্বর্য্য আসে, আর উপেক্ষায় ভগবান্ আসেন।

জগতের সমস্তকে উপেক্ষা করতে পারলে দেখবে ভগবান্ তোমার কাছে। মহম্মদ বলেছেন, যেখানে ভয় আছে সেখানে ঈশ্বর নেই, আর যেখানে ঈশ্বর আছেন সেখানে ভয় নাই। তিনি বলেছেন, বিশ্বাসী হও, দেখবে তোমার পতাকা রোমের প্রাসাদের ওপর উড়বে। যদি বল অবিশ্বাসীদেরও উড়ছে; এখন উড়ছে বটে, পরে থাকবে না। বিশ্বাসীর পতাকাই জয়লাভ করে।

যুবক। এতটা বিশ্বাস কি ক'রে আসে?

ঠাকুর। এই জন্যেই দিয়েছে **গুরুর সঙ্গ**। তাঁর কথা অনুযায়ী কার্য্য। তাতে মনের ময়লা যায়। ভালবাসা আসে। এক আছে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে আপনি বিশ্বাস হয়। দেখা মাত্রই আপন বোধ হয়, বিশ্বাস আসে। আর আছে, গুরুর সঙ্গ। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে করতে ক্রমে বিশ্বাস আসে। গুরুতে ভক্তি হলে ঈশ্বর তফাৎ থাকেন না। **বাছুরকে টানলে গাই আপনি আসে।**

যুবক। কাছে মাঝে মাঝে এসে থাকতে হয়।

ঠাকুর। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে। এক যেয়ে থাকতে নেই। তাঁর বহুভাব। অবস্থা না এলে থাকতে নেই। বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়। এক এক জনের সঙ্গে এক এক রকম। সব ভাব বরদাস্ত করবার অবস্থা না এলে থাকতে নেই। হয়ত তোমার প্রকৃতির সঙ্গে

একটা মিলল না। অমনি সংশয়। ভক্তি বিশ্বাস টলছে। তাই মাঝে মাঝে থাকতে হয়। সব সময় কখন থাকতে পারে? যখন সর্ব্বস্ব সমর্পণ, নিজের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, তখন সব ভাব মিষ্টি লাগে। দেখ, শুকদেবেরই সংশয় এসেছিল তা তোমাদের ত কথাই নেই।

শুকদেব জনকের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা নিতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, জনক কতকগুলি সুন্দরী যুবতী মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় কোলে নিয়ে বসে আছেন। দেখেই ঘৃণা হ'ল। "এর কাছে উপদেশ নিতে যাব?" এই ভেবে ফিরে যাচ্ছেন। জনক বুঝতে পারলেন, অমনি ডাকলেন, "শুকদেব এস, কোথায় যাও?" জনক ডাকছেন, শুনে শুকদেব ফিরলেন। সঙ্গে একটা ঝুলি, উলঙ্গ অবস্থা। একটা অবস্থা সন্ন্যাসীদের হয়, ঝুলি নিয়ে ফেরেন, ভিক্ষা সম্বল। ঝুলিটা রেখে জনকের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। এমন সময় দূত এসে বললে, "মহারাজ, রাজ্যে আগুন লেগেছে।" জনক সেইখানে বসেই বলে দিলেন, "এই এই করগে।" সিদ্ধপুরুষদের সব চোখে ভাসে, যা করবার সব তখনি বুঝতে পারেন। তাই বলে দিয়ে আবার গল্প করছেন।

এদিকে অগ্নি-শিখা বাড়তে বাড়তে শুকদেবের ঝুলিটার ওপর এসে পড়েছে। তাই দেখে শুকদেব, তাড়াতাড়ি উঠে ঝুলিটা সরাতে যাচ্ছেন। জনক বললেন, "কি শুকদেব, কোথায় যাও?" শুকদেব বললেন, "আমার ঝুলিটা পুড়ে যাবে, সরিয়ে রাখি।" জনক বললেন, "তুমি ত আচ্ছা লোক; আমার রাজত্ব পুড়ে যাচ্ছে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করছি, আর তোমার ঐ ঝুলিটার জন্যে দৌড়ুচ্ছ!" শুকদেব দেখলেন, তাইত, এতবড় রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে, বসে আমার সঙ্গে গল্প করছেন, আর আমি ঝুলিটার মায়ায় দৌড়ুচ্ছি! বললেন, "আমার অপরাধ হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা করুন, ব্রহ্মবিদ্যা দিন।" জনক বললেন, "না, এখনও ঠিক্ বুঝতে পার নি। এক কাজ

কর ; এই এক বাটী তেল নাও, নিয়ে রাজ্যটা ঘুরে এস, যেন এক ফোঁটাও মাটিতে না পড়ে। এক ফোঁটা পড়লে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা দেব না। আর রাস্তায় কত গাছ আছে গুনে এস। দেখ' তেল যেন না পড়ে।" শুকদেব রাজ্য ঘুরে এলেন। জনক জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শুকদেব, ঘুরে এলে?" শুকদেব বললেন, "হ্যাঁ এসেছি।" "তেল পড়েনি?" "না, মোটেই পড়েনি।" "ক'টা গাছ গুনেছ?" শুকদেব বললেন, "ওই যা ভুলে গেছি, পাছে তেল পড়ে যায় সেই দিকে মন থাকাতে গাছ গুনতে ভুলে গেছি।" জনক বললেন, "শুকদেব! দেখে কে? মন। শোনে কে? মন। মন যদি তাঁর দিকে থাকে ত মেয়েই বা কি, পুরুষই বা কি? আর কাপড় পরাই বা কি, উলঙ্গই বা কি? আমার যদি মন তাতে না থাকে, তবে তাদের কাপড় থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? যাদের কুতে মন তাদের লজ্জা। মনে কু ওঠে, তা'ই আরোপ করে। সু, কু দুই মনে। চোখ শুধু বস্তুতে আরোপ করে।

ছোট মেয়ে যখন উলঙ্গ হ'য়ে কাছে আসে, তখন ত লজ্জা হয় না বা মনে কোন কুভাব ওঠে না। সেই মেয়েটী বড় হ'লে কেন হয়? ভেতরে কাম ভাব থাকলেই সেটা আরোপ করে। ভেতরে কু আছে, তাই কু ভাবে।

কাজেই গুরুর ওপর অগাধ ভক্তি বিশ্বাস না এলে সব সময় কাছে থাকতে নেই। তিনি এক এক ভাব নিয়ে এক এক জনের সঙ্গে খেলা করছেন। সব বুঝতে পারবে না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, তুমি আমার কাছে আছ বটে, কিন্তু তুমি আমায় বুঝতে পার নি। চিনতে চাও ত সাধনা কর। যশোদা কৃষ্ণকে ছোট থেকে মানুষ করলে, কই চিনতে পারলে? ননী চুরি করতে গেলে তাড়া দিচ্ছে। রাধিকা সব সমর্পণ করেছিল তাই সব ভার নিয়েছে। যশোদার এক ভাব, বাৎসল্য-ভাব। তার এদিক ওদিক হ'লে মন খারাপ হ'চ্ছে। আর গোপীদের ত নেওয়া নেয়ি নেই, তারা কৃষ্ণে ডুব দিয়েছে। জলে ডুব দিলে আর

দেখা যায় না। জল নোংরা কি ভাল, কাল কি সাদা, ভাববার আর অবসর নেই। তারা ডুব দিয়েছে।

গুরুর কাছে কিছু সময় থাকবে। তাতে শক্তি বাড়বে, সংসার ভাল করতে পারবে।

দুই রকম সংসার আছে। এক চোখ বুজে, আর এক চোখ তাকিয়ে। তাকিয়ে যে সংসার করে সংসার তার অধীন; সব দেখতে পায়। আর চোখ বুজে যে সংসার করে সে সংসারের চাকর সেজে আছে।

যুবক। নির্জ্জনে সাধনা করা উচিত?

ঠাকুর। নির্জ্জন মানে ত অন্য কিছুই নয়, মন স্থির হ'লেই নির্জ্জন। গুরু-সঙ্গে মন স্থির হয়; তাতে বৈষয়িক চিন্তা গিয়ে সৎ-চিন্তা আসে। নইলে মৌনী থাকলে কি হবে? তা'হলে বোবারাও ত মৌনী। প্রাণে সব খেলছে, মুখে কথা কইতে পাচ্ছে না। যে মন স্থির করেছে, মনে বাজে চিন্তা ওঠে না, সেই মৌনী।

যুবক। মন স্থির কি ক'রে হয়?

ঠাকুর। গুরুর উপদেশে চলা। এক আছে পূর্ব্ব সংস্কারে স্বতঃ হয়। আর নয় সাধনা। তাঁর সঙ্গ। তাঁতে ভক্তি, বিশ্বাস। হাত যদি কেবল ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখ ঠাণ্ডাই অনুভব হবে। আগুন পাবে কোথায়? গুরু মন দখল করে নিলেন। অন্য জিনিষ আসতে পারবে না। সৎএ মন দিলে সৎ-চিন্তাই উঠবে। ঠিক্ ঠিক্ বিশ্বাস থাকা চাই, নয় ত মন চারিধারে ঘুরবে।

যুবক। গুরুর মন্ত্রে কি তা করে না?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তা হয়। তবে সাধনা চাই। আগুনের শক্তি রয়েছে, যদি পাখার বাতাস দাও তবে জ্বলে উঠবে। তা না ক'রে যদি জল ঢাল, তা কি ক'রে হবে? না নিভতে পারে, কিন্তু জোর হবে না। এজন্যে বাতাস, সাধনা।

চাষারা জমিতে চাষ দেয়, কত তদ্বির করে, তবে বীজ ফেলে। গাছ

হল, ধান ফলল ; তবু আগাছায় মেরে দেয়। তাই আগাছা মারে। আগাছা মারাই বিশেষ দরকার।

এই জন্তে সঙ্গ। গুরু ঐ আগাছা মেরে দেন। দিনে যত কাজ কর সেটা রাত্তিরে মনে ওঠে। মন স্থির হয় না। মন সংস্কারগত ; যেটা ভাবে, সেটারই ছাপ লাগে। তাই সর্ব্বদা ব্যবহার রাখলে সেই চিন্তাই উঠিয়ে দেবে।

পুত্তু। তাঁকে ডাকলে বাসনা ক্ষয় হয়। আবার বাসনা পূর্ণ না হ'লে নাকি নিবৃত্তি হয় না ?

ঠাকুর। ডাক ত দু'রকম আছে। এক—মা সন্দেশ দাও, দিলেন, সন্দেশও খাওয়া হ'ল ডাকও বন্ধ ; আর—মাকে পাবার জন্যে ডাকছি, যতক্ষণ না পাই ছাড়ব না।

পুত্তু। অন্য জিনিষের জন্যে ভেতরে ইচ্ছা রইল, আর তাঁকেও ডাকছি।

ঠাকুর। তাঁকে ডাকছ কেন ?

পুত্তু। অমনিই।

ঠাকুর। অমনি কি ক'রে হবে ? ভেতরে রইল এটা (বাসনা) বড়। কি ক'রে ডাকলে ?

পুত্তু। বলব না।

ঠাকুর। মনে রাখলেই ত বলা হল।

পুত্তু। তবেই ত মুস্কিল, যা তা খেয়াল হ'ল।

ঠাকুর। তিনি ভুল বুঝিয়ে দিতে পারেন। এ সব খণ্ড বাসনা। মনে হ'ল টাকা বড়, তিনি বুঝিয়ে দিলেন—এ নোংরা। আবার কিছু দিতেও পারেন।

বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে বলেছিলেন, 'তুমি কালী কালী করতে বল, আমার মা ভাই খেতে পাচ্ছে না। কালী টালী বুঝি না, আমার টাকা চাই।' তিনি বললেন, 'ওরে আমি কি করব ? আমি মাকে বললুম, তা মা বললেন,—তোর মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বেশী হবে

না।' তবুও ছাড়ে না, তাই বললেন, 'আচ্ছা যা, আজ মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি।' তিনি গেলেন, যাবার সময় মনে করলেন, খুব টাকা টুকি চেয়ে নেব। গিয়ে মন কি রকম হ'য়ে গেল। বিবেক বৈরাগ্য চেয়ে বসলেন। ফিরে এলে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে? কি চাইলি?' বললেন, 'ভাবলুম টাকা চাইব, তা মার কাছে গিয়ে মন কি রকম হ'য়ে গেল। মার কাছে টাকা চাইব! তা এ ত সবাই ভোগ করছে। মার কাছে চাইব, একটা ভাল জিনিষই চেয়ে নিই। তাই বিবেক বৈরাগ্য চাইলুম।' পরমহংসদেব বললেন, 'বেশ করেছিস্, তোর উপযুক্তই চেয়েছিস্।'

পুস্তু। আবার ভয় হয়, বাসনা পোরাতে গিয়ে তাঁকে ভুলে যাই।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাঁকে ধরতে হয়। বাসনা উঠুক ক্ষতি নেই, মূল ধর; তিনি বুঝে নেবেন।

যুবক। তাঁকে পাবার চেষ্টা কি বাসনা নয়?

ঠাকুর। চাওয়া মানে পাও নি। সে বাসনায় দোষ নেই। 'অকাম বিষ্ণুকাম বা'।

পরমহংসদেব বলতেন, হ্যালঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয় আর মিশ্রি মিষ্টির মধ্যে নয়। শাক অপকারক, কিন্তু হ্যালঞ্চে শাক ভাল। সন্দেশ খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিশ্রিতে হয় না। দোষটা নেই অথচ মিষ্টি।

যুবক। গুরুর উপদেশানুযায়ী কাজ করতে করতে বিক্ষিপ্ত মন একদিকে আসে।

ঠাকুর। মন সরষের পুঁটলি। যদি ছড়িয়ে দাও, কুড়ান মুস্কিল। একবার কুড়িয়ে পুঁটলি বাঁধতে পারলে এক জায়গায় থাকবে।

যুবক। সে কি ক'রে হয়?

ঠাকুর। কাজ করতে করতে হয়। আর ভালবাসায় হয়।

পুস্তু। শেষেরটাই সোজা।

ঠাকুর। বটে, তবে মনটা রাখা চাই। ভালবাসা আত্মযোগ; ঠিক্ ঠিক্ মন দিতে হয়।

পত্তু। একটু এদিক ওদিক হ'লে?

ঠাকুর। যোগ ঠিক্ ঠিক্ করতে না পারলে কি স্কুলে মার্ক পাও? যে রকম দেবে, সে রকম পাবে। আট আনা দাও আট আনা পাবে, চার আনাতে চার আনা, ষোল আনা দিলে তবে হবে।

এই বলিয়া গান ধরিলেন :—

ভালবাসা শুধু আত্মযোগ।
চাই এই সুযোগে সেই যোগেতে কায়-মন-প্রাণ সুসংযোগ॥
স্থূলে দেখ জায়াপতি, রতিতে পায় একই মতি,
আলিঙ্গনে দুই যেন এক, একই প্রাণে একই ভোগ॥
চর্ম্মরোগে পড়ে যারা, হয় যোগ-মর্ম্মহারা,
তারাই বলে ভালবাসা যোগ নয়, বিয়োগ রোগ॥
পালে যারা সত্য-ধর্ম্ম, সার না ভাবে স্থূল কর্ম্ম,
জেনে তারা সার মর্ম্ম করে না আর অভিযোগ॥

তাঁর কাছে যেতে হ'লে সাধনা চাই। মহম্মদের আয়েষা নামে স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঈশ্বরের পুত্র, তুমি উপাসনা কেন করছ? মহম্মদ বললেন—তাঁর (ঈশ্বরের) প্রসন্নতা না এলে তাঁর পুত্র হ'লেও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। দেহ ধারণ করলে সকলকেই উপাসনা করতে হয়।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালার পর ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরা ধ্যান করিতেছেন।

গদাধর-আশ্রম হইতে দুইটী ব্রহ্মচারী আসিয়া বসিলেন।

কালীবাবু। গুরু আর ইষ্ট কি এক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, গুরু ইষ্টে সমভাব ভাল জিনিষ। অদ্বিয়ের

মধ্যে ঠাকুর আছেন, তাতেই ভগবান্ থাকেন ত। সংস্কারগত ব'লে আলাদা ধরা। তাই বলেছে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো-মহেশ্বরঃ।"

কালীবাবু। গুরুতে ইষ্ট দর্শন হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, হয়।

কালীবাবু। তবে ইষ্ট আবার আলাদা কেন?

ঠাকুর। সংস্কারগত মন ব'লে। দু'পা দু'হাত ওয়ালা মানুষের ওপর অতটা বিশ্বাস রাখা ত যা তা নয়। তাই ইষ্ট আলাদা। বই প'ড়ে বলা যেতে পারে। ঠিক্ ঠিক্ বিশ্বাস রাখা শক্ত। মনের উচ্চতা এলে অবশ্য হয়। ঠিক্ ঠিক্ বোধ আসে, ইষ্ট আলাদা দরকার হয় না।

গল্পেই ত আছে, ভগবান্ আগে দর্শন দিলেন না। গুরু আগে হ'ল, তার পর। মানে ত আর কিছুই নয়। দেখ, ওপর শক্তি আগেই পাওয়া যায় না, গুরুতে মন রাখলে ক্রমে সে অবস্থা আসে। ধ্রুব পরে দেখলে, নারদও যাতে ভগবান্‌ও তাতে। দেখ, বাছুর টানলে গাই আপনি আসে। গাই বাছুর আলাদা নয়। ছেলে মা একই নাড়ীর যোগ। নাড়ী কেটে আলাদা কর বইত নয়।

শিখদের গুরুতেই সব। আলাদা কিছুই নেই। 'রাধা-স্বামী'দেরও তাই। বৌদ্ধদেরও দেখ, বুদ্ধ ছাড়া কিছুই নেই। তবে সাধারণ মায়ার জীব, বহুরূপে মন আকৃষ্ট হ'চ্ছে, এই স্বভাব। তাঁর ভাবে চট্ ক'রে যায় না।

কালীবাবু। সাধারণতঃ যাকে সামনে দেখে তাকে ভালবাসে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, ব্যবহারে ভালবাসা হয়। গুরুর সঙ্গে, ব্যবহার, তাঁতে ভালবাসা জন্মে।

কালীবাবু। ইষ্ট কেন?

ঠাকুর। সংস্কারানুযায়ী বিশ্বাসের তারতম্য। ভালবাসা এলেও বিশ্বাস আসে না। দুইই না হ'লে ত হবে না, তাই আলাদা ইষ্ট।

কালীবাবু। গুরুর চিন্তা, ধ্যান করলে, আবার আলাদা ইষ্টের ধ্যান দরকার ?

ঠাকুর। আবশ্যক নেই। তবে সাধারণ সেটা গুরুতে আনতে পারে না। অর্জ্জুন সর্ব্বদা কৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছে, তবু বিশ্বরূপ দেখে কাঁপছে, বলছে—তোমার সখা ব'লে কত ঠাট্টা করেছি, ঠিক্ ব্যবহার করিনি, আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা কর। তাইত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, অর্জ্জুন, তুমি আমার সঙ্গে আছ বটে, কিন্তু আমাকে এখনও পাও নি।

কালীবাবু। ভ্রম ত তিনি ভেঙ্গে দিতে পারেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তিনি পারেন বটে; তবে সব অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ। বালক বালকের অবস্থাতেই থাকবে। যৌবন না এলে বালকত্ব যাবে না। তিনি অবশ্য যৌবন এনে দিতে পারেন। কিন্তু তা সাধারণ নিয়ম নয়। নিয়ম হ'চ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠ্‌তে হবে। তিনি ইচ্ছা করলে অমনিও তুলে নিতে পারেন; কিন্তু সেটা নিয়ম নয়।

গীতাতে অর্জ্জুনকে বলছেন—উত্তিষ্ঠ, বধ। যুদ্ধ প্রভৃতি এত কাণ্ড কারখানা কেন ? উনি ত ইচ্ছা করলে সব শেষ ক'রে দিতে পারতেন।

কালীবাবু। ধরা না দিলে ত ধরতে পারি না।

ঠাকুর। ধরা দেবার ব্যবস্থা সব করেছেন। যা দিয়ে ধরবে তা ঠিক্ রাখতে হবে, তবেত ধরবে ?

কালীবাবু। তাঁর ইচ্ছাতে সবই ত হয়।

ঠাকুর। তবে তাঁর ঘাড়ে সব ফেলে দাও। তোমার চিন্তা কেন ?

কালীবাবু। সংশয় তিনি দিচ্ছেন যে।

ঠাকুর। সংশয় তিনি দিচ্ছেন না। সেটা প্রকৃতিগত। তিন রকম প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজ আর তম। গীতায় আছে, "কাম এষ, ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।" গুণজ ধর্ম্ম। ইচ্ছা না থাকলেও জোর করে নিয়ে যায়।

কালীবাবু। সব ত জানি, মন ত তবু বোঝে না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, গুণজ ধর্ম্ম। রজোগুণে কাম। কাম মানে কামনা। কামনা অপূরণে ক্রোধ। সত্ত্ব আসলে তবে জ্ঞানের উদয় হবে। রজ আসলে উদ্যম, অশান্তি, স্পৃহা। কর্ম্মে আসক্তি; প্রবল ইচ্ছা। পূরণ না হ'লেই দুঃখ, অশান্তি। আর তমোগুণে শোক, মোহ, ভয়। তাই অর্জ্জুন বলছেন—

এই সব ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন; এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? আর স্বজন, গুরুজন বধ ক'রেই বা কি হবে? কুলস্ত্রী নষ্ট হবে; বর্ণসঙ্কর হবে। তার চেয়ে দরকার নেই রাজ্য নিয়ে; আমি বনেই যাব। কৃষ্ণ বলছেন, অর্জ্জুন, তুমি জ্ঞানীর মত কথা বলছ বটে, কিন্তু তোমার সে অবস্থা নয়। সত্ত্বগুণীর মত কথা বলছ, কিন্তু তোমার সত্ত্বগুণ নয়; তমোগুণে ছেয়ে ফেলেছে। শোক, মোহ, এসেছে। তুমি বললেও হবে না, তোমার প্রকৃতি কাজ করবে। বনে যাবে বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনাদি এরা যখন ঠাট্টা করবে, তখন থাকতে পারবে না। তাই এ সব রেখে দাও। যা অবস্থা, সে রকম কাজ কর। উত্তিষ্ঠ, বধ।

গোপেন আসিল।

ঠাকুর। এস, গোপেন এস।

কালীবাবু। ফেরাবার পথও ত তিনি।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাই সঙ্গ, সঙ্গে সব বদলায়। সত্ত্বগুণীর সঙ্গ করলে সত্ত্বগুণ বাড়ে, আপনিই আসে। রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ আর তমোগুণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়ে। এই-ই সাধারণ নিয়ম।

কালীবাবু। তাঁর কৃপা নইলে হয় না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাঁর কৃপা লাভ করলে অন্য জিনিষের আবশ্যক নেই। বললেই হবে না; ভালবাসা হ'তে পারে, স্থির বিশ্বাস শক্ত। বলতে পার; যতই ভাষা বল কাজে দাঁড়াতে পারবে না। ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। প্রকৃতি স্বতঃ কাজ করবে। বদলাবার জন্যে সঙ্গ, সাধনা। সংসারীদের সাধনা ক'রে যাওয়া কঠিন।

সব ছেড়ে একদিক ধরতে হবে। দেহ পণ করতে পারলে তবে সাধনা। সাধনা এ নয় যে দু'টো হরিনাম করলুম, দু'টো কালী-নাম করলুম আর সব মেরে দিয়েছি। তার নাম সাধনা নয়। দেহ যায় যাক বস্তু লাভ না হ'লে ছাড়ব না; এই হ'ল সাধনা। সব ছেড়ে এক লক্ষ্য হ'তে হবে। চারিদিকে মন থাকলে হয় না। পরম-হংসদেব বলতেন, কালীঘাটে কালী দর্শন করতে যাচ্ছ, মাঝখানে শুনলে, দান করা ভাল, দান করতে লাগলে। এ দিকে মায়ের ঘরের দোর বন্ধ হ'য়ে গেল। মায়ের দেখাই পেলে না। যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছ আগে সেটী সফল কর তারপর অন্য কাজ। সব অবস্থাতে তাঁতে মন ঠিক্ রাখতে হবে। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু মানাপমান বর্জ্জিতম্। তবেই সাধনা। দেহকে মেরে ফেলতে হবে। দেহেতে আসক্তি থাকলে মন স্থির হবে না, ভয় যাবে না। বললেই ত হবে না।

তুলসীদাস বলছেন,—

সত্যবচন, দীন ভাব, পরধন উদাস,
ইস্‌মে নহি হরি মিলে তো জামীন তুলসীদাস।

এত সবাই জানে। বাল্যশিক্ষাতেই পড়েছে, 'সদা সত্যকথা বলিবে, কুবাক্য বলিও না।' কিন্তু যে মাষ্টার পড়াচ্ছে সে ছাত্রের সামনেই মিথ্যা কথা বলছে। তখনই বলছে। বাপ ছেলেকে বলছে সত্য কথা বলতে, আবার ছেলের সামনেই দু'শ গণ্ডা মিথ্যে বলছে। এ ত জানে তবে সবাই পারে না কেন?

গোপেন। ভগবানে বিশ্বাস নেই ব'লে পারে না।

ঠাকুর। এ ত বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ; ভগবান্ ত আলাদা। সবাই যে ভগবান্ মানবে তার ত মানে নেই। জ্ঞানী ভগবান্ মানে না, কিন্তু সত্য কথা ত মানে। বাক্য ত রক্ষে করতে হবে। ভগবানকে বিশ্বাস না করলেই কি কথা আছে যে, একজনকে মারতে হবে? নিজের ছেলেকে মারলে কষ্ট হয় এ বোধ ত আছে। দু'টো

বল আছে। এক ধর্ম্মবল আর এক নীতিবল। ধর্ম্মবল না হ'লেই বা, নীতিবল ত ধরবে। সংসারে নীতিবলই বড়।

গোপেন। সংসারে চাণক্য নীতি।

ঠাকুর। সবাই ত চাণক্য মানবে না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' সবাই চায় না। সংসার ত দু'রকম আছে। এক হল সংসারের অধীন হ'য়ে সংসার করা। সে যেন তেন প্রকারেণ সংসার করে। সংসারটাই তার কাছে বড়। আর আছে সত্যে ঠিক্ থেকে, সংসারকে অধীন ক'রে সংসার করা। সৎ, চিৎ, আনন্দ। একটা ঠিক্ থাকলেই আর সব আসবে। তাই তুলসীদাস বলেছেন, সত্য বচন, দীন ভাব, পরধন উদাস, ইস্‌মে নহি হরি মিলে তো জামীন তুলসীদাস।

কিন্তু কই পারে কই? দেখ, বাসনা-কামনা থাকতে অভাব যায় না; যতই লেকচার (Lecture) দাও অভাব থাকবেই। কারও কম, কারও বেশী। ধনীর না হয় লাখ টাকার অভাব; গরীবের দু'এক পয়সার অভাব; অভাব আছেই। অভাব থাকতে ভয় যাবে না। ভয় থাকতে সত্য কথা বেরুবে না।

গোপেন। যুধিষ্ঠিরের কি ভয় ছিল? তিনি বললেন যে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।'

ঠাকুর। ছিল বই কি, নইলে নরক দর্শন হ'ল কেন? তিনি কৃষ্ণে বিশ্বাস রেখে 'অশ্বত্থামা হত' বললেই পারতেন। আবার 'ইতি গজ' লাগালেন কেন? আর নয় ত না বললেই পারতেন। আমি মিথ্যা বলব না। কৃষ্ণই হ'ন আর যিনিই হ'ন, আমার কি? তাও নয়; কৃষ্ণে বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় নেই, আবার ভাইদের মায়াও আছে। না বললে মারা যায়; দু'নৌকায় পা দিলেন। 'ইতি গজ' লাগিয়ে দিলেন। তাই নরক দর্শন।

আর 'দীন ভাব' বললেই হবে না। প্রণাম করলেই দীন ভাব হয় না। কেরাণী বাবুরা আপিসে গিয়ে সাহেবকে সেলাম ঠোকে, বাইরে এসে যা তা বলে। দীন ভাব হ'চ্ছে মনের নম্রতা। অহঙ্কার

থাকতে ঠিক্ ঠিক্ দীন ভাব হবে না। আর 'পরধন উদাস' অর্থাৎ পরের ধনে উপেক্ষা। পরের ধনে মনকে আকর্ষণ করায় কারা? রিপুরা। দুটো ধর্ম্ম আছে—স্বধর্ম্ম আর পরধর্ম্ম; স্বধর্ম্ম হ'চ্ছে আত্মার ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম হ'চ্ছে রিপুর ধর্ম্ম। তাই পরধর্ম্মে অর্থাৎ রিপুর ধর্ম্মে উদাসীন থাকবে।

অসিতা আসিল।

ঠাকুর। এস, অসিতা এস।

গোপেন। একজন যদি মিথ্যাকেই ধর্ম্ম ক'রে নেয়?

ঠাকুর। সে আছে রাঁধুনীর রান্না ধর্ম্ম, চোরের চুরি ধর্ম্ম। সেটা ব্যবহারিক।

প্রকৃতিগত একটা আছে। পশুর পাশব, মানুষের মনুষ্য ধর্ম্ম, এ আছে। তবে **যার দ্বারা অধর্ম্ম নষ্ট হয়, সেই ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম্ম**। তারপর আছে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দু'এর পার—

"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।

যদি না মানে প্রবোধ (মনরে আমার) জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥"

তখন স্থায়ী শান্তি আসবে। আর সাধারণ ভক্তি, ভালবাসায় বিচার আসে, 'এতে ভাল হবে, এতে মন্দ হবে।' তখন বিচার ক'রে অবিদ্যা বাদ দিতে হয়। আর সে অবস্থা এলে বিচারশূন্য। জ্ঞানীর অবস্থা, আর পূর্ণ ভালবাসার অবস্থা এক।

গোপেন। জ্ঞান, ভক্তি একসঙ্গে এলে ভাল।

ঠাকুর। জ্ঞান কি? নিজেকে জানার নামই ত **জ্ঞান**। আর ঈশ্বরকে জানার নাম **ভক্তি**। সেও ত তুমি, আবার তুমিই সে। একই জিনিষ। আমিই সেই এই জ্ঞান। তুমি নিজে ঘরে উঠলে আর অপর একজন ধরে তোমায় উঠিয়ে নিলে। একই ত।

গোপেন। ভক্তিটা সোজা বটে।

ঠাকুর। সোজা এই জন্যে, দেহ, পরিবার, ছেলে, মেয়েতে মন আছে, ভালবাসা আছে, তাই ভক্তিই সহজ। জ্ঞান আসবে

কোত্থেকে? দেহাত্ম-বুদ্ধি না গেলে কি জ্ঞান আসে? সাধারণ এক জ্ঞান আছে। পাখীর পাখীত্ব, পশুর পশুত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব, এ সাধারণ জ্ঞান। ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞান দেহাত্ম-বুদ্ধি না গেলে হয় না। মুখে বলবে দেহ অনিত্য, অথচ তারি যত্ন দিবারাত্রি করছ। যে অনিত্য তার এত যত্ন কেন?

গোপেন। নিত্যকে পাবার জন্যে। দেহ না থাকলে কি ক'রে পাব?

ঠাকুর। এই দেহই ত নয় শুধু; তার তিন অবস্থা দিয়েছে, স্থূল, সূক্ষ্ম, আর কারণ। তারপর মহাকারণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ সেটা স্থূল দেহ। আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। তখনও মন থাকে; যেমন হাওয়ায় ফুলের গন্ধ থাকে ফুল কিন্তু থাকে না।

গোপেন। দেহ না থাকলে ভোগ হয় কি ক'রে? ভোগ কি সূক্ষ্ম শরীরে হয়?

ঠাকুর। কেন হবে না? ভোগ কিসে হয়? ভোগ ত হয় মনে। ঘুমুচ্ছ, পাশে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে, ভোগ করতে পার? মন নইলে ভোগ হয় না। মন রইল, কাজেই ভোগ হবে।

গোপেন। কি রকম হ'ল তা'হলে? সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। অথচ ঘ্রাণে ভোগ হয়। দেব উদ্দেশ্যে নিবেদন করছ, দেবতা কি এসে খান? পিতৃ উদ্দেশ্যে দিচ্ছ, কি ক'রে হ'চ্ছে? সাধু গুরু আছেন, মনে মনে চিন্তা করলে তিনি সব জানেন। ভক্তিভাবে মনের সহিত কোন জিনিষ নিবেদন করলে তিনি দূরে থাকলেও তাঁর জিহ্বায় সে তার'পান।

গোপেন। জ্ঞানের দরকার ত?

ঠাকুর। অজ্ঞানতা গেলে ত জ্ঞান হবে? জ্ঞান ত দু'রকম আছে। এক সাধারণ জ্ঞান। হাকিমী করছ, এ পক্ষের উকীল ও পক্ষের উকীল যা বললে শুনে, তারপর আসামী বাদী শুনে একটা ক'রে

দিলে। আর যদি সে জ্ঞান ফুটে ওঠে, দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি এই যা বলছি তোমার হয়ত ভাল লাগল ; বাইরে গেলে আর একজন আর একটী বুঝিয়ে দিলে, ভাবলে সেটীই ভাল। কোন্‌টী ভাল, বেছে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই।

"আচার্য্যের উপদেশে জনমে জ্ঞান,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া পার্থ জনমে বিজ্ঞান।"

বল্‌লুম, ভগবান্ আছেন, ভাবলে, 'হ্যাঁ ঠিক্'। বাইরে বেরুলে, আর একজন বললে, 'কিছুই নেই'। তুমিও বললে, 'নেই'। কারণ, এটাতেও অন্ধ, সেটাতেও অন্ধ। দু'য়েরই বোধ নেই। তবে যেখানে বিশ্বাস, ভক্তি এসে পড়ে, সেখানে তাঁর শক্তি কাজ করে, অপর শক্তি কাজ করতে পারে না। নইলে কি শক্তি আছে উপদেশ অনুযায়ী চল? সদ্‌গুরু লক্ষ্য রাখবেন, সব আগাছা মেরে দেবেন। এক হ'চ্ছে বাপের ধর্ম্ম আর গুরুমহাশয়ের ধর্ম্ম। গুরুমহাশয় ত স্কুলে পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন। তারপর ছাত্র যা খুসী তাই করুক। আর বাপের ধর্ম্ম ; পিতা জানেন যে ছেলে খারাপ হ'লে তারই অশান্তি। তাই তার সব খবর তাঁকে রাখতে হয়। সদ্‌গুরু পিতার চেয়েও আপন। তিনি যা ভাল তাই বলবেন, করিয়ে নেবেন। সদ্‌গুরু ত সন্দেশ খাওয়া টাকা নেওয়ার জন্যে নয়। তাঁরা কারও ওপর আশা রাখেন না, তাই খোসামোদ করেন না। যা ঠিক্ তাই বলবেন।

গোপেন। গুরুর কাজ হ'চ্ছে মুখে তুলে দেওয়া, গেলা শিষ্যের কাজ।

ঠাকুর। সদ্‌গুরু না গিলিয়ে ছেড়ে দেন না। এমন ক'রে দেন, না গিলে থাকবার জো নেই। পরমহংসদেব বলেছেন, "গুরু তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম।" যে গুরু মন্ত্র দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যান, আবার টাকা নেবার সময় আসেন, এ অধম গুরু। আর এক আছে, মন্ত্র দিয়ে বোঝান, এটা করো ভাল হবে, এ হ'ল মধ্যম গুরু। আর আছে উত্তম গুরু, তিনি করিয়ে ছেড়ে দেন।

সংসারী গুরু কি রকম জান? তাঁরও টাকার দরকার; তিনি টাকার জন্যে শিষ্যের কাছে দৌড়চ্ছেন, শিষ্যও সাহেবের কাছে দৌড়চ্ছে। দু'এরই সমান অবস্থা, কি আর করে। কথক যেমন মুখে বলছে, রাজরাণীর ছেলে, অথচ টাকার জন্যে সামনে একটি রেকাব পাতা। তুমি রাজরাণীর ছেলে এই যদি জান তবে রেকাব কেন?

গোপেন। তিনি দেবেন বলে?

ঠাকুর। তিনি বাক্সেও ত দিতে পারেন। রেকাবের কি দরকার? এ হ'ল সাধারণ গুরু। তাঁদের ওই ব্যবসা। তবে তাঁদেরও কিছু দেওয়া উচিত।

কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকতে ঠিক্ ঠিক্ সে ভাব হয় না। মায়ার আকর্ষণ! তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দ্বার,
এরাই গাণ্ডীব-ধারী, আত্মজ্ঞান-নাশকারী,
এ তিনে হে অর্জ্জুন কর পরিহার।

কামিনী অর্থাৎ স্ত্রীলোক, যাতে কামের কার্য্য হয়। প্রথম এর থেকে দূরে থাকতে হয়। তাই তিন প্রকার সাধনা,—**পশ্বাচার, বীরাচার** আর **দেবাচার**। **পশ্বাচার** হ'চ্ছে, পশু যেমন শত্রু দেখলেই দূর থেকে ভয়ে পালায়, তেমনি লোভ আছে, কাজেই প্রলোভনের জিনিষ থেকে দূরে থাকবে। সন্দেশে লোভ আছে, সন্দেশের দোকানে বসে জপ করো না; সেদিকে মন যাবে। তাই দূরে বসে করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চনে আকর্ষণ আছে, কাজেই তাদের থেকে দূরে থাকবে। অবস্থা তৈরী হ'লে কাছে থাকতে পার।

আর আছে **বীরাচার**, অবস্থার উন্নতি হ'লে হয়। রিপুর জিনিষ থাকবে অথচ কার্য্য থাকবে না। তাই আছে—

রসিক রসিক সবাই কহে, ক'জন রসিক হয়।
ভাবিয়া দেখিলে রসিক সুজন কোটীতে একটী রয়॥

গোপত পিরীতি গোপতে করিবি, সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবেত রসিকরাজ॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, শ্রীগুরু-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ী॥

বীর মানে, শত্রু দেখে ভয় খাবে না। শত্রু হ'চ্ছে রিপুগণ। পঞ্চ 'ম'কার—মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন আর মুদ্রা। এ ক'টাই বড় প্রলোভন। এর হাত থেকে রক্ষা পেলে আর কিছুরই ভয় থাকে না। সন্দেশে যদি লোভ না থাকে তবে পোড়া গুড়ে আর কি করবে? এই পাঁচটীর থেকে মন তুলে নিতে হয়। মনেই ত ভোগ করে। সোনার সিংহাসনে ঘুমিয়ে থাকলে কি বোধ থাকে? বীরাচার আসলে তখন সব কামিনীতে মাতৃভাব। "ত্রিজগত মায়ের মূর্ত্তি জেনে কি মন তাও জান না?"

এ বললেই ত হবে না। সে একটা অবস্থা। তবে সদ্‌গুরুর কৃপায় সব হয়। আবার তিনি শক্ত করবার জন্যে সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। লড়াই না করলে কি যোদ্ধা হয়? ঘরের মধ্যে তলোয়ার খেলে কি হবে?

গোপেন। হ্যাঁ আছে, ডন কুইক্সোটের (Don Quixote) গল্প। তিনি নিজের ঘরে তলোয়ার খেলতেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ, অনেকে গা বাজাতে জানে, তবলা দিলেই বিপদ। কাঠে ধপাধপ ধপাধপ করছে, তবলায় উঠছে না। তা হবে না। এ পাঁচটাতে যার ভয় নেই, সেই বীর। তখন সব তাতে তাঁর ভাব পাবে।

"জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে ঘরে ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখনা।"

আর **দেবাচার** হ'চ্ছে,—এ পাঁচটী ভেতরে, বাইরে নয়। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি, সহস্রারে পরমাত্মা পরম শিব। তার থেকে রমণ অবস্থা হয়। দ্বিদলে সুধাভাণ্ড আছে, সুধা স্খলিত হয়। সেই সুধাপানে সাধক পরমানন্দে থাকেন। আর "জয়কালী জয়কালী

বলে বলি দাও ষড়রিপুগণে।" আর মুদ্রা হ'চ্ছে আসন,—সিদ্ধাসন, বদ্ধপদ্মাসন, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ইত্যাদি চৌরাশি রকমের আসন আছে। তবে স্থির সুখমাসনম্; যে ভাবে স্থির হ'য়ে বসে ডাকা যায়।

কিন্তু সংসারীদের পক্ষে এ সব সাধনা নয়। তাদের ভক্তিযোগই ভাল। বায়ুক্রিয়া ক'রে যোগ তাদের জন্যে নয়। ক্ষয় বন্ধ না হ'লে বায়ুক্রিয়া হয় না। তাতে ব্যাধি হয়। সংসারীর পক্ষে ভক্তি, ভালবাসা, আর সঙ্গ। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি, ২৪ ঘণ্টা তাদের দিয়ে ব্যবহার, তাই মন নেমে যায়। মাঝে মাঝে সদ্‌গুরু-সঙ্গ চাই। হাতীকে চান করিয়ে ছেড়ে দিলে, আবার কাদা মাখছে। তাই মাহুত বেঁধে দেয়। সেই জন্যে গুরু-সঙ্গ।

মেয়েদেরও সাধন চাই। যাদের নিয়ে ২৪ ঘণ্টা ঘর করতে হবে তাদের ভাল হওয়া চাই। যা তা নয়, আত্মযোগ। তার ভেতরেরটা তোমার ভেতরে আসবে। তোমার চেয়েও তার পবিত্রতা বেশী চাই। আল না বেঁধে জমীতে জল ঢেলে কি হবে? সব ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাই চাই আগে আল বাঁধা। তাই তোমাদের খুব কড়া বলব, তাদের নরম। কারণ শক্ত বললে দাঁড়াবে না। দরকার দাঁড় করান, ভেতর সাফ করা। সাফ না হ'লে কড়ায় ফল নেই। মায়া ভয়ানক জিনিষ। পার্ব্বতী শিবকে বলছেন, "তুমি যতই জ্ঞানের উপদেশ দাও, আমার মায়া বিস্তার করলে সব ভেসে যাবে।" তাই আগে যেটা মায়া সেটাকে ঠিক্ ক'ত্তে হয়, তবে ভিত্তি ঠিক্ হবে। অনেকের প্রাণে অত্যন্ত ভাব, বাড়তে দেবে না, ভেঙ্গে দিচ্ছে।; দেখ, মা সন্তান প্রসব করেন, তিনিও যে পরিমাণ সম্বন্ধ রাখতে পারেন না, স্ত্রীতে তার বেশী রক্ষা করে।

আশু। স্বামীর ওপর ভক্তি রেখে তার অসৎ কর্ম্মে সাহায্য করলে স্ত্রীর পাপ হবে না কি?

ঠাকুর। তা হয় না। তবে ঠিক্ ঠিক্ ভক্তি থাকলে স্বামী ফিরে যায়। যদি স্থির বিশ্বাস থাকে, তবে সাধ্য কি স্বামী কাছ থেকে নড়ে?

সাবিত্রী যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলে। যমের ক্ষমতা হ'ল না, প্রবৃত্তির কি ক্ষমতা আছে ?

আশু। তবু যদি সাহায্য করে ?

ঠাকুর। সে ত মায়া, ভয়। ভালবাসা নয়। ঠিক্ ভালবাসা হ'লে স্বামীকে ফিরতেই হবে।

পরে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা হইতেছে।

কালীবাবু। মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে এই বিশ্বাসে যে তা'হলে স্বর্গে যাবে। তা কি যায় ?

ঠাকুর। অন্যায়ের ফল অন্যায়ই হয়, অন্যায়ের ফল কখনও ন্যায় হয় না। একে বিশ্বাস বলে না। বোধ এবং বিবেচনা-শূন্যতা বলে। এতে মনুষ্য-বুদ্ধির অভাব আছে। তাই নিজে নিজেকে মারছে। ঠিক্ ঠিক্ বোধ এলে বুঝতে পারবে, এ ঈশ্বরবাক্য হ'তেই পারে না, কারণ সবই ঈশ্বরের সন্তান।

কালীবাবু। তাদের হিংসা, দ্বেষ রয়েছে।

ঠাকুর। তা ত আছেই ; একেবারে হিংসা গেলে কি আর মারা হয় ? সে আছে গীতাতে, হন্যমান হনন্তে, কে কারে মারে ? তাতে পাপ নেই। সে ত খুব ওপর স্তরের কথা। তখন নিজের মৃত্যুতে যে আনন্দ, অপরের মৃত্যুতেও সে আনন্দ। কিন্তু এই হিংসা, দ্বেষের ওপর যে কার্য্য হয়, সেটাতে জ্ঞানের অভাব। এজন্য এটা ধর্ম্মের মধ্যে হ'তেই পারে না। কারণ ধর্ম্ম অহিংসা। মনকে যাতে তৈরী করা হয় সেই ধর্ম্ম ; আর সব সাধারণ সংস্কার মাত্র।

গোপেন। সব যদি সংস্কার মাত্র হয়, তবে ত সব উল্টে দিতে হয়। সমাজ কিসে দাঁড়ায় ?

ঠাকুর। কেন ? অবস্থানুযায়ী মানুষকে চালাবার জন্যে ঋষিরা সব নিয়ম ক'রে গেছেন। সে সব মানতে হবে বই কি।

গোপেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, সমাজ evolution (ক্রম-বিকাশ) এরই ফল। আপনিই হয়েছে।

ঠাকুর। তাঁদের মতও তাঁরা ঠিক্ রাখতে পাচ্ছেন কই? আজ একটা বলেছেন, কাল সেটা বদলাচ্ছেন। এঁরা হলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি। চার যুগ নিয়ে কাজ করেছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এঁদের চোখের ওপর ভাসছে। কি হবে না হবে আগে লিখে গেছেন। আর ওঁরা (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা) কাল কি হবে জানেন না। আর নতুন কিছুই বলতে পাচ্ছেন না।

এঁদের সব শাস্ত্রেতেই রয়েছে, এঁরা চার যুগেরই ব্যবস্থা করেছেন। আবার মহাপুরুষেরা মাঝে মাঝে এসে দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী যা যা দরকার বদলে দিচ্ছেন। সংসারী মানুষকে বোঝাবার জন্যে তাদের বৃত্তিকে সৎ দিকে নিয়ে যাবার জন্যে মহাপুরুষরা এসেছেন।

প্রালব্ধ, আয়ু ইত্যাদির কথা উঠিয়াছে।

গোপেন। তেল থাকতেও বাতি নেবে। তবে প্রালব্ধ ঠিক্ কাজ করে কি ক'রে? ব্যতিক্রমও ত হয়।

ঠাকুর। দেখ, যখন যা হবার সময় হ'লে সে রকম বুদ্ধি তুলে দেয়। রাম সোনার মৃগ তাড়া করলেন, সীতাহরণ হ'ল। রাম বলছেন, 'এ হবেই, নয় ত আমার এ রকম ভ্রান্তি হ'ল কেন? সোনার কখন মৃগ হয়? এত জানি, তবুও ভ্রান্তি কেন?' তবে আছে, তেল থাকতেও বাতি নেবে: সেটাও প্রালব্ধে দেওয়া যে তেল থাকতেই নিভবে।

গোপেন। তবে তেল নিয়ে ব্যস্ত কেন?

ঠাকুর। স্থির ত থাকতে পারে না। দেহ ত যাবেই, তবে ওষুধ কেন? সাবধান-বুদ্ধি আছে। সাবধান-বুদ্ধি থাকতে সাবধান হ'তে হয়।

গোপেন। বোধ কি সব বিষয়ে হয়?

ঠাকুর। নির্ভরতা আসলে সব বিষয়ে বোধ হয়। অবস্থায় ওপর।

গোপেন। সব চরম বললে কি ক'রে হবে?

ঠাকুর। চরম বললে একটু করবে? দাঁড়াতে বললে বসতে পারবে; বসতে বললে ত শুয়ে পড়বে।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উঠিল। পণ্ডিত ৺বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী। তাঁহার বেদ, স্মৃতি ও দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বহু সভায় বিচারে জয়লাভ করিয়া তিনি 'শাণিত কৃপাণ' উপাধি পাইয়াছিলেন। ঢাকায় বাড়ী; দেড় মাস হইল দেহ রাখিয়াছেন। ঠাকুরকে খুব ভক্তি করিতেন। ৮৬ বৎসর বয়স হইলেও ঠাকুরকে দেখিবার জন্য প্রায় দিনই দূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেন। ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি ছিল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, 'মরবার সময় যেন যুগলরূপে দেখতে পাই।' ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ভক্তদেরও খুব ভালবাসিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। তাই বলিতেছেন, "পণ্ডিতটী মারা গেল। তার জন্যে মন কেমন ক'চ্ছে। গেল বার কাশী যাবার সময় কেঁদে কেঁদে বলেছিল 'দেখা হবে কি?' বড় ভাল লোক ছিল।"

সকলেই দুঃখ করিতেছেন।

৯॥০টা বাজিলে অনেক ভক্ত উঠিয়া গেলেন। ১০টার পর আরতি হইল। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—সপ্তম অধ্যায়।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১লা মে, ১৯২৬ ইং,

শনিবার, কৃষ্ণা-চতুর্থী।

কলিকাতা।

দেবস্থানে বলি, বিন্ধ্যাচলের ঘটনা—মৃত্যুর পর আত্মার গতি ও জন্মান্তরবাদ...স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মাদার ক্রিষ্টিনা (Mother Christina), জনৈক আমেরিকান ও বশীবাবু—বুদ্ধের কথা—পন্থা নানা ; মূল, এক—গুণত্রধর্ম্মের প্রভাব—ভগবান্ কর্ত্তা ও তাঁর স্বেচ্ছাচার কথার প্রতিবাদ—ঠিক্ ঠিক্ শান্তি—বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ—জ্ঞানী ও ভক্ত—মহামহিমা-শালিনের লক্ষণ—কবীরের উপদেশ—গুরু ও বিধাতাপুরুষের গল্প—সাধনা ও বই লেখা—ভোগ মনে ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর—সূক্ষ্ম শরীরের গতি, কায়াব্যূহ, পরমহংসদেব ও বিশে পাগলা—অন্নদা ঠাকুর নানা দল ও সম্প্রাদায়—সাধুর অপঘাত মৃত্যু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—নীচুস্তরের সাধন, শঙ্করাচার্য্য ও কাপালিক—ঠাকুরকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা—পূর্ব্বে দেশে ঠাকুরের সর্পাঘাতের ভয়—ঠাকুরের অসুখ।

বৈকালে খিদিরপুর হইতে কালু, হরিপদ ইহারা আসিয়াছে। আরও দুই একজন আছে। বলির কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর বিন্ধ্যাচলের একটী ঘটনার কথা বলিলেন।

ঠাকুর। বিন্ধ্যাচলে গিয়ে শুনলুম, কোন এক মারোয়াড়ী নাকি সেখানে বলি বন্ধ করার জন্য পাণ্ডাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বললে, 'এই পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি, বলি বন্ধ ক'রে দাও।' পাণ্ডাদেরও টাকার লোভ, তাই নিলে। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বলি হয় নি। ১২টার সময় সেই মাড়োয়ারীটি আর যে পাণ্ডা টাকা নিয়েছিল দুইই মারা গেল। তখন আবার বলি দেয়।

তা দেখ, যে নীতি চ'লে আসছে তা ভাঙ্গতে নেই। পুরীতে জগন্নাথের জায়গা, এমন বৈষ্ণবের দেশ, সেখানেও বিমলা দেবীর কাছে একটা বলি দিতে হয়?

কালু। সে ত এক দিন মাত্র, মহাষ্টমীর দিন।

ঠাকুর। হ্যাঁ, আমি বলছি, ঐ একদিন বলি না দিলে কি হ'ত? আর চেষ্টাও যে করেনি ব'লে ত মনে হয় না। নিশ্চয়ই কোন ঘটনা হয়েছে। বলি যা তা নয়। যেখানে যে নিয়ম মানতে হয়।

আবার পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উঠিয়াছে, ঠাকুর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

কালু প্রশ্ন করিল।

কালু। আচ্ছা, এখন আর তাঁর পাত্তাই নেই; সব শেষ।

ঠাকুর। ওপরে না গেলে পাত্তা পাবে কি ক'রে?

কালু। যুক্তিতে ত বোঝা যায়; কেউ ত পায় নি?

ঠাকুর। ঢের পেয়েছে; পাত্তা যে পাওয়া যায় না, তাও ত জান না। যাঁরা উঠেছেন তাঁরাই পেয়েছেন।

কালু। সে স্বপ্ন।

ঠাকুর। সবই ত স্বপ্ন। তুমিও স্বপ্ন, এ সৃষ্টিটাও স্বপ্ন।

কালু। পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম কিছুই নয়। তিনি সব এই ভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

ঠাকুর। খুব ভাল; তিনি সব করেছেন আর পরজন্মটা পারবেন না?

কালু। সৃষ্টি ত Evolution (ক্রম-বিকাশ) বলেছে। উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী, বাঁদর, মানুষ ইত্যাদি।

ঠাকুর। এখন মানুষ দেখছ, মানুষ ধর। মানুষের পরিণতি দেখ। সৃষ্টির ত নানা থিওরি (Theory যুক্তি) আছে। উপস্থিত কি আছে দেখ।

কালু। মানুষের গোড়া আছে ত?

ঠাকুর। গোড়া বালক, বালক থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য, তার পর মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি থাকল ?

কালু। সেটা ত তারা theory (যুক্তি) তে trace (অনুসন্ধান) ক'চ্ছে।

ঠাকুর। কই পাচ্ছে ? পারলে তর্ক থাকে ? তর্ক ত আন্দাজের ঢেলা। তবে সাধুরা দেখেছেন, বলেছেন, তাই বিশ্বাস করতে হয়; আর সাধারণের অনুমান মাত্র।

দেখ, দেহকে রেখে নিজে যদি এ জীবনেই আলাদা থাকা যায়, তবে দেহান্তেও সেটা থাকবে না কেন ?

কালু। থাকলেও সে আবার আসবে কেন ?

ঠাকুর। পূর্ব্ব সংস্কারে আসবে।

কালু। তারা পূর্ব্ব সংস্কার মানছে না।

ঠাকুর। সে ত নিজের যুক্তি। ওরাই ত দিচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র যীশাস, মহম্মদ তাঁর কাছে থেকে আসছেন। একজন যদি আসতে পারেন তবে আর সব পারে না ? তবে যার যা ভাব নিয়ে থাকতে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পুনর্জ্জন্ম থাক বা না থাক, তা নিয়ে মেলা বিচারের কোন আবশ্যক নাই। যার যা ভাব তাই নিয়ে থাকা। এ জন্মে যাতে ভাল হয়, সেটার চেষ্টা করলেই হ'ল।

কালীবাবু আসিলেন। তাঁহার বন্ধু বশীশ্বরবাবুও আসিয়াছেন। সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা Mother Christina (মাদার ক্রিষ্টিনা) এবং আর একজন আমেরিকান সাহেবও আসিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিবেন কথা ছিল। মাদার ক্রিষ্টিনার খুব বয়স হইয়াছে। শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। না ধরিলে বসিতে পারেন না। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মাদার ক্রিষ্টিনাকে বসিবার জন্য কার্পেটের উপর বালিশ দেওয়া হইল।

বশীবাবু বলিতেছেন,—এঁরা আপনার কথা শুনে দেখা করিতে

এসেছেন। ইনি স্বামীজীর শিষ্যা। ২২৷২৩ বৎসর এখানে আছেন এবং একটু একটু বাংলা বুঝতে পারেন। আর সাহেব একজন বুদ্ধভক্ত —১৯ বৎসর বয়েস থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করছেন। বৌদ্ধ-শিল্পকলায় এঁর খুব অনুরাগ।

ঠাকুর। আমি মুখ্যু মানুষ, ইংরাজি শিখি নি। (হাস্য)। ভাষা জানলে বেশ আনন্দ হয়, এমনি তা হয় না।

Mother সাহেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছেন।

ঠাকুর। সব ত আপন, সকলের সঙ্গেই ত আপনত্ব।

ঠাকুর এমন কোমলভাবে কথাটি বলিলেন যে, তাঁহারা ভাষা না বুঝিলেও মুগ্ধ হইলেন। বুদ্ধের কথা বলিতেই বলিলেন, "বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ বলে ত কিছু নেই। শুধু ভাবের তারতম্য। যিনি যে ভাব নিয়ে কাজ করেছেন। জিনিষ একই। লাল গাই, সাদা গাই—দুধ এক, সাদা।

বশীবাবু অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। বুদ্ধের চারটী উপদেশ আছে,—'অহঙ্কার করিও না, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়চিন্তা করিও না, অর্থ থাকে ত দান করিও, আর জ্ঞানীর কাছে উপদেশ লইও।' সবই এক ; কেউ ভক্তি ভাবে যায়, কেউ জ্ঞান নিয়ে থাকে। আমিই ভগবান্—এই বোধ হ'চ্ছে জ্ঞান। মায়া থাকতে, দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে ত সে বোধ হয় না। যতক্ষণ মায়া থাকে ততক্ষণ দু'টো আছে। 'আমি,' 'আমার'—বুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হবে না। এক আছে দেহেতে আত্মা ভ্রম, আর আছে আত্মায় দেহ ভ্রম।

বশীবাবু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। Mother শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ঠাকুর। বুদ্ধ একটা অবস্থার নাম। বুদ্ধ ত একজন নয় ; বহু বুদ্ধ। ও একটা স্তর। সে অবস্থায় মন গেলে তবে বুদ্ধ।

মাদার। Realisation (ভগবৎ অনুভূতি) এর পন্থা কি ?

ঠাকুর। পন্থা নানা ; মূল এক। যে কোনটা ধরে যদি

ঠিক্ যাও ত একেই আসতে হবে। চণ্ডীতে আছে,—শম্ভু-নিশম্ভু বধের সময় চণ্ডিকা বহুরূপে শম্ভুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। শম্ভু বললে, 'তুমি একা ছিলে বহু হ'লে কোত্থেকে?' চণ্ডিকা বলিলেন, 'মূর্খ, তুমি জ্ঞানহীন অন্ধ, তাই বুঝতে পারছ না। এ সব আলাদা নয়, সবই আমি। আমার থেকে বেরিয়েছে আবার আমাতেই মিশে যাবে।' এই বলে সব আপনার শরীরে মিশিয়ে নিলেন। একে বলে মায়া। মায়াতে বহু দেখায়। মায়া গেলেই সব এক।

যীশাস্ বলেছেন, 'কাল কি খাবে ভেব না। এক মুহূর্ত্ত পরে কি হবে জান না, তবে কেন ভাবছ?' বুদ্ধও বলেছেন, 'চিত্তকে স্থির কর। সঙ্কল্প-বিকল্প-শূন্য হও। চিন্তা রেখ না।' বাসনা-ত্যাগেই চিত্ত স্থির হয়। দুইই এক কথা বলেছেন। সবই এক, শুধু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন-ভাবে কাজ করেন। যীশাস্ বলেছেন, 'ভেবেই বা কি করবে? চিন্তা ক'রে কি এক চুল বাড়তে পার?'

বশীবাবু। ভগবান্ বুদ্ধি দিয়েছেন, তখন ভাবব না?

ঠাকুর। বুদ্ধি দিয়েছেন বলেই ত ভাববে না। দেখছ যখন ভেবে কিছু হয় না তখন ভাববে কেন? বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আসে যে "তাইত ভেবেও ত দুঃখ যায় না। তবে ভাবনা ছেড়ে দিই।"

বশীবাবু। পারি না ত।

ঠাকুর। বুদ্ধি দিয়েছেন তিনি, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ নেই। তাই পার না। সে জন্যেই ত শক্তি করতে বলছি। সেই আছে না—

'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।'

ধর্ম্ম কি জানি, কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হয় না; অধর্ম্ম কি তাও জানি, তার থেকে নিবৃত্তি হয় না। বলাদিব নিয়োজিত। আমি ইচ্ছা করি দূরে থাকতে, তবু কোন পুরুষ আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যায়? তখন ভগবান্ বলছেন, 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।' 'অর্জ্জুন, এসব কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের কার্য্য। রাজোগুণে

কাম। এই গুণজ ধর্ম্ম। কামনা অপূরণে ক্রোধ। কামনা-বাসনাই জোর ক'রে এসব করায়।'

বশীবাবু। তাঁর কোনও আইন নেই। যা ইচ্ছে করাবেন।

ঠাকুর। আইন ত দিয়েছেন,—শরণাগত হবে। চোরে উপদ্রব করে ত পুলিসের শরণাগত হও। তাই অর্জ্জুনকে বলেছেন, 'এই কাম-ক্রোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।'

বশীবাবু। ও বুদ্ধি দিলেন কেন?

ঠাকুর। সৎ বুদ্ধি দিয়েছেন, অসৎ বুদ্ধিও দিয়েছেন। ভাল-মন্দ দুই বোধ ত আছে।

বশীবাবু। থেকেই বা কি লাভ?

ঠাকুর। এটা ত বোধ আছে যে এটা ভাল, এটা মন্দ। আবার এদিকে (ভালর দিকে) জোরও ত দিচ্ছেন। **প্রধান হ'চ্ছে সঙ্গ।** যে রকম সঙ্গ কর সে রকম উদ্দীপন হবে। রজোগুণীর সঙ্গ কর, রজোগুণ বাড়বে, সত্ত্বগুণীর সঙ্গ কর, ত সত্ত্বগুণ বাড়বে, আবার তমোগুণীর সঙ্গ কর, তমোগুণ বাড়বে। প্রধান হ'চ্ছে সঙ্গ।

বশীবাবু। তিনি কর্ত্তা, যা খুসী তাই করছেন।

ঠাকুর। যদি কর্ত্তা ঠিক্ ঠিক্ করতে পার, তবে ভাব কেন? যদি জান তিনিই সব করছেন, তবে এত ভাবনা কেন?

বশীবাবু। কর্ত্তা যদি কম দেন, বলব না?

ঠাকুর। কর্ত্তা বলছ আবার তাঁর ওপর বিচার রেখেছ? কম বেশী যা দেন সে ত কর্ত্তার ইচ্ছা। কর্ত্তা যদি বল, তাঁর উপর নির্ভর কর। নিজেরই ভুল মনে করবে। কর্ত্তার ভুল হ'তে পারে না। নয় ত কর্ত্তা বলে মানছ কেন?

বশীবাবু। দায়ে পড়ে।

ঠাকুর। তবে মনে ঠিক্ নেই। দেখ, দু'রকম কর্ত্তা আছে। এক হ'চ্ছে গুণ নেই কর্ত্তা; শুধু নাম কেনার জন্য। ভীমরুলের চাক রয়েছে, বললে, "কর্ত্তা, এটা ভাঙ্গতে পারেন?" বললে, "মই আছে?

নিয়ে এস।” মই দিয়ে উঠে যেমন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছে অমনি কামড়ে অস্থির ক'রে দিয়েছে। সারা গা ফুলে গেছে, জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছে, তখন জিজ্ঞাসা করলে “কি কর্ত্তা, জ্বলছে নাকি?” তা বললে, “ফোলে বটে জ্বলে না।” (সকলের হাস্য)। আবার জিজ্ঞাসা করলে, “কর্ত্তা, পানা পুকুরে শীতকালে থাকতে পারেন?” বললে, “গামছা আছে? নিয়ে এস,” গামছা পরে নেমে গেল। শীতকালে, ঠাণ্ডা জলে শরীর অসাড় হ'য়ে গেছে। কাঁপছে, তবুও যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, “কি কর্ত্তা, শীত ক'চ্ছে?” তা বললে, “কাঁপে বটে, শীত করে না।” (হাস্য)। এ এক কর্ত্তা। আর আছে, কর্ত্তৃত্ব গুণ আছে তাই কর্ত্তা।

বশীবাবু। যা কর্ত্তা তিনি, যা খুসী তাই করছেন। কাহাকেও রাজা করছেন, আবার কাহাকেও ভিখারী করছেন। সব স্বেস্থাচার।

ঠাকুর। আগে জিনিষ কি দেখ। স্বেচ্ছাচার বলতে হয় পরে বল। জগৎটা আগে ঠিক্ দেখ। খবরের কাগজে দুনিয়া দেখে যা তা বললে ত চলবে না। নিজে ঘুরে জগৎটা দেখ, নয় ত নিজেকে জান। তোমাতেই জগৎ, নিজেকে জানতে পারলে জগৎকেও জানবে। দুটোর একটা করতে হবে। অমুকের দুটো টাকা আছে দেখলে, আর একজনের তা দেখলে না, অমনি বলে দিলে বড় অন্যায়। তাতে হবে না। কেন তাকে দিচ্ছেন, আর একেই বা দিচ্ছেন না কেন, তা দেখ। দেখলে একজন ঘানি টানছে আর একজন reward (পুরস্কার) পেলে, তাতেই পুলিসের ওপর দোষ দিচ্ছ। কেনই বা ঘানি টানছে, আর কেনই বা reward পাচ্ছে তাই দেখ। ভেতরে প্রবেশ কর; প্রকৃতি ধর।

বশীবাবু। আচ্ছা, এ ঘানি টানার অবস্থা কে এনেছে? সেও ত তিনি দিয়েছেন?

ঠাকুর। সবই ত তিনি দিয়েছেন। তবে ঘানি টানা মন্দ বলছ কেন? সেও ত তাঁরি দেওয়া?

বশীবাবু। ভাল লাগে না বলে।

ঠাকুর। ভাল লাগা, আর না লাগা, এও ত তাঁর।

বশীবাবু। সবই বুঝি তবুও সে বুদ্ধি আসে। তাঁর পক্ষপাতিত্ব দোষ। কাকে রাজা আর কাকে ভিখিরী করেছেন।

ঠাকুর। পক্ষপাতিত্ব কোথায়? রাজাও তাঁর, ভিখিরীও তাঁর। তোমার যদি এক হাতে পাঁচ টাকা আর এক হাতে তিন টাকা থাকে, তখন তুমি কি বল এক হাতের উপর বেশী নজর? দুই হাতেই ত তোমার। সবই ত তাঁর।

বশীবাবু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। Mother (মাদার) ও সাহেবটী খুব আনন্দিত হইলেন। Mother (মাদার) বলিতেছেন, "intelligent reply (খুব বুদ্ধিমানের মতন উত্তর)।"

বশীবাবু। আমরা ওসব বুঝি না। আনন্দময়ী হ'য়ে তিনি কেন নিরানন্দ করেন?

ঠাকুর। আনন্দ নেবে ত সে রকম কাজ কর। পালোয়ান না হ'লে কি লড়াইয়ে জিততে পার?

বশীবাবু। আমাদের টাকা থাকলে বেশ আনন্দ হয়, নয় ত দুঃখ।

ঠাকুর। সব তাতেই আনন্দ নিতে হয়। আনন্দের ত আর হাত পা নেই। সব অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকলেই ত আনন্দ।

বশীবাবু। আমরা ব্রহ্মানন্দ চাই।

ঠাকুর। ব্রহ্মানন্দ নিতে হ'লে সব তাতেই আনন্দ নিতে হয়। ব্রহ্ম ত সর্ব্বময়। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু মানাপমানবর্জ্জিতম্। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, সব তাতেই আনন্দ নিতে হয়। নইলে ত খণ্ড আনন্দ চাচ্ছ। সন্দেশ জিহ্বাতে দিলে—বেশ আনন্দ হ'ল। না পেলে যদি দুঃখ, সে ত খণ্ড আনন্দ। সব নিতে হবে। বাবাকে ভালবাস, বাবার বাক্সে যা আছে সব নিতে হবে। শুধু হীরেটার বেলা নেব, সেটা হবে না।

বশীবাবু। সব তাতে আনন্দ নিতে যে দেয় না।

ঠাকুর। যে দিচ্ছে না তাকে ধর।

বশীবাবু। কে সে?

ঠাকুর। এ সব প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, গুণজ ধর্ম্ম। গুণ বদলাও। আর নয়, যাঁর আইন তাঁকে ধর। দোষ দিলে ত হবে না। অথবা ঠিক্ দিয়েছেন ভেবে সব সহ্য কর।

আমেরিকান। কখন কর্ম্ম ত্যাগ করে সাধনভজনের দিকে যেতে হয়?

ঠাকুর। সে অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে অবস্থা এলে হবে। প্রথমে তম, পরে তম থেকে রজ, আবার রজ থেকে সত্ত্ব। যখন সৎ-কর্ম্ম হয় তখন সত্ত্ব রজ মিশ্রিত। রজ না থাকলে কর্ম্ম থাকে না।

বশীবাবু। ধ্যান জপ করাও কি রজোগুণের কাজ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সত্ত্ব রজ মিশ্রিত। অধ্যবসায় রেখে ধৈর্য্য রেখে কাজ করা হ'চ্ছে রজের কাজ, আর ধ্যান, জপ, এ সব সত্ত্বগুণের কাজ। তম মিশলে আলস্য জড়তা আসে।

আমেরিকান। কখন বুঝব যে সে অবস্থা হয়েছে?

ঠাকুর। সে আপনি জানিয়ে দেয়। অবস্থার সঙ্গে ভেতরে জ্ঞানের উদয় হয়। সব অনুভূতি হয়। সে অবস্থা এলে আর সংসার করতে পারে না। চৈতন্যদেব যখন সংসার ছেড়ে যাচ্ছেন, ভারতী বললে, 'কেন সংসার ত্যাগ করবে? সংসারে কি ধর্ম্ম হয় না?' চৈতন্যদেব বললেন, 'আমার ত ইচ্ছা সংসারে থাকি, কিন্তু সংসার যে আমায় চায় না; আমি যে পারি না।' তখন এ অবস্থা হয়। সংসার আপনি ছেড়ে যায়।

আমেরিকান। সে অবস্থা আসবার আগে কি সংসারে বিরাগ আসতে পারে না?

ঠাকুর। **সব অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ।**

বশীবাবু। সে অবস্থা এলে nothing can keep you back (কিছুই তোমাকে আটকে রাখতে পারে না)।

ঠাকুর। তাই আছে, প্রথম শ্রদ্ধা, জ্ঞান লাভের ইচ্ছা ; তারপর লালসা। লালসার পর অনুরাগ, তারপর প্রেম। তখন কোনও বাধা মানবে না। মরব কি বাঁচব সে বোধ নেই।

মাদার। Irresistible impulse (অদম্য অনুরাগ) আসে।

ঠাকুর। তা ভিন্ন মনুষ্য মাত্রেই সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণ রয়েছে। কখন এটা কখন সেটা প্রবল হয়। রজেতে থাকতে, হয়ত কখনও সত্ত্বের কাজ হ'ল। সে শুনে শুনে ধার করা। ঠিক্ প্রকৃতি বদলায় নি। এজন্য সদ্‌গুরু। সব অবস্থায় দুঃখের হাত থেকে বাঁচিয়ে চালাবার জন্য। শুনে সব ছেড়ে বেরুল, কিন্তু বাইরের অবস্থা ত জানা নেই। গিয়ে দেখলে মহা দুঃখ। ভেতরের অবস্থা না এলে হবে কেন ? নির্জ্জন চাই। নির্জ্জন কোথায় ? জনতা ত জগৎময়। জনতা হ'চ্ছে রিপুরা। এদের হাত থেকে পার না পেলে যেখানেই যাও সেখানেই জনতা। দেখে মন, শোনে মন। মন ঠিক্ না হ'লে যেখানেই যাও সেখানেই গোলমাল।

দুটো অবস্থায় সংসার ছাড়ে। এক দারুণ দুঃখে। সংসারকে আঁকড়ে ধরে ভাবে সব করতে পারি। শেষে দেখে কোনটাই হয় না। তাই তাঁর দিকে যায়। এ আর্ত্ত অবস্থা। তখন এই ভাবে যে ভগবানকে ধরব, তাঁকে জানাব। সৃষ্টির মালিক যে তাঁকে ধরব। জেল থেকে রেহাই পেতে হ'লে জজ-সাহেবের কাছে দরখাস্ত করবে। তাঁকে ডাকবে। "ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।"

আর আছে, এসব ত সুখ-দুঃখের খেলা মনে করে বীর হব। এগুলিকে অধীন করব। সৃষ্টির বড় হব। এ হ'চ্ছে জ্ঞান। বুদ্ধ প্রভৃতি ভক্তি-পথের ন'ন। তাঁদের সোঽহং ভাব। দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, হ্যাঁ, না, দুয়েরই পার। দেখলে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, এরাই দুঃখের কারণ। তাই এদের হাত থেকে কিসে নিষ্কৃতি পাব, সেই সাধনা। বুদ্ধ অবস্থা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা—মন স্থির। বিচারেই না মন তোলপাড় করে।

বায়ুতে জলে ঢেউ উঠে। বায়ু থামলে স্থির। 'আছে', 'নেই', এ দুই ভাববারই দরকার নেই।"

Mother ঠাকুরের কথা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—তখনই অবস্থা। মহামহিমাশালীনের লক্ষণই দিয়েছে—'তরোরিব সহিষ্ণুতা, তৃণাদপি সুনীচ, যৌবনে-নচোন্মাদা, আর হেতুরেকে ফলাভাব।' "তরোরিব সহিষ্ণুতা" কি? দেখ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফল পাড়ছে, তবু কিছুই বলে না, সব সহ্য করে। বিনিময়ে তোমায় সুস্বাদু ফল দান করে। সে স্থির ভাবে তোমার অত্যাচার অবাধে সহ্য করছে। তাই সহ্য করতে শিখবে তরুর কাছে। রোগ, শোক, অভাব তোমাতে আসবে; সব সহ্য করবে। বুদ্ধেরই উপদেশে আছে যিনি অন্নকষ্টে রোগ এবং শোকে, আনন্দরক্ষা করতে পারেন তিনি 'সাধু'।

আর 'তৃণাদপি সুনীচ।' দেখ তৃণের উপর তোমরা পা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছ। কিছু বলে না, বরং পায়ে লাগবে বলে মাথা নীচু ক'রে দেয়। সেই রকম, সংসারে থাকতে গেলে বহু প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। এ দুটো কথা, সে দুটো কথা বলবেই, তাতে বিচলিত হ'তে নাই। তাকে ঘৃণা করতে নাই, সবকে আপন ভাবতে হয়। মানুষের মনুষ্যত্বটুকু নিতে হয়। প্রকৃতি ত উপাধি। সে ছেড়ে দিতে হয়।

আবার আছে 'যৌবনে নচোন্মাদা।' দেখ, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয় শিথিল হ'য়েই আসে। রিপু আপনি অধীন হয়। যৌবনই ভয়ানক সময়। রিপুর আকর্ষণ ভয়ানক। তখন যে ঠিক্ থাকতে প'রে সেই মহাত্মা।

আর 'হেতুরেকে ফলাভাব।' অহঙ্কারের হেতু আছে কিন্তু অহঙ্কার নেই। অহঙ্কারের হেতু নেই অথচ অহঙ্কার আছে সে ত অতি নীচ প্রকৃতির লোক। আহঙ্কারের হেতু আছে, আর অহঙ্কারও

আছে, এ সাধারণ জীব বুদ্ধি। কিন্তু অহঙ্কারের হেতু আছে, অথচ অহঙ্কার নেই—সেই মহাত্মা।

কবীরের উপদেশে আছে, "অহঙ্কারে বিপদ আসে, পাপে দুঃখ আসে, দানে ঐশ্বর্য্য আসে, আর উপেক্ষায় ভগবান্ আসেন।" আবার বলেছেন, "বিশ্বাস কর, গুরুতে প্রাণমন সমর্পণ কর, তা'হলে আনন্দ পাবে। আমি গুরুতে বিশ্বাস রেখেছি, প্রাণমন সব সমর্পণ করেছি, আমি সদাই অমরলোকের সঙ্গে বাস করছি।"

Motherএর কষ্ট দেখে ঠাকুর কম্বল দিতে বলিলেন, তিনি বারণ করিলেন। ঠাকুর বলছেন, "তোমার ত মা-লক্ষ্মী অনেক বয়স হয়েছে। তুমি ত দেবী হ'য়ে গেছ। তোমার দোষ আছে কি?"

বশীবাবু। স্বামিজী বলেছেন যে, "দেহ রাখবার আগে তোমার তৃতীয় নয়ন খুলবে।"

ঠাকুর। ইংরাজী জানি না, আলাপ ক'রে আনন্দ হ'চ্ছে না। তা তুমিই না হয় আমায় ইংরাজি শিখাও (সকলের হাস্য)।

বশীবাবু। তা করবেন না। বাংলা শিখেই লোকের জ্বালায় অস্থির। ইংরাজি শিখলে আর রক্ষা থাকবে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম সব উঠে যাবে। মুস্কিল হবে।

ঠাকুর। আমার কি মুস্কিল? যাঁর মুস্কিল তিনি ভাববেন (হাস্য)। আমি জানি খাব দাব আমোদ করব, ভাবনা তাঁর। আমি ভাবনার কি ধার ধারি? কর্ত্তা হ'তে গেলেই গণ্ডগোল।

কালীবাবু। আপনার সেই একটা গল্প আছে না? সেই রাজার ছেলে আর বিধাতা-পুরুষ।

ঠাকুর। হ্যাঁ, এক রাজার সন্তান হয় না। বহুদিন পরে রাণীর সন্তান-লক্ষণ হয়। তাঁর এক সিদ্ধ গুরু ছিলেন। তিনি রাজাকে বলে দিলেন 'রাজা তোমার ছেলে হবে। হ'লে আমায় খবর দিও।' ছেলে হ'লে রাজা গুরুকে খবর দিলেন। আট দিনের দিন গুরু এসে সূতিকাগারের দোর ধরে শুয়ে আছেন। ভাগ্য-লেখক এসেছেন ছেলের ভাগ্য

লেখবার জন্য। দোরে এসেই দাঁড়িয়েছেন। সাধুকে উল্লঙ্ঘন ক'রে যেতে পাচ্ছেন না, বললেন, 'পথ দাও।' সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?' বললেন, 'আমি ভাগ্য-লেখক, ছেলের ভাগ্য লিখব।' সাধু বললেন, 'কি লিখলে, যাবার সময় আমায় বলে গেলে আমি ছেড়ে দেব।' তাতেই রাজী হ'য়ে ঢুকলেন। যাবার সময় গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি লিখলে?' তা বললেন, 'এ ছেলের যখন ষোল বৎসর বয়স হবে, তখন রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকবে না। এ জেলের ব্যবসা ক'রে খাবে। তবে রোজই মাছ বেশ পাবে, কখনও অভাব হবে না।'

কিছুদিন বাদে আবার রাণীর সন্তান-লক্ষণ হ'ল। সেবার রাণীর মেয়ে হয়েছে। গুরুকে খবর দিয়েছেন। আট দিনের দিন ঘরের দোরে গুরু এসে শুয়ে আছেন। আবার বিধাতা-পুরুষ এসেছেন। যেতে পাচ্ছেন না। গুরু বললেন, 'যাহা লিখবে তাহা বলে যাবে?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা'। গুরু পথ ছেড়ে দিলেন। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, 'এই মেয়ে ষোল বৎসরে বেশ্যাবৃত্তি করে খাবে, তবে অভাব হবে না। রোজই বেশ টাকা পাবে।' এই শুনে গুরু নিজের কাজে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে রাজা ও রাণী মারা গেলেন। গুরুদেব এসে দেখলেন, কোথাও কেউ নাই। রাজত্ব নাই। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ খবর জানে না। তাই নিজেই খুঁজতে বেরুলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, কতকগুলি জেলে মাছ ধরছে। রাজপুত্রও তাদের মধ্যে রয়েছে—লক্ষণ দেখে টের পেলেন। চেহারাও বদলে গেছে। মনের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও বদলায়। সে সঙ্গে চেহারাও বদলে যায়, ব্যবসার ছাপ লেগে যায়। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি অমুক রাজার পুত্র?' সে শুনেই কেঁদে ফেলেছে, বললে, 'আপনি কি ক'রে চিনলেন?' তিনি বললেন, 'আমি তোমার পিতার গুরু।' ছেলেটী কাঁদতে কাঁদতে বললে, দেখুন, বাবা মা মারা গেছেন, রাজত্ব নেই। তাই জেলের ব্যবসা ক'রে খাচ্ছি।' গুরু বললেন, 'আচ্ছা, কোনও

চিন্তা নেই, তুমি আমার সঙ্গে এস।' একটা বাড়ীতে এসে বললেন, 'তুমি এই উঠানে গর্ত্ত খুঁড়ে এক ঘটী জল ঢেলে, তাতে ছিপ ফেলে বসে থাক। সন্ধ্যা নাগাদ একটা মাছ পাবেই, আর খদ্দেরও জুটবে। বিক্রি ক'রে যা পাবে, খেয়ে, দান ক'রে, বিলিয়ে দেবে। কালকের জন্য রেখ না। কাল আবার পাবে। এ রকম রোজ করবে। অসম্ভব বলে অবিশ্বাস ক'রো না। তুমি ত জান না কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা অসম্ভব। ঠিক্ থেক, মাছ পাইবে।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বোন কোথায়?' রাজপুত্র বললে, 'সে ত জানি না। তবে শুনেছি নাকি বেশ্যাবৃত্তি ক'রে খায়।' গুরু বললেন, 'আচ্ছা, আমি খুঁজে বা'র করব'। তোমাকে যা বললুম তাই ক'রো। এই বলে চলে গেলেন। এদিকে রাজপুত্রও তাই করেছে। রোজই একটা মাছ পায়, খদ্দেরও জোটে। যা পায় খরচ ক'রে ফেলে। আবার পরদিনও মাছ পায়। এই চলছে, কোনও অভাব নেই। এদিকে গুরু গিয়ে রাজকন্যেকে খুঁজে বা'র করলেন। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি অমুক রাজার মেয়ে?' শুনেই সে কেঁদে ফেললে। তিনি বললেন, 'আমি তোমার পিতার গুরু।' রাজকন্যা কেঁদে কেঁদে তার মনের দুঃখের কথা বলতে লাগল। গুরু বললেন, 'আচ্ছা, কেঁদ না, যা হবার তা ত হয়েছে। দুঃখ ক'রে কি হবে? এখন এস, যা বলছি তা কর। তোমার দোরে লিখে দাও যে, একলক্ষ টাকা ভিন্ন কেউ ঢুকতে পাবে না। দেখবে কেউ না কেউ টাকা নিয়ে আসবেই। আর যা পাবে, সেদিনই খেয়ে দেয়ে, দান ক'রে খরচ ক'রে ফেলবে। কালকের জন্য রেখ না। কাল আবার পাবে। বিশ্বাস রেখ, ঠিক্ পাবে।' রাজকন্যা রাজী হ'ল। তাই করেছে। দেখে, সন্ধ্যার সময় এক রাজা এসে একলক্ষ টাকা দিয়ে যায়। রোজই এই হ'চ্ছে। কিছুদিন যায়। একদিন গুরু পথ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় শুনলেন কে পেছন থেকে ডাকছে, 'ও মহাশয়, শুনুন্।' গুরু ফিরে দেখে বললেন, 'না, আমার সময় নাই।' সে বললে, 'শুনুন্ না মশাই।' তিনি বললেন, 'কে হে তুমি বিরক্ত

করতে এসেছ, কি হয়েছে কি ?' সে বললে, 'চিনতে পাচ্ছেন না ? আমি ভাগ্য-লেখক।' গুরু বললেন, 'ও তুমি, তা তোমার কি হয়েছে ?' সে বললে, 'আমায় রক্ষা করুন, আমার যে মাছ আর টাকা যোগাতে যোগাতে প্রাণ যায়।' গুরু বললেন, 'কেন বাপু, তুমি একটা রাজপুত্র আর রাজকন্যার ভাগ্যে যা তা লিখে গেলে, এখন বোঝ।' সে বললে, 'আর পারিনে, রক্ষা করুন।' গুরু বললেন, 'তবে সব ফিরেয়ে দাও। যেমন ছিল তা ক'রে দাও।' (সকলের হাস্য)। শেষে তাই হ'ল, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব ফিরে এল।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুরের আজ খুব আনন্দ। আবার কিছুক্ষণ পরে গান করছেন—

'মন করিস্ না রে গণ্ডগোল।'

—(৩৭ পৃষ্ঠা)

ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের গান Mother ও আমেরিকান শুনিতে লাগিলেন ও বিমুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ঠাকুরেরও আর খুব আনন্দ হয়েছে।

"মা" "মা", "আনন্দম্" "আনন্দম্", "ওঁ-তৎ-সৎ,"— এরূপ ধ্বনি মুহুর্মুহু করিতে লাগিলেন।

Mother, সাহেব ও বশীবাবু উঠিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলছেন, "বেশ, বড় আনন্দ হ'ল, মাঝে মাঝে নিয়ে এস।" তাঁহারা চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন, "বেশ মেয়ে, খুব শান্ত মূর্ত্তি। তবে ভাষা না জানলে আনন্দ হয় না। ডাক্তার সাহেব! তুমি আফিস থেকে এসে বরং আমায় ইংরাজি শিখাইও (সকলের হাস্য)। ঠিক্ বোঝান হয় নি। এর ইংরাজি করা কঠিন, এ সব অতি সূক্ষ্ম জিনিষ।" আবার বলছেন, "এরা খুব energetic (উদ্যমী) জাত। সূক্ষ্ম জানতে হ'লে কিন্তু খুব সাধনা চাই। সূক্ষ্ম অবস্থা লাভের ওপর এদের নজর কম ; বই লেখার বেশী ইচ্ছা।

কৈলাসের বাড়ীতে একটী উকীল মকদ্দমার ব্যাপারে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা করলে। বললে—আমি বেদের ব্যাখ্যা লিখেছি। আমি বললুম—এলে ত বাপু মকদ্দমা করতে, বেদের কি বুঝলে বল ত? বেদ মহা সাধনের জিনিষ। ঋষিরা সাধনা ক'রে সব লিখে গেছেন। আর তোমরা দিনরাত্ত ছেলে পরিবার টাকা কড়ি নিয়ে আছ, আর লিখে বসলে বেদ! তোমাদের কাছে বেদ শোনাও ত মুস্কিল। সাধন ক'রে অবস্থা লাভ কর, তবে লিখ। পণ্ডিতেরা কি তোমার চেয়ে কম সংস্কৃত জানেন, তাঁরাও ত লিখতে পারতেন। এই এক বাই, বই লেখা।

কৈলাসের সঙ্গে যখন শ্রীরামপুরে প্রথম দেখা হয়, আমায় বললে—একটা স্কুল হবে, তাতে আপনাদের মত মাষ্টার থেকে যদি ছেলেদের পড়ান হয় ত বেশ হয়। আমি বললাম—আমি আর কি পড়াব, মুখ্যু মানুষ। তা না হয় বিদ্বান্ দেখেই নিলে। তাতেই বা কি হবে? জুটো কথা পড়িয়ে কি হবে? মাষ্টাররা নিজেরাই নিজের উপদেশ মত চলে না, তা ছেলেরা তাদের কথা কি শুনবে। পড়িয়ে কি হয়? এ সব ভাব আসা চাই। যেখানে যার মন মজে। এমনি শুনে কি হবে? শোনার কি অভাব আছে?

গোপেন আসিল। ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'এস, গোপেন এস।' গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে।

গোপেন। ভোগ মনে উৎপত্তি কি দেহ-আত্মার সংযোগে উৎপত্তি?

ঠাকুর। আত্মার একটা তেজ ত্রিগুণে পড়ে মন হয়। মনে ভোগ হয়।

গোপেন। দেহ না থাকলে কি ভোগ হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সেজন্য সূক্ষ্ম দেহ। এক পাঞ্চভৌতিক দেহ। আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নিয়ে সূক্ষ্ম দেহ। মন থাকে তাই ভোগ।

গোপেন। স্থূল দেহে যখন রোগ হয় তখন কি মনেও হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যতক্ষণ মন দেহে থাকে।

গোপেন। সূক্ষ্ম দেহে কি রোগ নেই?

ঠাকুর। না।

গোপেন। তা'হলে ভোগ কি ক'রে হয়?

ঠাকুর। মনে ভোগ। স্থূল দেহে রোগ হয়। মন দেহে থাকে ব'লে অনুভূতি হয়, মনের ক্রিয়া হয়।

গোপেন। সূক্ষ্ম দেহে অনুভূতি কি ক'রে হয়?

ঠাকুর। অনুভূতি ত মনের। সূক্ষ্ম দেহে মন থাকে তাই অনুভূতি।

গোপেন। মনের লয় কখন হয়?

ঠাকুর। যখন আত্মার সঙ্গে যোগ হয়। জল আলাদা রয়েছে। সাগরে যখন ফেলবে তখন আলাদা থাকল না।

গোপেন। আত্মদর্শন হ'লে?

ঠাকুর। হ্যাঁ। তাই ত দিয়েছে মনটা যেন একটা সাগর। হাওয়া লেগে সাগরে ঢেউ উঠে। হাওয়া থামলে সব স্থির। তেমনি চিন্তা-বায়ু মনে উঠলে মন তোলপাড় করে। নিশ্চিন্ত হ'লে স্থির। সাগরে যেমন হাঙ্গর কুমীর রয়েছে, মনেও তেমনি—রিপুরা। আবার ভালও আছে, যেমন বিবেক, দয়া, ভালবাসা ইত্যাদি।

গোপেন। স্থূল দেহে মনের কাজ কি দেখা যায়?

ঠাকুর। মন ত দেখবার জিনিষ নয়। দেখলেই ত স্থূল।

গোপেন। সূক্ষ্ম দেহ দেখা যায় না?

ঠাকুর। দৃষ্টি থাকলে দেখা যায়। যেমন আরসীর মানুষ। আরসীতে মানুষের চেহারা দেখছ। স্থূল নয় অথচ দেখছও বটে। স্বপ্নে মানুষ দেখছ নানা রকমের। কিন্তু স্থূল নয়। সূক্ষ্মের পর **কারণ শরীর**, যাতে ভগবানের আনন্দ উপভোগ করা যায়।

গোপেন। কারণ শরীর না হ'লে ভগবানের আনন্দ উপভোগ হয় না?

ঠাকুর। না, এই শরীরে হয় না। তারপর মহাকারণ। এ তুরীয় অবস্থা, বলা যায় না। "তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়।"

কালীবাবু। এ শরীরের ভেতরেই সে সব আছে?

ঠাকুর। হ্যাঁ আছে, ভেতরে; চাপা আছে; ইচ্ছা করলে আলাদা করা যায়। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মে কারণ যোগ থাকে। তাতে পরস্পরের গতি। সূক্ষ্ম ছাড়ালে কারণ, কারণ ছাড়ালে মহাকারণ।

কালীবাবু। রূপ হয় অথচ স্থূলত্ব নেই কি রকম?

ঠাকুর। যেমন আরসীর মানুষ, স্থূলত্ব নেই।

কালীবাবু। ভাষা প্রয়োগ করে কি?

ঠাকুর। একটা শব্দ পেলে—দৈববাণী—স্থূলের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই অথচ শুনলে শব্দ হ'ল।

গোপেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ত?

ঠাকুর। তোমার অনুভবের জন্য। মূলে, স্থূল তাতে নেই। সূক্ষ্ম এই জন্যে দেখ। ঘরের সব দোর দেওয়া, কোথাও পথ নেই, অথচ হঠাৎ দেখলে ঘরের মধ্যে মনুষ্য-মূর্ত্তি। স্থূল হ'লে কি ক'রে যাবে? অথচ মানুষ রয়েছে, কথাও ক'চ্ছ। পরমহংসদেবকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে দেখলে। পরমহংসদেবকে বললে, "আপনাকে দেখলাম কাছে বসে। গায়ে হাত দিলাম, অনুভূতি হ'ল। আপনি ঢাকা গিছলেন?" তিনি বললেন, আমি "কখনও ঢাকা যাইনি।" এই সূক্ষ্ম দেহ।

গোপেন। সূক্ষ্ম দেহেও ত গিছলেন। যাইনি বললেন কেন?

ঠাকুর। এই স্থূল দেহে যাননি, তাই বলছেন।

শান্তিপুরে ছিল একজন, পাগলের মত চলত ফিরত। সবাই বিশে পাগলা বলে ডাকত; ঢিল ছুঁড়ত, ঠাট্টা করত। জমীদার মতিবাবু তাকে ভক্তি করতেন। রথের সময় বিশে পাগলা রথ টানছে, মতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বিশ্বনাথ, এখানে যে, পুরী যাওনি?"

সে বললে, "হ্যাঁ, পুরীতেও বিশ্বনাথ।" মতিবাবু টেলিগ্রাম করলেন। উত্তর এল, "হ্যাঁ, বিশ্বনাথ এখানেও রথ টানছে।" একে বলে কায়াব্যূহ।

গোপেন অন্নদাঠাকুরের কথা তুলিয়াছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, চিনেন কিনা।

ঠাকুর। হ্যাঁ চিনি, কাশীর মঠে আমার কাছে এসেছিল। বড় ভাল লোক, আমায় খুব ভালবাসে। আমাকে বললে—অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করব ইচ্ছা, কিন্তু মেলা বড়লোক যায় বলে যেতে পারি না। আমি বললুম—সে কিগো! তুমি যাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে, বড়লোক কি করবে তোমার? আর তুমি সাধু মানুষ, তোমার আর বড়লোক গরীব-লোক কি? দেখ, একটি বড়লোকের যদি সদ্বুদ্ধি হয়, কত লোকের উপকার হয়। তাদের মধ্যে অনেক উচ্চতা থাকে। খুব ভাল লোক। অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে বসে আনন্দ করলে, গান করলে।

গোপেন আবার নানারকম সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছে।

গোপেন। নানারকম মঠ, দল, সব হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে আবার ঝগড়া। সাম্প্রদায়িকতা ভাল নয়।

ঠাকুর। হয় কি, গরুর পালে গরু আসলে মিশে যায়। গরুর পালে যদি মোষ আসে তবেই গুঁতোগুঁতি। ভাবের মিলে শান্তি। অভাব হ'লেই অশান্তি।

গোপেন। তবে যে গান রয়েছে, "নানাভাবে সব আসি একঠাঁই।"*

ঠাকুর। সে গুরুর পক্ষে। তিনি সব পারেন। অপরে পারবে কেন? সব দলে মিল হবে কোত্থেকে? শেষ না গেলে ত মিল হয় না। তবে এই ভাল, তাঁকে যে ভাবে হয় ডাকছে। আবার এটা না হয় যে তাঁকে ডাকছি, অতএব লোকের মাথা কিনেছি।

---

* ঠাকুরের গান, ৭ পৃষ্ঠা।

বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর ত সবাই হ'তে পারবে না। তবে তাঁকে ডাকে, ভাল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে তারা একটা সৎনীতিতে আছে ত। লোকে যে পাঁচ কথা বলে, তার মানে হ'চ্ছে, দেখ, কাল দেয়ালে কাল দাগ পড়লে সে কারও চোখে পড়ে না; সাদা দেয়ালে কাল দাগ পড়লেই চট্ ক'রে চোখে পড়ে। এজন্যে সাধু-সংক্রান্ত স্থানে বা অন্য কোন ধর্ম্মস্থানে একটু বৃত্তির এদিক ওদিক হ'লেই লোকে পাঁচ কথা বলে।

গোপেন। সাদা দেয়ালে কালী দিতেই সবাই চায়।

ঠাকুর। কেন চায় জান? যাদের কাল দেয়াল, তারা সাদা দেয়ালে কালী দিতে চায়। নিজেরটার মত হোক। এ মানুষের স্বভাব। দেখনা, যদি একটী ছেলে সাধু-সঙ্গ করে, লোকে বলে ছেলেটী বিগড়ে গেল। আর একজন এদিকে যা খুসী তাই করে, হয় ত ক্লাব ট্লাবে যায়; সবাই বলে, বাঃ, ছেলেটী বেশ উন্নত হ'চ্ছে। এই এক হাওয়া পড়ে গেছে। তার মানে নিজের সংস্কারে উচ্চভাবের বেড় পাচ্ছে না। তাই নিজের দলে টেনে নিতে চায়।

গোপেন। লাঙ্গুলহীন শৃগালের গল্প আছে।

ঠাকুর। হ্যাঁ আছে। হনুমানের মুখ পুড়ে গেল। সীতাকে ধরলে, কি করি, সবাই যে আমার পোড়া মুখ দেখে ঠাট্টা করবে। সীতা বললেন, আচ্ছা, আজ থেকে সব বাঁদরের মুখ পুড়ে যাবে। তাই হ'ল। সবারই মুখ পোড়া, কে কাকে ঠাট্টা করে (সকলের হাস্য)।

গোপেন। ধর্ম্মের দিকে গেলে প্রথমে লোকে বিদ্রূপ করে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, বিদ্রূপ ত করেই, আক্রোশ পর্য্যন্ত আসে। বহু লোক আসছে, মানছে—দেখে হিংসা হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে পুরীতে বিষ দিয়ে মারলে।

গোপেন। তাঁর এই পরিণাম হ'ল! অপঘাতে মৃত্যু।

ঠাকুর। তাঁদের পক্ষে অপঘাত কি? নিজে ত মরছেন না। আর দেহ ত যাবেই। তাঁতে মন রয়েছে, অপঘাত কি? মায়ার জীবের জন্যে অপঘাত। তা'হলে ত যীশাস্, রাম, চৈতন্যদেব, সকলেরই অপঘাত।

গোপেন। ত্রৈলঙ্গস্বামীর কি ভাবে দেহ গিয়েছিল ?

ঠাকুর। তাঁর যোগে দেহ গিয়েছিল। তাঁর কথা আলাদা। তাঁর ত লোকশিক্ষা ছিল না। লোকশিক্ষা বড় শক্ত। বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ। বি, এ, পাশ করা যেতে পারে, পড়ান বড় শক্ত। সংসারী হ'ল, অথচ সংসার থেকে তফাৎ। পয়সা দিয়ে একজনকে বিদায় করা যায়। ভার নেওয়া বড় শক্ত কথা। সকলের ওপর ভালবাসা নিয়ে লড়তে হবে।

নিম্ন স্তরের সাধনের কথা উঠিয়াছে।

ঠাকুর। হ্যাঁ আছে। তাতে শক্তি টক্তি লাভ হয়। কিন্তু ওপর শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য প্রচার করতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ষাট হাজার শিষ্য। দেখলেন, এক কাপালিক মদ্যপান করছে, নরকপাল হাতে। বললেন, 'একি অনাচার ? তুমি কি ব্রাহ্মণ ?' সে বললে, 'হ্যাঁ আমি ব্রাহ্মণ'। তিনি বললেন, 'ব্রাহ্মণ হ'য়ে ভ্রষ্টাচার!' তখনই শিষ্যদের হুকুম দিলেন, 'লাগাও কোড়ার প্রহার।' ষাট হাজার শিষ্য কোড়ার প্রহার দেবে। কাপালিক তখন মদ্যপান ক'রে হুঙ্কার দিলে। এক ভৈরব এসে উপস্থিত। বললে, 'শঙ্করাচার্য্য আমায় মারছে। রক্ষা কর।' ভৈরব বললে, 'আমি শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে পারব কেন ? তুমি আমার প্রসন্নতার চেষ্টা করেছ, আমি প্রসন্ন আছি। আমি কি বলেছি—তুমি মদ খাও, যা খুসী কর, নিজের নীতি ছেড়ে দাও ? শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে আমি পারব কেন ?'

আবার সাধুর ওপর আক্রোশের কথা উঠিতে ঠাকুর নিজের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। আমাকেও বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল। কাশীতে এক জায়গায় খেতে বলেছিল। আমি যাচ্ছিলুম। বাড়ীর কাছে গেলে আদেশ হ'ল, 'খেও না, ফিরে যাও। তাই ফিরে এলুম। পরে জানলুম, তারা বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল।

গোপেন। সাধুরা কি বিষ হজম করতে পারে না ?

ঠাকুর। সে আলাদা কথা। আমি আরও দু'বার বেঁচে গেছি। সে সাপের মুখ থেকে। আগে দেশে থাকতে। দু'বার গোখরো সাপের ওপর দাঁড়িয়েছিলুম। একবার হ'ল কি, বাড়ীর পাশে অপর বাড়ীতে আগুন লাগল। আমি আমাদের বাড়ীর ভেতরে ছিলুম। চীৎকার শুনেই বাইরে আসছি। মাঝে একটি ঘর ছিল, এমনি পড়ে থাকত। পুরাণো বাড়ী, সাপটাপ থাকতে পারে, তাই সে ঘরে একটি আলো দেওয়া থাকত। আলোটা তখন নিভে গেছে। তাড়াতাড়ি আসছি, জুতোও পায়ে দিই নি। সে ঘরে এসে দেখি, পায়ের নীচে কি একটা ঠাণ্ডা আর নরম বোধ হ'চ্ছে। ডাকতেই সব আলো নিয়ে এল। দেখি, একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ! আমি তখনও তার ওপর দাঁড়িয়ে! তারপর চলে যাচ্ছে। ওরা সব মারতে চাইলে। আমি বললুম—দেখ, যদি ও কামড়াত তবে তোমরা আমার পাত্তাই পেতে না। সে আমার কিছুই করলে না, তোমরা এখন বীরত্ব করতে এসেছ। সাপটা জানালা দিয়ে চলে গেল। আর একবার ছোট বেলা—তখন দশ বার বছর বয়স। ছেলেদের সঙ্গে খেলছি। ইটের গাদা ছিল। আমি তার ওপর দাঁড়িয়ে। চাকর বারণ করছে, ওখানে সাপ আছে নেমে আসুন। তাকিয়ে দেখি, সাপ একটা পায়ের কাছে ইটের ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে আছে : কামড়ায় নি। সেটাকে ছেলেরা মেরে ফেললে। আমি বারণ করলুম, শুনলে না।

গোপেন। সাপ ত গেল। এখন দেহটা জ্বর-মুক্ত হ'লেই যে বাঁচি।

ঠাকুর। গেলেই পারে। জ্বরকে ত বলি নি বাপু 'এস', এখন যেতেই বা কেন বলব?

গোপেন। এ একটা চিন্তা বেড়ে গেল। আমরা চিন্তা কমাতে আসি তা বেড়েই যায়।

ঠাকুর। কেন চিন্তা করছ? আমি ত 'আহা, উহু' করছি নে। খাসা তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করছি। তবে তোমরা কেন চিন্তা কর? 'জরা, মৃত্যু, ব্যাধি দেহের ধর্ম্ম, আমি তার কি করব'।

কালীবাবু। অন্য সব বিষয়ের চিন্তা আপনি করছেন। এটাও না করলে কি ক'রে হবে?

ঠাকুর। আমি ত জানি, আমি কিছুই করতে পারি না।

কালীবাবু। আমরা বলি কমে যাক।

ঠাকুর। তোমরা বল ত কমে যাবে। আমি ত বলছি না বাড়তে।

কালীবাবু। আপনি যদি বলেন যে আমরা বললে হবে, তবে বলি।

ঠাকুর। আমি কি বলব? তোমাদের ভাব হ'তে পারে। হয় ত তোমাদের টানেই এই দেহ রয়েছে। আগেই ত যেতে পারত।

বলিতে বলিতে ঠাকুর গান ধরিলেন :—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা।

ইত্যাদি। —(৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া 'মা মা', 'আনন্দম্ আনন্দম্', 'ওঁ-তৎ-তৎ' প্রভৃতি আনন্দ-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন।

আজ জ্বর দেখা হইল। ৯৯.৮ ডিগ্রি আছে। কিন্তু এতক্ষণ কিছুই টের পাওয়া যায় নাই। ঠাকুর স্বাভাবিক ভাবেই বেশ আনন্দের সহিত আলাপ করিতেছেন।

৯৷৷টা বাজিল। অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—অষ্টম অধ্যায়।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২রা মে, ১৯২৬ ইং ;
রবিবার, কৃষ্ণা-পঞ্চমী।

কলিকাতা।

রিপু ও প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি—সমাজনীতি—ভগবানের বাজে সৃষ্টি—কৃপা—অর্থ ও সৎকাজ—সংসারীর কর্ত্তব্য ও লর্ড বেকনের কথা—লর্ড কার্জ্জনের কথা—কাফের শব্দের অর্থ—সাধনা কেন? প্রারব্ধ, পুরুষকার ও কৃপা—পাপ পুণ্য—রকম রকম কাজে রকম রকম নীতি—পোষাক ও ভালবাসা—অভ্যাস যোগ—স্বর্গ, নরক—ভোগ মনে—সূক্ষ্ম দেহ, মৃত্যু ও আত্মা—শ্রাদ্ধ—জরৎকারুর কথা—কীর্ত্তন।

আজ সকালে ঠাকুর কালীঘাট হইতে আসিয়া একটু বসিয়াছেন। এখনই আহার করিবেন। গোপেনও আসিয়াছে, মঠে ঠাকুরের প্রসাদ পাইবে। গোপেনের খুব উৎসাহ। আসিলেই কেবল ধর্ম্ম-কথা। ঠাকুরও তাহাকে পাইলে বেশ আনন্দিত হন।

ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, পল্টু ও সত্যেন বসিয়া আছে। কথা হইতেছে।

গোপেন। আমরা অত বুঝি না। জল তেষ্টা, জল চাই।

ঠাকুর। বললেই ত চট্ ক'রে হয় না। বাসনা-কামনা বাধা দেয়। রিপুর হাত থেকে রক্ষে না পেলে ত হয় না। তাই সাধনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দ্বার,
এরাই গাণ্ডীব-ধারী, আত্মজ্ঞান-নাশকারী,
এই তিনে অর্জ্জুন কর পরিহার।

আবার বলেছেন, কাম, ক্রোধ ও লোভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।

গোপেন। তাঁকে পেলে ত সব যায়।

ঠাকুর। হ্যাঁ, যায়। পাওয়া ত বললেই হয় না। সে জন্যে সাধনা। তাই আছে,—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ (মন রে আমার) জ্ঞান-সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া বলেছে। প্রথম ভার্য্যার সন্তান। প্রথম ভার্য্যা হ'চ্ছে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান কারা? কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুরা। তাদের দূর হইতে বুঝাইবি। দূর হ'তে কেন? কারণ, বিষ যদি খেয়েই ফেললে তবে জানলেই বা কি হবে? মরে ত গেলে। কাম-ক্রোধের কাজ যদি হ'য়ে গেল তবে বুঝিয়ে কি হবে? কাছে গেলে আকর্ষণে পড়ে যেতে পার, তাই দূর থেকে। অবস্থা না এলে, তৈরী না হ'লে, কাছে যেতে নেই।

দেখ, প্রধান হ'চ্ছে সঙ্গ। **সৎসঙ্গ মায়ার হাত থেকে বাঁচবে।** মায়ার আকর্ষণ বড় ভয়ানক। এজন্যে মহামায়ার শরণাগত হওয়া। সৎসঙ্গে দৃঢ়তা আসবে। লোকের কথায়, সমাজের কথায় কান দেবে না।

সমাজ-নীতির কথা উঠিয়াছে।

গোপেন। সমাজের নীতিমত না চললে সমাজে থাকা কঠিন হয়।

ঠাকুর। সমাজে নীতি ত অনেক রকম আছে। দেখ, কতক নীতি আছে, তাদের বিশেষ ভিত্তি নেই; যেমন, মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত বড় লজ্জার বিষয়। মেয়েরা গান গাইবে, বড় ভয়ানক কথা। এদিকে খুব ঝগড়া করছে, তাতে দোষ নেই। ভালটার বেলাই যত গোলমাল। সঙ্গীত তাঁর জিনিষ। আমি ভাগবত সঙ্গীতের কথাই

বলছি, যা তা গান নয়। সঙ্গীত সামবেদের অঙ্গ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পন্থা। গান মনকে একাগ্র করে, কুভাব নষ্ট করে। এ হ'ল খারাপ। এই ত তোমাদের সোসাইটি (Society সমাজ)। সৎনীতিও অনেক সময় সোসাইটির দোষে নষ্ট হয়।

নানান প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এ ক'দিন খুব মশা হয়েছে। সে কথা উঠিতে গোপেন জিজ্ঞাসা করিল।

গোপেন। কীট, পতঙ্গ, এদের কর্ম্মফল নেই? এই মশা যা তা করছে। এ সব বাজে সৃষ্টি। এদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

ঠাকুর। হ্যাঁ; এক ডাক্তার আমায় এসে বললে, একজন শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলা লেক্‌চার (বক্তৃতা) দিয়েছেন যে, ভগবানের অনেক বাজে কাজ আছে; যেমন সমুদ্রে বৃষ্টি। এ কেন? সমুদ্র বিশাল জলাধার, সেখানে আবার বৃষ্টি কেন? ডাক্তার আমায় বলছে, দেখুন, কি সুন্দর বলেছেন। আমি বললুম, দেখ ডাক্তার, এতে তাঁর যে সাধারণ বোধেরও অভাব, তারই পরিচয় দিচ্ছেন। তোমাদের ধারণা, জল কেবল নাওয়া, খাওয়া, বাসন মাজা, এই কাজেই লাগে; আর এর কিছু দরকার নেই। জলে সমস্ত পৃথিবীর ময়লা ধুয়ে সমুদ্রে নিচ্ছে। কত পয়জন (poison বিষ) নষ্ট করছে। এসব জিনিষ সমুদ্রে যাচ্ছে। সেখানে বৃষ্টির ফ্রেশ্ (fresh টাটকা) জল না হ'লে সমুদ্রের জল সব নষ্ট হ'য়ে যেত। সমুদ্রে আবার বাড়বানল প্রভৃতি হয়। বৃষ্টির জল সে সব ঠাণ্ডা করে। স্থূল বুদ্ধির ওপর কথাটা বলেছে। **সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে তাঁর কাজের বিচার করতে নেই।**

ভীষ্ম হেন লোক তাঁর মহিমা বুঝতে পারলেন না, মরবার সময় কাঁদছেন। সাধারণ জীবের ত কথাই নেই। ভীষ্ম শরশয্যায়। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি সব আছেন। ভীষ্মের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দেখে, অর্জ্জুন বলছেন, কি! পিতামহ ভীষ্মের শোক

কেন? কৃষ্ণ বললেন, জিজ্ঞাসা কর না। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, পিতামহ! আপনার শোক কেন? ভীষ্ম বললেন, অর্জ্জুন, আমি শোকে কাঁদছি না। স্বয়ং কৃষ্ণ তোমাদের সহায়, তবু ত দেখছি দুঃখের ইতি নেই। তাঁর মহিমা এখনও বুঝতে পারলুম না। এই ভেবে আমার চোখে জল পড়ছে। তা দেখ, সাধারণ তাঁর কি বিচার কি করবে!

ডাক্তার সাহেব। কালই ত কথা হ'ল। বশীবাবু বলছিলেন ভগবানের স্বেচ্ছাচারিতা।

ঠাকুর গত কল্যের কথা সংক্ষেপে বলিয়া গুরু এবং বিধাতা পুরুষের গল্প বলিলেন।

গোপেন। যাক, আমাদের শীঘ্‌গির একটা ক'রে দিন। আমরা হাকিম মানুষ adjournment (মুলতুবি) ভাল লাগে না। শীঘ্‌গির দুটো একটা উদ্ধার হ'য়ে গেলেই হয়।

ঠাকুর। দেখ, একটা সাক্ষী একটা আসামী হ'ল, বিশেষ জেরা নেই, মোকদ্দমা শেষ হ'তে পারে। মেলা সাক্ষী জুটলে কি করি?

গোপেন। নিয়ম আছে, murder case (খুনের মোকদ্দমা) দু'মাস শেষ করতেই হবে।

ডাক্তার সাহেব। এতেও আছে, শরীর বদলে যায়। শীঘ্‌গির ভোগ হ'য়ে যায়। মনে করলেই ত সব হয়। বিবেকানন্দ বলেন, ওখানে বসে ভাব তুমি মুক্ত, মুক্তই হ'য়ে যাবে।

গোপেন। আসল কথা, তাঁর ইচ্ছা নানারকম নিয়ে খেলবেন, নয়ত সৃষ্টি থাকে না। তবে ওঠবার উপায়ও ত করা চাই।

ডাক্তার সাহেব। ঐ ত সিঁড়ি দিয়েছেন।

গোপেন। তাইত অত সিঁড়ি দেখে লোক যায় না, ফিরে আসে।

ঠাকুর। দেখ ফিরে যাবার জো নেই। যদি জান ওপরে বাবু আছেন। বাবুর কাছে টাকা আছে, তোমারও প্রয়োজন আছে, উঠলেই দেবেন, তবে কি ফিরে যাও? কারও পায়ে হয়ত বাত, নড়তে পাচ্ছে না, তবু-যাবে। টাকার লোভ।

গোপেন। বাবু ত কৃপা ক'রে নীচে নেমে আসতে পারে।

ঠাকুর। পারেন; উপযুক্ত মনে করলে নীচে এসেও দেন। এখন সবাইকে নীচে এসে দিলে ত বাবুকে নীচেই বসে থাকতে হয়। ওপরে যাবার দরকারই হয় না। তবে ত ফুটপাতে বসতে হবে (সকলের হাস্য)।

গোপেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি ঘোরাবেন। যাব আসব, আর কি করব।

ঠাকুর। বাসনা যে ক'রে ফেলেছ অনেক। অনেক জিনিষ ধ'রে ফেলেছে। আবার না দিলে লোক চটে যায়। তবে তিনি বুঝে দেন। যীশাসের কথা আছে—ছোট ছেলে ক্ষুধা পেলে খেতে চায়; বাপ কি তখন তাকে ষ্টোন (Stone-পাথর) দেন? তা দেন না। সুস্বাদু আহারই দেন।

গোপেন। ইচ্ছা ক'রে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে বসে থাকি। উঠান রয়েছে। মাছ উঠবে, টাকা আসবে। (বিধাতা-পুরুষের গল্পে আছে)।

ঠাকুর। তা আসে। সবারই উঠানে আসতে হয়। তবে কেউ অনেক ছুটোছুটি ক'রে আসে, কেউ বা সোজা নেমে গিয়ে বসে।

বাসনাই ত দরিদ্রতা। দরিদ্রতা বলে ত কোন জিনিষ নেই।

গোপেন। নিজের জন্যেই কি সব বাসনা?

ঠাকুর। নিজের জন্যেই ত। পরের জন্যে আর কোথায়? পরের ওপর আশা রেখেছ তাই তার জন্যে করছ। চাকর বাসন মেজে না দিলে তাকে খেতে দাও কি? নিজের স্বার্থ রয়েছে।

গোপেন। একঘর টাকা হ'লে খুব নিষ্কাম কর্ম্ম করা যেত।

ঠাকুর। একঘর টাকা চাই এও ত কামনা।

গোপেন। সৎকাজের জন্যে।

ঠাকুর। একঘর টাকায় আর কত সৎকাজ করবে?

গোপেন। যতদূর সম্ভব।

ঠাকুর। তা এখনই যা সম্ভব তাই করনা কেন? যা তেল আছে তারই আলো জ্বালাও। ন'মণ তেল পুড়বে তবে রাধা নাচবে, তা কেন?

আর তোমার কাজের জন্যে জগতের আটকাচ্ছে না। তবে তোমার শান্তির জন্যে কাজ। **কামনা-বাসনা থাকতে, সৎকাজ হয় না।** লোকে ভাবে, টাকা হ'লেই এ করব সে করব। টাকা যখন এল তখন বেঁকে বসল। অসৎ কাজই করে।

এই সংসারে চেষ্টা করবে ম্যানেজারের মতন থাকতে। সামর্থ্যে যা আছে করবে। মেলা ভেব না। তা হ'লেই শান্তি ঠিক আসবে।

গোপেন। আচ্ছা দেখুন, একজন আমায় বলছিল, এ সব কি ধর্ম্ম করছ? বিবাহ করেছ, ছেলে পিলে আছে; তাদের দেখ শোন, সুখে রাখ, এই তোমার ধর্ম্ম।

ঠাকুর। যুক্তি খুব ভাল। আগে দেখ, সে কেমন রেখেছে; সেটা খোজ নাও। তাকে বল, তুমি ত বাপু, ভগবানকে ডাকছ না। আমি না হয় ডেকে অন্যায়ই ক'রে ফেলেছি; ক'রে ফেলেছি তা কি করব? তা তুমি না ডেকে কতটুকুন করলে? গতর ত নষ্ট হ'ল, সুখের কতদূর হ'ল?

গোপেন। একজন আমায় বলেছিলেন, যে লোক স্ত্রী-পুত্রকে যত্ন করে, লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা থাকে।

ঠাকুর। সংসারীদের ওই একরকম কথা। এই যে উপদেশ দিয়েছে, এতে ত ৯৯ পারসেণ্ট (শতকরা নিরনব্বুই জন) চলছে। উপদেশ দেবার আগেই চলছে। কতদূর সুখে শান্তিতে তারা তাদের পরিবারকে রেখেছে? মায়ার আকর্ষণে স্বতঃই মনকে ওদিকে নিয়ে যায়। পশু,

পক্ষী, সেও তার শাবক ও স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, আহার যোগায়। সকলেই দিনরাত তার পরিবার ছেলেকে সুখে রাখবার জন্মে কতই চেষ্টা করছে। কিন্তু সব সময় সকলের ঘরে কই লক্ষ্মী বাঁধা থাকে? তাদের সুখে শান্তিতেই বা রাখতে পারে কই?

শান্তি অশান্তি প্রালব্ধ কর্ম্ম। এ মনের একটা অবস্থা। বাসনা অধীন না হ'লে শান্তি হয় না। এ লেকচারে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর সংসার জগতের সূক্ষ্মতা বোধ কম। ঠিক্ ভাবে সংসারের উপলব্ধি হ'লে আর এসব কথা মেলা বলতেন না।

গোপেন। যারা অর্থ নষ্ট করে তাদেরই বলছেন।

ডাক্তার সাহেব। সে আলাদা কথা। ভগবানকে ডেকে ত নষ্ট হয় না।

ঠাকুর। ছেলে যদি তার পুত্র-কন্যাকে রেখে বাপ মার কাছে যায়, তাতে কি তার পুত্র-কন্যা কষ্ট পায়? বাপ মাই যে তাদের দেখেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে সকলের বাপ। তাঁর কাছে গেলে কি দুঃখ আসে?

গোপেন। গেলেই ত পায় না। কাঁদলে শোনেন কই?

ঠাকুর। দরকার মত শোনেন। যা খুসি তা চাইলে কেন শুনবেন?

গোপেন। বাপ ছেলেকে যা খুসি তা তৈরী করেছেন। তাই যা তা চায়, না পেলে দুঃখ আসে।

ঠাকুর। বাপ ঠিক্ আছেন, ঠেকে শিখবে, তাই দুঃখ কষ্ট দেন। অনেক ছেলে আছে এমনি শোনে না, হাত পা ভাঙ্গলে শোনে।

ডাক্তার সাহেব। আর্ত্তই তাঁর দিকে বেশী যায়।

গোপেন। তিনি যখন শোনাতে পারেন, তখন সবাইকে জোর ক'রে শোনান না কেন?

ঠাকুর। তবে ত সৃষ্টিই এক ঘেয়ে হ'য়ে গেল। সৃষ্টির সব ত উপলব্ধি করতে হবে। সবাই চোখ বুঝে আছে। বাপ সোহং, ছেলে

সোহং, তবে ত ভগবানই মাটি (সকলের হাস্য)। ছেলের আবশ্য আব্‌দার অভিমান আসে।

গোপেন। এখানে আসতেই কত রকম বাধা। সংসারে বদ্ধ হ'য়ে আছি। সংসারটা মনে হয় যেন একটা পাতকূয়া।

ঠাকুর। সংসারটাকে পাতকূয়া ক'রে ফেলেছ; সংসার ঠিক্ পাতকূয়া নয়। সে রকম গড়ে ফেলেছ।

গোপেন। সবাই ত তা বলে।

ঠাকুর। সবাই যে সেই।

গোপেন। যে ঢোকে সেই ত বলে।

ঠাকুর। যে ঢোকে সে নয়, প্রায়ই বল। সংসারে স্বাধীন না থাকলে বিপদ। আমি একটা কাজ করব, হবে না, আর একজন আমাকে দিয়ে তারটা করিয়ে নেবেন, সারাদিন তারই হুকুম তামিল করছি, সে সংসার আমি করিনি। আমার মনস্থ পূর্ণ হবে, তোমারও হোক ক্ষতি নেই।

গোপেন। তবে ত কোলাহল।

ঠাকুর। কোলাহল কতক্ষণ থাকে? দু'পক্ষ না হ'লে ত কোলাহল হয় না। একপক্ষ হ'লে ক্রমে নিঃশব্দ হ'য়ে আসবে। গোড়া থেকে ধরলে কোলাহল হ'ত না। আগে থেকে বোঝালেই ঠিক্ হ'ত। তুমি শক্ত হ'লেই সব ঠিক্ হবে। তবে দেখবে, মূলে যেন ক্ষতি না হয়। খাওয়া পরার যেন কষ্ট না হয়। আর সব ত বাসনার কোলাহল। বাসনা কত পোরাবে? বাসনার শেষ নেই। মূল ধর। আর মরা জানলে তাকে কে ধরবে? জ্যান্ত জানলেই না বলে। বাসনা মেটাতে গেলেই বিপদ। দেখ, কোথাও গেলে কেউ বললে একসের সন্দেশ আনতে, আনলে। তারপর বলবে, দু'সের এন, তারপর দশসের। কারণ জানে, চাইলেই পাওয়া যায়। আর গোড়াতে ঐ একসেরই যদি না আন তবে আর চাইবে না। জানবে, এখানে সুবিধা হবে না। আমার ওই পলিসি

(policy-নিয়ম) ছিল (সকলের হাস্য)। তাই আমি সংসারে কখনও ভুগিনি।

গোপেন। Lord Curzon (লর্ড কর্জ্জন) বলেছিলেন, আমার plenty of cash আর freehand (খুব টাকা আর মুক্ত হস্ত) হ'লেই সুখী হ'তাম।

ঠাকুর। তিনি বলেছেন, বেশ কথা। যার যা ভাব; যে যেভাবে সুখী হয়। তবে পূর্ব্বে সংস্কার বশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত হয়। মুক্ত না হ'লে অর্থ থাকলেও ব্যয় করতে পারে না। সুখ ত বাসনা-পূরণের নাম? তা বাসনা অধীন না হ'লে সুখী হয় না। কারণ বাসনা অনন্ত, একটার পর একটা আসে। সব অবস্থায় মনকে স্থির রাখার নামই সুখ।

গোপেন। টাকা ছাড়া তবে সংসারে সুখ কি হ'ল?

ঠাকুর। টাকা নিয়েই বা কই সুখী হ'লে? কেবল অসুখই আসবে।

গোপেন। তবে আর পরিবারের কর্ত্তা কি? কর্ত্তার ত সব করতে হবে?

ঠাকুর। কর্ত্তা কোথায়? চাকরেরও অধম। টাকা রোজগারের একটা কল। ছেলে পরিবার মেড়ে মেড়ে খাবে। কৃপণতা করে দুঃখ দিতে আমি বলছিনে। যা আছে তাই দাও। সোণার নেক্‌লেস আছে, তার ওপর হীরের চাই। আছে, আবার কেন? বাসনা পোরাতে গিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এর মধ্যে যেতে আমি রাজী নই। আমি বইএর উপদেশ দিই না। আমার সব প্র্যাক্‌টিকেল (practical-যা কাজে করেছি) উপদেশ (সকলের হাস্য)। মানুষ মানুষের মতন থাক। ক্ষুধার আহার, লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র, এর জন্যেই দাসত্ব স্বীকার ক'রে ফেলেছ, এই যথেষ্ট। আবার গোলামের গোলাম হ'তে চাও কেন? তিনি ঘুমিয়ে, স্বপ্নে তাঁর যা খেয়াল উঠবে চেয়ে বসলেন, আমাকে তা পোরাতে হবে। এজন্যেই তাদেরও (মেয়েদেরও) উপাসনা করাতে হয়। তবে কর্ত্তব্য বুঝবে। স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ

বুঝবে। তাদের ধারণা, বাসনা-পূরণ না করলে স্বামী ভালবাসে না। তা তুমি মর আর বাঁচ। এজন্যেই সাধনা। তা হ'লে বুঝবে। সে সব ভাব উঠবে। বাজে আব্দার করতে লজ্জিত হবে। দেখ, সীতার প্রচুর ছিল, তাই মণি, মুক্তা পরেছিলেন। আবার বনে যেতে সব বিলিয়ে দিলেন।

স্ত্রী কেন হ'ল ? পুত্র কেন হ'ল ? স্বামীকে, বাপকে রাতদিন জ্বালাবার জন্যে ? স্বামী হ'ল লোহার সিন্দুক, খুলবে আর টাকা নেবে। আর পিতা হলেন ব্যাঙ্ক, ছেলে চেক্ কাটবে আর টাকা পাবে। তাই বলি এজন্যে সাধনা। স্বামী প্রধান, প্রাধান্য ছাড়বে কেন ?

ঠাকুর মুখ ধুইতে উঠিলেন। ভক্তরাও প্রসাদ পাইতে নীচে গেলেন।

বৈকালে পাঁচটায় ভক্তরা সব আসিতে লাগিলেন। খিদিরপুর হইতে কালু, নন্দ, বিভূতি, হরিপদ, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানী-পুরের ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, অজয়, রাজেন, আশু, সত্যেন আছে। আরও দু'একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের কথা উঠিতে ঠাকুর কাফের শব্দের অর্থ বলিতেছেন।

ঠাকুর। মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারে যারা বাধা দিয়েছিল তাদেরই কাফের বলা হয়েছে। তারা ভগবান্ মানত না। আগে সব অগ্নি এবং নানা দেবতার উপাসক ছিল। যারা মহম্মদকে বাধা দিয়েছিল, বলেছিলেন, তাদের মার। কাফের মানে হিন্দু নয়। আগে ত হিন্দুস্থানে মুসলমান ছিল না। কাফের শব্দের ব্যবহার হবে কোথেকে ?

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। হিন্দুর অধঃপতন হ'লেও তাঁর দয়া এদের ওপর আছে। তাই এতদিন টিকে আছে। আবার হিন্দু জাগবে। তিনি যখন এতদিন এদের দেখেছেন, তখন এদের দ্বারা কোন মঙ্গল কার্য্য হবে।

পরে আর এক প্রসঙ্গ উঠিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল।

কিশোরী। জপতপের উদ্দেশ্য কি ?

ঠাকুর। দুটো আছে; এক আমরা দুর্ব্বল, মনের শক্তি নেই, যেটাতে যাই সেটাই পারি না। এজন্যে তাঁকে ডাকা। তাতে মনের শক্তি হয়। যে সব আবর্জ্জনা এসে মনকে ঢেকে দেয়, সে সব কাটে। আর আছে তাঁর নাম করতে ভাল লাগে। যাঁকে ভালবাসি তাঁর নাম করতে ইচ্ছা করে।

জ্ঞানী দেখে এ সব অনিত্য। সংসার ত বুঝছি; কিছুই থাকবে না। কিন্তু বুঝেও বুঝতে দিচ্ছে না। তাই সে মনের শক্তি করে। অনিত্য ছেড়ে নিত্য ধরবার চেষ্টা করে। আর ভক্ত ভগবানকে ধরে। তাঁর কৃপায়, তাঁর দয়ায়, এ জগতে শান্তি পাবে, তাই তাঁকে ধরে। জ্ঞানী বলে কাম, ক্রোধ, লোভ এরাই অশান্তির মূল। এদের সব নষ্ট করতে হবে তবে শান্তি পাব। ভক্ত অত বোঝে না। যাকে ভালবাসি তাকে চাই। অহেতুকী ভক্তিতে কেন চায় তাও বলতে পারে না। অথচ চাই।

কিশোরী। আমার মনে হয়, এই যে ডাকছি শান্তির জন্যে, এ যেন কষ্টে পড়েই ডাকা। যা হবার তা হবেই। এখন আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। সত্য ধরবার ক্ষমতা এলে সব বুঝব'।

ঠাকুর। বেশ, আসলে বুঝবে। সেটা হ'ল সবলতা।

কিশোরী। সে সবলতা কি ক'রে হবে ?

ঠাকুর। তাঁকে ডাকলে হবে। ভয় খেতে নাই। অধ্যবসায় নিয়ে চলতে হয়। আধার-বিশেষে অবস্থা। প্রকৃতিতে সুখ, দুঃখ আছে। দুঃখের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সাহস। আর না হয় তাঁকে ডাক। দুর্ব্বল রোগী ডাক্তারের শরণাগত হও।

কিশোরী। ডাক্তারের যে ক্ষমতা নেই।

ঠাকুর। তা নয়, তাঁর সব ক্ষমতাই আছে। ক্ষমতা না থাকলে তিনি ঈশ্বর কি ?

কিশোরী। তিনি যে দয়া করবেন, যা একবার ছেড়েছেন তার ফল কোথায় যাবে?

ঠাকুর। সবই ঠিক। এও ত জান, জেল দিলে জেল মাপ হয়। তাঁর দয়াতে সৎভাব এল, সে রকম চললে মাপ হ'য়ে গেল। বিচারক দয়া করলে জেল মাপ হয়। সে তাঁর তুলনায় কতটুকু? অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দয়া হ'ল, স্তূপাকার অগ্নির দয়া হ'তে পারে না? যাঁর থেকে দয়ার সৃষ্টি তাঁর দয়া হ'তে পারে না?

কিশোরী। সবাই দয়া পেলে ত সৃষ্টি যাবে।

ঠাকুর। তাকি হয়? সব কি তাঁর ভাবে যাচ্ছে? সবাই কি তাঁকে ডাকছে?

কালু। প্রালব্ধ ব'লে একটা আছে ত?

ঠাকুর। প্রালব্ধ ত জান না। প্রালব্ধ হবেই, এ হ'চ্ছে জ্ঞানীর কথা। যা হবে নিতে হবে, তবে খণ্ডনের চেষ্টা কেন? এ শক্তির কথা। দোষ করেছ, জজ জেল দিলে, খাটবে। কিন্তু যদি ভয় আসে তবে দরখাস্ত করতে হবে।

কালু। দরখাস্ত ক'রে কি হ'বে? যে জন্যে যত বৎসর নির্দ্ধারিত করেছেন তা না পূরলে কি ক'রে কমবে?

ঠাকুর। দেখলেন তার সে রকম বৃত্তি বদলে গেছে। তাই কমিয়ে দিলেন। শাস্তি কেন? শোধরাবার জন্যেই ত। শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্যে ত নয়। তোমার কর্ম্মের ক্ষয় হ'ল। অবস্থার দরুণ, কান্নার দরুণ প্রকৃতি বদলাল। যদি বোঝেন শুধরেছে, তবে ছাড়লেন।

কালু। প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে ভোগের অবসান হয় কি?

ঠাকুর। হয় বই' কি? তমোগুণে পশুর কাজ, রজোগুণে মানুষের কাজ, সত্বগুণে দেবভাবের কাজ। বদলে গেলেই হ'ল। আর তোমাকে দণ্ড দেবার ত ক্ষমতা নেই। তোমার বৃত্তিকে দণ্ড দেওয়া। তোমাকে দিলে যে তাঁকে দেওয়া হ'ল। তুমি যা ঠিকই আছ। বৃত্তি. গুণ. বদলায়।

কিশোরী। তিনি সৃষ্টি একবার ক'রে দিলেন। তাতে ত তাঁর হাত নেই।

ঠাকুর। হাত দেবার দরকার নেই। দরকার হ'লে হাত দেন বই কি? ভুল হ'লেই না নতুন ক'রে করেন। ভুল নেই, নতুন কেন? সব ঠিক্ আছে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। দেখ, দুঃখে সন্তুষ্ট থাকার নামই অবস্থা। অবস্থা লাভের আগে কর্ম্ম করতে হয়। খেলে পেট ভরে। খাওয়ার আগে চেষ্টা ক'রে আনতে হবে, রাঁধতে হবে, তবে খাওয়া। আনবার অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া। যতক্ষণ শান্তি না আসছে ততক্ষণ দুঃখ। দুঃখ কষ্টে যতক্ষণ না সুখ আসছে ততক্ষণ স্থায়ী সুখ নেই। এ দু'অবস্থায় হয়। যদি একজনকে পূর্ণভাবে ভালবাসতে পার তাতে দুঃখ বোধ থাকে না। সংসারকে ভালবেসে ত সব দুঃখ করছ। তা সওয়া হ'য়ে গেছে বলে দুঃখ বোধ হয় না। যার হয়নি সে সংসারে যেতেও মহাদুঃখ মনে করবে। আর নয় ত মনের শক্তি। এই এই উপদেশ পালন করব, এই ভাবে চলব। তবে সবলতা আসবে; একটা অবস্থা হবে। ভালবাসা যদি তাঁতে দাও তবে দুঃখ থাকে না। সুখ, দুঃখ ভোগে ত মন? সে মন রইল তাঁতে। সাধারণ ত সে ভালবাসা দিতে পারে না। নিজের কাছেই মন থাকে, চিন্তা এসে যায়। আর আছে তাঁর শরণাগত হও। তিনি মুক্তি দেবেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—অর্জ্জুন তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় পাপ থেকে মুক্তি দেব।

কিশোরী। চোর ডাকাতের পাপ-পুণ্য নেই?

ঠাকুর। পাপ-পুণ্য আলাদা। কর্ম্মফল আছে। এই কাজ তার এই ফল। আগুনে হাত দিলে পুড়বে, আবার বরফে হাত দিলে ঠাণ্ডা হবে। কার্য্য করেছে, তার ফল আছে।

কিশোরী। সে জন্যে কা'কেও দোষ দেবার নেই?

ঠাকুর। কষ্ট আসলেই দোষ দেবে। আর আনন্দ আসলে সুখ্যাত করবে।

কিশোরী। তবে পাপ-পুণ্য নেই?

ঠাকুর। তোমাকে একজন চড় দিলে, তোমার দুঃখ হ'ল, সে দুঃখটা যে চড় দিলে তাতে গিয়ে লাগল, তাই পাপ। বুদ্ধ বলেছেন,—যারা গরীব তাদের কোন শক্তি নেই বটে, কিন্তু তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস আছে। হাপরে যেমন লোহা গলায়, তেমনি নিরীহ দুঃখীদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমায় জ্বরিয়ে দেবে। পাপ-পুণ্য তারই নাম দিয়েছে। একটা চড় দিলে অপরের কষ্ট হ'ল, তার দুঃখটা তোমায় এসে লাগল, এই পাপ। আর সন্দেশ খাওয়ালে আনন্দ হ'ল, সে আনন্দটাও তোমায় এসে লাগল, সেই পুণ্য।

খিদিরপুরের ভক্তরা উঠিলেন। দাঙ্গার আতঙ্ক এখনও আছে। তাই সন্ধ্যার আগে যাইবেন।

কিশোরী। পাপ-পুণ্যের ভয় সে রকম না থাকলে ত নাস্তিকতা আসবে।

ঠাকুর। নাস্তিক হওয়া ত ভাল। কিছুই মানে না, সে ত ভয়ানক জ্ঞানী।

জিনিষ হ'চ্ছে তাঁর কৃপা। তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে কাঁদ।

কিশোরী। যে কাঁদে তারই হয়?

ঠাকুর। করুণার অর্থই ত তাই। করুণার কারণের উৎপত্তি হ'লেই করুণা হবে। কারণ ছাড়া কি ক'রে হবে?

কিশোরী। আচ্ছা, এক বাড়ীতে দশ বারটা ছেলে, সবাইকে একটা ধর্ম্মভাবে গড়তে চাই। না হ'লে ত দুঃখ হয়।

ঠাকুর। ভালর চেষ্টা সকলেতেই করতে পার। মূলে সবই ত এক, প্রকৃতি ত ধার করা। সোনাতে কাল দাগ লেগেছে, লোহা দেখাচ্ছে। প্রকৃতি লোহা নয়। কাল দাগটা উঠে গেলেই সোনা হ'তে পারে। সোনা না হ'লেই কঠিন। সকলের মধ্যেই সৎ আছে।

অসৎএর ময়লা পড়েছে। সৎএর চেষ্টা সকলেতেই করা যেতে পারে।

কিশোরী। চেষ্টা ত বাজেও হ'য়ে যেতে পারে?

ঠাকুর। তা ত তুমি জান না। যাঁরা চেষ্টা করে করেছেন তাঁদের দেখ। তাই বিশ্বাস।

প্রধান হ'চ্ছে সঙ্গ। মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে কাজ হয়। সৎ সঙ্গে প্রকৃতি বদলায়।

সুরথ, কালীবাবু, কালীমোহন, কানাই, শশি আসিল।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

তারপর ঠাকুর আপন মনে বলিতেছেন—

মন গরীবের দোষ কি আছে?

তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচে।

আর এক প্রসঙ্গ উঠিল।

কালীবাবু। মণির সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল যে, আমাদের দেশে সব তাতে ধর্ম্মনীতির দোহাই দিয়ে কতকগুলি দুর্ব্বলতার কাজ করেছে। নাটকে দেখলাম (ভাস্কর পণ্ডিতের কথা যাতে আছে), যুদ্ধের সময় নীতির দোহাই দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ রাখলে। সে সুযোগে অপর পক্ষ জিতে গেল। আমার মনে হয় রাজনীতি আলাদা, ধর্ম্ম-নীতি আলাদা। যে কাজের যা নীতি সে ফলো (follow-অনুসরণ) করা উচিত।

ঠাকুর। হ্যাঁ, সব জায়গায় সংস্কারিক ধর্ম্ম ভাল নয়। ধর্ম্মের ওপর রাজনীতি হ'লে রাজত্ব ভাল হয়। তবে এ যুদ্ধ বন্ধ রাখা টাখা, এসব হ'চ্ছে সংস্কারিক। এ জায়গায় সংস্কারিক পূজা কেন? পূজা ত তাঁকে ডাকা? মনেতেই তাঁর শরণাগত হওয়া যায়। সেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞে দেখ; ইন্দ্রজিৎ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা বর দিতে চাইলেন। বললেন, "আমায় অমর বর দাও।" ব্রহ্মা বললেন,

"তা পাবে না। তবে তুমি যজ্ঞ কর। যদি নির্বিঘ্নে করতে পার, তবে সে যজ্ঞ-খোঁটা দিয়ে লড়লে সবাইকে হারাতে পারবে। কিন্তু বিঘ্ন হ'লে পারবে না।" শত্রু সেই দুর্ব্বলতা জেনে নিলে। লক্ষ্মণ যজ্ঞে বিঘ্ন ক'রে ইন্দ্রজিৎকে মারলে। তাই ত যুদ্ধে অর্জ্জুনকে সংস্কারিক জিনিষ দিচ্ছেন না। উত্তেজিত করছেন।

রাবণ-বধের জন্যে রাম দুর্গা-পূজা করেছিলেন। তাঁর পূজা, সে আলাদা কথা। তাঁর শক্তিতে সব রক্ষা হবে। অসুরনাশিনী দুর্গা, "দুর্গমে জীব তরে বলে, দুর্গানাম ধরণীতলে।" তাই দুর্গার অর্চ্চনা। ভাস্কর তারই নকল করেছে। জিনিষ ত সব এক নয়। শুধু তাই নয়; রামের সহায় ছিল কত? বিভীষণ, লক্ষ্মণ, এরা সব রক্ষা করছেন। কেবল রাম তিন দিন পূজা করেছিলেন। ধর্ম্মই ভিত্তি ঠিক্ কথা। ধর্ম্ম ত এক রকম নয়। রকম রকম কার্য্যে রকম রকম ধর্ম্ম। এখন চাকরীতে যেতে হবে। ১০টা ৫টা আপিস। বেলা বারটা পর্য্যন্ত পূজা করলে সাহেব শুনবে কেন? চাকরী করতে হ'লে তারি মধ্যে সারতে হবে।

পুস্তু। ঠিক্ ঠিক্ পূজা করলে?

ঠাকুর। ঠিক্ ঠিক্ পূজা করলে চাকরীতে যাবে কেন? অভাবেই না চাকরী করে। ঠিক্ ঠিক্ পূজা করলে অভাবই থাকে না। অভাবই দরিদ্রতা। যার যেটা নেই সেটাই তার দরিদ্রতা।

পুস্তু। অনেক সময় মনে হয়, এটা না করলে লোকে কি বলবে? হয় ত জামা গায়ে না দিয়ে রাস্তায় বেরুলাম, লোকে কি ভাববে?

ঠাকুর। অপরের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। ভালবাসা, আদর যে খালি গায়ে আসে না তা ত নয়। তা'হলে আমাকে ত আদর মোটেই করত না। যখন জামা গায়ে দিয়েছি, তখন কেউ এত আদর করেনি। সব মনের ওপর নির্ভর করছে।

ঠাকুর একখানি মাত্র কাপড় পরিয়া থাকেন। তার খোঁটটা গলায় জড়ান থাকে। তাতেই দিনরাত, শীতগ্রীষ্ম, সব সময় চলিতেছে।

জামা অথবা অপর কাপড় গায়ে দিতেই পারেন না। গা জ্বালা করে।•

পুত্তু। কি ক'রে এসব ভাব যাবে ?

ঠাকুর। তাঁকে ডাকা। অবস্থার সঙ্গে সব সম্বন্ধ।

পুত্তু। ছোট বেলা থেকে সংস্কার থাকে।

ঠাকুর। ছোট বেলার সব সংস্কারই কি ভাল ? সংস্কার স্থায়ী বস্তু নয়। সংস্কার কর্ম্ম করায়, আবার কর্ম্মে তার ক্ষয় হয়।

পুত্তু। চেষ্টা ক'রেও ত হয় না।

ঠাকুর। চেষ্টা করেছ কি না দেখ। ক'দিন চেষ্টা করেছ ? জ্বর হ'ল, একদিন একটা পিল (কুইনাইন) খেলে ; গেল না ; ছেড়ে দিলে। তাতে কি হবে ? আরও খাও যে পর্য্যন্ত না সারে। বহুদিনের সংস্কার এক কথায় যায় না। বিশেষতঃ প্রাকৃতিক সংস্কার। অভ্যাসে যায়। অভ্যাস যোগ কৌন্তেয়। 'লগি রহো ভাই, বনাতে বনাতে বন যাই।'

জিতেন আসিল। তাহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

জিতেন। স্বর্গ আর নরক কি ?

ঠাকুর। সুখ আর দুঃখ।

জিতেন। এ জীবনেই ভোগ হয়, না জীবন গেলে ?

ঠাকুর। এ জীবনেই হয়। জীবনীশক্তি না থাকলে কি ভোগ হবে ?

জিতেন। তবে কেন বলে দেহান্তে ভোগ ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, দেহান্তে ; জীবনান্তে নয়। দেহ গেলেও জীবন থাকে।

জিতেন। আত্মা ত নিষ্ক্রিয় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ।

জিতেন। দেহ নাশ হয়, আত্মা থাকে ?

ঠাকুর। আত্মা ত থাকেই। সূক্ষ্ম দেহও থাকে।

জিতেন। দেহ গেলে ভোগ কি ক'রে হয়?

ঠাকুর। দেহ কি ভোগ করে? ভোগ করে ত মন। মন ত মরেনি। দেহ গেল।

জিতেন। মন কি ক'রে ভোগ করে?

ঠাকুর। ঘুমিয়ে যখন আছ, দেহ ত রইল। ভোগ হয়?

জিতেন। মনের ক্রিয়া ত থাকে না।

ঠাকুর। তবেই মন ভোগ করে। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহ থাকে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নিয়ে সূক্ষ্ম দেহ। তাতে মন থাকে, কামনা-বাসনা সব থাকে। জড়িত হ'য়ে থাকে।

জিতেন। আত্মাও জড়িত হ'য়ে থাকে?

ঠাকুর। আত্মা ত সর্ব্বময়। সবতাতে থাকে। কলসীর ভেতর শূন্য। ভাঙ্গলেও শূন্য রইল। বড় হ'য়ে গেল মাত্র। শূন্য ত রয়েছে। কলসী বেড় দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছিল। কলসী ভেঙ্গে গেল, শূন্য শূন্যই রইল।

জিতেন। আত্মা মিশে গেল?

ঠাকুর। মিশবে কোথায়? আত্মা কি অতটুকু যে মিশবে? আত্মা অনন্ত। শূন্য রয়েছে। ঘর দিয়ে মাপ। ঘর ভেঙ্গে দাও, অনন্ত শূন্যই রইল।

জিতেন। মনের অবস্থা এখন আর মৃত্যুর পরে কি একই থাকে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, একই থাকে। তোমার জামা ছাড়লেও তুমি ঠিক্ রইলে।

জিতেন। তবে মৃত আত্মারা অনুভব করে না কেন?

ঠাকুর। করছে, সবই করছে। তবে শ্রাদ্ধ তর্পণ কেন? মরা গরুতে ঘাস খায়?

জিতেন। খৃষ্টানেরা ত শ্রাদ্ধ মানে না।

ঠাকুর। আর একটা কিছু করে। প্রেয়ার (prayer-প্রার্থনা) করে। তাদের ভাবে তাদের, এদের ভাবে এদের।

জিতেন। আমরা যদি শ্রাদ্ধ ছেড়ে সামান্য উপাসনা করি?

ঠাকুর। কেন তা করবে? নীতি অনুযায়ী কাজ করবে। সামান্য করলে সামান্য পাবে। প্রেয়ারও (prayer-প্রার্থনা) ভক্তি-পূর্ব্বক না করলে কাজ হবে কেন? শ্রাদ্ধ মানে কি? শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্পণ। শ্রদ্ধা থাকল না, শ্রাদ্ধ কিসের? সে ত ভূতের বেগার।

জিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজও ত উপাসনা করে।

ঠাকুর। ব্রহ্মবিৎ হ'লে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় কাজ দেবে।

কালু। ব্রহ্মবিৎ হ'লে কে কার শ্রাদ্ধ করে।

জিতেন। মুসলমানদের?

ঠাকুর। তাদের নীতি অনুযায়ী তাদের কাজ হয়।

জিতেন। ব্রাহ্মণদের পৃথক্ ব্যবস্থা কেন?

ঠাকুর। অবস্থা অনুযায়ী। ব্রাহ্মণ মানে কি? সবল। ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণ। অবশ্য আজ-কালকার বামুনদের কথা বলছিনে। যে, যে পরিনাণ শক্তিসম্পন্ন, সে, সে পরিমাণ কাজ করবে। পৈতে গলায় দিলে ব্রাহ্মণ হ'ল না।

জিতেন। অপর একজন বিশ্বাস করে যদি বার দিনে শ্রাদ্ধ করে?

ঠাকুর। বিশ্বাস আলাদা কথা। তাতে সব হ'তে পারে। এখন দেখতে হবে, যেটাকে বিশ্বাস বলছি সেটা ঠিক্ বিশ্বাস কিনা, না ফাঁকি মারছি। তাঁর কাছে ত ফাঁকি চলে না। দেখ, ব্রাহ্মণ বলে হিংসা দ্বেষ কেন? তাঁরা মহাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের কার্য্য আর সাধারণের কার্য্য এক হবে?

এখন, ক্রিয়া না করলে কে কি করবে? আগুন না জ্বাললে কি হবে? তবে দেবভাষা সে রকম নীতি, তাতে যা ফল হয়। ঋষিরা ত লোক ঠকাবার ব্যাপার করেন নি। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। শক্তিসম্পন্ন হও, সে রকম ব্যবস্থা হবে। যদি তা হও তবে শ্রাদ্ধই বা অপরের করতে হবে কেন? পুৎ নামক নরকে গেলেই না পুত্র ত্রাণ করবে। নরকেই গেলে না, পুত্র কি করবে?

ঋষিবাক্য ঠিক্। সে অনুযায়ী কাজ করা চাই। দেখ, তখন যিনি কাজ করাতেন তিনিও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যিনি করতেন তিনিও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করতেন। তাতে কাজ হ'ত। এখন উভয়তই গণ্ডগোল। শ্রাদ্ধে ত কাজ হয়ই। সেজন্যে জরৎকারু বিবাহ করলেন। পূর্ব্ব-পুরুষেরা সব উর্দ্ধপদ হেঁটমুণ্ড হ'য়ে ছিল। জরৎকারু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কা'রা? তোমাদের এ দশা কেন?" তারা বললে, "আমরা জরৎকারুর পূর্ব্বপুরুষ। কুলাঙ্গার নিজের কাজ নিয়ে আছে, আমাদের কথা ভাবে না। পিণ্ড পাইনি তাই এ যন্ত্রণা-ভোগ।" জরৎকারু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসে পরিত্রাণ পাবে?" তা'রা বললে, "বিবাহ করলে পুত্র হবে, তবে কাজ হবে।" তাই বিবাহ করিলেন।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল, "আমার কথার অবাধ্য হ'লে তোমায় ত্যাগ করব, এই সর্ত্তে বিবাহ করতে পারি।" তাতেই তিনি রাজী হ'লেন। বিবাহ হ'ল। একদিন জরৎকারু বললেন, "আমার নিদ্রা এসেছে, আমি তোমার কোলে ঘুমুই। যতক্ষণ নিজে না উঠি আমার ঘুম ভেঙ্গ না।" শুয়ে আছেন। এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, স্ত্রী দেখলেন উঠছেন না। স্বামীর সন্ধ্যার সময় বয়ে যাচ্ছে তাই ভেবে জাগালেন। জরৎকারু উঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তুমি আমায় ডাকলে কেন?" তিনি বললেন, "সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, সময় যাচ্ছে ব'লে ডাকলাম।" তখন ডাকলেন, "সন্ধ্যা!" সন্ধ্যা এসে হাজীর। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি নাকি যাও?" সন্ধ্যা বললে, "সেকি! আপনার সন্ধ্যা না হ'তে কি যেতে পারি?" স্ত্রীকে বললেন, "কই সন্ধ্যা যাচ্ছে? তুমি আমার কথা অমান্য করলে, আজ থেকে তোমায় ত্যাগ করলাম।"

যে স্ত্রী স্বামীর শক্তি জানে না, সে কি স্ত্রী? অবস্থা না বুঝলে, স্বামীর ভাব না ধরতে পারলে সে স্ত্রীর মধ্যে গণ্যই হবে না।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টা বাজিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনের পর অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—নবম অধ্যায়।

২০শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৩রা মে, ১৯২৬ ইং ;
সোমবার, কৃষ্ণা-ষষ্ঠী।

কলিকাতা।

ধর্ম্ম ও অর্থ—নির্ভরতা—জিতেন—বিশ্বাস—কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও গুরুকৃপা—জনার অভিশাপ—জ্ঞানী ও ভক্ত—সাধনা ও সংসার-ত্যাগ, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি—চৈতন্যদেবের লোকশিক্ষা ও কার্য্য—বিশ্বাস, ভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত—নানক, তাঁহার পুত্রদ্বয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত—শঙ্করের শক্তি মানা—রাবণ, অন্তর্ভক্ত, বহিঃশত্রু।

বৈকালে পাঁচটায় ভক্তরা সকলে একে একে আসিতেছেন। ভবানীপুরের অজয়, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, আশু ও সত্যেন আছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি, গোপেন, তাহার বাড়ীর মেয়েরা এবং গোপেনের জামাই আসিয়াছে। আরও কয়েক জন ভদ্রলোক আছেন।

ঠাকুর শরীর ভাল নয়। পেটের গোলমাল হইতেছে। ঠাকুর গোপেনের জামাইকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব তাঁকে ডাকবে। তাঁতে মন রাখবে। খুঁটো ধরে ঘুরবে, তা'হলে সংসারে আছাড় খাবে না। ধর্ম্মটাকে বড় করবে, অর্থটাকে বড় ক'রো না। শাস্ত্রেই দিয়েছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম্ম আগে, পরে আর সব। ধর্ম্ম বড় করলে অর্থের অভাব হবে না। যে অর্থ আসবে তাতে শান্তি হবে। অর্থ বড় করলে কিছু অর্থ আসতে পারে, সেও ভাগ্যানুযায়ী, কিন্তু তাতে শান্তি হবে না। **আর তাঁতে মন রাখলে, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সংসার করান তবে অর্থ দেবেনই। তাঁতে নির্ভর করলে সব হয়।**

গীতাতেই আছে—

আমা ছাড়া অন্য কিছু নাহি জানে যেই জনা।
আমারি ধ্যানে রূপ করে উপাসনা॥
সেই যুক্ত যোগী, তার অভাব যা হয়।
নিজে চেষ্টা করি, আনি পূরাই তাহায়॥
উপস্থিত ধন তার করিয়া রক্ষণ।
দুঃখ নাশ করি আর দেই মোক্ষধন॥

বহাম্যহম্।

আমি তার সব বহন করি।

নানা কথা হইতেছে। কথায় কথায় ঠাকুর জিতেনের কথা বলিতেছেন। জিতেন, এলাহাবাদে সি, আই, ডি, ইন্‌স্পেক্টর (C. I. D. Inspector)। ঠাকুরের ওপর অগাধ ভক্তি বিশ্বাস।

ঠাকুর। জিতেনের খুব বিশ্বাস। ভাষায় নয়; স্থির বিশ্বাস। বিপদে পড়েও স্থির বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে।

বিপদে স্থির থাকতে পারলেই না বিশ্বাস। পাণ্ডবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অত বাঁধা ছিলেন কেন? কত বিপদ ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তবু কৃষ্ণ ছাড়া জানে না। সংসারীর বিশ্বাসই প্রধান জিনিষ।

গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে।

গোপেন। কর্ম্মফল কেউ এড়াতে পারেনি।

ঠাকুর। কি ক'রে বুঝে ফেললে এড়াতে পারেনি?

গোপেন। অনেক শিষ্য সদ্‌গুরু-সঙ্গ করেছে, তবু কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়েছে।

ঠাকুর। তা কি সব সময় হয়?

এই বলিয়া ঠাকুর গুরু ও বিধাতা-পুরুষের গল্প বলিলেন।

(১০৫ পৃষ্ঠা)

গোপেন। কর্ম্মফল যখন ভগবানের আইন, তখন ত মানতেই হবে।

ঠাকুর। অমান্য ত করছিনে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সব করতে পারেন। তিনি আইন ভাঙ্গতেও পারেন। সাধারণ পারে না। তাই ত বলছেন, অর্জ্জুন, আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় মুক্ত করব। **কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় হয়।** এর তিন অবস্থা দিয়েছে। এক—তীর যোজনা ক'রে ছুঁড়েছে; আর এক—যোজনা করেছে, ছুঁড়েনি; আর—যোজনা করবে বলে তূণে পোরা আছে। শেষের দুটোর ধ্বংস হ'তে পারে। যেটা ছুঁড়েছে সেটা লাগবে। কিছু ভুগতে হবে। গুরুকৃপায় ভোগের সময় কমে। ছ'মাসের জায়গায় ছ'দিন হ'য়ে গেল। আর দেখ, তাঁর নামে সবই হয়।

তারা নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
অনলে তৃণ যথা, হয় ভস্ম রাশি রাশি।

সাধারণ তাই বটে, ভুগতে হবে। কিন্তু অপর নিয়মও আছে। জজ হুকুম করলেন, দশ বৎসর জেল। কিন্তু আবার আপীল রয়েছে। হয় ত বরাতক্রমে রাজা জেল দেখতে গেলেন, কয়েদীকে খালাস দিয়ে দিলেন।

গোপেন। ওটাও তার কর্ম্মে ছিল।

ঠাকুর। সবই ত ছিল। কর্ম্ম ত কেউ জানে না। দেখছ দুঃখ রয়েছে। কর্ম্মফল ভোগ করছে। জান না ত তার আইটেম (item-দফা) কত। দশটাতে হয় ত পাঁচটা ভোগ হ'ল, পাঁচটা হ'ল না। একজনের সাত জন্ম অন্ধ হবার কথা ছিল। উপাসনা করলে, ছ'জন্ম কেটে গেল। যেবার অন্ধ হ'য়ে জন্মেছে সেবারই শুধু ভোগ হ'ল।

জ্ঞান শাস্ত্রে লিখেছে কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে। ভক্তিতে তা লিখেনি। জ্ঞানী বলছে, দেহ ভোগে। আমি ত নিত্য, নির্লিপ্ত।

কর্ম্মফল কি করবে? জ্ঞানী নিজের কাজ ক'রে চলে যায়। ভক্ত তাঁকে ধরে, তিনি সব ক'রে দেবেন।

আবার গুরু অনেক কর্ম্ম নিজের ওপর নেন। প্রবীর বধ হ'লে জনা অর্জ্জুনকে অভিসম্পাত করলেন। অর্জ্জুন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, "অর্জ্জুন, সরে এস।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন"? কৃষ্ণ বলছেন, "শীঘ্‌গির সরে এস, কথা বলবার সময় নেই।" সরে আসতেই দেখলেন গাছটি জ্বলে গেল। কৃষ্ণ বললেন, "বুঝলে কেন সরে আসতে বলেছি? জনা অভিসম্পাত করেছে। তার দীর্ঘনিঃশ্বাসে তুমি জ্বলে যেতে; সেটা ওই গাছের ওপর দিয়ে গেল। তাতেও হয়নি অর্জ্জুন, এই দেখ, আমার অর্দ্ধেক অঙ্গ পুড়ে গেছে।"

তাঁরা সেটা নিয়ে নেন। ছেলেকে লাঠি মারছে, ছেলের মাথায় পড়ছে, বাপ সেটা নিজে গ্রহণ করলে। ছেলে বেঁচে গেল।

জ্ঞানী ত তা চাচ্ছে না। তার অঙ্গ দগ্ধ হয় হোক। সে জানে দেহ অনিত্য, এর জন্যে শরণাগত কেন হ'তে যাব? দেহের দাসত্ব করব? তবে স্বাধীনতা কোথায়? আর পূর্ণভক্ত তারও এভাব থাকে না। তার দেহ, রোগ, ভোগ এসব চিন্তার সাবকাশই নেই। সে সব তাঁতে অর্পণ করেছে। তাতে যা দুঃখ আসে আসুক। গোপিকাদের কৃষ্ণের কাছে যাবার জন্যে বাঁধলে; সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। আবার ছুটছে। কৃষ্ণকে দেখলে সব ভুলে যায়। দুঃখ ছিল কি না, বেঁধেছে কি না, দেখা মাত্র সব ভুল। ভক্তের প্রথম অবস্থা অবশ্য আলাদা। ঠিক্ ঠিক্ যাতে এসেছে তার কথাই বলছি। তার সব তাতেই আনন্দ। সে জানে, দেহ ত আমার নয়, রোগ হ'লেই বা। এও ত তিনি দিয়েছেন। তাঁর যাতে আনন্দ সে আমি সহ্য করতে রাজী। ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত কি জ্ঞানী হওয়া শক্ত কথা। বুদ্ধ বলেছেন, সাধু কে? যে রোগ, শোক, আর অন্নাভাবে নিজের আনন্দ রক্ষা করতে পারে সেই সাধু। তা ভিন্ন সাধু-ভাবাপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু

সাধু হওয়া বড় কঠিন। সংসারীদের দু'টাকা কমলেই সর্ব্বনাশ। আর সাধু কাল কি খাবে জানে না। তাতেই আনন্দ। ভয় রাখে না।

সোমদেব। সংসার ছাড়লে আর সে ভাবনা থাকে না।

ঠাকুর। ছাড়াছাড়ি কি একটা অবস্থা ?

সোমদেব। সংসারী ত শুধু নিজের জন্যেই ভাবে না। ছেলে পরিবার রয়েছে।

ঠাকুর। আচ্ছা, ঈশ্বর-উপাসনা করে না এমন অনেক লোক ত আছে, যাদের সংসারে কেউ নেই, তাদের জিজ্ঞাসা কর দেখি নিজের জন্যে ভাবে কিনা। দিনরাত্তির ভেবে অস্থির হ'চ্ছে। কুকুর বেড়ালটা পর্য্যন্ত দুপুর রোদ্দুরে ছট্‌ফট্ করে খাবার সন্ধানে ঘুরছে। আর সাধুদের একটি পয়সা নেই। দাঁড়াও দেখি সে অবস্থায়।

গোপেন। সৎএ বিশ্বাস এলে তা হয়।

ঠাকুর। বিশ্বাস এলে ত সবই হয়। তোমরা ত বদ্ধ ভাবে সংসার কর। বিশ্বাস কই ? বিশ্বাস থাকলে ভয় আসবে না। মা বাপ আছেন জানলে কি ভয় হয় ? আর দেখ, ছেলে পরিবার ছেড়ে বনে গেলেই সাধু হয় না। আর ছেলে নিয়ে থাকলেই যে সাধন হয় না, তাও নয়। মনেই সব। তা'হলে কে সাধু ? বশিষ্ঠের দুই পুত্র, শিখগুরু নানকের দুই পুত্র; মহম্মদের চোদ্দটী স্ত্রী ছিল। কা'কে বলতে পার এ কথা ? তাঁরা ত সংসার রেখেই সাধন করেছিলেন।

গোপেন। চৈতন্যেরও স্ত্রী ছিল।

ঠাকুর। তাঁর বাপ, মা, স্ত্রী, সবই ছিল। তবে তিনি ছেড়ে গেলেন। বুদ্ধেরও স্ত্রী-পুত্র ছিল, তিনি তাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন। তাঁদের রাজত্ব ছিল, তাঁরা রাজত্ব ছেড়ে গেলেন। আর বশিষ্ঠাদি এঁদের খাবার সংস্থান নেই অথচ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কার্য্য। সংসার বলে কি আলাদা কিছু আছে ? বনের মধ্যে কি সংসার নেই ? সেখানেও মেয়ে পাখী, পুরুষ পাখী দুটোতে মিলে বাস করছে, বাঘ বাঘিনী রয়েছে, শৃগাল শৃগালী রয়েছে। সেখানেও ত বেশ সংসার। সংসার

ছাড়া কোথা? আবার জনক সংসারে থেকে রাজত্ব করেও মুক্ত, রাজর্ষি। আর ভরত রাজা সব ছেড়ে-ছুড়ে বনে গিয়ে কি হ'ল? হরিণ শিশুর পাল্লায় পড়ে হরিণ জন্ম। সংসার ত মনে। বাসনা কামনার দাস হ'য়ে সংসারে বদ্ধ থাকলে কি হবে? যে যার প্রালব্ধ নিয়ে এসেছে। তুমি তার কি করতে পার?

গোপেন। শিশুরও কি তাই?

ঠাকুর। সবই তাই। বাসনায় জড়িত হ'য়ে দুঃখ নিয়ে আসছ। এই বদ্ধতা। যদি টাকা দেন বেশ ত খাও। গুড়ের ডেলা খেলে কি ভগবান্ প্রসন্ন হবেন, আর সন্দেশ খেলেই দৌড় মারবেন? তবে যত কমে থাকতে পার। বাসনার দাস হ'য়ে থাকবে না। মা পোলাও পাঠাচ্ছেন খাও। আবার শাক ভাত এলেও দুঃখ করবে না। ঘাস খেয়ে যদি ভগবান্ পাওয়া যেত, তা'হলে গরুগুলিও পেত। তবে যত সহজে চালাতে পার। মন বিগ্ড়োবে কেন? **নির্ভরতা** কিন্তু ভয়ানক। রোগ হয়েছে, খেলে বাড়বে, তবু খেতে হবে। তিনি কি খারাপের জন্যে পাঠাচ্ছেন? বিচার রেখে খেলে ত লোভ এল। ভালটার বেলা আছি আর মন্দটার বেলা নেই?

গোপেন। নির্ভরতাই ত মুস্কিল।

ঠাকুর। সে অবস্থা না এলে হবে না। এটা ত নির্ভরতা নয়। ছেলের অসুখ, ডাক্তার দেখালুম, কিছুই হ'ল না, সবাই জবাব দিয়ে গেল। তখন বললুম, 'ভগবান্, তুমি ছাড়া গতি নেই।' সেটা বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস রাখব তাঁর ওপর। ডাক্তার কি করবে? সে নিজের বাড়ীতেই কিছু করতে পারে না। তবে নীতি, লোক দেখান ডাক্তার ডাকা, ক'রে গেলে। ভরসা তাঁর ওপর।

বিশ্বাস বড় শক্ত। প্রধান হ'চ্ছে সঙ্গ। তাতেই ক্রমে হবে। তা না হ'লে দেখ, পুরুষকারের কি কেউ কমতি করে? যত বি-এ, এম-এ সারাদিন ঘুরে ঘুরে মুখে রক্ত উঠছে। হয় ত পঁচিশ টাকার চাকরী পেলে। তার কি অসাধ বড়লোক হ'তে? তবু হয় না কেন?

গোপেন। শেষ অবতার চৈতন্যদেব। তিনি বললেন, তোরা হরিনাম কর্, মুক্ত হবি, সাধন করতে হবে না। এ ত সোজা, তবু কাজ হ'চ্ছে কই ?

ঠাকুর। সবই ঠিক্, বুঝলুম। এ হরিনামই ক'টা লোক করছে ? বিশবার 'শালা' বলছে ত দশবার 'হরি' বলছে। এত সোজা, তবু ক'টা লোক তাতে বিশ্বাস রেখেছে ? তিনি ত বলেছিলেন, "ভর যুবতীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, বল হরিবোল।" যা খুসী তাই ক'রে হরি নাম করুক। তবে তাঁর শক্তিতে বিকাশ হ'লে বুঝবে। ভর যুবতী কে ? না, মা বসুন্ধরা, স্থির-যৌবনা। মাগুর মাছের ঝোল কি ? না, প্রেমাশ্রুপাত। হরি বলে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদ।

তখন সব অশিক্ষিত সমাজ। বহুলোক মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে। তাদের ফেরাবার জন্যে যত সোজা ব্যবস্থা তাই দিচ্ছেন। ওরা লোভ দেখাচ্ছে—মুসলমান হও, পরী আসবে, ভোগ হবে। তার থেকে ফেরাবার জন্যেই সোজা ব্যবস্থা। সবাই ত বলছে—হরি বললে তরে যাব। বলেও বিশ্বাস হয় না কেন ? গিরীশ ঘোষ বলে গেছেন :—

এক নামে মুক্তি পায় নরে, এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
গোষ্পদ সমান তার এ ভব-সাগর।

তিনবার রাম নাম শুনিয়েছিলেন বলে গুহককে চণ্ডাল হ'তে অভিশাপ দিলেন। জিনিষ ত সব সোজা। তবে তার মধ্যে এমন বাঁকা দেওয়া আছে, যা ভয়ানক। সব অবস্থার ওপর।

গোপেন। বেশ ত মুসলমান হ'চ্ছিল, ভগবানের ক্ষতি কি ?

ঠাকুর। ক্ষতি নয় ; তবে যদি হরিনাম ক'রে আবার হিন্দু হয়, তাতেই বা ভগবানের ক্ষতি কি ?

গোপেন। চৈতন্যদেব হিন্দু **অবতার** হলেন কেন ?

ঠাকুর। দেশ, কাল, অবস্থানুযায়ী অবতারেরা দেহ ধারণ করেন। দেশের অবস্থার হানি, ধর্ম্মের গ্লানি হয়েছে, জাতি নষ্ট হ'চ্ছে। তা থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি এলেন। গীতায় ভগবান্ বলছেন,—যখন যখন

এ পৃথিবীতে ধর্ম্মের হানি হয়, এবং পাপ বৃদ্ধি হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, এবং পাপীদের ধ্বংসের জন্য আমি নিজ মায়া-বলে শরীর ধারণ ক'রে এই অবনীতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

গোপেন। মনে হয় যেন ভগবান্ হিন্দুদের ওপর পক্ষপাতিত্ব করেছেন। তাদেরই সব অবতার।

ঠাকুর। কেন মহম্মদও ত হলেন। যখন যার পালা। ধর্ম্মের যখন গ্লানি হয়, তখনই তিনি আসেন।

গোপেন। হরিদাসকে হিন্দু করলেন কেন ?

ঠাকুর। তিনি করেছেন কোথায় ? সে তার নিজের ভাবে গেল। যার যা প্রাণে চায় তা করবেন না ? জোর ক'রে ত করেন নি।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তি ও ভক্তের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত হওয়া কি সোজা কথা ? চৈতন্যদেবের এত ভক্ত, মোটে সাড়ে তিন জন ছিল **অন্তরঙ্গ**। মাধবীলতা স্ত্রী, তাই অর্দ্ধেক। মেয়েদের পুরো নয়, আধখানা। তাদের মায়া বেশী কিনা তাই আধখানা (সকলের হাস্য)। শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে ষাট হাজার শিষ্য ঘুরত, দশটি অন্তরঙ্গ ছিল। যীশাসের বারটি ছিল। ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত ক'টা ? **পূর্ণ বিশ্বাস না এলে সংশয় ওঠে।** এই হরিনাম করছে, ফোঁটা তিলক কাটছে, আবার বলছে, 'মহাপাপী'। বিশ্বাস কই ?

সেই একজন বৃন্দাবনে গিয়েছিল। জলতেষ্টা পেয়েছে। দেখলে একটি মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছে জল চাইলে। সে বললে, "আমি মুচি, জল দেব কি ক'রে ?" তা বললে, "বল— 'শিব'।" সেও বললে। তাতেই বিশ্বাস। শিব বলেছে, পবিত্র হ'য়ে গেছে। তার হাতের জল খেলে।

কবীর ছিলেন জোলা—মুসলমান। গঙ্গাতীরে বসে আছেন। এক ব্রাহ্মণ গঙ্গার জল চাইলে। কবীর একটি মাটির হাঁড়ি ক'রে জল দিলেন। ব্রাহ্মণ বললে, মেটে হাঁড়ীতে কি ক'রে খাব ? কবীর

বললেন, গঙ্গাজলের এই ক্ষমতা নেই মাটির হাঁড়িকে শুদ্ধ করে? তবে তোমায় শুদ্ধ করবে কি ক'রে?

স্থির বিশ্বাস না এলে ভক্ত হয় না।

নানকের দুই পুত্র ছিল। আর একটী অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল; সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকত, তাঁর খুব সেবা করত। পুত্ররাও সেবা করত। তবু তিনি ভক্তটিকে বেশী ভালবাসতেন। ছেলেদের দেখে হিংসা হ'ল। 'আমরা ওঁর ঔরসজাত পুত্র, সর্ব্বদা সেবা করছি, আমাদের সঙ্গে কিছু না। ও একটা কোথাকার কে, তাকেই ভালবাসেন। তার সঙ্গে যত ফুসফাস, পরামর্শ। আমরা কেউ নই?' নানক সেটা বুঝলেন। একদিন নানক ছেলেদের আর ভক্তটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছেলেরা সঙ্গে যাচ্ছে, ভক্তটি একটু পেছিয়ে আছে। তার একটু ভয় আছে, ওরা হিংসা করে, তাই সঙ্গে যাচ্ছে না।

যেতে যেতে দেখেন, পথে একটি মড়া প'ড়ে আছে। নানক বড় ছেলেকে বললেন, "এর খানিকটা খেতে পার?" ছেলেটি বললে, "সে কি? মড়া কি খাব, মড়া কখনও খায়! আপনি কি বলছেন?" নানক বললেন, "পার কি না?" সে বললে, "না, পারব না।" তারপর ছোট ছেলেকে বললেন, "তুমি পার?" সে ভাবলে, 'বাবা কি বাতুল হলেন না কি? মড়া খেতে বলছেন?' সেও বললে, "পারব না।" এমন সময় ভক্তটি কাছে এসেছে। নানক তাকে বললেন, "তুমি এ মড়াটি খেতে পার? সে বললে, "কোন্ দিকটা খাব বলুন।" নানক বললেন, "মাথাটা খাও।" কামড় দিতেই দেখে, মড়ার মাথা নয়, একতাল সুস্বাদু হালুয়া।

নানক বললেন, "কেন একে এত ভালবাসি দেখলে? তোমরা বিচার রেখেছ, বাবা অন্যায়ও বলতে পারেন। তাঁর মাথা খারাপ। তাই সব আদেশ পালন করতে নেই, বেছে পালন করতে হয়। আর এর পূর্ণ বিশ্বাস। এ জানে, ইনি যা বলবেন তা অন্যায় হ'তেই পারে না। অতএব বিচার-শূন্য।"

সকল ধর্ম্মেই দিয়েছে বিশ্বাস। মহম্মদও বলেছন, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস করলে বড় হবে।

শঙ্কর ত জ্ঞানী, তবু ভক্তি বিশ্বাস মেনে গেছেন। আগে শক্তি মানতেন না। কাশীতে চৌষট্টি ঘাটে গেছেন। গরম কাল, খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। ঘাটে নামছেন, আর তিনটে পৈঁঠা নীচেই গঙ্গা। কিন্তু মাথা ঘুরে ঐখানে বসে পড়েছেন। আর নামতে পাচ্ছেন না। এমন সময় দেখেন, একটি বৃদ্ধা এক ঘটি জল নিয়ে উঠছে। তাকে বললেন, "মা, আমায় একটু জল দিতে পার, বড় তেষ্টা পেয়েছে।" সে বললে, "তেষ্টা? তিনটে পৈঁঠা নীচেই ত গঙ্গা রয়েছে। নেবে খেতে পাচ্ছ না?" শঙ্কর বললেন, "না মা, শক্তি নেই।" তখন বৃদ্ধা বললে, "তুমি না শক্তি মান না?" বলেই অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তার পরই শঙ্কর শক্তি মানছেন। "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং" আরম্ভ হ'ল। বুদ্ধ অত জ্ঞানী, তবু জন্মান্তর মানছেন। পাঁচ শ জন্মের কথা লিখে গেলেন।

রাবণেরও বিশ্বাস ছিল। রাবণ ছিলেন, **অন্তর্ভক্ত বহিঃশত্রু**। ইন্দ্রজিৎ যখন বধ হ'ল, তিনি আবার যুদ্ধসজ্জা ক'রে অপর সব বীরদের পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এমন সময় মন্দোদরী এসে বলছেন, "তোমার কি এখনও ভ্রম গেল না? আবার যুদ্ধসজ্জা করছ? জান, রাম কে? সীতা কে? জান, রাম স্বয়ং ভগবান্, সীতা লক্ষ্মী। সীতাকে মাথায় ক'রে, রামের কাছে নিয়ে যাও। ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ভগবান্, তোমায় ক্ষমা করবেন। তোমার সব গেল, এত দেখেও বোধ হ'ল না?" স্ত্রীর উপদেশ শুনে রাবণের ক্রোধ হয়েছে। বলছেন, "মন্দোদরী, তুমি আমায় উপদেশ দিতে এসেছ? আমি জানি না রাম কে? আমি জানি না, তুমি জান? তুমি আমায় চিনতে পারলে না, সামান্য স্বামীর ছাঁচে আমায় গড়ে নিয়েছ; আমি কে তাই জানলে না, আর রামকে চিনে ফেলেছ? জান মন্দোদরী, রাম আমার জন্য এসেছেন? জান, তিনি আমায় কত ভালবাসেন? আমাকে

দেখলে তাঁর সীতা ভুল হ'য়ে যায়। আমার ওপর তাঁর কত দয়া! আমি যখন সংসার-মোহে বদ্ধ হ'য়ে আছি, আমার সম্পদ বাড়তে বাড়তে চলেছে, যেটা করি সেটাই হয়, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সব দেবতারা আমার আজ্ঞাকারী; লঙ্কাপুরীকে সুবর্ণ, মণি, মাণিক্যে সুশোভিত করেছি; মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ ভোগ করছি; পাছে এ সবে আমি ভুলে যাই, এ সম্পদে তাঁকে ভুলে থাকি, তাই তিনি সামান্য একটা বাঁদর দিয়ে লঙ্কাপুরী পুড়িয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, 'রাবণ! এ ঐশ্বর্য্য কিছু নয়। তোমার এত দিনের পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। আমায় ভুলে এ সব নিয়ে থেক না। এতে মন রেখ না, আমার ওপর রাখ।' কি অসীম দয়া! পাছে আমি তাঁকে ভুলে যাই, তাই তিনি চৈতন্য করিয়ে দিলেন। সীতা লক্ষ্মী তাও জানি। আমার রাজ্যে সব ছিল, সকল দেবদেবী ছিল, শুধু লক্ষ্মী ছিলেন না। তাই মা আপনি এসেছেন। তিনি স্ব ইচ্ছায় না এলে আমার কি ক্ষমতা তাঁকে আনতে পারি?"

"আমি রামের কাছে এ রকমে যেতে রাজী নই। কামনা-বাসনা নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাব না। তা'হলে তিনি ওই দিয়েই আমায় ভুলিয়ে দেবেন। কামনা, বাসনা—এই পুত্র-পৌত্রাদি। তাই এদের একে একে পাঠাচ্ছি। তাদের ধ্বংস হ'চ্ছে। তারাও তাঁর হাতে মরে যে শান্তির স্থানে যাচ্ছে, তা এমনি তারা পেত না। এরা সব যাবে। তখন কামনা-বাসনাশূন্য হ'য়ে আমি যাব, আর ফিরব না।"

রাবণ ছিলেন অন্তর্ভক্ত। রামও তাঁকে আসতে দেখে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করেছিলেন। এই ভক্তি, বিশ্বাস।

ঠাকুর বলিতে বলিতে আনন্দিত হইয়া গান ধরিলেন:—

কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে!

—(১৯ পৃষ্ঠা)

আবার গাহিতেছেন—

তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন।

—(১৩ পৃষ্ঠা)

এই গানটী ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভক্তরা সকলে বিমুগ্ধ-চিত্তে গান শুনিতেছেন। গান শেষ করিয়া ঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

প্রায় ১০টা বাজিল। অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—দশম অধ্যায়।

২১শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৪ঠা মে, ১৯২৬ ইং ;
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা-সপ্তমী।

কলিকাতা।

বিশ্বাস—স্বতঃ ভক্তি ও সংস্কারিক ভক্তি—সাধুর লক্ষণ—রিপু—কামিনী ও লজ্জা, শুকদেব—ব্রহ্মচর্য্য—'তিন' অঙ্কের বিশেষত্ব—ত্রিসন্ধ্যা—পুরুষকার ও নির্ভরতা—সেবা—যার ভাগ্যে যা আছে হবেই—ভগবানের নামেই দুঃখ যায়—ধনীর পুত্র ও গৃহস্থের ছেলের গল্প।

ঠাকুরের বিকালে একটু একটু জ্বর হয়। মাঝে মাঝে জ্বর দেখা হইতেছে। প্রায় ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর হয়। পেটের গোলমালও আছে।

বিকালে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। খিদিরপুর হইতে কালু, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানীপুরের অজয়, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আছে। কলিকাতা হইতে কালাবাবু, মা-মণি আসিয়াছেন।

ঠাকুর গান করিতেছেন :—

সাধে কি গো ব্রহ্মময়ী, ডাকি তোরে মা দিবানিশি।
ডাকিব না মনে হলে, তুমি জোর করে ডাকাও আসি॥
যদি কভু দুঃখ পাই, অমনি বল ভয় নাই,
আমার অভাব পূরণ কর সদাই, থাকি আমার মনে বসি।
শুনি, জন্ম-মৃত্যু বড় ভয়, জানি না মা কিবা হয়,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, আমি মিছে কেন ভাবি বসি॥

যাহা কিছু করি আমি, জানি ভাল করাও তুমি
(তাই) ভালমন্দ জানি না মা,
(পাপ-পুণ্য বুঝি না মা) যা কর গো এলোকেশী॥
কি দিব মা তোর তুলনা, তুই মাত্র তোর উপমা,
দীন বলে মা এই কর গো, যেন ভবানন্দে সদা ভাসি॥

মাঝে মাঝে 'মা মা' বলিয়া তান দিতেছেন। সুরে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সকলে বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া মেজেতেই বসিলেন, কার্পেটে বসিলেন না। তিনি সাধুর স্থানে আসনে বসিবেন না। কালু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।" বিশেষ পরিচয় দিলেন না। ঠাকুরকে বলিতেছেন :—

বৃদ্ধ। আমি পাপী, আপনার কৃপার জন্য এসেছি, তাঁকে ডেকেও কিছু হ'ল না।

ঠাকুর। পাপ কোথা ? তাঁকে যদি ডাকছ, আবার পাপ কি ?

"তারা নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
অনলে তৃণ যথা হয় ভস্ম রাশি রাশি।"

আর তোমার ত বয়স হয়েছে, মনোবৃত্তি দুর্ব্বল হয়েছে। বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয় স্বতঃই দুর্ব্বল হয়। তাঁকে ডাকছ, আবার পাপ কি ?

বৃদ্ধ। ৫৫ বৎসর বয়স হ'ল, বহুদিন ব্রাহ্ম-সমাজে কাটালাম। তার দরুণ সে সব কুসংস্কার বলুন আর সুসংস্কার বলুন হয়েছে ;—

ঠাকুর। কি কুসংস্কার হয়েছে ?

বৃদ্ধ। এই যেমন মনে করুন—তাঁরা নানক, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের বলেন, আমরাও যেমন মানুষ তাঁরাও তেমনি সাধারণ মানুষ; তবে তাঁরা বড় হয়েছেন।

ঠাকুর। বেশ ত, বড় হয়েছেন, তবে বড় বলে মানতে দোষ কি ?

বৃদ্ধ। দোষ নেই। দেখুন, আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, এক যোগীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকে বললাম,—আমি পাপী, আমায় আপনি মন্ত্র

দিন। তিনি বললেন,—"দেখ, জগদ্‌গুরু ছাড়া আর কোন গুরু নেই, কে মন্ত্র দিবে? আমি ত হরিনাম করতে বলব, তাই কর।"

ঠাকুর। ঠিক্‌ই বলেছেন।

বৃদ্ধ। তাই সময় ক'রে একটু করি। কালীমোহন বাবুর কাছে আপনার কথা শুনলাম। আপনি যোগী, মহাপুরুষ, তাই এসেছি।

ঠাকুর। আমি যোগী টোগী বুঝি না। তবে এদের ভক্তি বিশ্বাস আছে; খাই দাই আর এদের নিয়ে আনন্দ করি। ঐত বলেছেন, তিনি মঙ্গলকর্ত্তা, তবে যার ভেতর দিয়ে কার্য্য করান।

বৃদ্ধ। আমি আপনার চরণে প্রার্থনা করি, আমায় দীক্ষা দিন।

ঠাকুর। বেশ ত। তবে দেখ, হঠাৎ কোন কাজ করতে নাই। হঠাৎ কোন মহাপুরুষকে দেখে বলে ফেললে, খুব ভাল, পরে হয় ত সে বিশ্বাস রইল না। তাতে অনিষ্ট হয়। হঠাৎ কিছু করতে নাই।

বৃদ্ধ। দেখুন, আমি যাঁকে ভক্তি বিশ্বাস করি, তিনি মহাপুরুষ না হ'লেও আমার ভক্তি বিশ্বাসে হবেন।

ঠাকুর। সে ঠিক্, বিশ্বাসে সব হয়। প্রহ্লাদকে বলেছিল,— তোর হরি সর্ব্বময়, তবে এই স্ফটিক স্তম্ভে আছে? সে বললে,— হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছেন। ভেঙ্গে দেখলে আছে। বিশ্বাসে সব হয়। তবে, এখন মনের যে অবস্থা আছে, সেটা ঠিক্ থাকবে কিনা তা ত জানা নেই। তাই সঙ্গ করতে হয়, আসতে হয়। তবে কাজ হবে।

বৃদ্ধ। আমার ত আর দিন নেই, বয়স হ'ল।

ঠাকুর। দিন কোথায় যাবে? দেহের ওপর ত দিন নয়। তাঁর সন্তান তাঁকে ডাকবে, দিন অদিন কি আছে?...

দেখ, কোন সমাজই খারাপ নয়। ঠিক্ ঠিক্ ভাব নিয়ে কাজ করতে পারলে সবই ভাল। ব্রাহ্ম-সমাজও ভাল। ব্রহ্ম বলছে, সে ত খুব ভাল।

বৃদ্ধ। আমার বাসনা-কামনা নেই, সব আপনার চরণে অর্পণ করলাম।

ঠাকুর। তবে তুমিই ত নারায়ণ! **বাসনা-কামনা গেলেই ত সব হ'য়ে গেল।** ঘরের সব দুয়োর যদি বন্ধ ক'রে দাও, তবে ত ঘরেই আছ। বাসনা-কামনা গেলেই ত তাঁর চিন্তা ছাড়া কিছু রইল না। তবে তুমিই তিনি হ'য়ে গেলে। আরশুলাগুলো কাঁচপোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকাই হ'য়ে যায়। মারীচ রামের চিন্তা করতে করতে রামে মিশে গেল। **বাসনাই ত উৎপাতের মুল।** ওদের যখন মেরেছ, তবে ত ক্ষীর হয়ে গেছ। কাঠের জ্বালের ত আর আবশ্যক নেই।

কালু। সাধুর ওপর ভক্তি বিশ্বাস এলে কার্য্য হয় না কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ হয়; তবে হয় কি, এক আছে স্বতঃ ভক্তি ওঠে; আর এক সংস্কারিক ভক্তি। স্বতঃ ভক্তিতে কাজ হ'তে পারে। আর সংস্কারিক ভক্তি,—শুনেছে সাধুকে ভক্তি করতে হয়, তাই করে। সেটা স্থায়ী নয়। সেটাকে প্রথমে বেড় দিয়ে প্রকৃতিস্থ ক'রে নিতে হয়। স্বতঃ যেটা ওঠে তাতে কাজ হয়। সে পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ।

কালু। তাতেও বিচার ওঠে।

ঠাকুর। বিচার ত আর কিছু নয়, সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য। ঠকাব বলে নয়।

কালু। সাধু কি না কি করে বিচার করব?

ঠাকুর। সাধুর লক্ষণ রয়েছে। বুদ্ধ বলেছেন,—রোগ, শোক আর অন্নকষ্টে যিনি আনন্দ রক্ষা করতে পারেন তিনিই সাধু। (বৃদ্ধকে বলিতেছেন) আসতে আসতে ভালবাসা হয়। সাধু বিশ্বাস আনিয়ে দেয়; তাতে কাজ হয়।

বৃদ্ধ। যদি আপনাকে স্পর্শ করতে পারতাম, তবে আমার লৌহময় দেহ কাঞ্চন হ'ত।

ঠাকুরের শরীর খারাপ বলিয়া কাহাকেও ছুঁইতে দেওয়া হয় না, দূর হইতেই প্রণাম করিতে হয়। ছুঁইলেই দেখা গিয়াছে শরীর বেশী খারাপ হয়।

ঠাকুর। দেখ, আমার স্বাস্থ্য খারাপ, তাই ছুঁতে দেওয়া হয় না।

বৃদ্ধ। আমি মহাপাপী, যদি স্পর্শ করতে পারতাম।

ঠাকুর। আমার অসুখ, যদি ছুঁলে তোমাদের অসুখ বিসুখ হয়?

বৃদ্ধ। আমি ত আর কিছুকে ভয় করি না।

ঠাকুর। সেটা ত গেল তোমার কথা। তোমার উদ্দেশ্য ত তা নয়। তুমি ত তোমার দেহটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করতে আসনি। লৌহময় দেহ কাঞ্চন করতে এসেছ। তাই যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় তার কি হবে? তুমি ত দেহের ভাল চাচ্ছ?

বৃদ্ধ। না, আমি ভাল-মন্দ চাই না।

ঠাকুর। সে ত সব অর্পণ। তা'হলে কি দেহের ভাল চায়?

বৃদ্ধ। তাই ত; ভ্রান্তি আসে।

ঠাকুর। হ্যাঁ; সেই গোল। রিপুরা ভ্রান্তি আনিয়ে দেয়। এ রিপুর কাজ। রামপ্রসাদ বলছেন,—

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় মা বেটে ॥
পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশ ইন্দ্রিয় মহালেঠে,
তারা কারুর কথা কেউ শোনে না, দিন ত আমার গেল কেটে ॥

বৃদ্ধ। দেখুন, আমার পথ ভুল হয়েছে। আমি যেন wrong-wayতে (ভুল পথে) যাচ্ছি।

ঠাকুর। পথ ভুল হবে কেন? তুমি তাঁকে ডাকছ; তিনি ত সর্ব্বময়। তাঁর উদ্দেশ্যে বেড়াচ্ছ, তিনি কি দেখছেন না? ভুল হয় ত তিনি দেখিয়ে দেবেন।

বৃদ্ধ। যদি ডাকার মত ডাকতে পারতাম। সে বিশ্বাস কই? দ্রৌপদী ডেকেছিল।

ঠাকুর। দ্রৌপদীর যতক্ষণ বিশ্বাস ছিল না, এক হাতে কাপড় ধরে আছেন, ততক্ষণ শুনছেন না। বিশ্বাস ঠিক্ আসেনি। খানিকটা

এক হাতের ওপর আছে। যখন দু'হাত তুলে ডাকলেন তখন তিনি এলেন। পূর্ণ বিশ্বাস।

বৃদ্ধ। দেখুন, আমার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। আমি একটী পুকুর কাটিয়েছিলাম, একটী মেয়ে তাতে চান করছিল, আমায় দেখে লজ্জা করলে না।

ঠাকুর। তবে ত বেশ; তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা। আমার ত তা হয়নি (সকলের হাস্য)। শুকদেবের হয়েছিল; তাঁর পিতার কিন্তু হয়নি।

মেয়েরা চান করছিল, শুকদেব কাছ দিয়ে চলে গেলেন, কেউ সঙ্কোচ বোধ করলে না। কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব যেতেই সবাই লজ্জায় কাপড় টেনে দিতে লাগল। দেখে ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মা তোমরা আমার ছেলেকে দেখে লজ্জা করলে না। তার অল্প বয়স। আর আমি তার পিতা, বৃদ্ধ হয়েছি, আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জা হ'ল?" মেয়েরা বললে, "তোমার পুত্র ত কই আমাদের এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, তুমিই বা কেন করছ? এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ওপর তোমার নজর ছিল। কিন্তু তোমার পুত্র শুকদেবের ছিল না। সেজন্য তাঁকে যেতে দেখে আমাদের মোটেই লজ্জা আসেনি।" তা বাবা, তোমার যখন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, তখন তোমার ত শুকদেবের অবস্থা। (সকলের হাস্য)।

বৃদ্ধ। আমার চোখটাও গেছে।

ঠাকুর। তিনি তোমায় রূপ থেকে বাঁচিয়েছেন। বিল্বমঙ্গল চোখ গেলেই ফেল্‌লে, রূপে আকর্ষণ হয় বলে।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধটী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গোপেন, আশু, অজয় ও শশী আসিয়াছে।

গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে।

গোপেন। ব্রহ্মচর্য্য না হ'লে কি সাধনার জোর হয়?

ঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্য না হ'লে সাধনার জোর হয় না বটে, তবে তার রকম আছে। সংসারীদের জন্যে মাপ আছে।

গোপেন। কি রকম?

ঠাকুর। নীতির ওপর থাকতে হয়। তাতে দোষ হয় না। রামে দুই পুত্র, তবুও বলছে জিতেন্দ্রিয়। **ব্রহ্মচর্য্য হ'চ্ছে ব্রহ্মেতে আচার্য্য।**

গোপেন। সাধারণের বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য না হ'লে সাধনে কোন ফলই ফলে না।

ঠাকুর। তার কোন মানে নেই; যারা জ্ঞান-পন্থী, তাদের সব কড়া নীতি নিতে হয়। ভক্তিমার্গের তা নয়। তাঁকে ধরব, তিনি কমিয়ে দেবেন। আপনি কাজ হয়। চিন্তাই না কার্য্য করে? তাঁর দিকে মন থাকল, অন্য দিকে যাবে কখন?

গোপেন। জ্ঞানীর ব্রহ্মচর্য্য দরকার হয় না?

ঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্য মানে নীতির কাজ। এক আছে ঊর্দ্ধরেতা। তার আলাদা পন্থা।

কালীবাবু। যোগক্রিয়া না হ'লে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায় না?

ঠাকুর। তিনি ইচ্ছা করলে ক'রে দিতে পারেন। আর স্বতঃ স্বভাব, বৃত্তি থাকবে অধীন হয়ে। এ জ্ঞানীর পথ। দেখ, সব জিনিষের মূল হ'চ্ছে বাসনা। বাসনা গেলে অপর জিনিষের কার্য্যকারী শক্তি থাকে না। কি ক'রে থাকে? খেতে ইচ্ছা নেই, খাওয়া কি জোর ক'রে হ'তে পারে? মূল তাঁকে ধরতে হয়; তিনি সব ক'রে দেবেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। যত তাঁতে ভালবাসা আসে, তত অপর বৃত্তি দুর্ব্বল হ'য়ে আসে।

গোপেন। নতুন যারা ভক্তিমার্গ নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ত কিছুদিন দুঃখ চলবে।

ঠাকুর। যতক্ষণ বাসনা ততক্ষণ দুঃখ থাকবে। দুঃখের রাজত্ব না ছাড়ালে ত দুঃখ যাবে না। যতক্ষণ এ ঘরে আছ, ততক্ষণ

এ ঘরের অনুভূতি হবে। এ ঘর ছাড়ালেই না অপর ঘরের অনুভূতি।

নানা কথার পর আবার গোপেন আর এক নূতন প্রসঙ্গ তুলিল।

গোপেন। 'তিন' অঙ্কের এত বিশেষত্ব কেন? তিন গুণ, ত্রিশূল :—

ডাক্তার সহেব। ত্রিভঙ্গ মুরারি—

ঠাকুর। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তার থেকেই তিন।

গোপেন। পাঁচ বললেন না কেন, ছয়ই বা নয় কেন?

ঠাকুর। তা নয়। তিনেই সৃষ্টি। গুণাত্মক নিয়েই না সৃষ্টি। গুণ গেলে সৃষ্টি থাকে না। তিন গুণ। একজন আমায় বলেছিল, তিন গুণ কেন? চার নয় কেন? আমি বললুম, তিন পাওয়া যাচ্ছে তাই বলছি। পাওয়াও যাচ্ছে, আর তিনিও বলছেন তিন (গীতাতে)। বেশী পাওয়া গেলে তাই বলা যাবে। তুমি পেয়ে থাক ত বল।

গোপেন। ব্যাসদেব নাকি বলেছেন পৃথিবী ত্রিকোণ। আজ-কালকার পণ্ডিতেরা বলেন কমলা লেবুর মত। এদেরটাই ত ঠিক্ মনে হয়। ব্যাসদেব বোধ হয় ভারতবর্ষ দেখে বলেছেন। ভারতবর্ষের আকার কতকটা ত্রিকোণ।

ডাক্তার সাহেব। এঁরাও বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ড।

ঠাকুর। দেহের বর্ণণা করতে গিয়ে ওরই মধ্যে যত ব্রহ্মাণ্ড আছে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। নাভিমূলে মণিপুরে ত্রিকোণ; মন সেখানে গেলে ত্রিকোণের কাজ হ'চ্ছে, সব ত্রিকোণ দর্শন হয়। আবার একস্থানে আছে সব গোলাকার।

অচ্যুত। সব ত্রিকোণ কি রকম? সব জিনিষ ত্রিকোণ দেখা যায়?

ঠাকুর। ত্রিকোণ নিয়ে বেষ্টিত। ভেতরে যা আছে থাকুক; বেড়াটা ত্রিকোণ।

অচ্যুত। আবার বেদে নাকি আছে, পৃথিবী চতুষ্কোণ আর হাতীর পিঠের ওপর।

ঠাকুর। চতুষ্কোণও আছে, সেখানে গেলে সে রকম দেখবে। চতুর্দ্দল্ পদ্মে যখন মন, তখন চারই দেখছে। স্বাধিষ্ঠানে ষড়দল, তখন ছয় ভাবে দেখছে। দিকদলে দশ দল পদ্ম, দশটা দিক, সেখানে দশ ভাবে। আবার কোথাও বা মহাসমুদ্র, আকার নাই।

আর কিছু নয়, একটা চতুষ্কোণ, একটা গোলাকার, যাই থাক্, এর ভেতরে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ এর ঠিক্ মাপ হওয়া কঠিন।

আশু এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলিল।

এক পণ্ডিত এক সাহেব বাড়ীতে মাষ্টারী করতে গিয়েছিল। ছেলেকে পড়াচ্ছে, 'সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে'। ছেলে বলে, "তা নয়, পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে।" এ তর্ক ভেতর থেকে সাহেব শুনে বাইরে এসে পণ্ডিতকে খুব ধমকে দিলেন, "মূর্খ, কিছু জান না।" পণ্ডিত বেগতিক দেখে বল্লে, "পনের টাকার জন্য পৃথিবী ঘুরতে হয় ঘুরুক, আমার কি ?" (সকলের হাস্য)

গোপেন। পড়েছি, রাত দুপুরে মন যে ভাবে গতি করে যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে নাকি তখন মন কোন্ গুণে আছে ধরতে পারে।

ঠাকুর। পরীক্ষা করলে সব সময়ই ধরতে পার। তবে তখন সব নিস্তব্ধ, মন স্বতঃ স্থির হয়। তাই দিয়েছে সেটা সাধনের প্রশস্ত সময়। আর সারাদিন সংসার সংসার ক'রে অস্থির, তখন একটু সময় পেলে, সত্ত্বগুণের চিন্তার সুবিধা হয়। প্রকৃতির ঠাণ্ডা ভাবে সহজে কাজ হয়।

ডাক্তার সাহেব। ভোরেও তাই ?

ঠাকুর। ভোরেও তাই। ভোরে একটা বীর হাওয়া চলে, তাতে সত্ত্বগুণের জোর হয়। মনে খুব জোর হয়। মধ্যযাম রাত্রি ১২টার পর আর ভোরে সাধনের প্রশস্ত সময়।

ডাক্তার সাহেব। সন্ধ্যায় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সন্ধ্যায়ও নিস্তব্ধ।

কালীবাবু। ত্রিসন্ধ্যা কোন্‌টা কোন্‌টা ?

ঠাকুর। ভোরে—উদয়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত, ১২টার পর, আর সন্ধ্যায়। যে সময় চিত্ত স্থির হয়, তখনই তাঁকে ডাকবে। পূর্ব্বে এই নীতি বলবৎ ছিল, ভোরে ওঠা।

গোপেন। সবই ত তাঁর ওপর নির্ভর করলাম, কিন্তু শাস্ত্রে যে দিয়েছে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি ততঃ কুত্র দোষঃ" ইত্যাদি। যত্ন না করলে ত কাপুরুষতা।

ঠাকুর। ঠিক্ দিয়েছে। সংসারীদের জন্য ঠিক্ ব্যবস্থা। সংসারীদের ত ঠিক্ নির্ভরতা হয় না। নির্ভরতার নাম ক'রে মিছিমিছি অলসতা আনে। তাই গীতায় অর্জ্জুনকে বলছেন,—উত্তিষ্ঠ, বধ। সব অর্পণ ত করবেই না। ভাষার ওপর থেকে পুরুষকারও ছেড়ে দিলে, তবে ত জড়তা এল। আর যে কাপুরুষ বলছ, কাপুরুষের ক্ষমতা আছে নির্ভর করে? নির্ভর করতে কতখানি শক্তির দরকার। পেটে ক্ষুধা আছে, ঘরে চাল নেই। তার ওপর দাঁড়ান কত সাহসের কাজ। সে নির্ভরতা সহজ নয়। তাই উত্তেজনা করছে কর্ম্ম করতে। উত্তেজনায় অধিক কাজ হয়। বাক্যের স্বভাব আছে একজনকে কার্য্যে লাগান যায়। বেশীক্ষণ রাখা যাবে না। তবে করতে করতে ক্রমে প্রকৃতি এসে যায়।

কালীবাবু। এ ত উত্তেজনা, কিন্তু যাঁদের বাক্যে শক্তি আছে, তাঁদের কথায় কি কাজ হয় না ?

ঠাকুর। সে ত আলাদা কথা। সঙ্গ কেন? এজন্যই ত। নির্ভর করতে ত পারে না, তাই পুরুষকার। প্রথম প্রথম দুটো জড়িয়ে কাজ হয়। তাঁর কাছে এলে এটা হবে এই বিশ্বাসও আছে, আবার তাঁর কাছে আসতে হবে এ পুরুষকারও রয়েছে। নির্ভরতা ভয়ানক। আসব, না আসব, কোন চিন্তাই থাকবে না—তাঁকে সব দিয়েছি।

কালীবাবু। তখন কাজ থাকে না ?

ঠাকুর। কিছু না; সব তিনি করছেন।

কালীবাবু। হাত-পা নাড়া?

ঠাকুর। সে ত জীবের ধর্ম্ম। জীবনী-শক্তি থাকে motion (গতি) থাকল। সঙ্কল্প নিয়ে কাজ থাকবে না।

গোপেন। নির্ভরতা কখন আসবে?

ঠাকুর। এলে ত পূর্ণ। যাতে এসেছে সে ত জগৎ মেরে দিয়েছে। সঙ্কল্প যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নিজের ঘাড়ে।

কালীবাবু। সংসারে সম্বন্ধ রাখতে গেলে ত সঙ্কল্প থাকবে।

ঠাকুর। তার কি মানে আছে? যিনি চন্দ্র-সূর্য্য গড়েছেন, তিনি তোমার সংসার চালাতে পারেন না?

কালীবাবু। আপিসে কাজ করতে যেতে হবে।

ঠাকুর। যার যেতে না হয় তার কাজ কি?

শশী। আপিসে ত যেতে হবে।

ঠাকুর। সে ত চাকরীর জন্য যাচ্ছ, সেখানে নির্ভরতা কোথায়?

শশী। সব ছেড়ে দিলে ত হবে না।

ঠাকুর। শুধু শুধু ছেড়ে দিলে কেন হবে? সে অবস্থা না এলে কেন ছাড়বে? তাঁকে যখন সব সঁপেছ, ছেলেও তোমার নয়, পরিবারও তোমার নয়; চাকরীরও আর দরকার নেই।

কালীবাবু। হয় ত বাড়ীর কোন স্ত্রীলোকের ওপর কেউ অত্যাচার ক'চ্ছে। মনে এল বাধা দিই, আর নির্ভরতা মনে এলে ভাবছি, তিনি সব করবেন।

ঠাকুর। যদি তোমার বাড়ীর স্ত্রীলোক হয়, আর তোমার ঠিক্ নির্ভরতা থাকে, সাধ্য নেই কেউ অত্যাচার করে। ঠিক্ ঠিক্ নির্ভরতা চাই। শুধু ঐ সময় বললে হবে না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তিনি এক হাতে কাপড় ধ'রে যতক্ষণ ডাকছে, ভগবান্ আসছেন না। তখনও ঠিক্ নির্ভরতা আসেনি। এক হাতের ওপর খানিকটা ভরসা আছে।

দু'টো হাত তুলে যখন ডাকছেন—"এস প্রাণবল্লভ", তখন এলেন। কাপড় যত টানে ফুরোয় না।

কালীবাবু। একটা লোক ভিক্ষা করতে এসেছে। হাতে টাকাও রয়েছে—এদিকে নির্ভরতা আছে। ভাবছি, আমি টাকা কেন দেব? যা হয় হবে।

ঠাকুর। কেন দেবে না। টাকা হাতে রয়েছে। টাকা নিচ্ছ, ছেলে খাবার চাইলে কিনে দিচ্ছ। এটার বেলায় কেন দেবে না?

কালীবাবু। তবে সংসারীর পূর্ণ নির্ভরতা কি ক'রে হয়?

ঠাকুর। পূর্ণ নির্ভরতা ছেলে পরিবারে মন থাকতে হয় না।

কালীবাবু। টাকাকড়ির মধ্যে গেলে পূর্ণ নির্ভরতা হয় না।

ঠাকুর। তবে সঙ্কল্প-শূন্য হ'লে হয়। ঘরে খাবার আছে, ছেলে চাইলে দিয়ে দিলে, চিন্তা রাখলে না। এক সব ছেড়ে দেওয়া, আর না হয় সঙ্কল্প-শূন্য হওয়া।

কালীবাবু। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, চিন্তা হবে না?

ঠাকুর। চিন্তা রাখবে না। সময় এল, সব যোগাযোগ হ'ল, দিয়ে দিলে। কুষ্ঠী ঠিকুর্জ্জির ধার ধারবে না।

কালীবাবু। সাধারণ ত সে সব করে।

ঠাকুর। সাধারণের মধ্যে ত যাচ্ছ না। কুষ্ঠী সাধারণ ফল বললে। আর তাঁর নামে ফেলে দিলে মন্দ থাকলেও ভাল হবে।

কালীবাবু। দুর্ভিক্ষ হ'চ্ছে সে জন্য টাকা তুলতে হবে। এও ত কাজ। নির্ভর করে থাকলে কি ক'রে হবে?

ঠাকুর। পূর্ণ নির্ভরতায় সে ভাব আসে না। দুর্ভিক্ষ তিনি দিয়েছেন, তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। আমি কি বুঝি? দুর্ভিক্ষ হওয়া খারাপ কি ভাল—তাই বা কি জানি? তাঁকে ডাক, মঙ্গল হবে। তাঁতে যারা আছে, তারা টাকা পয়সার চিন্তা রাখবে না। তাদেরও ত তিনি পিতা, তিনি কি দেখছেন না? যারা আমিত্বের ওপর আছে তারা যাবে, সেবা করবে। আসল কথা—তাঁকে পাওয়া। পরমহংসদেব বলতেন,

ভগবান্ যদি আসেন, তবে কি তাঁর কাছে কতকগুলি ডিস্‌পেন্‌সারী চেয়ে নিবি ? তাঁর জগৎ, কোথায় দুর্ভিক্ষ হবে, তুমি তার কি করবে ? টাকা যদি তিনি তোমায় দিয়ে থাকেন ত দাও ; ফুরিয়ে গেল। কি করবে, সে জন্য ভাববে না। যার যার নীতিতে থাকবে। মেলা এতে ওতে গেলে তাঁর ওপর নির্ভরতা কমে যাবে।

গোপেন। নিষ্কাম সেবা। পথে একটা লোক পড়ে আছে দেখলুম,—

ঠাকুর। নির্ভর করলে সেবা কেন ? তবে হঠাৎ সামনে কিছু হ'ল, একটু সাহায্য ক'রে দিলুম, যদি অপর কেউ না থাকে। অপর লোক এলেই সরে যাব। যদি এই করতে থাকি, তবে তাঁকে ডাকব কখন ? আর ফল-কামনাও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে। যার সেবা করলুম সে মরে গেল। প্রাণে লাগবে।

কর্ম্ম যত বাড়বে তত তাঁর কাছ থেকে সরে যাবে। বিশ্বাসীর কথা বলছি, তা ছাড়া অপর ত কর্ম্মে যাবেই। দয়া, মায়া, দুই বন্ধন। জগতের নিয়ম—প্রকৃতি অনুযায়ী জিনিষ আসে। যাদের অর্থ আছে তারা করুক। নিষ্কাম কর্ম্ম ত বললেই হবে না, সকাম এসে যাবে।

পরমহংসদেব বলতেন,—যারা তাঁর ভাবে যাবে তাদের কতকগুলি কর্ম্ম জড়ান উচিৎ নয়। তা ছাড়া অপর ত কর্ম্ম নিয়ে আসে, করবেই। যাঁর এত দয়া, যিনি বিপথে গেলে টেনে নেন, তাঁর কাছে এসেছি, আমার ভাবনা কেন ?

গোপেন। সৎকর্ম্মও ত করতে পারে।

ঠাকুর। সৎকর্ম্মও জড়ান, অসৎকর্ম্মও জড়ান। উপস্থিত মত কাজ করে যাওয়া ; জড়ালেই বেড়ে যাবে। যার ভাগ্যে যা আছে সে হবেই। কারও ক্ষমতা নেই কিছু করে।

একটা গল্প আছে। দুই বন্ধু ছিল, একজন ধনীর পুত্র, আর একজন সাধারণ গেরস্থের ছেলে। দু'জনে খুব ভাব। গেরস্থের

ছেলেটার ভগবতে বিশ্বাস ছিল, আর ধনীর ছেলেটার সাধারণ বোধ। দু'জনে একদিন তর্ক হ'চ্ছে। ধনীর পুত্র বলছে, "টাকায় জগতের দুঃখ নষ্ট করা যায়।" অপর বন্ধু বলছে, "তা নয়; ভগবানের নামে দুঃখ যায়, টাকার কি ক্ষমতা আছে? যার কপালে দুঃখ আছে, টাকায় তার কি করবে? টাকা যার যার ভাগ্য।" দু'জনে তর্ক হ'চ্ছে, মীমাংসা হয় না। তারপর কথা হ'ল; গেরস্থের ছেলেটী বললে, "আচ্ছা বন্ধু এস, পরীক্ষা করা যাক। তুমি একজনকে টাকা দাও, আমি একজনকে ভগবানের নাম দিই, দেখি কার দুঃখ যায়।" এই বলে দু'জনে বেরিয়েছে। ধনীর ছেলে একলক্ষ টাকা নিয়েছে। বেড়াতে বেড়াতে এক দরিদ্রের বাড়ী এসেছে। দেখে, একখানা কুঁড়ে ঘর, চাল বেড়া ভেঙ্গে পড়ছে। লোকটী শীর্ণকায়, পরিধানের কাপড় ছেঁড়া। ধনীর পুত্র তাকে ডেকেই বললে, "কি, তোমার এ দশা কেন?" সে বললে, "কি করি? অর্থ নেই, খাওয়া জোটেনা, বড় কষ্টে আছি।" ধনীর পুত্র বললে, "আচ্ছা, তোমাকে এই এক লক্ষ টাকা দিচ্চি। এই দিয়ে বেশ বাড়ী ঘর কর। কৃপণতা করো না, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আবার দরকার হ'লে দেব।" তারপর সেখান থেকে দুই বন্ধু চলল। যেতে যেতে দেখে, আর একটী বাড়ীরও সে রকম জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা। সে বাড়ীর লোকটীকেও ডাকলে। সেও বললে, "বড় দুর্দ্দশা, খেতে পাই না, অর্থ নেই।" তখন অপর বন্ধুটী তাকে বললে, "আচ্ছা, হরিনাম কর না কেন?" সে বললে, "ওতে কি হবে? আমি যে খেতে পাচ্ছি না। হরিনাম করে কি ক্ষুধা যাবে?" বন্ধুটী বললে, "না ক'রেও ত খেতে পাচ্ছ না—না হয় ক'রেও তাই হ'ল, তোমার ক্ষতি কি? দেখ, আমি ব্রাহ্মণ, উপযাচক হ'য়ে তোমায় বলে যাচ্ছি, কথাটা ধর।" সে রাজি হ'ল। "দেখ, একটু কষ্ট হ'লেও ছেড় না যেন।" এই বলে তারা চলে গেল। ধনী বন্ধুটী হাসলে, বললে, "বন্ধু, তোমারও যেমন; হরিনামে খাবার জুটবে?"

কিছুদিন যায়, একদিন ভোর বেলা ধনীর পুত্র তার গোশালা দর্শন

করতে গেছে। গিয়ে দেখে, কি একটা চক্‌চক্ করছে। কাছে গিয়ে দেখলে, এক হাঁড়ী তুঁষ আর তার ওপর একটী মোহর। মোহরটী নিয়ে একটী চাকরকে ডেকে হাঁড়ীটী তার মাথায় দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এল। এনে তুঁষ ঢেলে দেখলে, একলক্ষ টাকার মোহর। সে ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল, মোহর কে এখানে রেখে দিলে? তখন ঐ বন্ধুটী এসেছে। তাকে বলছে, "দেখ বন্ধু, আজ গোশালায় বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, একটী তুঁষের হাঁড়ীতে একলক্ষ টাকার মোহর। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" বন্ধুটীর সন্দেহ হ'ল। বললে, "বন্ধু তুমি যে সেই একজনকে একলক্ষ টাকার মোহর দিয়ে এসেছিলে, এ সেই মোহর নয় ত?" ধনী বন্ধু বললে, "তুমিও পাগল হয়েছ বন্ধু! সে মোহর এখানে কি ক'রে আসবে? আর সে কি এত দিন তার একটীও খরচ করেনি? সব রেখে দিয়েছে?" বন্ধু বললে, 'আমার কিন্তু সন্দেহ হ'চ্ছে, চল, বরং দেখে আসি।"

দু'জনে বেরিয়ে গেল। তার বাড়ীতে গিয়ে দেখে, সেই দুর্দ্দশা; বাড়ী ভেঙ্গে পড়েছে, বেড়া খসে পড়ছে। তা'কে ডেকে বললে, "কিহে, তোমার এ অবস্থা কেন? টাকা কি করলে?" সে বললে, "কি বলব আমার দুরদৃষ্ট। আপনি সেই টাকা দিয়ে গেলেন। আমি আর কোথায় রাখব, আমার ঘরে ত বাক্স পেটরা নেই। তাই একটী হাঁড়ীতে রেখে তুঁষ চাপা দিয়েছিলাম, পাছে কেউ দেখে নিয়ে যায়। আমরা তুঁষ বিক্রী ক'রে খাই। এখন গ্রাম থেকে তুঁষ নিতে এসেছে, আমার স্ত্রী দু'গণ্ডা পয়সা না নিয়ে সেই হাঁড়ী শুদ্ধ দিয়ে ফেলেছে।" ধনীর পুত্র খোঁজ ক'রে জানলে তারই লোক সেই তুঁষ কিনে এনে হাড়ী শুদ্ধ সেই গোশালাতে রেখেছে। গেরস্তের ছেলে তখন বললে, "দেখ বন্ধু, তুমি ভাবছ টাকায় সব হয়। তার অদৃষ্টে যা আছে কোথায় যাবে? তার এই দু'আনাই ছিল, দু'আনাই পেল; আর তোমার দেখ, একলক্ষ টাকা ছিল তাই পেলে। নয় ত তোমার চাকররাও ত

সেখানে ছিল। তারাই মাথায় ক'রে নিয়ে গেল। তাদের চোখেও ত পড়তে পারত। তাদের ভাগ্যে নেই, কি ক'রে হবে? তোমার ভাগ্যে ছিল তুমি পেলে। তা দেখ, টাকাতেই যে সব হয়, তা নয়; তবে তোমার মারফৎ ভগবান্ যদি কা'কেও ধনী করেন, হ'তে পারে। নয় ত টাকা দিলেই হয় না। আচ্ছা চল, সেই লোকটীকে দেখা যাক।"

সেখানে গিয়ে দেখে, বেশ সুন্দর বাড়ী ঘর হয়েছে। তাকে ডাকতে সে এসে ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা নিলে, বললে,"আসুন! আপনারই কৃপায় আমার সব হয়েছে। আপনি সেই হরিনাম দিয়েছিলেন। তাতেই আমার এই সব।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম বল দেখি শুনি।" সে বললে, "আমি জেলের ব্যবসা ক'রে খেতাম। যে দিন যা সামান্য মাছ পেতাম তাতেই কোন রকমে দিন চলত। প্রথম প্রথম হরিনাম ক'রে বড় কষ্ট বেড়ে গেল। আগে যাও বা পেতাম তাও পাই না। মাঝে মাঝে বিরক্তি আসত, ভাবতাম ছেড়ে দিই। আমার স্ত্রী বারণ করত, বলত, 'ছেড়েই বা কি হবে? এতেও ত কোন লোকসান নাই, ব্রাহ্মণ দিয়ে গেছে, ছেড় না।' একদিন খুব কষ্ট হয়েছে, কিছুই পাইনি, ছেলে-পিলে সব উপোস ক'রে আছে। এত কষ্ট হ'ল—কাঁদতে লাগলাম। হরিনামে বিরক্তি এল, ভাবলাম এই হরিনাম। যার নাম ক'রে খেতে পায় না, কষ্ট বেড়েই গেল, দূর ছাই ও আর করব না! স্ত্রী আবার বোঝাত—ছেড় না, ছেড়ে কি কষ্ট যাবে? তা সেদিন সকাল বেলা হরিনাম ক'রে জাল নিয়ে বেরিয়েছি। যদি কিছু পাই ছেলে-পিলে খাবে। নদীতে গিয়ে হরিনাম ক'রে যেমন জাল ফেলেছি, এক প্রকাণ্ড রুই মাছ উঠল। টেনে ওপরে তুললাম। ভারি আনন্দ হ'ল। বললাম, হরি তুমি আছ, সত্যিই আছ। তোমায় কেঁদে কেঁদে ডেকেছি, তাই এত বড় মাছ উঠল। খুব আনন্দ হয়েছে। বাজারেরও বেলা হয়েছে, বাজারে নিয়ে গেলাম। বিক্রী ক'রে জিনিষ-পত্র আনব। হরি চিন্তা করতে করতে আর মনে মনে তোমায় প্রণাম করতে করতে বাজারে

গেলাম। গিয়ে দেখি খদ্দের জোটে না। মাছ নিয়ে বসে আছি। অপর দিন বাজারে মাছ পড়তে না পড়তেই খদ্দের এসে জোটে। সেদিন ১১টা ১২টা বেজে গেল; কোথাও কিছু নেই। বড় কষ্ট হ'ল, কাঁদতে লাগলাম, ভাবলাম এই হরিনাম! হরিনাম ক'রে এই হ'ল! বাজারে মাছ এনে খদ্দের মেলে না! এ কেউ শুনেছে! নাম ক'রে শেষে এই হ'ল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে বসে শেষে বাড়ী এসে মাছটা স্ত্রীর কাছে ফেলে দিলাম। বললাম, হরিনাম আর কচ্ছিনি। বাজারে মাছ নিয়ে খদ্দের জোটে না? যে নামে এত দুর্দ্দশা, ভুলেও আর সে নাম কচ্ছিনি। স্ত্রী বললে, 'তোমার একি মতিভ্রম হ'ল? হরিনামেও কখনও দোষ দিতে আছে? আমাদের অদৃষ্টে ছিল এই হবে। মিছিমিছি তাঁর নিন্দা করো না।' কি করব? মাছটাও পচে উঠেছে। স্ত্রীকে বললাম, কেটে দেখ কয়েক ভাগা পাড়ায় নেয় কিনা? আর যা থাকে সিদ্ধ করে ছেলে-মেয়েদের দাও। সে সেটা কাটলে, কেটে দেখে পেটের মধ্যে একখণ্ড কাঁচ। সেটা ছেলেরা নিয়ে নিলে। মাছ যা দুই এক ভাগা বিক্রী হ'ল—পচা মাছ কেই বা আর নেবে—আর বাকীটা সিদ্ধ করে সবাই খেলে। আর ভাবছি, হরিনাম আর করছিনে, কাল থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, যে হরিনাম করবে তার কাছেও যাব না। এ সব কিছুই নয়, কেবল বাজে কথা। এই ভাবে আছি। এখন ছেলেরা কাঁচটা নিয়ে খেলা করত। একদিন একটী ভদ্রলোক এসে আমার এখানে বসল। কাঁচটী দেখে বললে, ওটা আমায় দিতে পার? তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি। আমার তখন কি রকম বুদ্ধি এল। একখণ্ড কাঁচ, পঞ্চাশ হাজার টাকা বলছে, এর বোধ হয় খুব দাম হবে। আমি বললাম, না; ওটা কি পঞ্চাশ হাজার টাকায় দিতে পারি? ওর যা দাম! পরে একলক্ষ দু'লক্ষ উঠতে লাগল। শেষে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা দিয়ে কাঁচটী কিনলে। আমি টাকা কোথায় রাখব? তাঁকে বললান, তুমিই রাখ। সে-ই এ বাড়ী ঘর দোর সব ক'রে দিয়েছে। সম্পত্তি কিনে দিয়েছে। তা হরির কৃপায়

সব হয়েছে। আপনার দয়াই মূল। না হয় আমার কি এ সব হ'ত ?”

গেরস্থের ছেলে তখন বললে, “দেখলে বন্ধু, টাকায় কি উপকার করা যায় ? তাঁর নাম করলে সব হয়।”

নানা কথার পর দূরের ভক্তরা উঠিয়া গেলেন। ১০টার পর ঠাকুর আরতি করিলে সকলে বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—একাদশ অধ্যায়।

২২শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৫ই মে, ১৯২৬ ইং ;

বুধবার, কৃষ্ণা-অষ্টমী।

কলিকাতা।

নন্দবিদায়—সৎকাজ ও আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা—আজ কালকার যুবকগণ—রাজা ও বড়লোক—সবই ভগবানের দেওয়া—কর্ম্মও তাঁর ইচ্ছা—বৈরাগ্য—মন কোন অবস্থায়ই সুখী হইতে চায় না—বাসনাই দরিদ্রতা।

বিকাল ৫টা হইল। ঠাকুরের অসুখটা ঠিক্ কি তাহা স্থির হইতেছে না। একটু জ্বর বিকালে লাগিয়াই আছে। পিলেও বাড়িয়া গিয়াছে। তাই রক্ত-পরীক্ষা করিবার কথা হইয়াছে। আজ ডাক্তার সুবোধবাবু, রক্ত লইতে আসিয়াছেন।

অসুখ সম্বন্ধে দু' একটী কথাবার্ত্তার পর সুবোধবাবু রক্ত নিলেন। রক্ত দেখিয়া বলিলেন।

সুবোধবাবু। রক্ত সাদা হ'য়ে গেছে। এ ভাল নয়।

ঠাকুর। কলকাতা সাহেবের দেশ কিনা, তাই এখানে এসে সাদা হ'চ্ছি (হাস্য)।

সুবোধবাবু। না, এ ভাল না। রক্তের পরিমাণ খুব কমে গেছে। মোটে শতকরা পঁচিশ হিসাবে আছে। সাধারণতঃ আশি থেকে একশ' পর্য্যন্ত থাকে। আপনি মনের শক্তিতে বসে আছেন। অন্য রোগী হ'লে এ অবস্থায় নড়তে পারত না।

ঠাকুর। আমি ত কোন কষ্ট বোধ করছি না।

সুবোধবাবু। না, আমরা ছাড়ব না। দেহের বিষয়ে আমরা authority (বিশেষজ্ঞ)। আমাদের মেনে চলতে হবে।

সুবোধবাবুর কাজ আছে, শীঘ্রই যাইবেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

বৈকালে ভক্তরা অনেকে আসিয়াছে। অজয়, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আশু প্রভৃতি ভবানীপুরের ভক্তরা আছে। খিদিরপুর হইতে অচ্যুত, বিভূতি, হরিপদ আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী, সোমদেব, জিতেন, শশী, কানাই, পচু, অনুকূল, সুরথ আসিয়াছে।

অচ্যুত সুভাষবাবুর কথা বলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সুভাষ খুব ভাল ছেলে, ভেতরে একটা তেজ আছে, চোখে মুখে বেশ ভাব।"

দূরে বাঁশী বাজিতেছিল। ঠাকুর পুত্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গান বাজাচ্ছে বল দেখি?" পুত্তু ঠিক্ বলিতে পারিল না। ঠাকুর বলিলেন, "আর ত ব্রজে যাব না ভাই।" গানটি ছোট করিয়া গাহিলেন। নন্দ-বিদায়ের গান। নন্দ-বিদায় সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। ঐ জায়গার সুন্দর ভাব। ব্রজ ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছেন, ধড়া চূড়া সব দিয়ে যাচ্ছেন। যাদের না দেখে থাকতে পারতেন না, এত ভালবাসতেন, তাদের জিনিষটা পর্য্যন্ত—ধড়া, বাঁশী, চূড়া—সব ফিরিয়ে দিলেন। এতদিনের ভালবাসা চট্ ক'রে কাটিয়ে দিলেন। কি রকম নির্লিপ্ততা! তাদের চূড়াটি পর্য্যন্ত কাছে থাকতে পারবে না।

কালীবাবু একটা club (ক্লাব) করিতেছেন। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গে আমাদের যুবকদের বর্ত্তমান অবস্থা, একত্রে কাজ করার শক্তির অভাব, আমাদের কর্ত্তব্য, ইত্যাদি সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। সকলে মিলে একটা সৎকাজ করতে হ'লে ভেতরে শক্তি চাই। সৎ জিনিষ চালাতে হ'লে সকলের ভেতরে সৎ থাকা চাই সৎকথা সবাই বলে; অসৎ যুক্তি ত কেউ দেয় না। কিন্তু করতে গেলে যে শক্তির দরকার। শক্তি না হ'লে কিছুই দাঁড়াবে না।

কালীবাবু। উঠছে পড়ছে ক'রে দাঁড়াবে ত ?

ঠাকুর। সে যখন দাঁড়াবে আপনি হবে। তখন সৎএর বিকাশ আরম্ভ হবে। তোমাদের বলছি তাতে না যেতে। তোমরা যারা একটা নীতি নিয়ে তাঁর দিকে আছ, তাদের নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া ঠিক্ নয়। অপরে তা করবে বই কি। নিজের যদি কিছু অর্থ দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে কিছু দিয়ে দেবে। জিনিষের ভেতর নেবে। দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী অবস্থার সূক্ষ্মতা নেবে।

কালীবাবু। আমি বিশেষ লিপ্ত হব না। তবে আজ একটা meeting (সভা) আছে।

ঠাকুর। মিটিং দল টল, এতে যত না যাওয়া যায় ততই ভাল। পরমহংসদেব বলতেন, দল পানা পুকুরে হয়। প্রায়ই সাধারণ যুক্তি কি রকম জান ? যেমন শেয়ালের যুক্তি। শেয়ালগুলো রাত্তিরে যখন গর্ত্তে ঢুকতে যায়, দেখে খেয়ে দেয়ে পেট মোটা হ'য়ে গেছে, ঢুকতে কষ্ট হ'চ্ছে। তখন যুক্তি করে, কাল গর্ত্ত বড় করতেই হবে। সকাল বেলা পেট কমে গেছে, বেরোতে আর কষ্ট হয় না। কাজেই গর্ত্ত বড় করবার কথা ওঠে না। আবার রাত্তিরে সেই অবস্থা। ঢুকতে পারে না। তখন আবার বলে, না, কাল গর্ত্ত বড় ক'রে তবে ছাড়ব। রাত্তিরে পেট খালি হ'য়ে যায়, সকালে আর দরকার হয় না। এ চলছেই, গর্ত্ত আর বড় হয় না। এদেরও তাই। যুক্তির বেলা সব আছে। কাজে কেউ নেই। ভেতরে স্থির ভাবনা আসলে কোন বড় কাজ হয় কি ? খুব ধৈর্য্য আর বুদ্ধির বিকাশ চাই। এদের কত কথাই মনে উঠবে। জলের বুদ্বুদের মত উঠছে পড়ছে। স্বার্থ আর হিংসা এদের প্রবল। এ দুটোকে নষ্ট করতে না পারলে কোন কাজই দাঁড়াতে পারে না। তাই বুদ্ধ দিয়েছেন অহিংসা পরমোধর্ম্ম। হিংসা গেলে ভগবানকে পাওয়া যায়। বড় কাজ ভাঙ্গে কেন ? হিংসায়। দুঃর্ভিক্ষ হ'ল ; সবাই বললে, এই করব, সেই করব। দু'দিন পরে হিংসা আর স্বার্থ ; কাজেই অমিল। তারপর আছে লোভ। আগে বলা যেতে পারে সব ঠিক্

করব; কাজে গেলে দাঁড়ান কঠিন। যার যার ভাব নিয়ে থাকবে। মেলা এটা ওটায় মিশবে না। ধর্ম্মভাবে যাচ্ছ, তাই থাক।

কালীবাবু। আমাদের সেখানেও ধর্ম্মচর্চ্চাই হয়।

ঠাকুর। সে চর্চ্চা কি জান? সেটা বাঁধি জিনিষ নয়। হ'তে পারে ভাল কথা হ'ল মাঝে মাঝে। বাঁধি নীতি নিয়ে কাজ করলে সেদিকে মন থাকে।

কালীবাবু। আমি সে সবের পক্ষপাতী নই, তবে যতটুকু দরকার।

ঠাকুর। দরকার কিছুই নেই। দেখ, আমি যখন খিদিরপুরে মঠে আছি, কালু গিয়ে আমাকে স্বদেশ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগল। আমি বললুম, হ্যাঁ, তুমি যা বলছ কথাগুলি ভাল। কিন্তু দেশের যা অবস্থা, এ কথার ওপর দাঁড়াবার শক্তি নেই। কালু তা বুঝবে না। খুব যুক্তি দেখাচ্ছে। আমি বললুম, যুক্তি ত দেখালে, সব হ'ল। কাজে কি হবে? তামসিক বৃত্তিতে দেশ ভরে গেছে। যে কথা বললে, সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাতে দাঁড়াতে পারে না। কারুর সাধ্যি আছে এর ওপর থাকে? মিটিং লেক্‌চার খুব হ'তে পারে। কাজে পড়লে দেখবে সব উল্টো। পরে তুমিও বুঝতে পারবে। তাদের প্রকৃতি যে নিচ্ছে না। মরাকে যদি বল, দৌড়, মরা কি তা পারে? যদি বল, মাটির পুতুল দিয়ে যাত্রা গাওয়াব, সে কি হবে? ভিত্তি ঠিক্ না হ'লে কিছুই হবে না।

কালীবাবু। আজ-কাল একটু ভাব ফিরেছে। ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব ও চরিত্র-বল, একটু দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুর। আগেকার চেয়ে এখনকার ছেলেদের, স্কুল-কলেজের ছেলেদের কথাই বলছি, এদের একটু চরিত্রের দিকে উন্নতি হয়েছে। এরা পরিশ্রমী, পরোপকার-ইচ্ছাও কিছু কিছু আছে। কিন্তু ধৈর্য্যাভাব। আর একজনকে মেনে চলতে পারে না। আগে সেটা খুব ছিল। এখন স্ব স্ব প্রধান। এদের বড় মানে হ'চ্ছে, 'আমরা বড় করছি বড়, আবার

ছোট করছি ছোট'। আগে যে বড় হ'ত, সবাই তাকে মেনে চলত। আর এরা বালক, প্রকৃতি ধরতে পারে না। কারণ, যে শিক্ষা হয়, তাতে মানুষ তৈরী হয় না। অর্থকরী বিদ্যায় ভেতরের মানুষটা মরে যায়। এজন্যে সূক্ষ্মতা-বোধ কম। তবে এরা সাধারণের চেয়ে অনেক ভাল।

কালীবাবু। পৃথিবীর সব জায়গায়ই এখন এই ভাব, স্ব স্ব প্রধান।

ঠাকুর। পৃথিবীর তা হ'তে পারে। ভারতবর্ষে কিন্তু একজনকে ভালবাসা, একজনকে সম্মান করা, এটী প্রধান গুণ ছিল। এদের অতিথি-সৎকার, প্রভুভক্তি খুব ছিল। যাকে কর্ত্তা করত, তাকে ভালবাসত এবং ভয় করত। একটা দাসের ভাব নিয়ে যে তাকে মানত তা নয়। যথার্থ ভালবাসা ছিল। এখন বড় করার মানে নেই। এখন ঘরেই সে ভাব নেই, বাইরে কোত্থেকে হবে।

অন্য জাতি যখন যাকে বড় করবে, যতক্ষণ সে সেই র‍্যাঙ্কে (rank-পদ) থাকবে ততক্ষণ তার অর্ডার (order-আদেশ) শুনবে। এমনি খুব স্বাধীন-চেতা হ'তে পারে, কিন্তু তার কথা মেনে চলছে। আবার দরকার হ'লে তাকে নামাতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আছে, তার কথাই মেনে চলবে। ভুল বললেও শুনবে। তা নইলে কি যুদ্ধ চলত? আমাদের দেশে ছিল ভালবাসার সঙ্গে মানা। তাদের ভালবাসা নয়, শুধু আইন মেনে যাওয়া।

এদের (এ দেশীদের) হিংসা আর স্বার্থ এত বেশী, এ দুটোর দরুণ কোন কাজ দাঁড়াতে পারে না। হিংসা সবারই আছে। হিংসা ছাড়া কে চলবে? সব ত বুদ্ধ হ'য়ে আসেন নি। তবে তাদের হিংসা কাজে বাধা দেয় না। এদের বাধা দেয়। চারটী এদের ভয়ানক প্রবল। স্বার্থ, হিংসা, ধৈর্য্যাভাব আর লোভ এ দেশে ভয়ানক ভাবে কাজ করছে। আবার ক'টা নতুন উৎপত্তি হয়েছে, দেহসুখ, কপটতা ও স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, রাজা অর্থ আর সম্মান এ দুটো নেবেই। কেউ ত আর শুকদেব হ'য়ে রাজত্ব করতে আসেন নি। যে রাজা হবে সেই অর্থ আর সম্মান নেবে।

হিন্দু-রাজা থাকতেও এই নিয়ম ছিল। অর্থ সব রাজকোষে জমা দিতে হ'ত। তার থেকে নীতি অনুযায়ী নাও। তখন প্রজারও রাজার ওপর খুব ভক্তি বিশ্বাস ছিল। রাজাও সাধন-ভজন ক'রে রাজত্ব করতেন। ধনাগারের ওপর বড় লোভ ছিল না। জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ ক'রে রাজত্ব করতেন। এখন যাঁরা এসেছেন তাঁরা অনেক ভাল। তবে আমরা দোষ দিচ্ছি, এটা আমাদের প্রকৃতিগত। আমাদের ধোপার স্বভাব। ধোপা পরের কাপড় কাচে, কিন্তু নিজের কাপড়টি ময়লা। আমরা পরের দোষই দেখছি, নিজের দোষটা দেখছি না। নিজে সে অবস্থায় পড়ে কি করি দেখলেই হয়।

আমি দরিদ্র, ধনীকে খুব গালাগাল দিলাম। নিজের যেই পয়সা হ'ল, অমনি আলাদা মূর্ত্তি। বরং ধনীর ছেলেরা পয়সার ব্যবহার জানে, অর্থের ওপর ততটা আকর্ষণ নেই। বহু অর্থ দেখেছে, বাপ-ঠাকুরদাকে বহু অর্থ ব্যয় করতে দেখেছে, সে এক রকম সহ্য হ'য়ে গেছে। তবে এক প্রকৃতি আছে, টাকার ওপর পয়সা ফেলছে। বাক্স খুলবে না পাছে ব্যয় করতে ইচ্ছা যায়। তাদের কথা আলাদা।

বহু লোক নিয়ে চালান যে কত কঠিন, সেটা কে বোঝে? ঘরে বসে যুক্তি খুব চলতে পারে। নিজের বাড়ীতেই তিন চারজন নিয়ে যে ঘর করছি, তাদের সঙ্গে কি ব্যবহার কচ্ছি, তা যদি দেখি, এদের কেন রামা মেথরকেও দোষ দিতে পারি না। এ বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ। অন্যায় দু'একটি হ'য়ে যেতে পারে। কেউ ত আর শুকদেব হ'য়ে বা অবতার এসে রাজত্ব করছে না। তারাও সাধারণ মানুষ। নিজেদের কি অবস্থা। অলসতা, প্রবল লোভ, ধৈর্য্যের অভাব, প্রবল হিংসা, প্রবল স্বার্থ, এ ক'টাই ত কাজ করছে। এতেই হাবুডুবু খাচ্ছি। সে দিকে তাকাচ্ছি না। এ গুলির থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে নিজেরাই

আগে মানুষ হই ; তবে মানুষের বিচার করব। টাকা কিছু হ'তে পারে। ওতে কি মানুষ হয় ? মানুষ হওয়া চাই। সাধন-ভজন ক'রে যাঁরা রাজত্ব ক'রে গেছেন, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি, তাঁদেরই বহু প্রকৃতি নিয়ে ব্যবহার করতে গিয়ে কি অবস্থা হ'ল। এরা ত সাধারণ মানুষ।

পাঁচটা কথা বলতে পারি, কাজে করা শক্ত। এদিকে ত সামান্য দেহের কষ্ট, সামান্য দুঃখ সহ্য করতে পারি না। মান-অভিমান-বর্জ্জন মুখে বলি বেশ। একটী লোক যদি একটু সম্মানের ত্রুটী করে, অমনি তার ওপর চটে কি ব্যবহারই যে কচ্ছি জানি না। হাতে বন্দুক থাকে ত ছুঁড়েই দিলাম, চাবুক থাকে ত দু'ঘা লাগিয়ে দিলাম ; কি, না দুটো কথার হের ফের হয়েছে। কত সাধনা করতে হবে, কত উচ্চে উঠতে হবে, তবে মানুষ হবে। তবে জিনিষ বুঝবে।

কি জন্য অপর জাতি বড় ? তাদের দোষ দেখ' না। গুণ দেখতে চেষ্টা কর ; গুণ নাও। দোষের দিকে তাকালে গুণ নজরে পড়বে না। কি দোষেই বা আমরা ছোট আছি। নিজেদের দোষ অনুসন্ধান কর ; ক'রে বাদ দাও। হঠাৎ নিজেকে বড় বলে ভেব না। ধৈর্য্য এবং ঠিক্ ঠিক্ লক্ষ্য রাখ। চোখ রেখে চল। তা'হলেই বড় হ'তে পারবে।

পুত্তুর মাষ্টার আসিয়াছেন। তিনি এম-এ পড়েন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

ঠাকুর। ভগবান্ সম্বন্ধে তোমার কিছু মনে হয় ?

পুত্তুর মাষ্টার। সময় সময় হয়, আবার সময় সময় হয় না।

ঠাকুর। কি হয় ?

পু-মা। তাঁকে সর্ব্বময় কর্ত্তা মনে হয়, আবার তা হয় না।

ঠাকুর। কেন হয় না ?

পু-মা। কোন কাজের জন্য ডাকলাম, সে হ'ল না। বিশ্বাস চলে গেল।

ঠাকুর। কর্ত্তা বলছ ত ? তোমার হুকুমে কর্ত্তার চলা উচিত

না কর্ত্তার হুকুমে তোমার চলা উচিত? তিনি যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন ত?

প্রথমে দেখ নিজের ভাল মন্দ কি বুঝি? বাসনার তাড়নায় যা ইচ্ছা তাই কচ্ছি। যা মনে উঠছে তাই চাচ্ছি। সব যদি তিনি দেন তবে ত বিপদ। লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ক'টা পূরাবে? বাসনা পূরণ না হ'লেই ত তোমাদের দুঃখ। নয় ত প্রকৃত দুঃখ তিনটী;—ক্ষুধার অন্ন, তাও রসনা-তৃপ্তির জন্য নয়, ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য; লজ্জা-নিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্র; আর ব্যাধির যন্ত্রণা। তা ভিন্ন সবই ত বাসনার তাড়না।

পু-মা। সে সব বাসনাও ত ভগবান্ দিয়েছেন।

ঠাকুর। ভগবান্ ত সবই দিয়েছেন। বাসনা জল-বুদ্বুদের মত। বুদ্বুদ এক একটা উঠছে, আবার মিশে যাচ্ছে। বাসনাও তাই। উঠল, পূরণ না হ'লে দুঃখ হ'ল, আবার মিশে গেল। কর্ত্তা যদি খাড়া কর, তবে তাঁর হুকুমে চল।

পু-মা। কারও খারাপ প্রবৃত্তি, কারও ভাল প্রবৃত্তি কেন?

ঠাকুর। তাতে ক্ষতি নাই; খারাপ ভাল দুই আছে। খারাপ দিয়েছেন, তাতে এই এই হয়; আবার ভাল দিয়েছেন, তাতে এই এই হয়। দুটো আছে, বেছে নাও। অন্ধকার আছে বলেই না আলো? স্থিতিই এই। ছানাতে চিনিতে ময়রা অনেক রকম তৈরী করে। যার যেটা প্রিয় সে সেটা নেয়। যে যেটা চাচ্ছে। তুমি ভালও নও, মন্দও নও। তুমি ভাল-মন্দ দুএরই পার। এ হ'চ্ছে প্রকৃতি।

পু-মা। কর্ম্মের স্বার্থকতা কি? সবই যদি তাঁর ইচ্ছা, তবে আর কর্ম্ম কেন?

ঠাকুর। কর্ম্মও তাঁর ইচ্ছা। যদি দেন কর্ম্ম করতে, করব। যদি দেন ঘুমুতে, ঘুমোব। তিনিই ঠেলে দিচ্ছেন।

পু-মা। তাঁর কর্ম্মের জন্য আমরা দোষী নই।

ঠাকুর। তুমি দোষী নও, তবে ভেতরে বোধ আছে বলে দোষী।

সুখ-দুঃখ অনুভব করে মন। দোষ-গুণ বিচার করে মন। দোষ, ভেতরে বোধ আছে, তাই নিতে হবে।

পু-মা। কর্ম্ম যখন ইচ্ছাতে হয় না, তখন দায়ী কে ?

ঠাকুর। দায়ী কেউ নয়, কর্ম্ম করলে তার সাজা আছে।

পু-মা। আমার ত ইচ্ছা নয় যে কর্ম্ম করি।

ঠাকুর। তাঁর ইচ্ছা রয়েছে।

পু-মা। শরীরের কষ্ট-ভোগ ত আমার হ'চ্ছে।

ঠাকুর। শরীরটাও তাঁকে দাও। তা'হলে ভোগও তিনি করবেন। আমি করছি বোধ রেখেছ, তাই আমিত্ব বুদ্ধি। তবে ভাল-মন্দ সব বোধ থাকবে। আর তিনি সব হ'লে তুমিও তাঁর, সবই তাঁর।

গান আছে না,—

তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুঃখ,
তোমারই দেওয়া বুকে তোমারই অনুভব।

পু-মা। কর্ম্মফল কি সবকে ভোগ করতে হয় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সবকেই ভোগ করতে হয়।

পু-মা। কেউ রেহাই পায় না ?

ঠাকুর। পায়; তবে সাধারণ আইনে সবকেই ভোগ করতে হয়। আর মাপও হয়; জজ সাহেব দশ বৎসর জেল দিলেন। জেলে ভাল ব্যবহার দেখে হয়ত পরে পাঁচ বৎসর কমিয়ে দিলেন। এমনও হ'তে পারে যে রাজা জেল দেখতে গেলেন, কয়েদী খালাস পেল।

আশু। বৈরাগ্য এলে আবার সংসার কি ক'রে করবে ?

ঠাকুর। বৈরাগ্য কি ? সংসার-বস্তুতে অশ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধা ত হয় মনে। কার্পেটে বসে আছ। তাতে মন নেই, বসার দরুণ বৈরাগ্য গেল না। জিনিষ হ'চ্ছে আসক্তি। আসক্তিই ভোগ করে। আসক্তিশূন্যতা বৈরাগ্য।

আশু। স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াতে হবে। সেজন্যে ত কাজ করতে হবে। উদাসীনতা, এল, কাজ হবে কি ক'রে ?

ঠাকুর। খুব উদাসীনতা এলে কাজ করতে পারবে না। তবে বোধ আছে কর্ত্তব্য, স্ত্রী-পুত্রের জন্য চিন্তা আছে, তাই করতে হবে। আর বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তারা থাকলেও সে তাদের চিন্তা রাখবে না। আর এক সংসার-নীতি। সব রেখেছ; এদের উদর চালাতে হবে, তাই কিছু রোজগার। কামনা-বাসনা তৃপ্তির জন্য খেটে মরা নয়। তার ত ইতি নেই। সেই এক মহারাজা, তাঁর কোন অভাব নেই। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাণী, তোমাকে আমি খুব সুখে রেখেছি, না ?" রাণী বললে, "তুমি কি সুখে রেখেছ ? ইন্দ্রের শচী আমার চেয়েও কত সুখে আছেন।" রাজা ত শুনে অবাক! এত হীরে মুক্তোর মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছি, তবু বলে শচীর চেয়ে সুখী নই! তা আমি রাজা হ'য়ে এত করেও মন পেলুম না, বলে, 'কি সুখে রেখেছ ?' সাধারণ লোকে আর কি সুখে রাখবে ?"

মন কোন অবস্থায় সুখে থাকতে চায় না। বাড়ীর চাকর, দশ টাকাতেই তার চলে। তার ওপর এগার টাকা হ'লে ভারি আনন্দ, মাইনে বেড়েছে। আর মনিবের এত টাকাতেও কুলুচ্ছে না। সেও ত জীব, তারও ত ছেলে পরিবার রয়েছে। সামান্য খেয়ে তার গায়ে কি রকম জোর। বড় বড় বোঝা ঘাড়ে করছে। আর তোমাদের দু'শ গণ্ডা খেয়েও হ'চ্ছে না।

জিনিষ বাসনা। এতেই দরিদ্রতা, এতেই অভাব। বাসনার নাশ করতে হবে।

গোপেনের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। গোগেনবালার কথা উঠিয়াছে। গোগেনবালা ডাক্তার সাহেবের কনিষ্ঠা ভগ্নী। গোপেনের মেজ ভাই দ্বিজেনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার ঠাকুরের ওপর অসাধারণ ভক্তি ভালবাসা। ঠাকুর প্রায়ই তাঁহার কথা বলেন আজও বলিতেছেন।

ঠাকুর। গোপেন বড় ভাল মেয়ে। এত সরল, ভেতরে কোন খুঁত নেই। আমার ওপর খুব ভক্তি, বিশ্বাস আর একটা অগাধ ভালবাসা। যীশুর শিষ্যা মেরীর ভাব অনেকটা আছে। অমন মেয়ে বড় চোখে পড়ে না।

নানা কথার পর অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—দ্বাদশ অধ্যায়।

২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৭ই মে, ১৯২৬ ইং ;

শুক্রবার, কৃষ্ণা-দশমী।

কলিকাতা।

সবল ও দুর্ব্বলের সংসার—ঠাকুরের অসুখের কথা—রিপুর মায়া—রোগ ও স্বাস্থ্য—মঙ্গল ও অমঙ্গল, তিনি মঙ্গলময়—ঠাকুরের গান ও ভাব।

ঠাকুরের শরীর আজ খারাপ। জ্বর ৯৯·২ ডিগ্রী আছে।

বিকাল ৫টা বাজিল। একে একে ভক্তরা আসিতেছেন। ভবানীপুরের পুন্তু, ডাক্তার সাহেব, আশু, অজয় আছে। খিদিরপুর হইতে অচ্যুত, বিভূতি, হরিপদ আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি আসিয়াছেন। নির্ম্মলবাবুর ছেলে (কানু), কালীবাবুর ছেলে (ধ্রুব) আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। একটী নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন ;

ঠাকুর। খুব তাঁর নাম করবে। তাঁতে থাকবে, সব মঙ্গল হবে। দুটো নীতিতে সংসার করা যায়। এক, যদি দুর্ব্বল হই তবে সবলের আশ্রয়ে থাকতে হয়। আর নয় ত, যদি সবল হই তবে সংসার করা যায়। এ দুটো অবস্থায় ঠিক্ ভাবে সংসার করা যায়। এ ভয়ানক স্থান, বড় পেছল জায়গা।

ডাক্তার সাহেব। সবল হ'য়ে সংসার কি রকম ?

ঠাকুর। নিজে কাম ক্রোধ লোভ এদের জয় ক'রে যাওয়া চাই। সবলতা মানে জ্ঞান। প্রকৃতিগত বোধ এসেছে। যাতে যাচ্ছে তাতেই বোধ আছে। অনিষ্ট হয় না। আর দুর্ব্বলের সবলের

আশ্রয়ে থাকতে হয়। বিপদ এল, তার দোহাই দিয়ে বেঁচে গেল। এই দেখ না, আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি। কেউ আক্রমণ করতে আসলেই 'কালী, ডাক্তার সাহেব' বলে চেঁচাব (সকলের হাস্য)। কোন ভয় নাই। নির্ভাবনায় আছি।

কালীবাবু। কে কার ভরসায় আছে তা বোঝবার উপায় নেই (সকলের হাস্য)। আমরা যেটা নিজে চেষ্টা ক'রে পারি না, সেটা এখানে এলে আপনি হ'য়ে যাচ্ছে। তবে এখন একটা গণ্ডগোলে পড়েছি।

ঠাকুর। কি গণ্ডগোল ?

কালীবাবু। আপনি একটা পুরাণ জিনিষ (প্লীহা) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেটাকে না তাড়ালে হ'চ্ছে না।

ঠাকুর। পুরাণ হ'লে কি ছাড়ান যায় ? ভালবাসা বেশী হ'য়ে গেছে (সকলের হাস্য)। দেশে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি, তাই এটা বড় হ'য়ে গেছে।

কালীবাবু। সেখানে (দেশে) যখন ছিলেন, তখন সেখানকার সব নিয়েছেন, এটাও নিয়েছেন। এখন সেখানকার সব যখন ছেড়ে দিয়েছেন, এটাকেও ছেড়ে দিন।

ঠাকুর। এর ওপর বিশেষ মায়া ছিল (সকলের হাস্য)।

কালীবাবু। এটাও দুর্ব্বল, সবলের আশ্রয় নিয়েছে।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের জন্য ভক্তরা সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। দিন দিন স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িতেছে। অথচ ঔষধেও কোন ফল হয় না। ঠাকুরের ঔষধ খেতে ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্তরা ধরিয়া পড়িলে খান। কিন্তু খাইলেই দেখা গিয়াছে শরীর খারাপ হয়। তাই আজকাল তাহারাও জোর করিতে ভয় পায়। অথচ রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঠাকুর নিজে সেজন্য মোটেই ভাবেন না। ভক্তদের দুইটি ছাড়া উপায় নাই। এক ঔষধ, নয় ত ঠাকুরকে ধরা। ঔষধে ত কিছুই হয় না। তাই আজ সকলে ঠাকুরকে বলিতেছেন, যেন তিনি

শরীরটা 'সুস্থ করিয়া লন। ঠাকুর নানা কথায় সেটা কাটাইয়া দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় দেশ (মাঝের গাঁ) হইতে আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের জ্যেঠতুত ভাই।

ঠাকুর। অমূল্য বলছিল, "এবার একবার দেশে চলুন। নয় ত যা শরীর হ'চ্ছে আর যেতে পারবেন বলে ভরসা হয় না।" আর কি হবে? মা ষষ্ঠি রাগ করেন ত ছেলে কেড়ে নেবেন।

অচ্যুত। ছেলেটার ওপর আপনার মায়া না থাকতে পারে, আমাদের আছে।

কালীবাবু। ভক্তদের জন্য যখন দেহটা, তখন সেটাকে ভাল করে দিন। নয় ত এবার আমরা ষ্ট্রাইক (strike-ধর্ম্মঘট) করব। মাকে জোর ক'রে ধরব।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। বলিতেছেন:—

ঠাকুর। দেখ, বহুদিনের আলাপ যেতে চায় না। তাড়িয়ে দিলেও যেতে চায় না। আবার আসে। এই রিপুরা দেখনা, মন্দ বুঝছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে। তবুও তারা ছাড়ে না। যেমন পোষা কুকুর। বাবু কোলে করেছেন। বাবুর গা চাটছে, বেশ আছে। কেউ হয় ত বললে, 'কি কুকুর একটা নিয়ে আছেন? অস্পৃশ্য জীব, ছোঁবেন না।' তখন কোল থেকে নামিয়ে দিলেও যেতে চায় না। তার কোলে উঠে অভ্যাস হ'য়ে গেছে কিনা, যেতে চাইবে কেন?

ভূতে পাওয়া রোগী দেখনি? রোজা ভূত ঝাড়াচ্ছে। বলছে, 'যাচ্ছি যাচ্ছি,' তবু যেতে চায় না।

কালীবাবু। সে রকম রোজা হ'লে ত দেখেই পালায় (সকলের হাস্য)।

অজয়। সে রকম্ ভূত হ'লেও ছাড়ে না।

ঠাকুর। সেই এক বাড়ীতে ভূতে পেয়েছে। রামায়ণ দিচ্ছিল।

তা ভূত গাছ থেকে রামায়ণ ওয়ালার ঘাড়ে পড়ে তাকে ফেলে দিলে (হাস্য)।

ঠাকুর ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করিতেছেন। কানু, ধ্রুব, এরা তাঁহাকে ডন দেখাইতেছে।

আবার অসুখের কথা উঠিয়াছে।

ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেহের ধর্ম্ম রোগ, শোক, ব্যাধি। এর হাত থেকে ত নিষ্কৃতি নেই। বিশেষতঃ কর্ম্ম-জগতের সঙ্গে থাকতে হ'লে এ সব আসে।

কালীবাবু। আসে, তবে ছেড়ে দিক।

অচ্যুত। রোগ যেমন দেহের ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যও ত তেমনি ধর্ম্ম।

ঠাকুর। স্বাস্থ্যধর্ম্ম তাদের পক্ষে, যাদের স্বাস্থ্যের এদিক ওদিক হ'লে মন চঞ্চল হয়। দেহ ত থাকে না, যাবেই; এ যাদের বোধ আছে, তাদের স্বাস্থ্যে কি করবে? যাদের স্বাস্থ্যের গোলমালে মন চঞ্চল হয়, ধর্ম্ম-কার্য্যে বিঘ্ন হয়, তাদের জন্যই স্বাস্থ্যধর্ম্ম।

কালীবাবু। তবু শরীরের ধর্ম্ম শরীর কেন পালন করছে না?

ঠাকুর। আর ত আবশ্যক নেই। মন যদি শরীর ছাড়িয়ে গিয়ে থাকে, তবে শরীর তার ধর্ম্ম পালন করুক বা নাই করুক আসে যায় না। মন যদি তাতে থাকে তবে দরকার হবে। কারণ, শরীরের গোলমাল হ'লে মন চঞ্চল হবে, ধর্ম্মে বিঘ্ন হবে।

কালীবাবু। স্বাস্থ্য থেকে কাজ নেই এও ত তিনি বলছেন না।

ঠাকুর। শরীরের সঙ্গে কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। শরীরে যারা মনকে রক্ষা করে, তাদের কাজে বিঘ্ন হ'তে পারে। দুঃখ এল, সঙ্গে সঙ্গে মনকে হারিয়ে ফেল্লে। যাদের মন শরীর ছাড়িয়েছে তাদের ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই। শরীর সুস্থ যদি থাকে বেশ। অসুস্থ থাকলেও আসে যায় না।

কালীবাব। স্বাস্থ্য ত শরীরের ধর্ম্ম।

ঠাকুর। আর ত দরকার নেই।

কালীবাবু। আপনার না থাকতে পারে। কিন্তু কাজ করতে গেলে ত চাই।

ঠাকুর। যাঁর কাজ তিনি বুঝবেন। রাখা দরকার—রাখবেন, না রাখা দরকার হয় ত রাখবেন না।

কালীবাবু। তিনি টিনি ত আমরা বুঝি না। আমরা আপনাকেই দেখছি। আমরা দেখছি তিনি ভাল কাজ করছেন না। সকলের প্রাণে কষ্ট দিয়ে তাঁর কি লাভ?

ঠাকুর। ওটা ত বুঝার ভুল।

কালীবাবু। ভক্তের জন্য ভগবান্ দেহ ধারণ করেন; তবু এ রকম করেন কেন?

ঠাকুর। তিনি মঙ্গলময়। যা করেন, মঙ্গলের জন্য।

ডাক্তার সাহেব। মঙ্গল অমঙ্গল বুঝা যায় না।

ঠাকুর। অমঙ্গলও যে মঙ্গল। মূল মঙ্গল। অমঙ্গলেই মঙ্গল টেনে আনে।

কালীবাবু। ভবিষ্যৎ চিন্তা করছি না। উপস্থিত যা প্রাণে লাগছে বলছি।

ঠাকুর। তা দেখ, প্রহ্লাদের বারে বারে কত দুঃখ পেতে হয়েছে।

কালীবাবু। প্রত্যেকবার ত তিনি কোলও দিয়েছেন।

ঠাকুর। তিনি ত দুঃখ দেন না। দেখ, এত ব্যাধি, এত কাণ্ড-কারখানা; ডাক্তার বলছে, 'কি ক'রে বসে আছেন,' তবু ত তিনি আনন্দ ঠিক্ রেখেছেন। এর চেয়ে কি সুখ দেবেন। তিনি সবই মঙ্গলের জন্য করেন।

সোমদেব আসিল।

ঠাকুর। এস, সোমদেব এস।

আবার বলিতেছেন।

কেন করেছেন, একটা মঙ্গল নিশ্চয়ই আছে।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ—

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, একবার বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী এসেন কি না এসেন দেখি॥
নিয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে,
তার একটা ভাবনা কি রে,
নইলে তারা নামের কবচমালা বৃথায় আমি গলে রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমার কভু নাতান, কভু সাতান, কভু দেনার দায়ে নাহি ঠেকি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলে,
অন্যে কি বুঝিতে পারে,
ত্রিলোচন যার না পায় তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কিসে॥

মাঝে মাঝে 'মা মা' বলিয়া তান দিতেছেন। গম্ভীর ধ্বনিতে হল্ ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ভক্তরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন,—

"নিয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কি রে,
নইলে তারা নামের কবচমালা বৃথায় আমি গলে রাখি।"

গান শেষ করিয়া 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন। অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়াছেন। সন্তানদের দেখিতেছেন। হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাহারা নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া আছে।

আবার অপর কথার অবতারণা করিয়া ঠাকুর সে ভাব বদলাইয়া দিলেন।

নানা কথার পর ৯॥টায় অনেকে উঠিলেন। ১০টার পর ঠাকুর আরতি করিতে বসিয়াছেন। কালীবাবুর কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। কালী বড় ভাল ছেলে। ভেতরে কোন গোলমাল নেই। এত বড় সম্পত্তি মালিক, তা অহঙ্কার বলে জিনিষ নেই। মান অভিমান কিছুই নেই। কাশীতে একটা মোটা কাপড় পরে খালি-পায়ে ঘুরতো। যেখানে সেখানে পড়ে আছে। জমিদার কি বড়লোক বলে মনে কোন অহঙ্কার নেই। নিজের কর্ম্মচারীদের কি প্রজাদের সঙ্গেও খুব সরল ব্যবহার করে। তাকে দেখলেই আনন্দ হয়।

তারপর আরতি করিলেন। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৮ই মে, ১৯২৬ ইং ;

শনিবার, কৃষ্ণা-একাদশী।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু—ঠাকুরের অসুখের কথা—কবীর ও বুদ্ধের উপদেশ—মন সদাই চঞ্চল—সদ্‌গুরু, রাজপুত্র ও দুষ্ট বন্ধুর গল্প—অর্থে সুখ হয় না—ভক্ত ও অর্থ—চার্ব্বাকের মত—মোক্ষ—ব্রহ্ম ও সৃষ্টি—শক্তি ও শক্তিমান্—দেবতা ও মানুষ—রাজা ও অলক্ষ্মী প্রতিমার গল্প—বৈজ্ঞানিক ও পরজন্ম—পৌরাণিক বর্ণনা—সৃষ্টিতত্ত্ব—ভোগ করে মন—কৃষ্ণ, গোপী ও দুর্ব্বাসার কথা—মহাপুরুষ ও সংসারী—অবতার—প্রাচ্য সাধু ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত।

আজ শনিবার। আপিস সকালে ছুটী হইয়াছে বলিয়া অনেকে আসিয়াছেন। শ্রীরামপুর হইতে মনোরঞ্জন, অশ্বিনী, ধনকেষ্ট আসিয়াছে। খিদিরপুরের কালু, ললিত, বিভূতি, অচ্যুত আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু আসিয়াছেন। ভবানীপুরের অজয়, রাজেন, শশী, ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি আছেন।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। পরে 'মা মা, আনন্দম্, আনন্দম্, ওঁ-তৎ-সৎ' বারবার বলিতেছেন। আজ খুব আনন্দ। ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তদের দেখিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বলিতেছেন—"ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দময়ী মারে জানে।"

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। ইনি আলিপুরের প্রসিদ্ধ সরকারী উকীল। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ঠাকুরের অসুখের কথা হইতেছে। ভক্তদের এই একমাত্র চিন্তা। সকলেই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি রকম আছেন?"

ঠাকুর হাসিমুখে বলেন, "বেশ আছি।"

ঠাকুরের মুখের ভাব দেখিয়া শরীরে যে অত বড় রোগ রহিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মুখ সর্ব্বদা অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল, হাসি-মাখা, সদাই প্রফুল্ল, অথচ ডাক্তার বলিয়াছে—২৫ পারসেণ্ট রক্ত আছে। এ অবস্থায় সাধারণ লোক নড়াচড়া করিতে পারে না।

কৈলাসচন্দ্র বসু বলিতেছেন,—কালাজ্বর যদি ঠিক্ হয়, তবে খুব mild (কম) ভাবে দুটো একটা injection (ফুঁড়ে অষুধ) দিতে হবে। যিনি এটা আবিষ্কার করেছেন, তিনিই বলেছেন, এ শুধু ঐ কালাজ্বরের বিষের ওপরই কাজ করবে।

ঠাকুর। এ মাসটা যাক, দেখি। ক'টা দিনই বা আছে। যদি এমনি সেরে যায়, তবে আর ফোঁড়াফুঁড়ি কেন?

কৈলাসবাবু। আপনার বোধ হয় সে রকম কষ্ট বোধ হয় না?

ঠাকুর। এমনি কিছু বোধ হয় না। তবে কোনদিন বিকালে একটু কান টান গরম বোধ হয়, যেন ঝাল বেরুচ্ছে। হয় ত কখনও একটু দুর্ব্বল অনুভব করি।

ডাক্তার সুবোধবাবু ও চারুবাবুর কথা উঠিয়াছে। তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন, খুব ভক্তি করেন। কৈলাসবাবুও বলিতেছেন তাঁহারা খুব ভাল লোক।

কালীবাবু। সুবোধবাবু লোকটি বেশ।

ঠাকুর। সুবোধও বেশ, চারুও খুব ভাল; বেশ শান্ত স্বভাব। দেখ, কখনও হয় ত চলতে দুর্ব্বল বোধ করলুম। আবার খুব চলতে আরম্ভ করলুম। কোন কষ্ট হ'ল না। কাশীতে শিবরাত্তিরের আগের দিন চলতে খুব কষ্ট হ'ল। আর শিবরাত্তিরের দিন খুব ঘুরলুম। অনেক দেবদেবী দেখে বেড়ালুম। কোনটা আবার তিন চার তলা

নীচে। সেই সিঁড়ি ভাঙ্গতে কোন কষ্ট হ'ল না। এমনি সিঁড়ি উঠতে কষ্ট হয়।

কৈলাসবাবু। শরীরের চেয়ে যে আপনি বড়, কাজেই অসুখ আপনার কি করবে ?

আশু আসিয়া বসিল। গোপেন আসিল।

ঠাকুর। এস, গোপেন এস।

গোপেন। আপনার শরীর কেমন আছে ?

ঠাকুর। মন্দ কি, বেশ আছি।

প্লীহার কথা হইতেছে। ঠাকুর বলিলেন,— সেটা আগেও ছিল, তবে এখন একটু বেড়ে গেছে।

গোপেন। বৃদ্ধি থাকলে আবার হ্রাসও আছে।

ঠাকুর। বটে ; বাড়ের পালা পড়েছে কিনা (সকলের হাস্য)।

দেখ, হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি তার পায় বিধি ?
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজ।

আমার ব্যাধি যখনই ঘটে দেখেছি, আপনি না গেলে যায় না।

ঠাকুর অন্যকথা পাড়িলেন।

ঠাকুর। দেখ, হিংসা আর অভিমান, এ দুটোই দুঃখের কারণ। বুদ্ধের চারটী উপদেশ আছে ;—কা'কেও ঘৃণা করবে না ; বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়চিন্তা করবে না ; অর্থ থাকে ত দান করবে ; জ্ঞানীর কাছে পরামর্শ নেবে। কবীরেরও চারটী আছে ;—অহঙ্কারে বিপদ আসে ; পাপে দুঃখ আসে ; দানে স্থৈর্য্য আসে ; আর উপেক্ষায় ভগবান্ আসেন। রোগ, শোক, তাপ, সমস্ত জিনিষকে উপেক্ষা করতে পারলে তার কাছে ভগবান্ থাকবেন। মহাপুরুষের লক্ষণ দিয়েছে—রোগ, শোক, অন্নকষ্টে যিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন তিনিই মহাত্মা।

এ সংসার ভয়ানক স্থান। এখানে থাকতে হ'লে দুর্ব্বলতা যাওয়া চাই। এক আছে, কোন বীরের আশ্রয় নিয়ে থাকা ; আর নয় ত, নিজে বীর হওয়া। বীর হ'লে কে তোমার কাছে আসবে ? আর বীরের

আশ্রয়ে থাকলেও কেউ তোমার কাছে আসবে না। তাই দিয়েছে সৎ সঙ্গ। দুর্ব্বল হ'লেও সবলের সঙ্গে থাকলে শত্রুপক্ষ অপকার করতে পারে না, ভয় পায়।

মনকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস নেই। এই বেশ আছে, কোন গোলমাল নেই। আবার হয় ত ছুটল। পাগলা হাতীর মত। বেশ খাসা আছে; চট্ ক'রে দৌড়াতে আরম্ভ করলে, কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কিছুই ঠিক্ নেই।

এর একটী গল্প আছে। এক রাজপুত্রের এক সাধুগুরু ছিলেন। সে গুরুকে খুব ভক্তি করত। গুরু ছাড়া কিছু জানত না। বেশ আছে। এখন তার একটী বন্ধু জুটল। অর্থ থাকলেই মুস্কিল। দুষ্ট লোকগুলো সেদিকে গতি করে। তারা ত মানুষটাকে ভালবাসে না। তার অর্থকেই ভালবাসে। দেখ, সে যদি অর্থশূন্য হ'য়ে যায়, কেউ তার কাছে আসবে না। রাজপুত্রেরও একটী বন্ধু এসে জুটল। বেশ ভাল ব্যবহার করতে লাগল। তার মিষ্টি কথায় রাজপুত্র মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তার সঙ্গে খুব বেড়ায়। গুরু সেটা টের পেয়ে একদিন রাজপুত্রকে ডেকে বললেন, "দেখ, তুমি ওর সঙ্গে মিশো না। ও লোক ভাল নয়। ওর সঙ্গ ছেড়ে দাও।" রাজপুত্র বললে, "না গুরুদেব, সে ভাল লোক। আর সে আমার কি করবে? আপনার সঙ্গে থেকে আমার মন তৈরী হ'য়ে গেছে। ওর কি শক্তি আমায় টলায়?" সাধু বললেন, "দেখ, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। মনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোন্ দিকে যাবে, ঠিক্ নেই। আর এ লোকও ভাল নয়। আমি বলছি, তুমি এর সঙ্গ ছাড়।" রাজপুত্র বললে, "না গুরুদেব, আপনার ওপর আমার ভক্তি বিশ্বাস রয়েছে; ওর কি ক্ষমতা আছে?" রাজপুত্র শুনলে না।

কিছুদিন যায়। দু'জনে খুব ভাব হয়েছে। একদিন বন্ধুটী বললে, "রাজপুত্র, চল একটী বাগানে বেড়িয়ে আসি। বেশ সুন্দর বাগান।" রাজপুত্র বললে, "চল বন্ধু; বাগানে বেড়াতে যাব তাতে আর দোষ কি?

দু'জনে গেল। গিয়ে বাগানের ফটকে দেখে, মদ্য বিক্রি হ'চ্ছে। বাগানে ঢুকতে হ'লে একটু মদ্য পান ক'রে যেতে হবে, বন্ধু বললে, "এ আর কি। একটু মদ খেলে যদি বাগানের আনন্দ পাওয়া যায়, তাতে আর দোষ কি? সামান্য একটু মদ বই ত নয়।" রাজপুত্র বললে, "কি বলছ বন্ধু, আমি মদ খাব!" সে বললে, তোমার গুরু ত আর এখানে নেই। তিনি ত দেখছেন না, এতে আর দোষ কি?" রাজপুত্র বিরক্ত হ'য়ে বললে, "না বন্ধু, তোমার সঙ্গে এসে ভাল কাজ করিনি। সামান্য বাগানের আনন্দের জন্য মদ খাব!" যেই রোক দেখেছে, অমনি সে নরম হয়েছে। নিয়মই এই, বাবুকে কড়া দেখলে মোসাহেবরা নরম হ'য়ে পড়ে। মনকে কড়া দেখলে রিপুরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। যেই দেখেছে রাজপুত্র চটে গেছে, অমনি বলছে, "না বন্ধু, তোমায় ঠাট্টা করছিলুম। চল, আর এক দরজা আছে, সেই দিক দিয়েই যাব।"

সেখানে গিয়ে দেখে গোমাংস বিক্রী হ'চ্ছে। সেখান দিয়ে যেতে হ'লে একটু গোমাংস ভক্ষণ ক'রে যেতে হবে। বন্ধু বললে, "একটু গোমাংস ভক্ষণ করা। না হয় খেলেই বা। এতে আর কি দোষ? রাজপুত্র চটে গিয়ে বললে, "কি বলছ! আমি হিন্দু হ'য়ে গোমাংস ভক্ষণ করব! গো-মাতা, যাকে আমরা পূজো করি, যার দুগ্ধ খেয়ে ছোটবেলা আমরা বেঁচেছি, যার পরিশ্রমে শস্যাদি উৎপন্ন হ'চ্ছে, আর সেই শস্য খেয়ে আমরা দেহ ধারণ ক'রে আছি, ত'ার মাংস খাব? না বন্ধু, তোমার কথা শুনে ভাল কাজ করিনি। গুরুদেব আগেই বারণ করেছিলেন, না শুনে অন্যায় করেছি।" তখন সে নরম হ'য়ে পড়ল; বলছে, "না বন্ধু চটছ কেন? আচ্ছা চল, আর এক দরজা আছে, সেই দিক দিয়ে যাই।"

সেখানে গিয়ে দেখে, এক ব্রাহ্মণ খড়গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকতে হ'লে তাকে কেটে যেতে হবে। বন্ধুটী বললে, "এ আর কি বন্ধু। তুমি রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়ের সন্তান। ক্ষত্রিয়রা কত যুদ্ধ

করে, কত জীব-হত্যা করে। তা একটা ব্রাহ্মণ কাটবে তাতে কি? চল, কেটে বাগানে ঢুকি।" রাজপুত্র বিরক্ত হ'য়ে গেলেন। বললেন, "কি বলছ বন্ধু, ব্রহ্ম-হত্যা করব। যে ব্রাহ্মণ বর্ণ-গুরু, যাঁদের ইঙ্গিতে জগৎ চলছে, আমি মিছিমিছি সামান্য একটা বাগান দেখবার জন্য তাঁকে মারব? না; তুমি দেখছি বড় খারাপ লোক। তোমার সঙ্গে আসা ঠিক্ হয়নি। গুরুবাক্য অমান্য ক'রে বড় অন্যায় করেছি।" লোকটি বললে, "না না বন্ধু, রাগ করো না। চল, আর এক দরজা আছে, সেদিক দিয়ে যাই।" সেখানে গিয়ে দেখে বারাঙ্গনা। বারাঙ্গনার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। দুর্ব্বলতা এসেছে। সব ভুলে গেছে, গুরু আর মনে নেই।

নিয়মই হ'চ্ছে, মনকে একবার দুর্ব্বল পেলেই রিপুরা চেপে ধরে। তখন সব ভুল। যখন যে অবস্থায় মন থাকে সে রকমই সব দর্শন হয়। সে রকমই সব অনুভূতি হয়; সে সব যুক্তি-প্রমাণ আসে। যখন সৎএ মন থাকে তখন সব সৎ এবং উচ্চ ভাবের প্রমাণ মনে ওঠে। যখন অসৎএ মন তখন সে সব প্রমাণ-যুক্তি মনে আসে। সে সবই ভাল লাগে। এ প্রপঞ্চই এই। যেই তারা তাদের অধীন ক'রে নিয়েছে, তখন তাদের যুক্তি-প্রমাণ ঠিক্ বলে বোধ হ'চ্ছে; আর তাই ভাল লাগছে। তখন গুরুবাক্য সৎ যুক্তি আর মনে নেই। পাছে জ্ঞান থাকে, আবার বোধ আসে, তাই প্রথম দরজায় নিয়ে মদ্য পান করাল। যেটুকু জ্ঞান ছিল তাও লোপ হ'ল। তার পরেই দ্বিতীয় দরজায় গিয়ে গোমাংস ভক্ষণ। এখন যা বলছে তাই করছে। তৃতীয় দরজায় গিয়ে ব্রাহ্মণ-হত্যা। যেই ব্রাহ্মণকে কেটেছে অমনি দেখে গুরু সামনে। গুরু বলছেন, "কি রাজপুত্র। তোমার মন না তৈরী হয়েছে? তোমায় না বলেছিলাম মনকে বিশ্বাস নেই। এর সঙ্গে মিশো না। তুমি কি ভাব গুরু দূরে থাকে? কিছু দেখতে পায় না? গুরু কখনো কাছ ছাড়া থাকেন না। তিনি আপন। আপন কখনো কাছ ছাড়া হয়? সব কাজের ভেতর তিনি ঠিক্ চালিয়ে নেন্। তবে কখনও দরকার মত

দুঃখ দেন, তার ভেতর দিয়ে নিয়ে যান।” গুরুকে যেই দেখেছে, এরা সব সরে গেছে ; পুলিশ দেখলে যেমন চোর দৌড় মারে।

মনের স্বভাবই এই। রিপুর ভয়ানক আকর্ষণ কোথায় নিয়ে ফেলছে, বুঝতেই দেয় না। তাই গুরুর সঙ্গ। তাতে শক্তি হয়। মনকে চাঙ্গা করে। অস্থির ছেলের বাপ-মার কাছে থাকা উচিত। তা'হলে আর পড়ার ভয় থাকে না।

কৈলাসচন্দ্র বসু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

ঠাকুর তাঁহার কথা বলিতেছেন :—

ঠাকুর। দেখ, কৈলাসের আমার ওপর একটা খুব ভক্তি বিশ্বাস। মাঝে মাঝে ছুটে আমাকে দেখতে আসে। স্বভাবটি অতি ভাল, শান্ত, হাস্য বদন। অতবড় উকীল, অহঙ্কার নেই। আমার ওপর খুব ভালবাসা। কৈলাসকে দেখলে বড়ই আনন্দ হয়। তার স্ত্রীও ভক্তিমতী ; আমার ওপর একটা অগাধ ভক্তি। আমাকে দেখবার জন্যে কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের বাড়ীতে গেলে এত যত্ন করে তা বলবার কথা নয়। তাদের ছেলে মেয়ে সকলেরই আমায় পেলে মহা আনন্দ ; আমাকে ছাড়তে চায় না। তাদের সরল ভালবাসা ভক্তি দেখলে বড়ই আনন্দ হয়। কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছা করে না।

আবার কথা হইতেছে।

শশী। অর্থ থাকলেই কি শান্তি পাওয়া যায় ?

ঠাকুর। তা কি হয় ? অর্থ ত শান্তির কারণ নয়। তবে ধর্ম্ম আর অর্থ যদি হয় তবে হ'তে পারে। ধর্ম্ম আগে, পরে অর্থ। ধর্ম্ম ছাড়া অর্থ অনর্থের মূল।

শশী। সংসারীদের অর্থে সুখ হয় যে ?

ঠাকুর। কই সুখ ? তৃপ্তি কোথায় ?

গোপেন। খেলে দেলে, বেশ আনন্দ হ'ল।

ঠাকুর। দেখ, পোলাও কালিয়া খেলেই ত আনন্দ হয় না। তাও সব সময় খেতে পার কি? দারুণ ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করছ, খাও দেখি তখন।

গোপেন। তার ব্যাধি আসবে না।

ঠাকুর। সে সব ত ভগবৎ-কৃপার কথা। ধর্ম্মের ভিত্তি না হ'লে হবে কেন? তা ভিন্ন খেতে গেলে; খুব পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা আছে। খেতে বসলে, আর বাড়ী থেকে খবর এল—ছেলের বড় ব্যামো। খাওয়া দাওয়া সব চুলোয় গেল; এখন উঠে যেতে পারলে বাঁচি।

গোপেন। অর্থ না থাকার চেয়ে বরং থাকা ভাল। তাতে সুখ হ'তে পারে।

ঠাকুর। হাঁ; বাসনা-কামনা থাকলে অবশ্য অর্থ হ'লে ভাল। অর্থ না থাকে যদি, বাসনার তাড়নায় কষ্ট পাবে। তাই কিছু অর্থ হওয়া ভাল। অর্থ থাকলেই যদি শান্তি হ'ত তবে রাজারা দুঃখ পায় কেন? তাদেরই ত চিন্তা, অশান্তি বেশী।

কাশীতে আমি কোন এক ধনীর বাড়ী গিয়েছিলুম। খুব বড় ধনী, লোকজন দারোয়ান কিছুরই অভাব নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, বাবা, তোমার ত কিছুরই অভাব নেই। অর্থ, সম্পদ, লোকজন, সবই আছে। খাসা বাড়ী বাগান সব আছে। আচ্ছা, আমায় বল দেখি, তুমি কি সুখী? তা সে বললে, "দেখুন, একটুও সুখ পাইনি। প্রায়ই রাত্তিরে ঘুম হয় না। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখি, দারোয়ানগুলো বেশ ঘুমচ্ছে। আমার হিংসা হয়, যদি দারোয়ান হতুম তবে ঘুমিয়ে বাঁচতুম।"

গোপেন। ভগবদ্ভক্তিতে অর্থ আসে।

ঠাকুর। আসেই যে তা নয়। তবে তাঁর দয়া থাকে; দরকার হয় ত তিনি দেন। নইলে ভক্তের বড় বিপদ।

যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, তার আর একরূপ হয় রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম আর মাথায় জটা॥

তাঁর ভক্ত হ'লেই যে টাকা আসবে তার মানে নেই।

গোপেন। কোন ভক্ত, বীর-সাধক, তার বাড়ীতে রোগ হ'ল—

ঠাকুর। কি রকম বীর-সাধক? সব তার অধীন হ'লেই না বীর-সাধক? রোগ, শোক, মৃত্যুতে তার কি? পলওয়ানের সঙ্গে লড়তে পারলে না বীর? পলওয়ান পটকে দিলে, সে কি রকম বীর?

গোপেন। অত বড় কথা না বলে ভক্ত বলছি (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। ভক্ত বড় সোজা কথা নয়। বলেছে—ভক্ত, ভাগবত, ভগবান্—এক। ঠিক ভক্ত হ'লেত সেই হ'ল। আরশুলাগুলো কাঁচপোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকাই হ'য়ে যায়।

গোপেন। আচ্ছা ধরুন সৎপথে মতি আছে, এমন কোন লোক। তার বাড়ীতে ছেলের অসুখ হ'ল, অর্থ সে কামনা করবে ত?

ঠাকুর। কামনা করলেই ত অর্থ হয় না।

গোপেন। তিনি দিতে পারেন।

ঠাকুর। নাও দিতে পারেন। যখন দিচ্ছেন না, তখন বুঝবে কোন কারণ আছে। একটী ছেলে ত ইচ্ছা করলেই আনতে পার না। ছেলে তাঁর নিয়মে আসছে। তিনিই আনছেন, তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

শশী। সে টাকা ধার করবে (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। হ্যাঁ; ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ (সকলের হাস্য)।

গোপেন। আচ্ছা, চার্ব্বাক ঋষি এই মতটী করলেন। এ কি রকম মত হ'ল?

ঠাকুর। ঠিক্‌ই মত। জ্ঞানীর এই অবস্থা। দেখ, ঋণ ক'রে ভোগ করলে। শোধ না দিতে পারলে বাড়ীর ঘর দোর সব যাবে। পরে আর টাকাও পাবে না। এ সব অবস্থায় দুঃখ না এলে ত জ্ঞানীই হ'য়ে গেলে। সব তাতে সমতা আসল। সুখ নিতে গেলে দুঃখ নিতে

হয়, তবে সমতা। চার্ব্বাক বলেছেন, 'গোপাল ফুল এত সুন্দর—তুলে নাও।' আর একজন বললে, 'কাঁটা যে, কি ক'রে তুলি?' তা বলছেন, 'এত সুন্দর ফুলটি ভোগ করবে, হাতে একটি কাঁটাও লাগবে না?'

দেখ, শাস্ত্রেই আছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আগে ধর্ম্ম, তার পর যদি অর্থ আসে তাতে শান্তি হয়। অনেক সৎ কাজ হ'তে পারে। বহু সদনুষ্ঠান হয়, এবং সৎ দিকে গতি হয়। অর্থ সেখানেই মন্দ যেখানে ধর্ম্মের ভিত্তি নেই। তার পর কাম হ'চ্ছে কামনা। ধর্ম্ম গোড়াতে রইল। কামনা যা এল সৎই হবে। আর পূরণের জন্য অর্থ রইল। কামনা পূরণ হ'য়ে গেল। কামনা নষ্ট হ'লেই মোক্ষ।

অসিতা। আচ্ছা, এই মোক্ষ জিনিষটা কি?

ঠাকুর। কি ক'রে বলব, আমি ত পাইনি (সকলের হাস্য)। মোক্ষ যখন পাবে তখন বুঝবে। আগে কি বুঝবে?

অসিতা। চিনি হওয়া না চিনি খাওয়া?

ঠাকুর। চিনি হওয়া।

অসিতা। চিনি হ'য়ে লাভ কি? চিনি খাওয়া বরং ভাল।

ঠাকুর। সে যার যেমন ইচ্ছা। কেউ বলছে খাব, কেউ বলছে হব। ভক্ত বলে চিনি খাব, জ্ঞানী বলে চিনি হব। আবার কেউ মোক্ষ চায় না। গোপিকারা মোক্ষ নিলে না। তাদের ত মোক্ষ হয়েছিল। তারা বললে, আমরা তা চাই না।

কালী। চিনি খাওয়াই ত বেশ মনে হয়।

ঠাকুর। বটে; চিনি হওয়ার অবস্থা ত দেখনি। তার বর্ণনা কি ক'রে করবে? চিনি হ'লে যে কি অবস্থা হয় তা ত বুঝতে পাচ্ছ না।

কালী। সে অবস্থা নিষ্ক্রিয়।

ঠাকুর। নিষ্ক্রিয় হ'লে বর্ণনা চলে না, "তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়"। সে বিজ্ঞান অবস্থা। মন, ভাষা সেখানে নেই, গুণ নেই।

অসিতা। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হলেন, তার থেকে সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ব্যাপার সৃষ্টি ; এ বুঝতে পারলাম না।

ঠাকুর। কি রকম জান ? ছেলে বিছানায় মুতলে। মা বিছানা ভেজা দেখে ঠিক্ করলেন, ছেলে মুতেছে। ছেলে কিন্তু ঘুমুচ্ছে। তেমনি আছে, তিনি নিষ্ক্রিয়, তাঁর থেকে ক্রিয়া চলছে। ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁকে মাপে ধরবে কি ক'রে ?

গোপেন। বোঝা কঠিন।

ঠাকুর। সে অবস্থা না এলে বুঝবে কি ? জ্যান্ত কখনও মরার বর্ণনা করতে পারে ?

গোপেন। তবে নিষ্ক্রিয় বলছে কি ক'রে ?

ঠাকুর। যারা দেখেছে। সেজন্য ঋষির বাক্য। সে জিনিষ সাধারণ কি বুঝবে ? চিন্তা-শূন্য অবস্থা। এ অবস্থা না হ'লে কি বুঝবে ? স্থির বসে আছে, অঙ্গ থেকে বহু বেরিয়ে যাচ্ছে। চণ্ডীতেই ত আছে—শুম্ভকে বধ করতে এল, বহুরূপ হ'য়ে। সে বললে, "একি ! তুমি এক ছিলে বহু হ'লে কি ক'রে ?" তিনি বলিলেন, "মূর্খ, বহু কোথায় ? সবই যে আমি, আমার থেকেই সব বেরিয়েছে।" এই বলে সব নিজের ভেতর নিয়ে নিলেন। প্রত্যেক লোমকূপ থেকে সৃষ্টি হ'চ্ছে ; আপনি হ'চ্ছে। সে অবস্থা না আসলে কি বুঝবে ?

সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত, অদ্যাপি তথাপি জানিতে পারেনি।

সাধারণ ডাল চচ্চড়ি খেয়ে তাঁকে কি ধরবে ? কত সাধনা করলে তবে সে স্তর আসবে। চিন্তাশূন্য অবস্থা, বাক্য-মনের অতীত। এই ত রয়েছে,—বিষ্ণু মহানিদ্রায় আছেন। নাভি থেকে ব্রহ্মা উঠলেন। কান থেকে মধু-কৈটভ বেরুল। ব্রহ্মা স্তব করতে লাগলেন। মহামায়ার আবির্ভাব হ'ল। তারপর যোগমায়া এসে বিষ্ণুর নিদ্রা ভাঙ্গলেন।

শশী। শক্তি আর শক্তিমান্ ; কে বড় ?

ঠাকুর। দুইই সমান; আলাদা করা যায় না। যখন যেটা খেলা করছে সেটা বড় মনে হয়। গুণের মধ্যে থাকি, তাই শক্তি মানতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব এক। সূর্য্য আর সূর্য্যের তেজ একই জিনিষ। আমি হাত নাড়ছি, শক্তি দেখলে। আবার স্থির আছি। যখন ক্রিয়া হবে তখন আলাদা; নয় ত এক।

শশী। চৈতন্য ছাড়া ত শক্তি হ'তে পারে না।

ঠাকুর। শক্তি যখন থাকল, চৈতন্য আছেই। অচৈতন্য হ'লে আর শক্তি কোথায় রইল ?

কালীবাবু। দেবতার চেয়ে মানুষ বড় ত ?

ঠাকুর। দেবতাদের বহু স্তর আছে। পূর্ণশক্তি, অর্দ্ধশক্তি। কেউ বা মোক্ষ দিতে পারেন। কারও বা অপর ক্ষমতা আছে। তবে মানুষ দেবতার ওপর যেতে পারে। তাই মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। ঋষিদের দেবতারা ভয় করত। স্বর্গাদির পরও মনুষ্য জন্ম।

পূর্ব্বে নারদ গন্ধর্ব্ব-লোকে বাস করতেন। সর্ব্বদা বহু গন্ধর্ব্ব-কন্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে নৃত্য-গীতে মত্ত থাকতেন। এখন দেবর্ষিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন। সেখানে নৃত্যগীত করবার জন্য গন্ধর্ব্ব-লোকে লোক চেয়ে পাঠালেন। নারদ গন্ধর্ব্বকন্যাদের নিয়ে এসে খুব নৃত্য-গীত, মদ্যপান আরম্ভ ক'রে অশান্তির সৃষ্টি ক'রে দিলেন। তখন ঋষিরা তাঁকে শাপ দিলেন, "তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! মানীর যথাযোগ্য সম্মান রাখতে জানিস না! আমাদের অপমান করলি! তুই নরলোকে জন্ম-গ্রহণ কর।" তাই কামকান্ত হ'য়ে জন্মালেন। আবার অবশ্য উঠে গেলেন। ভগবানের পার্শ্বদ হলেন।

কালীবাবু। সাধু মহাপুরুষের কাছে দেবতারা আসেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ; কবীর বলছেন, 'গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি কর; তা'হলে সর্ব্বদা অমর-লোকে বাস করবে। আমি গুরুতে বিশ্বাস করেছি, প্রাণ-মন সব অর্পণ করেছি, তাই সর্ব্বদা অমর-লোকে বাস করছি।' থাকেই ত, দেবতারা ত সাধারণ উপাসকদের কাছেই থাকেন।

রাবণের কাছে দেবতারা অনেকে ছিলেন। আবার আছে পূর্ণ শক্তি। এর ক'টা স্তর আছে ; কারও ষোল আনা শক্তি, কারও আট আনা, কারও বা চার আনা। যাদের ষোল আনা শক্তি—যেমন মহামায়া, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি, সেখানে গেলেই মিশে গেলে।

আবার দুই শ্রেণীর দেবতা আছেন। দুটো পথ আছে; শুক্লপথ আর কৃষ্ণপথ। শুক্লপথে যে সব দেবদেবী থাকেন তাঁরা মোক্ষ দিতে পারেন। সে পথে গতি করলে তাঁদের কৃপায় সূর্য্যলোক ভোগের পর মোক্ষ হয়। আর কৃষ্ণপথে যে সব দেবদেবী আছেন, তাঁদের কৃপায় চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গতি হয়। সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ হয়। তারপর মর্ত্ত্যে ফিরে আসে।

দেবশক্তি সর্ব্বদা সাধুদের কাছে থাকেন। আর দেখ, ধর্ম্ম যদি ঠিক্ থাকে, সব দেবদেবী তার ওপর প্রসন্ন থাকেন। এর একটী গল্প আছে।

এক রাজা খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। সাধনে খুব উন্নতি করেছিলেন। দেবতারা তাঁর ভয়ে কাঁপছে। এত ধার্ম্মিক ছিলেন যে, যে যা চাইত; দিতেন। কা'কেও বিমুখ করতেন না। দেবতাদের দেখে হিংসা হ'ল। ইন্দ্র প্রভৃতি ক'রে তাঁরা দেখলেন, এ ত বড় বেড়ে উঠল। আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজার ধর্ম্ম ঠিক্ আছে। কেউ কিছু করতে পারছেন না। তাঁরা এক ফন্দি বা'র করলেন।

একজন এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে আর একটী অলক্ষ্মী প্রতিমা সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছেন। আর চেঁচিয়ে বলছেন, "এ রাজ্যে কি এমন কেউ নেই যে একজন অভুক্ত ব্রাহ্মণকে খেতে দেয়? ব্রাহ্মণ আজ তিন দিন অনাহার। এমন কোন সৎ ব্যক্তি নেই যে অতিথিসেবা করে? রাজার কানে এ কথা গেছে। কি! আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ তিন দিন অনাহারে রয়েছে আর আমি সুখে আহারাদি ক'রে বসে আছি! এই ভেবে নিজে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা ক'রে আনলেন। "আসুন, আমার বড় দুর্ভাগ্য। আমি রাজা হ'য়ে খেয়ে দেয়ে

আরাম করছি, আর আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ উপবাসী এর খবর রাখিনি। আমার বড়ই অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা করুন। আপনি আসুন, আহারের ব্যবস্থা করছি।” ব্রাহ্মণ বললে, “রাজা, একটী কথা আছে। এমনি আমাকে সবাই খেতে দিতে পারত; কিন্তু আমার সঙ্গে একটী অলক্ষ্মী প্রতিমা আছে, এটী তোমাকে নিতে হবে। এটী আমার কাছে থাকার জন্যে আমার যত দুঃখ। এটী যদি নাও আর তার ভার গ্রহণ কর, তবে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি।” রাজা বললেন, “আচ্ছা বেশ, আমাকে দিন, আমি এর ভার গ্রহণ করছি।” ব্রাহ্মণ বললে, “দেখ’ রাজা, এ অলক্ষ্মী প্রতিমা। একে আশ্রয় দিলে তোমার রাজলক্ষ্মী, ধন, ঐশ্বর্য্য, সব যাবে। দুঃখ কষ্ট আসবে।” রাজা বললেন, “যা হয় হবে, তবু অতিথি বিমুখ ক’রে ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারব না।” তাই হ’ল। রাজা অলক্ষ্মী প্রতিমাকে আশ্রয় দিয়ে ব্রাহ্মণের সেবা করলেন।

এদিকে অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছেন দেখে লক্ষ্মী এসে বললেন, “রাজা, আর ত আমি থাকতে পারি না।” রাজা তাঁকে বললেন, “কেন মা, আমি ত তোমার সেবার কোন ত্রুটী করিনি। তবে কেন যাবে?” লক্ষ্মী বললেন, “তুমি যে অলক্ষ্মীকে স্থান দিয়েছ। যেখানে অলক্ষ্মী থাকে সেখানে আমি থাকি না।” রাজা বললেন, “তবে আমি কি করি? আমি যাকে আশ্রয় দিয়েছি তাকে ত ত্যাগ করতে পারি না।” লক্ষ্মী দেখলেন, রাজার কাছে সুবিধা হ’ল না। একবার অন্তঃপুরে যাই। লক্ষ্মী থাকলে মেয়েদের লাভ বেশী কিনা (সকলের হাস্য)।

ভেতরে রাণীর কাছে গিয়েই বললেন, “আমার আর এ রাজ্যে থাকা হ’ল না। আমার বাস উঠল। রাজা আমায় আর দেখে না। এক অলক্ষ্মী প্রতিমাকে আশ্রয় দিয়েছে। অলক্ষ্মী থাকলে আমি আর কি ক’রে থাকি?” রাণী দেখলেন, বিপদ। লক্ষ্মী গেলে ধন-ঐশ্বর্য্য সব যাবে, ভোগ-সুখের শেষ হবে। তাই রাজার কাছে গিয়ে বললেন, “এ কি রাজা, তুমি লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?” রাজা বললেন, “আমি

ত তাড়াইনি। আমি ত তাঁর সেবার কোন ত্রুটী করিনি। তিনি নিজে যাচ্ছেন, কি করব?" রাণী বললেন, "তুমি অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। অলক্ষ্মী থাকলে লক্ষ্মী কি ক'রে থাকেন?" রাজা বললেন, "তার আর কি করব? আমি আশ্রিতকে তাড়াতে পারব না।" রাণী বললেন, "তবে আমরাও যাই। লক্ষ্মী যেখানে নেই আমরা সেখানে থেকে কি করব?" রাজা বললেন, "তোমাদের যা ভাব হয় করতে পার।" সবাই ত লক্ষ্মীর বরযাত্র। যেই লক্ষ্মী গেল, সবাই চলে গেল। ধন-ঐশ্বর্য্য সব গেল। হাতীশালে হাতী গেল, ঘোড়াশালে ঘোড়া গেল। সব গেল।

তখন নারায়ণ এসে বললেন, "আমিও যাচ্ছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? আমি ত আপনার সেবার কোন ত্রুটী করিনি। তবে কেন যাবেন?" নারায়ণ বললেন, "দেখ, যেখানে লক্ষ্মী নেই সেখানে কি ক'রে থাকি?" তিনিও গেলেন; এক এক ক'রে সব গেলেন। সর্ব্ব-শেষে এলেন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম এসে বললেন, "রাজা, আমিও আর থাকতে পারি না।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?" ধর্ম্ম বললেন, "যেখানে লক্ষ্মী নেই, নারায়ণ নেই, সেখানে কি ক'রে থাকি?" রাজা তখন বললেন, "জান ধর্ম্ম! তোমার জন্য সব গেছে। তোমার কি শক্তি যে এক পা নড়? এক তোমার জন্যেই লক্ষ্মী, নারায়ণ, ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সব ছেড়েছি; শুধু তোমায় ঠিক্ রাখব বলে। তোমার কি ক্ষমতা আমায় ছাড়তে পার?" ধর্ম্ম দেখলেন, 'তাই ত, আমি কি ক'রে যাই? আমার জন্যেই ত সব গেল।' কাজেই তিনি যেতে পারলেন না। তখন লক্ষ্মী এলেন, বললেন, "বাবা, আমি আবার এলাম। ধর্ম্মছাড়া হ'য়ে কি ক'রে থাকব?" তারপর নারায়ণও এলেন, বললেন, "যেখানে ধর্ম্ম নেই সেখানে কি ক'রে থাকি?" ক্রমে রাজত্ব, ধন, ঐশ্বর্য্য, সবই ফিরে এল।

তা দেখ, ধর্ম্ম ঠিক্ থাকলে সব হয়। দেবতাদেরও কোন ক্ষমতা থাকে না তোমার অনিষ্ট করে। মানুষ ত সুখ চাচ্ছে। ভাবে

অর্থ-সম্পদে সুখ হবে। ধর্ম্মের ওপর ভিত্তি নেই, সুখ হবে কি ক'রে? অর্থের গাদায় বসিয়ে দিলেও অশান্তির স্রোত বয়ে যাবে। দশরথ প্রভৃতি করে রাজাদের ধর্ম্ম সহায় ছিল। তাও কত দুঃখ পেলেন। তখন ঋষিরা সব রাজকার্য্য দেখতেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য-দান গ্রহণ করলেন। নিজে একটী পয়সাও নিলেন না; বরং ধনাগার অর্থে ভরিয়া দিয়ে গেলেন। নিজে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই রইলেন। তাঁদের কত সাধনা কত শক্তি ছিল। সবাই বলে যে, ব্রাহ্মণরা সব নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য ক'রে গেছেন। এখন সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ব্রাহ্মণদের দোষ দিলে কি হবে। ভাল জিনিষ নেবে, সে শক্তি কই? বেদ বেদ ক'চ্ছে, কত বড় অবস্থা হ'লে বেদ নিতে পারে? ভাব বোঝাও শক্ত।

কালীবাবু। বুদ্ধের কাছে নাকি দেবতারা আসত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ইন্দ্র ত এসেছিলেন।

গোপেন। দেবতাদেরও হিংসা আছে?

ঠাকুর। অবস্থানুযায়ী। সব ত এক স্তরের নয়। খণ্ড শক্তি সব আছেন। তাঁদের এসব আছে।

কালীবাবু। হিংসা-দ্বেষ নিয়ে আবার দেবতা কি রকম?

ঠাকুর। শক্তি রয়েছে বলে দেবতা বলছে। দেবশক্তি কিছু আছে।

অসিত। আজকাল বৈজ্ঞানিকরাও পরজন্ম, প্রেতলোক, সব মানেন। বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge (সার অলিভার লজ) পরজন্মের কথা মানেন।

ঠাকুর। উনি কেন, তোমাদেরই ত রয়েছে। যীশাসও পরজন্ম দিচ্ছেন। শাস্ত্রকারেরা পরজন্মের কথা বার বার বলে গেছেন। আমাদের ত সব রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন দু'একটা নিজেরা বা'র ক'রে বিশ্বাস করছেন। এরোপ্লেন বা'র ক'রে পুষ্পকরথ বিশ্বাস করেন।

অসিতা। আমাদের আবার অনেক কবিতাও আছে। কুম্ভকর্ণের নাসিকা, রাবণের বহু রূপ, এসব কবিতা।

ঠাকুর। কবিতা থাক; আগে দেখ জিনিষটা কি। আগে চোখ তাকাও তবে ত বুঝবে, আলো কি অন্ধকার। চোখ বুজে সূর্য্যকে অন্ধকার বলছ, আবার অন্ধকারে সূর্য্য বলছ। কবিতার রং চং থাকতে পারে। মূল জিনিষটা ত থাকবে। বললে, অমুক দরিদ্রের বাড়ীতে ন্যাংড়া আম খেয়ে এলাম। হ'তে পারে তার বাড়ীতে ন্যাংড়া আম খাওয়া হয়নি। তাই বলে কি ন্যাংড়া আমই নেই? কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখালেন,—সহস্র বাহু, সহস্র পদ, সহস্র বদন, ইত্যাদি। এখন তুমি বিশ্বাস না করলে কি করব? সে যদি হ'তে পারে, তবে কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নাসিকা, রাবণের বহু রূপও হ'তে পারে। সে সব স্তরে না উঠলে কি ক'রে জিনিষ বুঝবে? 'অ আ' পড়ছ, কি ক'রে এম, এর পড়া বুঝবে? সে পড়ার ধারেই গেলে না, তার আর কি জানবে?

অসিতা। ওদের বাইবেলেও যা আছে তাও তারা সকলে বিশ্বাস করে না। কেউ কেউ করে।

ঠাকুর। বাইবেলে যা আছে তাও অন্যায্য নয়। ওরা বুঝতে পারেনি তাই বিশ্বাস করেনি। কোন মহাত্মার হয় ত চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, সে দৃষ্টি খুলেছে, তাই তিনি এখন বুঝছেন।

পুত্তু। বাইবেলের সৃষ্টি (Story of the Creation) কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

ঠাকুর। সৃষ্টির দেখ, বিকাশ অনুযায়ী বর্ণনা। যে যতখানি বুঝতে পেরেছে। কলকাতা কেউ খানিকটা দেখলে তারই বর্ণনা করলে। আবার কেউ সবটা দেখে সবটার বর্ণনা করলে। আবার কতক আছে,—দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী মানুষকে নিয়ে যাবার জন্যে লিখতে হয়।

পুত্তু। Bioscopeএ (বায়স্কোপ) দেখে এলাম, Red sea (লোহিত সাগর) দিয়ে মুশার সৈন্যদল যাচ্ছে। সাগর দু'ভাগ হ'য়ে গেল।

ঠাকুর। তোমাদেরও ত রয়েছে। যমুনা দু'ভাগ হ'ল। গোপিকারা দুর্ব্বাসার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। কৃষ্ণকে বললেন, "যমুনা কি ক'রে পার হব?" তিনি বললেন, "যাও, যমুনাকে আমার নাম ক'রে

বলগে, পথ ক'রে দেবে।" তাতে আরও আছে—কৃষ্ণ বলে দিলেন, "দুর্ব্বাসাকে বল", বাল-ব্রহ্মচারী যে কৃষ্ণ, তাঁর তোমার কথা মনে আছে।" গোপিকারা হেসে উঠল। কৃষ্ণ আবার বাল-ব্রহ্মচারী কবে হলেন! সহস্র গোপিনী সহস্র থালা খাবার সাজিয়ে চলেছে। যমুনাকে কৃষ্ণের নাম ক'রে বলতে, দু'ভাগ হ'য়ে পথ ক'রে দিলে। ওপারে গিয়ে দুর্ব্বাসার সঙ্গে দেখা ক'রে খাবার দিলে। দুর্ব্বাসা ঐ সহস্র থালা খাবার সব খেয়ে ফেললেন। কৃষ্ণের কথা গোপিকারা তাঁকে বললেন। তিনিও বলে দিলেন, "কৃষ্ণকে বল', অভুক্ত যে দুর্ব্বাসা, তাঁর তোমার কথা মনে আছে।" গোপিকারা ত অবাক, ওরে বাবা, সহস্র থালা খাবার খেয়েও অভুক্ত!

তা দেখ, খায় কে? ক্ষুধা, লোভ, রসনা। এ তিনই যার নেই সে কি খায়? হাজার থালা খাবার না খেয়েও যে অবস্থা, খেয়েও সেই অবস্থা। খাওয়া না খাওয়া সমান।

অসিতা। একটা সন্দেহ আমাদের নৈরাশ্য আনিয়ে দেয়। আমরা যারা সংসারী, টাকা পয়সা নিয়ে আছি, তাদের কিছু হবে না।

ঠাকুর। তা কেন? নয় ত আমার কাছে আসবে কেন? টাকা পয়সা, সংসারের মধ্যে আমাকেও ত রেখেছে। এই যে সংসারের কাজ কর্ম্ম ছেড়ে তোমরা ধর্ম্মচর্চ্চা করবে বলে আস, নিশ্চয়ই একটা ভাব আছে। সংসারীদের হবে না তার মানে কি? সংসারীদের জন্যেই ত তাঁরা আসেন। ত্যাগীর জন্যে ত দরকার নেই। যীশাসেরই ত কথা আছে, আমি পাপীদের জন্যই এসেছি, পুণ্যাত্মাদের জন্য নয়, তারা নিজেরাই যেতে পারবে। চৈতন্যদেব, পরমহংসদেব প্রভৃতি ক'রে এঁরা ত সাধুকে উদ্ধার করতে আসেন কি? সাধারণ সংসারী, যারা সংসার-মায়ায় আবদ্ধ, তাদের নিয়েই কাজ।

গোপেন। হিন্দুদের ওপরই পক্ষপাতিত্ব। সব অবতার এখানে।

ঠাকুর। তা কেন? যেখানে যেভাবে আছেন। মহম্মদ, যীশাস

এলেন, একই ত কথা। এখানে কৃষ্ণ; তিনি এখান থেকে ডুব মেরে গিয়ে সেখানে যীশাস হ'য়ে উঠলেন।

গোপেন। আফ্রিকায় ত হন না। সব ভারতবর্ষে।

ঠাকুর। সময় এলে হবে। তবে আছে, স্থান জায়গার প্রভাব আছে। তার আকর্ষণে কাজ হয়। আর জন্ম ত যেখানে ইচ্ছা হ'তে পারে। কাজ হ'লেই হ'ল। আলো এক ঘরে থাকতে পারে, তাতে কি? দেখ কতদূর আলো দিচ্ছে। যেখানে যেমন আবশ্যক মনে করেন। তিনি যে কারও মধ্যে নেই তা ত নয়। ধাঙ্গড়ের মধ্যেও তিনি। তাদের দিয়ে ময়লা সাফ করাচ্ছেন। আর ভারতবর্ষে জন্মালেই ত সব শুকদেব হবে না। তবে এক এক জায়গায় খনি থাকে। সেটা জায়গার গুণ।

অসিতা। ওদেশেও অনেক সাধু জন্মেছেন। মারটিন লুথার (Martin Luther) প্রভৃতি ঋষিতুল্য লোক।

ঠাকুর। আগে দেখ ঋষি কা'কে বলে। যাঁর আত্ম-জগৎ, জড়-জগৎ দুইই উপলব্ধি হয়েছে তাকেই বলে ঋষি। তা ভিন্ন সৎলোক বা সাধুব্যক্তি হ'তে পারেন। তোমার খুব টাকা আছে, তুমি ধনী হ'তে পার। কিন্তু যে ধনীর দ্বারা বহুলোকের উপকার হয়েছে, তাকেই বলব ঠিক্ ঠিক্ ধনী। ঋষিদের প্রভাবে অনেক অন্যায়কারী লোক ফিরে গেছে। এঁদের শক্তি দ্বারা বহুলোকের কাজ হ'চ্ছে। ওঁরা হয় ত নিজেরা ভাল লোক হ'তে পারেন। আবার বহুকে সে পথে গতি করান—সে আলাদা শক্তি চাই। সব আলোই ত আলো। কিন্তু সূর্য্যের আলোতে সব দেখা যায়। জোনাকীর আলো অতটুকু; মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলে। বিভিন্ন ভাবের প্রকৃতিকে নানান বিপদের ভেতর দিয়ে গতি করাবার শক্তি আলাদা।

অসিতা। তাঁরা অবতার না হ'তে পারেন। কিন্তু সাধু ঋষিতুল্য পুরুষ।

ঠাকুর। তা সব সমান হবে কি? চৈতন্যদেব এসেছিলেন; আর

দেখ, রূপ-সনাতন, এঁরাও ত ছিলেন সাধুপুরুষ। তা বলে কি চৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা হবে? তাঁর শক্তি এঁদের মধ্যে কাজ করছে। আচ্ছা তাঁরা (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা) যীশাসের আগে না পরে?

অসিতা। তাঁরা যীশাসের পরে।

ঠাকুর। তবে তাঁর শক্তি এদের মধ্যে কাজ করেছে। কিন্তু প্রথম যিনি সত্য বা'র করেন তাঁরই না কৃতিত্ব। চাল থেকে ভাত এখন সবাই করছে। কিন্তু প্রথম যিনি এটা বা'র করেছেন তাঁরই না বাহাদুরি। আর ঋষি দেখ, সে আলাদা অবস্থা। যিনি মনকে জয় করে আত্মানন্দে আছেন তিনিই ঋষি।

অসিতা। সক্রেতিস্ (Socrates) অক্লেশে বিষ পান ক'রে ফেললেন। জীবনের মায়া করলেন না।

ঠাকুর। খুব ভাল; তাঁর মনের অনেক শক্তি ছিল। কিন্তু এঁরা বহু বিষ পান করেছে তাদের বাঁচাতে পারেন। উনি নিজে বিষ খেতে পারেন। বাঁচাবার ক্ষমতা আলাদা।

রাত প্রায় ৯॥টা হইল। অনেকেই উঠিলেন। ঠাকুরের অসুখের কথা হইতেছে। সকলেই সেজন্য চিন্তিত। ঠাকুর নানা কথায় হাসি-ঠাট্টা করিয়া সে সব কাটাইয়া দিতেছেন। ১০টার সময় আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৯ই মে, ১৯২৬ ইং ;
রবিবার, শুক্লাদ্বাদশী।

কলিকাতা।

মঠে—গোপেন প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

৺পচু—সৎস্থানের শক্তি ও মাহাত্ম্য—ঠাকুরের ভাব—প্রেমই ভগবান্—তীর্থদর্শনাদি সংস্কার মাত্র—সংস্কার ও বিশ্বাস—শ্রাদ্ধ—পিতৃলোক, প্রেতলোক ইত্যাদি—স্বর্গসুখ—খণ্ডসুখ ও নিত্যসুখ।

বিকালে ভক্তরা আসিতেছেন। খিদিরপুর হইতে কালু, ললিত, পচু, অচ্যুত ও বিভূতি আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে মা-মণি, কালীবাবু, সন্ন্যাসী আসিয়াছে। ভবানীপুরের অজয়, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, রাজেন প্রভৃতি আছে।

ঠাকুর গান করিতেছেন :—

কে পাঠালে মোরে, কেন এমন ক'রে,
ঘুরি ভবঘোরে, বলে দে মা তারা।
কেন আসি যাই, সঙ্গেতে জড়াই,
পিতা, মাতা, ভাই, পুত্র, কন্যা, দারা॥
এরা কে আমার, আমি এদের কার,
পর যদি কেন ভাবি আপনার,
হ'লে হই খুসি, কত জনে তুষি,
(আবার) চলে গেলে কেন নয়নেতে ধারা॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি মাৎসর্য্য,
জানি মন্দ, কেন করি শিরোধার্য্য,
একি মা আশ্চর্য্য, শত্রুর সাহায্য
নিয়ে করি কার্য্য, হ'য়ে বুদ্ধি-হারা॥
এসেছি একাকী, যাব সব রাখি,
এ ভূতের বোঝা কেন নিয়ে থাকি,
শিকল কাটলে উড়ে যায় পাখী,
এ ভাঙ্গা খাঁচা নিয়ে থাকে না মা তারা॥
পতঙ্গের দশা হ'ল মোর তাই,
জ্বলন্ত অনলে সাধ করে যাই,
তাপ লাগে গায়, পলাইতে চাই,
উড়ি ঘুরিফিরি, প্রাণে হই সারা॥
তুমি বিনে তারা কে আছে আমার,
মা বলে মা, করি কতই আব্দার,
এ সংসারের-সাধ মিটেছে আমার,
আর যেন ভোগ হয় না এ কারা॥

খিদিরপুরের পচুর কথা হইতেছে। তিনি ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। কএক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। কবি হেমচন্দ্রের বংশের ছেলে। খুব ভাল ছেলে ছিলেন। কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাই সকলে 'কবি পচু' বলিত। সকলেই দুঃখ করিতেছেন।

ঠাকুরও দুঃখ করিতেছেন; বলিতেছেন—

ঠাকুর। বড় সুন্দর স্বভাব ছিল ওর। খুব সরল আর ভেতরে বেশ একটা আনন্দ ছিল। আমায় খুব ভালবাসত। এসেই আমাকে গান শোনাতে হবে। 'শ্রীরামপুরে গিয়ে আমায় একটি গান শুনিয়েই চলে গেল।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮৷৷টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। গোপেন, তপেন, আশু, কানাই, জিতেন, সুরথ, কিশোরী, অনুকূল এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন।

৮॥ টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তেরা স্তোত্র (জয়জগবন্দন) গাহিয়া আর একটি গান গাহিলেন।

প্রেম বিলাইতে আসিয়াছ যদি, প্রেমদান কেন করিবে না।*
তবে কেন মোর হৃদয়কানন প্রেমের কুসুমে ভরিবে না।
যেখানে আমার যাহা কিছু আছে, সকলি কি তুমি হরিবে না।
(এই) পুরাণ ভবন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মনোমত করি গড়িবে না॥
তোমার আশায় বসে আছি হায়, তুমি কিগো হাতে ধরিবে না।
(আমার) জীবন-তরণী কাঁপে গুণমণি, তুমি না তরালে তরিবে না॥
মলয়-পবন বহিলে কি আর বিষ তরুগুলি মরিবে না।
বল, তুমি মোর হৃদয়ে থাকিবে, জীবনে মরণে ছাড়িবে না॥

তারপর ঠাকুর কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; বলিতেছেন—

ঠাকুর। তোমরা একটি জায়গায় সকলে মিলে তাঁকে ডাকছ, এ খুব ভাল। সংসার ভয়ানক জিনিষ। এর প্রলোভন, মায়া কাটিয়ে কিছু সময় ক'রেও যে তোমরা তাঁকে ডাকছ, এ বড় সোজা নয়। এতেও অনেক কাজ হবে। বহু আত্মা একস্থানে, একত্রে তাঁকে ডাকলে সেখানে তাঁর শক্তি থাকে। শাস্ত্রে আছে—চিত্তশুদ্ধি যাঁদের হয়েছে সে সব আত্মা যে স্থানে থাকেন, সেখানে তাঁর শক্তির বিশেষ প্রভাব। আবার বহুলোক যেখানে তাঁকে উপাসনা করে, সে স্থানই দেবমন্দির হয়ে যায়। তাদের will forceএ (মনের শক্তিতে) তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। এজন্য স্থান-জায়গা-পাত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য দিয়েছে। তোমাদের ওপর সংসারের এত বড় ভার। এর মধ্যেও যে কিছু সময় ক'রে তাঁর দিকে মন দিতে পার, এ বড় সোজা নয়। সংসারের এত আকর্ষণ যে অনেকে তা পারে না। পরমহংসদেব বলতেন, **ওরে, তোরা সব সময় সংসার করিস।**

* খিদিরপুরের শিবকৃষ্ণ রায় কর্তৃক রচিত। ইনি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিয়াছেন।

কিছু সময় আমার কাছে আসিস। তাতেই কাজ হবে। আসতে আসতে ভালবাসা লেগে যায়। তখন আর বলতে হয় না 'এসো'; আপনিই দৌড়ায়।

ঠাকুর এই বলিয়া গান করিলেন।

আয়রে তোরা, আমার যারা, আয়রে আমার কাছে।

—(৮ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়া 'মা মা' বলিতে বলিতে নিষ্পলক-নেত্রে ওপর দিকে তাকাইয়া আছেন। দেহ স্থির। বিস্ফারিত-নয়নে বুঝি জগন্মাতার অনন্ত-রূপ সুধা পান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হওয়াতে আবার সন্তানদের দেখিতেছেন; হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বারবার বলিতেছেন,—"সব মঙ্গল হোক; আনন্দম্, আনন্দম্; ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

কিছুক্ষণ পরে গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে।

গোপেন। প্রেমই কি ভগবান্?

ঠাকুর। হ্যাঁ, **প্রেমই ভগবান্।** মানে, প্রেমে সবই ধ্বংস হ'য়ে যায়। কাজে কাজেই কি আর থাকবে? যেমন জ্ঞান এলে সব ধ্বংস হয়, প্রেম এলেও তাই হয়।

ঠাকুর গাহিতেছেন:—

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
সে ত জানে-নাক আত্মপর॥
সে ত চায়-নাক জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
(ও তার) স্বভাব ধন্য, হয় না ক্ষুণ্ণ, রটলে অখ্যাতি;
(ও তার) হস্তগত সুখের চাবি রে, করবে কেন অন্যে ডর॥
প্রেম এমনি রত্ন ধন, কিছু নাইক তার মতন,
পেলে ইন্দ্রত্ব-পদ তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যেজন;
সে যে হাস্যমুখে সদাই থাকে রে,
(ও তার) হৃদয়-জোড়া সুধাকর॥

প্রেমের চালটি বেয়াড়া, বেদবিধি ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ পেয়ে তার মুখে নাই সাড়া;
এই চোদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লে রে, সে আসমানেতে বানায় ঘর॥

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন, একই অবস্থা। প্রেমে আর পর বলে ত থাকে না। সব আপন হ'য়ে যায়। একটাতে নিজে ভগবান্ হ'য়ে যাওয়া, আর একটাতে ভগবানে মেশা, একই হ'ল। কাল গরু, সাদা গরু, দুধ সব সাদা।

তোমরা যা কর এ জ্ঞান-ভক্তি মিশ্রিত। অহেতুকী ভক্তি, অবস্থা না এলে হয় না। অব্যভিচারিণী ভক্তি—সে গোপিকাদের ছিল। কোন বিচার নেই।

গোপেন। স্ত্রীলোকদের যে তীর্থে যাবার টান হয়, সেটা কি রকম?

ঠাকুর। ও সংস্কার; কিছুই না। ওতে ভক্তি নেই। সংস্কারানুযায়ী করে। এই করলে পুণ্য হবে। তীর্থ ত, ঘুরে, আসল তীর্থ কতটুকু করে? সবই ত অপর কাজে কাটিয়ে দেয়। তবে একেবারেই যে না হয় তা নয়। কারও কারও সংস্কার শ্রদ্ধা আনে। ভক্তি আসে তাতে কাজ হয়।

গোপেন। বলে না, যেমন বিশ্বনাথ টেনেছেন?

ঠাকুর। ও কতকগুলো জিনিষকে ধারণা ক'রে নেয়। 'অমুক হবে তমুক হবে।' নিয়ে সে সব আরোপ করে। আসল উদ্দেশ্য হ'ল, ভেতর তৈরী করা। তার কিছু হয় না। বিশ্বনাথ দেখতে গেল। কতটুকু দেখে? আসতে খেল্‌না দেখতে দেখতে আসে। মনে বিশ্বনাথ কোথায়? সংস্কার মাত্র। গঙ্গা-স্নান করলে মুক্ত হয়, সবাই বলে। কিন্তু যদি বল যে আজ গঙ্গা-স্নানে সব মুক্ত হ'য়ে যাবে, তখন দেখবে কেউ গঙ্গার ধারেও যাবে না। সব টেনে দৌড় মারবে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষী কেউ নয়। সংসার-সুখ হবে, এ ফল হবে, সে ফল হবে, তাই নায়।

তপেন। সে সব ফল কখন হবে?

ঠাকুর। এ জন্মে হয়, ফিরে জন্মেও হয়,আবার ফল কেটেও যায়। এজন্যে আছে, ৺কাশীতে ম'লে মুক্তি হয়। স্থির বিশ্বাস থাকে ত হয়। কিন্তু সে বিশ্বাস কই? কথা আছে—রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা, পুনর্জন্মঃ ন বিদ্যতে। তা সবাই দেখেছে, আবার প্রত্যেক বছর দৌড়ুচ্ছে। মুক্তি যদি হ'য়ে গেল, আবার কেন? তবে রথ দেখতে ভাল লাগে, সে আলাদা কথা। আবার আছে—রথ দেখা কলা বেচা (সকলের হাস্য)।

গোপেন। পুনর্জন্ম হোক না হোক তা হয়ত মনে নেই। তবে বামন দেখতে ভাল লাগে।

ঠাকুর। তা রথের সময় কেন? বামন ত সব সময়ই আছেন।

গোপেন। তা রথে দেখতেই ভাল লাগে।

ঠাকুর। সে ত আলাদা কথা। অনেকে আবার ভিড় দেখতে যায়, কেউ শোভা দেখতে যায়, কারও বা রথ দেখতে ভাল লাগে তাই যায়।

কালীবাবু। গয়াতে পিণ্ড দিলে ত মুক্তি হয়, আবার শ্রাদ্ধ কেন?

ঠাকুর। কিছু আবশ্যক নেই। বিশ্বাস ঠিক্ নেই বলে বার বার দিচ্ছে। তবে একটা কথা আছে, পিণ্ড দেবার পরেও শ্রাদ্ধ পিতার জন্যে নয়, সেটা পুত্রের কর্ত্তব্য। পুত্রের মঙ্গলের জন্য পিতার আশীর্ব্বাদ নেওয়া। পুত্রের কল্যাণ হয়।

কালীবাবু। সে ত অমনি ডাকলেও হয়। কুশ পরে, আসনে বসে, নিয়মাদি ক'রে কেন?

ঠাকুর। যাদের বিশ্বাস আছে তাদের জন্যে নয়। রাম ত বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন।

গোপেন। শ্রাদ্ধের পর আত্মা কোথায় যায়?

ঠাকুর। নানা স্থানে ভোগ করে।

কালীবাবু। নিজের মঙ্গলের জন্য দানাদি করলেও ত হয়, শ্রাদ্ধ কেন?

ঠাকুর। সে যার যা ভাব। কেউ দান করতে পারে, কেউ তাঁকে

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ

(ভাবাবেশে)

(অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ২০৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে)

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

জানাতে পারে। আর এ হ'ল নীতির কথা। বিশ্বাস থাকলে কর্ম্মকাণ্ডে না গেলেও চলে।

গোপেন। তাঁর (অর্থাৎ পিতা বা অন্য পরলোকগত আত্মার) যদি জন্ম হ'য়ে যায়, তাতে কি ক'রে কাজ হবে ?

ঠাকুর। পিতৃলোক বলে একটা লোক আছে ত। সেখানে একজন আছেন, সে লোকের কর্ত্তা। তাঁতে সকলের শক্তি থাকে। যেমন তুমি বাড়ীর কর্ত্তা, তোমার থেকে যারা আসছে তাদের শক্তি তোমাতে থাকবে। তাঁর থেকে সব আসে আবার তাঁতে যায়। এক এক লোকের এক এক রাজা আছেন। সেই আত্মা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সেখানে গিয়ে তাঁর শক্তি কাজ করে। মনে কর, তুমি বাড়ীতে আছ, তোমার ছেলের নামে ৫০৲ টাকা এল। ছেলে বাড়ীতে নেই। তুমি সেটা নিয়ে ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিলে। সেখানেও তেমনি সে লোকের কর্ত্তা যার যার ব্যবস্থা করেন।

গোপেন। সাংসারিক ব্যবহার সেখানেও চলে ?

ঠাকুর। লোক মানেই ত সংসার। এই ত এটা ভূলোক। তেমনি পিতৃলোক, অর্য্যমালোক, প্রেতলোক ইত্যাদি। কোনটা একটু উঁচু, কোনটা বা নিম্নস্তরের।

কালীবাবু। প্রত্যেককেই প্রেতলোকে যেতে হবে ?

ঠাকুর। সাধারণ আত্মার তাই নিয়ম। সৎ আত্মার তা নয়। যদি সৎকাজে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে থাকে তবে যাবে না।

তপেন। পাপপুণ্য কি এখানেই ভোগ হয় না পরলোকে ?

ঠাকুর। এখানেও হয়, আবার পরলোকেও হয়।

তপেন। এখানে তবে শেষ নয়।

ঠাকুর। তোমারও ত এখানে শেষ নয়। দশ, বার, বিশ, এসব ত সংসারী বয়স। যেদিন সেই মহান্ আত্মার থেকে এসেছ আর যতদিন না তাঁতে গিয়ে মিশছ ততদিন তোমার বয়স। সাধারণতঃ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়কে তোমরা বয়স নাম দিয়েছ। যেমন কাল অনন্ত;

ঘড়ির মধ্যে মেপে ১২টা ১টা করেছ। আত্মা বহুলোক ভোগ করে। প্রেতলোক, স্বর্গলোক ইত্যাদি। আর পুণ্য-ক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে আসে।

তপেন। স্বর্গ-ভোগের পর মর্ত্ত্যে আসে?

ঠাকুর। হ্যাঁ; স্বর্গ ত স্থায়ী জিনিষ নয়। স্বর্গ-সুখ মানে কাম্য জিনিষ আছে। ভোগ হ'য়ে গেলে মর্ত্ত্যে আসতে হয়। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে ভবন্তি। এখান থেকে ঠিক্ হ'য়ে না গেলে মহান্ আত্মায় যাবে না। ভোগ-সুখ হ'তে পারে, তার ধ্বংস আছে। অভাব, ভয়, সব থাকবে। **তাঁর ভাব নিলে স্বর্গ-সুখ নীচে পড়ে থাকে। বড় আনন্দ পেলেই ছোট আনন্দ তুচ্ছ হ'য়ে যায়।** যতক্ষণ বড় আনন্দ না পায় ততক্ষণ ছোটটিতে মজে থাকে।

গোপেন। বড় সুখে বড় দুঃখ।

ঠাকুর। বড় সুখ হ'চ্ছে তাই যে সুখে দুঃখ নেই। আর এসব ত মাত্রার বেশী কম। **নিত্য সুখ**, যার ধ্বংস নেই।

কিশোরী। বড় সুখ যাকে বলছেন ওটা ত সুখ নয়, সুখ-দুঃখের অতীত।

ঠাকুর। যে আনন্দের কথা বলছি তার ধ্বংস নেই, তার বড় সুখ নাম দিচ্ছে। আর এসব সুখ মাত্রেই ছোট। তারই মধ্যে কোনটা কিছু বড়, কোনটা কিছু ছোট। মাপ আছে। যেমন ঘটীর জল, কলসীর জল, জালার জল; সব শেষ হবে। কিন্তু সমুদ্রের জলের আর শেষ নাই। নিত্যানন্দ—সর্ব্বদাই আনন্দ লেগে আছে। সুখ-দুঃখের অতীত ত বটেই। চিন্তা-শূন্য অবস্থা।

প্রায় ১০টা বাজিল। অনেকে উঠিতেছেন। গোপেন, তপেন বর্দ্ধমান যাইবে তাই বিদায় লইতেছে। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "সব মঙ্গল হোক, সমস্ত আনন্দ হোক। মাঝে মাঝে এস।"

আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—পঞ্চদশ অধ্যায়।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১০ই মে, ১৯২৬ ইং ;

সোমবার, শুক্লা-ত্রয়োদশী।

কলিকাতা।

মঠে—ভবেশচন্দ্র নাগ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কথা।

বেদ ও মূর্ত্তিপূজা—সাকার ও নিরাকার-বাদ—স্বধর্ম্ম পালন—বোধ অনুযায়ী উপাসনা—বেদ একটা অবস্থা—সব মূর্ত্তিতেই এক তিনি—সদ্‌গুরু—বহুরূপী পাখীর গল্প—মুসলমান-ধর্ম্ম—সর্ব্বময় ভগবান্—গুরু ও শিষ্যদ্বয়ের গল্প—কিছু সময়ও ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হয়—রাজকার্য্যরত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের গল্প—সাবধানে থাকা—মহম্মদের কার্য্য ও লোকশিক্ষা—মুসলমানদের উপাসনা—দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম্ম—প্রকৃত ধর্ম্ম—হিন্দু ও মুসলমানের আচার এবং সংস্কারের তারতম্য।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ। বারবার পায়খানা হইতেছে, খুব দুর্ব্বল অনুভব করিতেছেন। জ্বরও আছে।

বৈকাল প্রায় ৫॥টা। ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন আছে। সত্যেনের সঙ্গে তাহার বন্ধু ভবেশচন্দ্র নাগ আসিয়াছে। গৌহাটী হইতে তারক আসিয়াছে। ভবেশ আর্য্যসমাজের বই অনেক পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে আর্য্যসমাজীদের কথা হইতেছে।

ঠাকুর। আর্য্যসমাজীদের কি মত বল দেখি শুনি।

ভবেশ। আর্য্যসমাজীরা বেদ মানে। অন্যেরা মনে করেন বেদে মূর্ত্তিপূজা আছে; তাঁরা বলেন, বেদে মূর্ত্তিপূজা নেই।

ঠাকুর। কেন নেই? গুণজ ধর্ম্ম আছে ত। গুণজ ধর্ম্ম নিয়ে পূজা। গুণ এলেই মূর্ত্তি এল।

ভবেশ। ওঁরা কালী, দুর্গা, হরি, এসব মূর্ত্তি মানেন না।

ঠাকুর। কালী, দুর্গা, হরি, আর ত কিছুই নয়; তোমার দেহাত্ম বোধ আছে, মানুষকে পূজা করছ। মায়ায় পূজা হ'চ্ছে, তাই কালী, দুর্গা, হরির পূজার দরকার। এ পূজার বড় scaleএ (আকারে) সে পূজা। গুণ থেকে সৃষ্টি। গুণাতীত হ'লে সৃষ্টি নেই। বেদের শেষ তাই বটে। যতক্ষণ গোড়া না পড়বে ততক্ষণ শেষ উঠবে কি ক'রে? যতক্ষণ সংস্কার আছে, মুর্ত্তিপূজা থেকে ত্রাণ পেলে কোথায়?

ভবেশ। দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন—

ঠাকুর। আমি কারও নাম ক'রে বলতে চাইনে। বেদ ধরেছ, বেদ নিয়ে কথা বল। ব্যক্তিগত কথার দরকার কি? বেদ থেকে সৃষ্টি কিনা? সৃষ্টির আগে কি ছিল?

ভবেশ। ব্রহ্ম ছিলেন, ব্রহ্মে বেদ ছিল।

ঠাকুর। তার থেকে সৃষ্টি হ'ল ত? সৃষ্টি গুণাতীত, না গুণজ?

ভবেশ। গুণাতীত নয়।

ঠাকুর। তবে বেদ থেকে সৃষ্টি বলছ, বেদে গুণ থাকল। গুণ থাকলেই মূর্ত্তি থাকল। গুণে থেকে কি নিরাকারের উপাসনা হয়? যস্য নির্ণয়ঃ নাস্তি নিরাকারঃ। তা নির্ণয় না করলে গুণে বাঁধছ কি ক'রে? সীমা করছ; গুণ মানেই সীমা।

ভবেশ। গুণের মধ্যে আসলে মূর্ত্তি আসে, কিন্তু তার পূজা কেন?

ঠাকুর। পূজা কেন করে? আমি তুমি বোধেই ত পূজা। একজনকে সন্দেশ দিচ্ছ, সেও পূজা হ'ল? নিজেকে পূজা করছ, ছেলে-মেয়েকে পূজা করছ। সেটা বড়তে আরোপ করে দেব-দেবীর পূজা। ছোট বড় বোধ থাকলে বড়কে সম্মান করা স্বতঃ ধর্ম্ম! কাজেকাজেই পূজা আসে। তাঁর করুণা প্রার্থনা করা। মন যা বলবে তাই ত হবে। মূর্ত্তি নিলে কেন? সরলভাবে বল, বইএর কথা নয়। মনে মূর্ত্তির ছাপ পড়ে কিনা?

ভবেশ। হ্যাঁ পড়ে।

ঠাকুর। তবে ত তোমার কাছে মূর্ত্তি এসে গেল।

ভবেশ। মূর্ত্তি না ধরে নিরাকারের যতটা ধারণা করা যায় তাই ধরা উচিত।

ঠাকুর। ধারণা ত বুদ্ধির মধ্যে। যা কখনও দেখিনি তার কি আংশিক ধারণা করবে? হ'তে পারে, ঘর দেখনি। তবে গাছপালা দেখেছ, তাতে ঘর তৈরী হয় জান। ঘর বলতে একটা ধারণা ক'রে নিলে, গাছপালা দিয়ে এক রকম হবে। কিন্তু যার কিছুই দেখনি, যার নির্ণয় নাই, তার কি আংশিক ধারণা করবে? আর আংশিক ধারণা করলেই ত মেপে ফেললে।

ভবেশ। যেমন ধূম দেখে আগুন ধারণা করি।

ঠাকুর। ধূমও ত দেখেছ? আর যদি আগুন কখনও না দেখ, তবে ধূম দেখে আগুনই বা কি ক'রে মনে কর? মেঘও ত হ'তে পারে। ধোঁয়া দেখলেই কি আগুন বলবে? যে জানে অগ্নি থেকে ধোঁয়া হয়, সেই ধূম দেখে বলতে পারে অগ্নি আছে।

ভবেশ। কাজ দেখে ত কর্ত্তার ধারণা হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ; কর্ম্ম-কর্ত্তা বললেই ত মূর্ত্তি এল। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে ভাবলেই মূর্ত্তি। কর্ত্তার ধারণা কোত্থেকে হ'ল? পিতাকে কর্ত্তা দেখছ, তাঁর পিতাকে কর্ত্তা দেখেছ, তবে কর্ত্তার ধারণা হ'ল। কিছুই নেই, ধারণা কি ক'রে হবে? তোমাকে যদি বলা যায় প্রসব-যন্ত্রণা হ'ল, তুমি তার কি ধারণা করবে? বালককে যদি যৌবনের কথা বলা যায়, সে তার কি বুঝবে?

সেজন্যেই ত বলছে যার যার ধর্ম্মে ঠিক্ থাক্তে। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহ।" তোমার যা ধর্ম্ম তা বলবৎ রাখ। বালক যখন, তখন বালকের পড়া পড়। এম-এর লেক্‌চার (Lecture) মুখস্থ ক'রে কি হবে? অবস্থা না হ'লে নিরাকার হবে কোত্থেকে? সাকারে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে কি নিরাকারের ধারণা হয়? মুখস্থ বললে কি হবে?

যোগবাশিষ্ঠে আছে, ভরদ্বাজকে বাল্মিকী নিরাকারের কথা

বলছেন, ভরদ্বাজ বুঝতে পারছেন না। তাই বলছেন, "দেখ, তোমার এখনও সুখ দুঃখ বোধ আছে, পূর্ব্বসংস্কার পাপপুণ্য রয়েছে। নিরাকার বুঝবে না। আগে সাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর। পরে অবস্থা এলে বুঝবে।"

তাই ত দিয়েছে, সত্বগুণে হরি, শিব, কালী ইত্যাদির পূজা। তাঁদের উপাসনা করতে করতে বিবেক-বৈরাগ্য এলে, সে অবস্থা হ'লে, তবে চিত্ত শুদ্ধি হবে। চিত্ত স্থির হ'লে ব্রহ্মতেজ আপনি ঢুকবে, নিরাকার বুঝবে। অবস্থানুযায়ী চলতে হয়। ভাষার ওপর কতক্ষণ দাঁড়াবে? পাখী ত 'রাধাকৃষ্ণ' বলে; বেড়ালে ধরলেই কঁ্যা কঁ্যা করে।

ঠাকুর গান ধরিলেন :—

ও মন, বিনা অনুভূতি।
কি ফল বল যতই পড়না বেদ ভাগবত পুঁথি॥
পড়া পাখীত 'রাধাকৃষ্ণ' বলে দিবারাতি।
রাধাকৃষ্ণে কভু কি তার হয় রে প্রতীতি॥
ছল-চাতুরী প্রাণে ভরা, মুখে হরিনাম গীতি।
মন-মুখে না মিলন হ'লে মিলবে কি শ্রীপতি॥
চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধাবুদ্ধি না হ'লে সঙ্গতি।
সে ধন কি মন, পাবি কখন, ধ্যানে গায় না যোগী যতি॥
সকলের মূল সাধুসঙ্গ, তোর হ'ল না তায় রতি।
ও তুই মোহের ঘোরে মরবি ঘুরে, পাবি না নিষ্কৃতি॥

গান শেষ করিয়া আবার বলিতেছেন : —

আর দুর্গা, কালী কি হরির মূর্ত্তি ত একটা প্রথা। উদ্দেশ্য ত তাঁকে পূজা করা। ঘরে তোমার ঠাকুরদার অয়েলপেণ্ট (oil-painting-তৈলচিত্র) রয়েছে। কেউ তোমায় বলে দিলে, "এই তোমার ঠাকুরদা।" তোমার তাতে মন গেল; ভাবলে, 'তিনি এই রকম ছিলেন!' তোমার ভক্তি এল। তাতে তাঁর আত্মা আকৃষ্ট হ'ল। তুমি ত জান, এ তোমার ঠাকুরদা নয়, অয়েলপেণ্ট মাত্র। তবু তোমার will-force

(মনের শক্তি) তাঁর willকে (মনকে) আকর্ষণ করলে। তেমনি মূর্ত্তিতে তাঁকেই পূজা করা। তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ত দেখছেন, আমাকেই পূজা করছে। ভুল হয় ত তিনি ভুল ভেঙ্গে দেবেন।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ মূর্ত্তিপূজা ছাড়া উপায় নেই।

তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে।

আমি বলছি না যে নিরাকার বললে ভুল হয়। তবে সাকার থেকে নিরাকারে যেতে হয়। তাই দিয়েছে—দ্বিদল পর্য্যন্ত সাকার। তার ওপরে না গেলে নিরাকারের উপলব্ধি হয় না। তাই মূর্ত্তি। সব মূর্ত্তিই ত এক। কারও দু'হাত, কারও দশ হাত। যার যেটা ভাল লাগে পূজা করে।

ভবেশ। মূর্ত্তি ক'রে ত পরমাত্মাকে ছোট ক'রে ফেলা হয়।

ঠাকুর। ছোট ত করবেই। তোমার বোধ ছোট, বড় কোত্থেকে করবে? মূর্ত্তি না হ'লেও বা কোন বড় করছ? বোধ বড় না হ'লে বড় হবে কি ক'রে? বোধ অনুযায়ী কাজ করাই ঠিক্। বালক যদি পদ্ম ফেলে ফেলে চলে সেটাই তার ঠিক্। যারা নিজের ভাব অনুযায়ী না চলে তাদের সেটা কপটতা। সাকার ভেতরে আছে, অথচ মুখে বলছে নিরাকার, সে ত কপটতা। তার চেয়ে যে সাকারের উপাসনা করে, সে ঢের ভাল। তার সরলতা আছে।

অবশ্য যাদের সে অবস্থা এসে গেছে তাদের কথা ত বলছিনি। তাদের ত ব্রাহ্মণ চণ্ডালে সমজ্ঞান, গবী হস্তিনী, বিষ্ঠা চন্দনে, সমজ্ঞান এসে গেছে। তাদের ত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বোধ এসেছে; আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়। তাদের কথা ত আলাদা। তা নইলে ভাষা বলে কি হবে? ভাষা ত গ্রামোফোনেও বের করতে পারে। একি সোজা কথা? শঙ্করাচার্য্যের পর্য্যন্ত কত ধাক্কা খেতে হ'ল। সমাধি-যোগে বসে থেকে নিরাকার নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে মিশতে মিশতে

ভুল হ'য়ে যায়। বেদ, ভাগবত, পুরাণ, এ সব ত এক একটা অবস্থা। এই এই স্তরে উঠলে এই এই হয়, তারই বর্ণনা।

তবে সাংস্কারিক হ'তে পারে। হিন্দুরা যেমন গঙ্গাস্নান করছে, এ, ও, তা করছে। তেমনি নিরাকারের ধ্যান, একটা সংস্কারিক ব্যাপার। অবস্থার সঙ্গে, সাধনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলছেন, অর্জ্জুন, সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়। দেহকে মেরে ফেলতে হয়। তবে নিরাকার আসতে পারে।

আর কর্ত্তা বললে; নিরাকার কর্ত্তা কখনও দেখেছ? এদিকে নিরাকার সর্ব্বময় ব্রহ্ম বল্‌ছি, আর নিজের বাক্সে টাকা রেখেছি, কেউ নিতে এলেই তাড়া দেব। সাকারের মত সব করছি, বলবার সময় একটা বলে দিলাম। আমিত্ব বুদ্ধি, দেহাত্মবোধ থাকতে কি নিরাকার হয়? বাসনা-কামনার ঠেলায় অস্থির, রিপুর তাড়নায় পাগল ক'রে দিচ্ছে, বলে দিলাম সব ব্রহ্ম। তার চেয়ে 'হরি, কালী' বলে যদি বাসনার হাত থেকে, রিপুর থেকে, ত্রিতাপ জ্বালা থেকে, খানিকটা নিষ্কৃতি পায়, সেই ভাল। ব্রহ্ম বলে অশান্তি ভোগ ক'রে কি হবে?

আর মূর্ত্তিতেও ত তাঁকেও পূজা করা। কুমোরের বাড়ীতে যখন ঠাকুর থাকে, পূজা কর কি? এনে, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তবে পূজা হয়। তাঁর আরোপ করা। চিমনীর কাছে কি কেউ আসে? আলোর কাছেই সবাই আসে। তাঁর ত অনন্ত মূর্ত্তি; যার যাতে আকর্ষণ, তার তাতেই বেশী কাজ হয়।

হরি, কৃষ্ণ, কালী, সবই ত তিনি। সাকার, নিরাকার, সবই তিনি। সাধকেরা তাঁদের ভাব অনুযায়ী গড়ে নিয়েছেন। মূলে এক।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন:—

নির্ব্বাণ নগরে যদি যাবে, সমভাব ভাব সবে।
ভাব লম্বোদরে, দিবাকরে, হর, কালী, কেশবে॥

এক স্বর্ণের অলঙ্কার, গঠনে বিবিধাকার,
(যেমন) বাউটি, বালা, কণ্ঠমালা, ঝুমকো, সিঁথি, চন্দ্রহার,
আকার-প্রকার ভেদে নানারূপ নাম তার;
একত্রে গলায়ে দেখ, পুনরায় সেই স্বর্ণ হবে॥
শীর্ণকায় জীর্ণ-বেশ, দেখে কর'নাক শ্লেষ,
অনন্ত নরকার্ণবে পাইবে অনন্ত ক্লেশ।
ঈশ্বর নিরাকার, নিত্যানন্দ, নির্ব্বিকার,
সাধ করে সাধকেরা ধরে নররূপাকার;
ঈশ্বর-বিদ্বেষী কভু নিস্তার না পায় ভবে॥
ভারীর ভার যেমন দুইদিকেতে সমভার,
একদিক ভাঙ্গে যদি, দুইদিক ভাঙ্গে তার;
তেমতি সেই কালী-কৃষ্ণে অভেদ অন্তর যার,
সেই সে পরম সাধু মরণে মঙ্গল লভে॥

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা' 'আনন্দম্ আনন্দম্' প্রভৃতি আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন।

বিভূতি, অচ্যুত এবং আরও দুইটি নূতন ছেলে কিছুক্ষণ আগে আসিয়াছে। ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমরা কোথায় থাক ?

ছেলেটি। খিদিরপুরে।

ঠাকুর। কি কর ?

ছেলেটি। I. Sc. পড়ি।

ঠাকুর। বেশ, খুব পড়বে। আর তাঁকে ডাকবে। খুঁটো ধরে ঘুরবে, তবে পড়বে না।

ছেলেটি। ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তবে তাঁকে সাকার করে ত ছোট করা হ'ল। ছোট করা ত অন্যায়।

ঠাকুর। এজন্যে অন্যায় নয়। দেখ, প্রথমেই ছোট ছাড়া বড় কি ক'রে বুঝবে ? সামান্য বোঝা না তুলতে পারলে বড় বোঝা কি ক'রে

তুলবে? যতক্ষণ সীমায় আছ অসীম কি ক'রে বুঝবে? সমুদ্রের জল অসীম; তুমি কতটুকু দেখছ? যতটুকু চোখ যায়।

ছেলেটি। কোন সাধু যদি নিরাকারের উপাসনার কথা বলেন?

ঠাকুর। দেখ, সাধু যদি হন, তবে তিনি অবস্থার ওপর নিয়ে যাবেন। 'অ আ' পড়াতে না শিখিয়ে যদি এম-এর পড়া দেন, সেটা মাষ্টারের দোষ।

সদ্‌গুরু চাই। তিনি সব অবস্থা বুঝে কাজ করবেন। প্রকৃতিগত বিভিন্ন ভাব। যার যা উপযোগী সে রকম ব্যবস্থা করেন। এক আলুতে কত রকম তরকারী হয়। মা তার ভাজা, ডালনা, চচ্চড়ি, যার যা ভাল লাগে, ক'রে দিচ্ছেন। জিনিষ একই আলু। সীমাও তিনি, অসীমও তিনি। অসীম এসে যায় ভাল কথা, তবে সে বড় অবস্থা। সাধারণ মায়ার জীবের তা হয় না। তাঁর অনন্ত-রূপ। যে যতটা দেখেছে, বর্ণনা করেছে।

সেই গল্প আছে। চার বন্ধু ছিল। একজন একটা গাছে একটা পাখী দেখেছে। এসে বলছে, "দেখ বন্ধু, ও গাছটীতে একটী পাখী দেখে এলুম, বড় সুন্দর লাল পাখী।" দ্বিতীয় বন্ধু বললে, "সে আমিও দেখেছি, লাল নয় ত, সবুজ।" তৃতীয় বন্ধু বললে, "সবুজ নয় ত, সাদা।" চতুর্থ বন্ধু বললে, "হলদে।" এ নিয়ে চার বন্ধুতে অনৈক্য। তখন বললে, "চল, একসঙ্গে গিয়ে দেখি।" গিয়ে দেখে, গাছ তলায় একটি লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে, "ও, সে বহুরূপী পাখী? সে সব রংই ধরতে পারে। কখনও লাল, কখনও সাদা, কখনও বা সবুজ, আবার কখনও হলদে; আবার খুব কাছে গিয়ে দেখ, কোন রংই নেই।" তা অবস্থা না এলে জোর ক'রে বললে কি হবে?

ছেলেটি। মুসলমানেরা কি ভগবান্ এক মনে করে?

ঠাকুর। এক সবাই মনে করে।

ছেলেটি। তবে মসজিদ ভাঙ্গছে কেন? সেখানেও ত ভগবান্ আছেন।

ঠাকুর। মসজিদ ভাঙ্গছে, আবার দেবমন্দিরও ত ভাঙ্গছে। এক যদি বোধ থাকে তবে কোনটাই ভাঙ্গতে পারে না। মসজিদে ভগবান্ আছেন, মন্দিরেও আছেন।

ছেলেটি। ওদের আইডিয়া (Idea-বোধ) যদি হয় যে মন্দির ভাঙ্গলে ধর্ম্ম হবে?

ঠাকুর। Idea ত আর ঠিক্‌ভাব নয়, ও ত হ'ল গোঁড়ামি। ওতে ত ধর্ম্ম হয় না। আনন্দ, ভালবাসা, শান্তি ত আসতে পারে না।

ছেলেটি। ওরা যদি দুর্গা, কালী না মানে।

ঠাকুর। দুর্গা মানছে না, ঠিক্ ঠিক্ ভাবে আল্লাকে মানলে আল্লাই বুঝিয়ে দিতেন, সবই আমি। তা'হলে কেউ কারও দেবস্থান নিয়ে হিংসা করত না। ওরাও মন্দির ভাঙ্গতে আসত না, এরাও মসজিদ ভাঙ্গতে যেত না। কাজ ত দুই খারাপ। ঠিক্ ঠিক্ বোধ এলে দেখবে একই বস্তু, পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়েছে মাত্র; যার যে নাম ভাল লাগে।

সর্ব্বময় ভগবান্ বোধ এলে সব স্থানে তাঁকে দেখবে। সে এক গল্প আছে। এক গুরুর দুই শিষ্য ছিল। তিনি একজনকে ডেকে একটা নারকল দিয়ে বললেন, "এটা এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে আন যেন কেউ দেখতে না পায়।" শিষ্য করলে কি, এক গভীর বনের মধ্যে গিয়ে ভাবলে, এখানে ত কেউ নাই, এখানেই ভাঙ্গি। সেখানেই ভেঙ্গে নিয়ে এল। গুরু বললেন, "ঠিক্ ভেঙ্গছ?" সে বললে "হ্যাঁ, গুরুদেব, খুব নির্জ্জন স্থানে ভেঙ্গেছি; গভীর বনে, কেউ দেখতে পায়নি।" গুরু তখন অপর শিষ্যকে ডেকে আর একটা নারকল দিয়ে বললেন, "এটা নির্জ্জন স্থান থেকে ভেঙ্গে নিয়ে এস, কেউ যেন দেখতে না পায়।" সে নারকলটি নিয়ে খানিক পরে ফিরে এল। বললে, "গুরুদেব, নারকল ত ভাঙ্গতে পারলুম না। এমন নির্জ্জন স্থান কোথাও পেলুম না।

ভগবান্ ত সর্ব্বময়, তাঁর চোখ কি ক'রে এড়াব?" গুরু তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

দেখ, বড় কঠোরতা চাই, সাধনা চাই, তবে এসব উপলব্ধি হয়। দেহ ছাড়িয়ে যেতে হবে। দেহের চেয়ে রিপু বড়, রিপুর চেয়ে মন বড়, মনের চেয়ে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধির চেয়ে আত্মা বড়। সব ছাড়িয়ে গেলে তবে আত্মা। চব্বিশ ঘণ্টা দেহে মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুটো ভাষা মুখস্থ রেখে কি হবে? বোধ আলাদা জিনিষ।

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে গেলে যশোদা শোক করছেন। ভাবলেন, 'আমার এত কষ্ট হ'চ্ছে, না জানি রাধিকার কত কষ্টই না হ'চ্ছে।' গিয়ে দেখেন, রাধিকা হাসছে; বললেন, "কি, তোমার কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে দুঃখ হ'চ্ছে না? হাসছ।" রাধিকা বললেন, "কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কোথায়? আমিই যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কি আলাদা? মনকে স্থির কর দেখি, দেখবে, ভেতরেই তিনি আছেন।" সব বোধের ওপর।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

পুলিশের কএকজন কর্ম্মচারী (D.S.P.) আসিয়াছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরকে ভক্তি করেন, মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন। একজনের ছেলের অসুখ। অসুখের কথা হইবার পর ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। সংসারই এই। রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধি, একটা না একটা লেগেই আছে। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। এখানে থাকতে গেলে শক্তি করতে হয়। বোঝা ঘাড়ে করতে গেলে শক্তি চাই। যে যার প্রালব্ধ নিয়ে এসেচে। পূর্ব্ব-কর্ম্মানুযায়ী কাজ হয়। কিছু সময় তাঁকে ডাকবে। সংসার আছে, তাও করতে হবে; সেও তাঁর কাজ। তবু কিছু সময় যে ভাবে পার তাঁকে ডাকবে। যে ভাবে যে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।" যে ভাবে হোক, তাঁকে ডাকলে

কাজ হবে। কিছু সময়ও তাঁকে দিলে তাতেই অনেক কাজ হয়। সে একটী গল্প আছে।

এক ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে চাকরী করতে গেল। রাজাকে বললে, "আমি তেইশ ঘণ্টা আপনার চাকর, যা বলবেন তাই করব। কেবল একটি ঘণ্টা আমায় ছেড়ে দিতে হবে। তখন কিন্তু আমি আর আপনার চাকর নই।" রাজা বললেন, "তা তুমি তেইশ ঘণ্টা খাটবে, এক ঘণ্টা তোমায় ছেড়ে দেব, সে আর বেশী কি?" সে বললে, "দেখুন, তখন আমি আপনার চাকর নই। তখন আমায় কাজের কথা বললেও শুনব না।" রাজা তাতেই রাজী হলেন। সে তেইশ ঘণ্টা রাজ সরকারে চাকরী করত। বাড়ী এসে ঐ এক ঘণ্টা ঘরে দোর দিয়ে বসে তাঁকে ডাকত, তখন তাঁর চাকর সাজত। তাঁর চাকর মানে তাঁর গা হাত পা টেপা নয়। সব দিক থেকে মন কুড়িয়ে তাঁর দিকে দিত। ভাবত, তেইশ ঘণ্টা খেটে যদি সংসারের উন্নতি করতে না পারি, তবে আর এক ঘণ্টাতেই বা কি করব? তাই সে ঐ এক ঘণ্টা স্থির হ'য়ে বসত। এখন এক দিন রাজার সেই সময় বিশেষ কাজ পড়েছে। তখন বলছেন, "ব্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে এস।" আগে যা বলেছেন সব ভুলে গেছেন।

দুটো অবস্থায় রাজা হয়। এক, সত্ত্ব আর রজ মিশ্রিত। তারা জীবন্মুক্ত, সব জিনিষের বোধ থাকে। ঠিক্ ঠিক্ কাজ হয়। আর হয় তম আর রজ মিশ্রিত। তাদের স্বার্থই পরমার্থ। নিজের স্বার্থ পড়লে সব ভুল হ'য়ে যায়। এই প্রকৃতি; প্রকৃতিই কাজ করে। তাই আগে নিয়ম ছিল, রাজপুত্রেরা ঋষির আশ্রমে থেকে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে, কঠোর নীতি নিয়ে বিদ্যাভ্যাস করত। তাতে অবস্থা তৈরী হ'লে তবে রাজত্ব করত। তখন রাজত্ব তাদের অধীন। এই রাজাও স্বার্থ পড়াতে ব্রাহ্মণকে যে ছুটী দিয়েছিলেন সেটা ভুলে গেছেন। লোক পাঠিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে আসতে। বলে দিলেন, "ব্রাহ্মণকে বলো, আমার বিশেষ কাজ পড়েছে। এটা ক'রে দিলে, পরে তাকে দু'ঘণ্টার জন্য ছুটী দেব।" তারা ব্রাহ্মণকে গিয়ে বললে, "চল, রাজা ডাকছেন,

তাঁর জরুরী কাজ পড়েছে। এর পরে তোমায় দু'ঘণ্টা ছেড়ে দেবেন।" ব্রাহ্মণ বললে, "এখন ত যেতে পারব না। বলগে, এখন আমি তাঁর চাকর নই।" ফিরে এসে রাজাকে বলতেই তিনি চটে গেলেন। হুকুম অমান্য করেছে, তাতে ক্রোধ হয়েছে। তখন হুকুম দিলেন, "চারজন লোক গিয়ে ধরে নিয়ে এস।" ওরা যেতে পথে দেখলে ব্রাহ্মণ আসছে; বললে, "চল, রাজা চটে গেছেন। তোমায় ধরে নিয়ে যেতে আমাদের পাঠিয়েছেন।" ব্রাহ্মণ বললে, "চল।" গিয়ে উপস্থিত। রাজার দেখেই রাগ পড়ে গেছে। হুকুম অমান্য করার দরুণই না রাগ হয়েছিল, আবার দেখেই পড়ে গেল। বললেন, "এস, আমার বড় কাজ পড়েছে, এটা ক'রে দাও। পরে তোমায় দু'ঘণ্টা ছেড়ে দেব।" ব্রাহ্মণ বললে, "আচ্ছা; কাজ দিন।" খাতা পত্র যা লেখার তা সব লিখে দিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এদিকে এই ব্রাহ্মণের একঘণ্টা পূর্ণ হয়েছে। সে রাজবাড়ীতে এসে রাজাকে বললে, "আমায় কেন ডেকেছিলেন?" রাজা বললেন, "এই যে তুমি এসেছিলে!" সে বললে, "সে কি! আমি কখন এলাম?" রাজা বললেন, "তবে এসব কাজ ক'রে দিলে কে? এই হাতের লেখা কার? তোমার নয়?" ব্রাহ্মণ দেখেই সব বুঝতে পারলে। বললে, "রাজা, আমি তেইশ ঘণ্টা তোমার চাকরী করেছি। তোমার মন যুগিয়ে চলেছি। যা বলেছ, তাই করেছি। তেইশ ঘণ্টা তোমার চাকর সেজেও তোমার মন পেলুম না। তুমিই এক ঘণ্টা ছুটী দিয়েছিলে সেও ভুলে গেলে। আর এক ঘণ্টা তাঁর চাকর সেজেছিলুম বলে, তিনি আমার চাকর হ'য়ে এসে আমার কাজ ক'রে দিয়ে গেলেন? বল দেখি রাজা, কে আপন? আমারই ভুল হয়েছিল। আমার তাঁতে বিশ্বাস ছিল না, তাই সামান্য উদরান্নের জন্য তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছিলাম। যিনি জগৎকে খাওয়াচ্ছেন তিনি যে আমাকেও খাওয়াতে পারেন, সে বোধ ছিল না। তাই তোমার দাস সেজেছিলাম। তা আজ থেকে আর তোমার চাকর নই। এই তেইশ ঘণ্টাও আমি তাঁর সেবা করব।

চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তাঁর চাকর।” এই বলে ব্রাহ্মণ চলে গেল।

কিছু সময়ও যদি তাঁকে ডাক তাতেই অনেক কাজ হয়। তিনি ত সব দেখছেন। সংসারও ত তিনিই দিয়েছেন। সংসারও কর, আর কিছু সময় তাঁকেও দাও; তাতেই মঙ্গল হবে।

সৎ সঙ্গই প্রধান। মায়ার শক্তি ভয়ানক। মনকে বলে টেনে নেয়। এজন্যে সঙ্গ। তাতে শক্তি বাড়ে। তাঁতে মন দিলে তিনিই সব করে দেবেন। ভেবে কি করবে? ছেলেও ত তাঁর, তুমি ত ইচ্ছা করলেই একটি ছেলে আনতে পার না। তোমার যিনি পিতামাতা তারও ত তিনিই পিতামাতা।

নানা প্রসঙ্গ উঠিল। সাবধানে থাকবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। সাবধান আর কি করবে? মেলা সাবধান করতে গিয়ে যে অসাবধানই হ'য়ে যায়। দেখনা, কাশীতে নারকল পড়ে আমার পায়ের আঙ্গলটা ফেটে গেল। কাশীতে নারকল হয় না; নারকলের দেশও নয়। শীতলা-মন্দিরের পৈঠার ওপর কেমন সাবধানে বসে আছি। কোথাথেকে একটা ছেলে নারকল হাতে ক'রে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে সেটা পায়ের ওপর পড়ে গেল। আমার হাসি এল। 'দেখ, মানুষ সাবধান সাবধান করে, আর কোথাথেকে কিসের উৎপত্তি হয়।' এঁরা (ভক্তরা) তার ওপর চটে গেলেন। আমি বারণ করলুম। 'ও ত আর ইচ্ছা ক'রে ফেলে দেয়নি, ওর দোষ কি? তোমরা কেন ওর ওপর চটছ?' তা দেখ, এই ত সাবধান। আমি এজন্য সাবধানের উল্টোটা করি। এবার ৮।৯ মাস জ্বর চলছে। তা গঙ্গা নাওয়া, তেল মাখা, ডাব, মিশ্রি-ভেজা, তেঁতুল-গোলা, যত প্রকার ঠাণ্ডা সব চলছে। ডাক্তার examine (পরীক্ষা) ক'রে বললে, “২৫ পারসেণ্ট (শতকরা পঁচিশ) blood (রক্ত) আছে, এতে মানুষ নড়তে পারে না। আপনি কি ক'রে বসে আছেন?” আমি বললুম, শুধু বসে নেই বাপু, চান টান করি, কালীঘাট যাই, খাই দাই, সবই করি। কালাজ্বর বলছে; ফুঁড়তে

চায়। এখন উনি ত ফুঁড়ে দিলেন শেষে একটা কিছু হ'ল, sorry (দুঃখিত) বলে দৌড় মারলেন। (সকলের হাস্য)। আমি বাপু এর মধ্যে নেই। আর দেহ ত চিরস্থায়ী নয়। একদিন যাবেই। এর আর কি ভরসা রাখব।

ঠাকুরের ধাত বড় গরম। খুব ঠাণ্ডা ব্যবহার না করিলে বড়ই অসুস্থ বোধ করেন। সেজন্য জ্বর হইলেও ঠাণ্ডা জিনিষ ব্যবহার করেন। তাহাতেই উপকার হয়।

পুলিশের কর্ম্মচারীরা উঠিলেন। ঠাকুর চরণামৃত দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কানাই ও অজয় আসিল। আবার ভবেশের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ভবেশ। আপনি কি বলেন, মহম্মদ নিরাকারের উপাসনা প্রচার ক'রে অন্যায় করেছেন?

ঠাকুর। না, তা কেন? তিনি সে সময় যাদের ওপর কাজ করেছেন তারা সেই শক্তিসম্পন্ন ছিল। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যখন যে রকম দরকার, করতে হয়। এ দেশেও রয়েছে। শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান প্রচার ক'রে গেলেন, তখনকার সমাজে তাই দরকার ছিল। পরে যখন মানুষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল, সে ভাব ঠিক্ ঠিক্ নিতে পারলে না, তখন চৈতন্যদেব ভক্তিরস দিয়ে গেলেন। অবস্থা, দিন-কালের ওপর সব নির্ভর করে। মহম্মদ যে ভাবের লোক পেয়েছেন তাদের ভাব অনুযায়ী কাজ ক'রে গেছেন। সব আধারে সব সময় ত এক জিনিষ চলবে না। তাঁর ভাব ছিল বহুতে মন না রেখে একটাতে মন দাও। তাই বহু মূর্ত্তির পূজা বারণ করলেন।

ভবেশ। তিনি মূর্ত্তি ভাঙ্গলেন বটে, কিন্তু কাবাতে একটী মূর্ত্তি নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন।

ঠাকুর। হ'তে পারে; সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। অনেক সময় মহাপুরুষদের ভাব ধরা কঠিন। বোধ হয়, তিনি বহুতে মন না

রেখে একটা জিনিষে মন দিতে বলেছিলেন। একটা মূর্ত্তিতে মন স্থির করাই হয়ত তাঁর উপদেশ ছিল।

মহম্মদ বিশ্বাসকে বড় করেছেন। বিশ্বাস কর, সাধনা কর, নইলে তাঁর কাছে যেতে পরবে না। আয়েষা নামে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি ত ঈশ্বরের পুত্র, তোমার সাধনার কি দরকার?" মহম্মদ বললেন, "সাধনা না ক'রে কারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নাই। আমি তাঁর পুত্র হ'লেও সাধনা না ক'রে আমারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নাই। গৌহাটীতে মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হ'ল। মহম্মদ, রহমান (তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত; এ, বি রেলওয়ের কর্ম্মচারী), তারা আমায় তাদের নমাজ সম্বন্ধে বললে যে, খোদাকে সামনে দাঁড় করিয়ে পবিত্র জলে,—আমরা যেমন গঙ্গাজলকে পবিত্র মনে করি তারাও সে রকম কিছু জল রেখে পবিত্র মেনে নেয়,—তাতে হাত-পা ধোয়, চোখ মুছে, ঘাড়ে জল দেয়। চোখে জল দেয় আর বলে, "আল্লা! এ চোখে তোমার রূপ ছাড়া অনেক রূপ দেখেছি, তা ক্ষমা কর; প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে তোমার রূপ ছাড়া আর কোন রূপ দেখব না। এই মুখে অনেক বাজে কথা বলেছি। প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে আর তোমার নাম ছাড়া কিছু বলব না। এই হাতে কত কুকার্য্য অকার্য্য করেছি, প্রতিজ্ঞা করছি, আর তোমার আরাধনা ছাড়া করব না। এই পা দিয়ে কত কুস্থানে অস্থানে গেছি; তোমার মন্দিরে যাইনি, প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে তোমার মন্দির ছাড়া আর কোথাও যাব না।" এই ভাবে খোদাকে সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করে। তারপর তিনবার নত হয়। প্রথমবার ঘাড় নীচু ক'রে বলে, "আমি এই জগতের কাছে নীচ।" দ্বিতীয়বার হাঁটু গেড়ে বসে বলে, "আমি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের চেয়ে নীচ।" তৃতীয়বার ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বলে, "আমি পৃথিবীর মাটীর চেয়েও নীচ।"

এ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা হ'ল। আমি বললাম, বেশ সুন্দর উপাসনা। শুনলেও শান্তির উদয় হয়। তবে সকলের জন্য নয়।

এ উপাসনা মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই রক্ষা করতে পারেন। তাঁদের সে অবস্থা, তাঁরা পারেন। কিন্তু সাধারণ মায়ার জীব, যাদের 'হ্যাঁ, না' কোনটারই দাম নেই, তারা কি ক'রে এ রক্ষা করবে? সেজন্য প্রতিজ্ঞা ক'রেও বাইরে এসে অন্য রকম হ'য়ে যায়। তিনি শক্তি না দিলে মানুষের কি ক্ষমতা রক্ষা করে? শুধু বলাই হয়, কাজে করা কঠিন। এ ত আমাদেরও আছে, 'চোখ যেন তোমার রূপ ছাড়া না দেখে। কান যেন তোমার নাম ছাড়া না শোনে। মুখ যেন তোমার কথা ছাড়া না বলে। হাত যেন পুষ্পচয়ন করে, তোমার পূজা করে। পা যেন তোমার মন্দির ছাড়া না যায়।' এ ত আমাদেরও আছে। তবে প্রার্থনা করছে যেন এ সব না করি। সে অবস্থা না এলে 'যাব না' বলে কি প্রতিজ্ঞা করতে পারে? তা করতে গেলে শুধু একটা সংস্কারিক ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। অনেক সময় কেন করছে, তাও বোঝে না, চিন্তাও করে না।

ভবেশ। তবে ইসলাম ধর্ম্ম কি শুধু একদেশব্যাপী এবং এক সময়ের জন্য? সবার জন্য নয়?

ঠাকুর। সব ধর্ম্মই ত তাই; প্রকৃতিগত। তোমাদেরই বা বেদের থেকে পরিবর্ত্তন হ'য়ে এ অবস্থায় এল কেন? দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী সব বদলে আসবে। যেখানে যে ভাবে কাজ করা দরকার।

কৃষ্ণ দেখলেন, অর্জ্জুনের শোক মোহ এসেছে। বললেন, "অর্জ্জুন, তুমি সত্ত্বগুণীর মত কথা বলছ বটে, কিন্তু তোমাকে তমোগুণে ছেয়ে ফেলেছে।" তাই বলেছেন—"উত্তিষ্ঠ, বধ।" তিনি কংস প্রভৃতিকে যুদ্ধ ক'রে মারলেন। আবার কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে বললেন, "আমি অস্ত্র গ্রহণ করব না।" বৃন্দাবনে একভাব, মথুরায় একভাব, গোপিকাদের সঙ্গে একভাব, আবার ঋষিদের সঙ্গে আর একভাবে ব্যবহার করলেন। এক কুইনাইনে কি সব জ্বর ছাড়ে? এক এক ধর্ম্ম এক এক সময় প্রবল। বুদ্ধ এক রকম ক'রে গেলেন, শঙ্করাচার্য্য এসে আর এক রকম ক'রে দিলেন। আবার চৈতন্যদেব এসে সেটাও বদলে দিলেন।

যখন লোকের যে রকম বিকাশ দেখেছেন, সে রকম কাজ ক'রে গেছেন।

ভবেশ। তবে ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্ম কি ক'রে চলবে ?

ঠাকুর। কেন চলবে না ? তারা তাদের নীতিতে থাকবে। ঠিক্ ধর্ম্ম নিলেই হ'ল। এ সব ত সংস্কার নিয়ে লড়াই। মূল ধর্ম্ম ধর। সংস্কার কেন ধর ? ধর্ম্ম দুটোই এক। মহম্মদ বলছেন, 'বিশ্বাস কর।' তোমাদেরও আছে, বিশ্বাস কর, দুইই এক। তারাও আল্লা বলছে। তোমরাও ঈশ্বরকে ডাকছ। জিনিষ ত একই। কেবল ভাষা পৃথক্ পৃথক্। যেমন একটা পুকুরের চারটা ঘাট। এক ঘাটে বাংলায় বলছে 'জল', আর এক ঘাটে সংস্কৃতে বলছে 'অপঃ', আবার এক ঘাটে মুসলমানেরা বলছে 'পানি', আর এক ঘাটে সাহেবেরা বলছে 'ওয়াটার' (water)। বস্তু একই। আর কতকগুলি থাকে দেশীয় সংস্কার—যেখানে যে রকম। সুবিধার জন্য চালায় মাত্র।

ভবেশ। তা'হলে আপনি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, আর ভেতরের অঙ্গ, দু'টা মানেন না ?

ঠাকুর। আগে ধর্ম্মই কি তা বোঝ। ধর্ম্মই বুঝতে পারছ না, তার অঙ্গ কি বুঝবে ? ধর্ম্ম মানে যাতে অধর্ম্ম নষ্ট হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে মন রয়েছে। এরা বাইরের দিকে নিয়ে যায়। এসব থেকে মন তুলে নিতে হবে। প্রকৃতি ধরতে গেলে ত তোমাদের মধ্যেই মিল নেই। পাঁচ জনের পাঁচ রকম প্রকৃতি রয়েছে। ধর্ম্ম ত এক। সত্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, অক্রোধ, অলোভ, ভয়শূন্য ভাব আর চিত্তপ্রসন্নতা, এ সবই ধর্ম্মের অঙ্গ। এ ত সবারই আসতে পারে। যার যার সংস্কার-পালনে দোষ কি ? তবে এরই মধ্যে যার জ্ঞান আছে, সে অবস্থা বুঝে চলতে পারে, যাতে অপরের ক্ষতি না হয়। আর যার সে বোধ নেই, সে নিজের সুবিধা-নুযায়ী চলে, অপরের যা হয় হোক। এ ত পশুর কাজ। পশু রাস্তায় হেগে রাখলে। তার বোধ নেই যে অপরে মাড়াবে। তার

সুবিধা হ'ল তাই হেগে রাখলে। এ ত পশুর বোধ। মানুষ মানুষের মত চলবে; পরস্পরের সুবিধা দেখবে। তা সে বোধ না এলে কোত্থেকে হবে? শুধু ঝগড়াই চলবে।

গৌহাটীতে মুসলমান ভক্তরা বললে, "দেখুন, আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন। আমরা যা করি তার উল্টো করেন। আমরা পশ্চিম দিকে নমাজ করি, আপনারা পূর্ব্ব দিকে পূজা করেন; আমরা খাসী জবাই করি, আপনারা পাঁঠা বলি দেন; আমরা কাছা দিই না, আপনারা দেন; আমরা পাতার এ পিঠে খাই, আপনারা উল্টোপিঠে খান; আমরা দাড়ী রাখি, আপনারা কামিয়ে ফেলেন।" এই সব বলতে আরম্ভ করলে। আমি বললুম, দেখ, তোমরা সমস্ত বোধ অভাবের কথা বলছ। তলিয়ে দেখ না, যা তা বিশ্বাস কর। জিনিষগুলো মাথার মধ্যে নাও না। হিংসা কাকে বলে জান? হিন্দুরা যে তোমাদের দেখে সব উল্টো করলে। হিন্দুদের এ নীতি কতদিন থেকে চলে আসছে দেখ। তোমাদের আসার বহু আগে থেকে এসব নীতি চলে আসছে। তোমরা ত এলে সেদিন। তোমাদের দেখে উল্টো করলে কি ক'রে? কেন করে বুঝতে চেষ্টা কর। আগেই হিংসা বলে ধরে নিলে। এজন্য কোন জিনিষ বোঝ না।

পূর্ব্বদিকে কেন উপাসনা করি? আমরা তেজের উপাসনা করি। আমাদের গণনা আলো থেকে। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য ওঠে। কাজেই সে দিকে আমাদের উপাসনা। আর তোমাদের মক্কা পশ্চিমদিকে তোমরা সে দিকে মুখ ক'রে নমাজ কর। বলির কথা বলছ। আমাদের নীতিই আছে, যে জীব একবার ক্ষত হয়েছে সে জীব মায়ের কাছে আর নিবেদিত হয় না। হয় ত কোন পাঁঠাকে কুকুর কামড়েছে, তারও বলি হবে না। আর কাছা দেওয়া, কাছা খোলা, দুইই আমাদের মধ্যে রয়েছে। বহির্বাস ইত্যাদি আছে। দাড়ী কেউ রাখে, কেউ রাখে না। দেখ, আমার দাড়ী আছে, আমি ত তোমাদের দলের (সকলের হাস্য)।

এ সব ত দেশীয় রীতি। হিংসা নয়। আসল ধর্ম্ম এক। বাইরের নীতি যে যার সুবিধা মত নিতে পারে। যার যে পথ্যে উপকার হয়। মূল দরকার রোগ সারা।

এ সব ত সংস্কার। এর কি কোন দাম আছে? আমরাও কত সংস্কার পালন করি। সে এক গল্প আছে। একজনার স্ত্রী জপ করতে বসেছে। এক হাতে নাক টিপে ধরে আর এক হাতে মালা ঘোরাচ্ছে। এখন স্বামী আপিস থেকে এসেছে। বেচারী খেটে খুটে এসেছে, ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার চাচ্ছে। খাবারও তৈরী রয়েছে। কিন্তু স্ত্রী কথাও বলতে পারছে না, খাবারও দিতে পারছে না। জপ করছে, দু'হাতই বন্ধ। অথচ স্বামীর ক্ষিদে পেয়েছে, দেরী সইবে না। তাই পা দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ওই ওখানে খাবার ঢাকা আছে (সকলের উচ্চহাস্য)। দেখ, একরকম ভাবের সংস্কার আমরাও কত পালন করি।

নানা কথা হইতে লাগিল। পুত্তুব কয়েকজন বন্ধু আসিয়াছেন। একজন ঠাকুরকে গান শুনাইবেন।

গান হইতেছে :—

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়,
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ও কে নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে,
ঢলে ঢলে পড়ে পাগলেরই প্রায়॥
ও কে যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে;
ও কে দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে,
দেখে যা রে তোরা দেখে যা॥

(ও সে) বলে, 'কই ত কেউ পর নাই',
(ও সে) বলে, 'সবাই যে নিজ ভাই',
(ও সে) বলে শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে,
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে, এই চাই।
ও কে প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই॥
সব দ্বেষ হিংসা ছুটি, আসি পড়ে লুটি,
(ও তার) ধূলিমাখা দুটি পায়;
বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই,
নইলে প্রভু, তোমার প্রেমে গলে যাই।
এযে নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর,
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই॥
ঐ যে নরনারী সবে পাছে ধায়,
ওই জয়ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চলে, মুখে হরি বলে,
(তোদের) ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয়॥

আরও কয়েকটি গান হইল। বেশ মিষ্টি গলা। গান শুনিয়া সকলের আনন্দ হইল। তাঁহারা বিদায় লইলেন। ১০টার পর আরতি হইলে ভক্তরাও বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—ষোড়শ অধ্যায়।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১২ই মে, ১৯২৬ ইং ;

বুধবার, কৃষ্ণা-প্রতিপদ।

কলিকাতা।

মঠে—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার ম'শায়, 'শ্রীম'), রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীযুক্ত ললিত মহারাজ ও কালীবাবু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ঠাকুরের অসুখের কথা—ঠাকুরের আহার ত্যাগ—দেহ অনিত্য—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—পরমহংসদেবের কথা—শুদ্ধ আত্মা ও বিষয়ে মগ্ন মন—শুদ্ধভক্ত—কালীবাবুর সঙ্গে কথা—জীববুদ্ধি—নানা রকম জীব—রামপ্রসাদের বিভিন্ন অবস্থার গান—নির্ভরতা—গুরুর আশীর্ব্বাদ—চার প্রকার সাধনা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ; অনাত্মাবাদ ; শরণাগত হওয়া ; সাধুসঙ্গ—উকীল বেচারাম লাহিড়ীর সঙ্গে কথা—ভগবদুপলব্ধি—গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি চাই—সংসার লোহাপেটার স্থান।

বৈকালে ভক্তরা সকলে একে একে আসিতেছেন। ভবানীপুরের ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুতু, রাজেন আছে। খিদিরপুরের অচ্যুত, হরিপদ, বিভূতি আসিয়াছে। কালীবাবু আছেন। জনাই এর ভোলানাথ আসিয়াছে। উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী আসিয়াছেন। চন্দননগরের নিরঞ্জন আসিয়াছে।

আজ পরমহংসদেবের ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়—'শ্রীম') বিকালে আসিবেন কথা আছে। তিনি গদাধর আশ্রমে আসিয়াছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার আসিবার কথা হইতেছে। ভক্তরাও দুইজনের মিলন দেখিবেন বলিয়া উৎসুক হইয়া আছেন। আজ তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে।

বৈকালে ৫টায় ললিত মহারাজকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তরাও সব ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ললিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ললিত মহারাজ। আপনার শরীর নাকি খারাপ হয়েছে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, বিকালে একটু জ্বর হয়।

শ্রীম। লিভারের (liver-যকৃৎ) দোষ আছে কি ?

ঠাকুর। পিলে বেড়েছে। এটা গোড়া থেকেই ছিল। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি।

ললিত মহারাজ। চিকিৎসার কি রকম হ'চ্ছে ?

ঠাকুর। চিকিৎসা কি হবে ? আমার ধাত বড় গরম। একটা খাব, শেষে কি রকম হবে কি জানি।

শ্রীম। রোজই জ্বর হ'চ্ছে ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, রোজই হয়।

শ্রীম। ভাল কবিরাজ দেখালে হয় না ? রোজ জ্বর হওয়া ত ভাল না। দুর্ব্বলতা বোধ করেন না ?

ঠাকুর। এক একদিন একটু বোধ হয়। এক একদিন কিছুই বুঝতে পারি না। এবার কাশীতে একদিন ভয়ানক দুর্ব্বলতা বোধ হ'তে লাগল। রাস্তায় চলছিলুম, মনে হ'ল রাস্তা যেন ঘুরে যাচ্ছে। চলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তার পরদিনই শিবরাত্তির ছিল। পাণ্ডা বললে, "চলুন, ঠাকুর দেখিয়ে আনি।" বললাম, চল। তার সঙ্গে বেরিয়ে সেই সকাল থেকে দুটো পর্য্যন্ত সব দেবমন্দির ঘুরে দেখলাম। এক একটা আবার তিন, চার তলা নীচে। সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা করলুম। কিছুই কষ্ট বোধ করলুম না।

শ্রীম। ঘুম হয় বেশ ?

ঠাকুর। ঘুম, যেমন আমি ঘুমুই সে রকমই হয়।

শ্রীম। খাওয়া দাওয়া কি রকম ? দুধ টুধ খান ?

ঠাকুর। না; দুধ আমি ছোটবেলা থেকেই খেতে পারি না; সহ্য হয় না।

শ্রীম। মাছ টাছ খান?

ঠাকুর। হ্যাঁ, মাছ আর প্রসাদী মাংস খাই। মাছ-মাংস ছোটবেলা থেকে বড্ড প্রিয় ছিল। মাঝে চার বছর কিছুই খাইনি। আপনিই কেমন খাওয়া উঠে গেল। আধ পয়সার ছাতু খেয়ে দু'তিন দিন কেটে যেত। বেল-পাতা খেয়ে থাকতুম। এ রকম চার বছর কেটেছে। পরে এরা (ভক্তরা) আবার খাওয়া ধরায়। একটু একটু খেতে খেতে এখন খাই মন্দ না (সকলের হাস্য)।

শ্রীম। হরি মহারাজের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল; না?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ ছিল।

ললিত মহারাজ। একদিন কাশীর মঠে গিয়েছিলেন। আমিও সেখানে ছিলুম।

শ্রীম। অনেক দিন থেকে আপনাকে দর্শন করার ইচ্ছা ছিল।

ঠাকুর। আমারও অনেক দিন থেকে ইচ্ছা হয়েছিল। এরা বললেই বলতুম, গাড়ী ক'রে নিয়ে এস।

শ্রীম। এখানে আছেন; কাছেই আশ্রম রয়েছে (গদাধর আশ্রম), একদিন দেখে আসবেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ যাব। চিনতে না পারলে কাছে থেকেও ত হয় না। সামনে ভগবান্ আছেন; চিনতে না পারলে কিছুই হয় না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীম। সর্ব্বদা আপনি তাঁর ভাবে আছেন। তাই আসতে আসতে এঁদের (ভক্তদের, যাঁহারা তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন) বলছিলুম, 'তোমারই শ্যামের কথা হ'চ্ছে'। শ্রীমতী আসছেন, সখীরা কৃষ্ণকথা বলছিল। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের কথা কচ্ছিস সখি?" তারা বললে, "তোমারি শ্যামের কথা হ'চ্ছে।" তা আপনি যাঁর চিন্তা করেন, সেখানে তাঁরই পূজো হ'চ্ছে।

ঠাকুর। এও ত (শ্রীমকে দেখাইয়া) তাঁর মূর্ত্তি; তিনিই ত আপনাদের মধ্যে রয়েছেন।

ললিত মহারাজ। আপনি কি আমাদের বেলুড়ে কখনও গিয়েছিলেন?

ঠাকুর। বহু আগে গিয়েছিলাম। প্রায় ২০।৩০ বছর আগে।

শ্রীম। একবার দর্শন করবেন, গান শোনাবেন। আপনি তাঁকে ডাকেন, আপনার মুখে তার গান শুনব।

ঠাকুর। আমি ত ডাকতে পারি না। তিনি ডাকান্ তাই ডাকি।

শ্রীম। বেড়াল ছানা যেমন 'মিউ মিউ' করে মাকে সর্ব্বদা ডাকছে। এখানে কদিন থাকা হয়?

ঠাকুর। আমি পূজোর পর কাশী যাই।

শ্রীম। চেহারা ত বেশ ভালই আছে। একটু একটু ক'রে সেরে যাবে। আমার একবার এরকম হয়েছিল, প্রায় একমাস ছিল। ডাক্তার ওষুধ দিলে কিছুই হ'ল না। পরে আপনিই সেরে গেল।

ঠাকুর। এর আর চিন্তা ক'রে কি হবে? দেহ ত এমনিও যাবে, অমনিও যাবে, এর স্বভাব যাওয়া।

শ্রীম। তিনি রাখবেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ; তিনি বোঝেন রাখবার দরকার, রাখবেন। আর যদি রাখবার দরকার মনে না করেন, রাখবেন না।

শ্রীম। রাখবার জন্য ত বন্দোবস্তও আছে। জল-হাওয়া আছে। আর লোকজন, এঁরা সব সেবা করছেন। আয়োজন ত আছে।

ঠাকুর। এ সত্ত্বেও যায়। আমাকে অমিয়মাধব মল্লিক দেখতে এসেছিল। গল্প করলে, তাদের নাকি এক মিটিং হচ্ছিল। কথা উঠল, কে কি রকম চিকিৎসা করেন। তা একজন কবিরাজ বললে, আমরা শতকরা পঞ্চাশ জন আরোগ্য করি। এলোপ্যাথ বললে, আমরা শতকরা ষাট জন আরোগ্য করতে পারি। হোমিওপ্যাথ বললে, আমরা শতকরা আশী জন আরোগ্য করি। তারপর অমিয়মাধবকে তার মত

বলতে বললে। সে বললে, "আমরা ত সব আরোগ্য করি। কেউ পঞ্চাশ, কেউ ষাট, কেউ আশী জন; তা'হলে এই কেওড়াতলা আর নিমতলার শশ্মানগুলো কি ক'রে চলছে?" (সকলের হাস্য)। সবাই ভাল করে তবে এত মরে কোত্থেকে?

শ্রীম। সৃষ্টি, পালন, সংহার—সমান বেগেই চলেছে।

ঠাকুর। সৃষ্টি গুণজ কিনা, গুণেই সৃষ্টি। তিনটীই সৃষ্টির সহায়।

শ্রীম। দুপুর বেলা একটু ঘুম হয়?

ঠাকুর। হাঁ, একটু শুই। ঘুমটা স্বভাবতঃই আমার কম হয়। রাত্তিরে বারটার এদিকে শুই না। আবার রাত থাকতে উঠি।

শ্রীম। আপনার পরমহংসদেবকে দেখা হয়নি বোধ হয়? দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেছিলেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ; গতবারও গিয়েছিলাম।

শ্রীম। সে সবই রয়েছে; পঞ্চবটী, তাঁর ঘর, সব সে রকম রয়েছে। আমরা দেখেছি, মার সঙ্গে কথা কচ্ছেন। শুধু দেখা নয়, মার সঙ্গে কথা কয়েছেন। কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, আবার কেউ খেয়েছে। দেখেছি, এই সমাধি অবস্থা, আবার বাহ্য। একেবারে বালক। ভক্তেরা কোনদিন আসত না। তাই গঙ্গাধারে দাঁড়িয়ে বলতেন, "ভক্তেরা ত এল না।" বলতেন "যারা সব ছেড়ে ভগবানকে চিন্তা করে, তাদের দেখলে তবে ত প্রাণ শীতল হবে। মাছটা ড্যাঙ্গায় তুললে যেমন ছট্‌ফট্ করে, তেমনি শুদ্ধ ভক্ত না দেখলে প্রাণ কেমন করে। আবার কারও হাওয়া গায়ে লাগলে গা জ্বালা করে, তাই চাদর গায়ে দিয়ে থাকি।" আমি যখন প্রথম গেছি, সে ঘরে বসে আছেন। গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। বলছেন, "যার তাঁর নাম করতে চোখের জল ঝরে গা রোমাঞ্চ হয়, তার আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করতে হয় না।" এই প্রথম কথা শুনি।

দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া আছেন। ঠাকুর অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিতেছেন। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম। মনকে টেনে রাখতেন ছাতার মত। ছাতা যেমন বন্ধ করা যায় তেমনি মনকে গুটিয়ে নিতেন। দেখেছি, একেবারে বাহ্যশূন্য। যারা যাতায়াত করত তাদের দেখলে আনন্দিত হতেন।

ঠাকুর। কতকগুলি ছেলেকে দেখা যায়, তাদের আত্মা শুদ্ধ। তারা বিষয়ে যেতে পারে না। গিয়ে পড়লেও তাতে থাকতে পারে না। তাদের দেখলে আনন্দ হয়। আবার কতক আছে, তা নয়, বিষয়েই মন।

শ্রীম। যারা সব কাছে যেত, তাদের বলতেন, "তোমরা সব কোকিল, কাকের বাসায় জন্ম, কিন্তু বাইরে বিচরণ করছ। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে জন্ম, কিন্তু তাতে মন নেই, শুদ্ধ আত্মা।" আপনি কিছু বলুন, আপনার মুখে শুনতে ভাল লাগে।

ঠাকুর। আমি কি জানি, কি বলব?

শ্রীম। আপনি রাতদিন তাঁর চিন্তা করছেন।

ঠাকুর। আমি কই করতে পারি। তবে তিনি যতটুকু করিয়ে নিচ্ছেন। আমার কি রকম, কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে না। যদি ভাবতে যাই, মন কেমন করে। তিনি যেমন করান। আমার ভাবনা নেই।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) যেমন বলতেন, "আমার মা সব জানেন।"

ঠাকুর। একটা অবস্থায় হয়, তিনি শুদ্ধ ভক্ত জুটিয়ে দেন। তাদের দেখলে আনন্দ হয়। তাদের ছাড়া থাকতে পারে না। তা ভিন্ন যারা আসে তাতে প্রাণে অশান্তি হয়। তারা এসে বসলেই তাদের জিনিষ এসে লাগে। নেব, বা নেব না বললেও হবে না, আপনি এসে ঘাড়ে চাপে। পবিত্র ভাব এলে মনে আনন্দ দেয়, আর কতক মনকে চঞ্চল করে দেয়।

শ্রীম। আপনি একটি মায়ের নাম শোনান।

ঠাকুর গান ধরিলেন :—

কে গো তুমি বল না।
(ও মা, কে মা তুমি বল না)
তুমি আমাতে থাকিয়ে,
(কে মা তুমি বল না আমায়)
আমারে লইয়ে, করিতেছ কত খেলনা ॥
ভক্তিভাবে ডাকি যে সময়,
অপরূপ রূপে এসে দেখা দাও আমায় ;
আবার, রূপ চলে যায়, আমাতে মিশায়,
কে করে কার ঠিকানা ॥
ভেবে ভেবে ভাবা হল সার,
যত ভাবি ততই বাড়ে, কুড়িয়ে আনা দায় ;
এখন, যার মন তার কাছে রেখে
তাড়িয়ে দি'ছি ভাবনা ॥

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন। খুব আনন্দিত হইয়াছেন। বারবার অস্ফুট 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন। সকলের দিকে বারবার তাকাইতেছেন। কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালীবাবু। তিনি যতক্ষণ না আকর্ষণ করেন, ততক্ষণ কি ভক্ত হওয়া যায় ?

ঠাকুর। তাঁর আকর্ষণেই ইচ্ছা আসে। সে রকম বৃত্তি ওঠে। তাঁর দিকে মন যায়, বিশ্বাস আসে।

কালীবাবু। অবিশ্বাস, বিচারও ত আসে।

ঠাকুর। সে জীববুদ্ধির স্বভাব। যতক্ষণ জীবত্ব, ততক্ষণ বিচার-বুদ্ধি যাবে না।

কালীবাবু। তিনি না তুলে নিলে কি যায় ?

ঠাকুর। তিনিই ত সব করছেন। সে রকম বুদ্ধি ঠেলে দিচ্ছেন। গীতায় বলেছেন "লুকায়িত থাকি জীবের বুদ্ধি বৃত্তি পরে"। 'জীবের বুদ্ধি বৃত্তিতে আমিই থাকি।' যে বুদ্ধি তুলে দেন, সে রকমই কাজ হয়।

কালীবাবু। তিনি জীবত্ব বুদ্ধি কেন দিলেন?

ঠাকুর। জীব থাক, তাতে ক্ষতি নেই। জীবের মধ্যে ভালমন্দ, দুইই আছে। পরমহংসদেব বলেছেন না, পুলী সব দেখতে এক রকম কিন্তু ভেতরে তফাৎ আছে। কারও ভেতর ক্ষীরের পোর, কারও ভেতর নারকলের পোর, কারও বা কলাইএর পোর। জীব থাক, জীবের রকম আছে। জীব থেকে শিব হওয়া ত সোজা কথা নয়। জীব-ধর্ম্ম থাকতে সংশয়-বুদ্ধি যাবে না। খুব মন যদি তাঁতে মজে, তবে যেতে পারে।

কালীবাবু। মজাবার কর্ত্তাও ত তিনি।

ঠাকুর। সবই তিনি, এটা ঠিক্ জানলে ত সংশয় থাকবে না। তখন ত কোন চিন্তাই নেই। তখন বলছেন,—

ভবসাগরে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা॥

তখন যাঁরি জোয়ার, তাঁরি ভাটা, সবই তাঁর। আমার চিন্তা কেন? সবতাতে তাঁর উপলব্ধি হয়, স্থির বিশ্বাস থাকা চাই। এর একটি গল্প আছে। রাজকন্যা ও সিদ্ধগুরুর গল্প বলিলেন। (৭১ পৃষ্ঠা)।

আবার বলিতেছেন।

সব তিনি এ বোধ ঠিক্ ঠিক্ এলে চিন্তাশূন্য অবস্থা হবে। তখন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গবী হস্তিনী, বিষ্ঠা চন্দন, সবতাতে সমজ্ঞান। তখন, 'ত্রিজগৎ মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তা জান না?' যতক্ষণ তা না হয় সব ভাবা। যদি জানি মা-ই সব করছেন, তবে কি ভাবনা থাকে? তা প্রথমই হয় না।

রামপ্রসাদেরই দিয়েছে। প্রথম অবস্থায় তিনি বলছেন:—

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাই মা গেঁটে।
আমি দিন মজুরি নিত্য করি পঞ্চভূতে খায় মা বেটে॥

পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশ ইন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারুর কথা কেউ শোনে না, দিন ত আমার গেল কেটে॥

দেখছেন, তাঁর নাম করছেন, তবু অপর জিনিষ মন কেড়ে কেড়ে নিচ্ছে। বাসনা-কামনা উঠছে। মন সব তাঁতে দিতে পারছেন না। পরমহংসদেবের কথা আছে না, আলে যদি ছ্যাঁদা থাকে তুমি জল সেঁচে কি করবে? সারাদিন জল সেঁচবে আর সন্ধ্যাবেলা দেখবে সব ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তেমনি, প্রথম অবস্থায় সংশয়-বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি রয়েছে। বেশ যাচ্ছে; আবার রিপুরা জোর ক'রে অপর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'বলাদিব নিয়োজিত।' তখন বলছেন,—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নেই শঙ্করী হেথা।

ভয় এসেছে, 'জগতে আর কে আছে? কি করি?' তারপর সাধন করতে করতে যেই বোধ আসে, রিপুগণ অধীন হয়, তখন আর ভয় নাই। বলছেন,—

ওরে ভ্রান্ত, একান্ত তুই হলি রে মাতৃহীন বালকের মত,
ওরে মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।

তখন নির্ভীক অবস্থা, জানে মা আছেন, আর ভয় নাই। কবীরের কথা আছে—"যেখানে ভয় আছে সেখানে ভগবান্ নাই; যেখানে ভগবান্ আছেন সেখানে ভয় নাই।" আমার ব্রহ্মময়ী মা আছেন। মা আছেন যদি জানে তবে ভয় কি? সবতাতেই আনন্দ, সবই তাঁর দান।

শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু মানাপমান বর্জ্জিতম্।

শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সব অবস্থায় স্থির আনন্দ। দুঃখও যে মার দেওয়া। মাকে ভালবাসি ত মার বাক্সে হীরা, সোণা, রূপা, কাচ যা আছে সব নেব। হীরেটির বেলা আনন্দ, কাচটির বেলা নেই,

সে ত স্বার্থের জন্যে। দুঃখকে দুঃখ বলে ভাববে কেন? এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল নিহিত আছে।

গীতাতে আছে, মৃত্তিকা, পাষাণ, স্বর্ণে সমজ্ঞান হয়। মন একস্তরে গেলে মৃত্তিকা পাষাণ স্বর্ণ সবই এক। এক 'খ' রূপী নিরঞ্জন। আর এক অবস্থা আছে, সবই বোধ আছে কিন্তু প্রয়োজন নেই; তাতে মনও নেই। মাটী কি তাও জানি, পাথর কি তাও জানি, সোণা কি তাও জানি—মাটীতে কি হয় জানি, পাথরে কি হয় তাও জানি, সোণায় কি হয় তাও জানি। কিন্তু এ তিনেরই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হিসাবে না দাম হয়? দেখ, সোণা এত যত্ন ক'রে বাক্সে তুলে রাখে; আবার বাড়ী তৈরী করতে হলে তা দিয়ে ইট কিনছে। প্রয়োজন অনুসারে মাটীর আদর সোণার চেয়ে বেশী হ'ল। যার তিনেরই প্রয়োজন নেই, তার এ তিনের সঙ্গে সম্বন্ধই নেই। অথচ জানে এরা কি।

কালীবাবু। সে সব অবস্থা গুরুর আশীর্ব্বাদ ছাড়া হয় না।

ঠাকুর। সে ঠিক; **গুরুতে বিশ্বাস রাখলে সব হয়। বাছুর ধ'রে টানলে গাই আপনি আসে। গুরুতে বিশ্বাস রাখলে তাঁতেই রাখা হ'ল।**

ঠাকুর শ্রীমকে বলিতেছেন—বালিশ দেওয়াব? বসতে কষ্ট হ'চ্ছে?

শ্রীম। না, বেশ বসেছি।

ঠাকুর। দেখ, সংসারীদের পক্ষে গুরুতে বিশ্বাসই প্রধান। সাধন ভজন ক'রে তাঁর দিকে গতি করা বড় কঠিন। চারিদিকে মন থাকতে ঠিক্ ঠিক্ নীতিপদ্ধতি নিয়ে চলা শক্ত। এজন্য কিছু সময় সাধুসঙ্গ করতে হয়। সঙ্গে কর্ম্মক্ষয় হয়। মন সে দিকে যায়। পরমহংসদেব বলতেন, ভিজে কাঠ উনুন-পাড়ে রাখলে জল মরে যায়। তখন অল্পেতেই ধরে। এজন্য সদ্‌গুরু সঙ্গ।

শাস্ত্রে চার প্রকারের উপাসনা দিয়েছে। এক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। শুনবে, মনে চিন্তা করবে, অভ্যাসের দ্বারা চিত্তস্থির করবে। শুনবে কার কাছে ? যার শাস্ত্রে উপলব্ধি হয়েছে ! যার বিবেক বৈরাগ্য আছে। তার কাছে শুনলে কাজ হবে। ছেলে মরেছে, কাঁদছে ; তার কাছে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কি করলে পুত্রশোক লাগে না,' সে তার কি উপদেশ দেবে ? সে নিজেই কাঁদছে। তার উপদেশের কোন দাম নাই।

এর একটি গল্প আছে। এক ভাগবতের পণ্ডিত এক রাজার কাছে ভাগবত শোনাতে গিয়েছিল। গিয়ে বললে, "আমি ভাগবতের বড় পণ্ডিত। আমার ভাগবত শুনে সব জায়গায় সুখ্যাত করেছে। মহারাজ, আমি আপনাকে কিছু ভাগবত শোনাব।" রাজা বললেন, "পণ্ডিতজী, আর একটু পড়ে আসুন।" শুনে পণ্ডিতটি ভাবলে, "আচ্ছা মুখ্যু রাজা ত ! আগে আমার ভাগবত শুনুক। শুনে যদি ভাল না লাগে তখন বলুক, 'পড়ে এস'। না শুনেই বলে, 'প'ড়ে এস'।" কি আর করে। ফিরে গেল।

কিছুদিন পরে ফের অর্থচিন্তা, অর্থের অভাব। আবার রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বলছে, "মহারাজ, এইবার আপনাকে ভাগবত শোনাব।" রাজা সেবারও বললেন, "পণ্ডিতজী, আর একটু পড়ে আসুন।" পণ্ডিত ভাবলে, "আচ্ছা রাজা ত ! এক কথা বারবার বলছে কেন ?" এক সাধুর কাছে গেল। গিয়ে তাঁকে সব কথা বললে। সাধু বললেন, "রাজা ঠিক্ বলেছে। রাজার ত অন্যায় হয়নি। ভাগবত পড়ে যদি তোমার অভাব গেল না, অর্থের জন্যে রাজার কাছে দৌড়তে হ'ল, তবে রাজা ত তার ওপরে বসে আছে। সে ভাগবত শুনে রাজা কি করবে ? তাই বলেছে, 'পণ্ডিতজী, তুমি এখনও ভাগবত পড়নি।' ভাগবত উপলব্ধি করতে পারলে অভাব থাকে না। তখন রাজার কাছে অর্থের জন্য ছুটতে হয় না। ভাগবতের প্রথম পাতা

পড়ে বেশ ক'রে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। বুঝতে পারবে ভাগবত কি? ভাগবত তোমার একটা অবস্থা, পাঠ্যপুস্তক নয়।"

তখন পণ্ডিত ভাগবতের প্রথম পাতা খুলে যেমন চিন্তা করেছে, সাধুসঙ্গে একটা শক্তি এসেছে, আর মন স্থির হ'য়ে ঠিক্ ঠিক্ ভাগবত চিন্তা করতেই, ভাব এসেছে, কাঁদছে। দ্বিতীয় পাতা খোলার অবসর নাই। কিছুদিন যায়। রাজা একদিন বললেন, "কই সেই পণ্ডিতটি ত আর এল না। দেখ ত কোথায় গেল।" দেখে যে পণ্ডিত একস্থানে বসে আছে, ভাগবতের প্রথম পাতা খোলা, কেবল কাঁদছে। এই শুনে রাজা বললেন, "এইবার আমি যাব।" পণ্ডিতের কাছে এসে বললেন, "পণ্ডিতজী, এইবার আমায় ভাগবত শোনান।" পণ্ডিত বললে, "মহারাজ, আমার ভাগবত শোনাবার আর আবশ্যক নেই, আমার অভাব ঘুচে গেছে।"

আর এক আছে **অনাত্মাবাদ**। দোষ অনুসন্ধান করে ত্যাগ করা। অনিত্য যা, তা বাদ দেওয়া। দোষ গেলে গুণ থাকল। অনিত্য গেলে নিত্যই রইল। এখন কোন্‌টা দোষ কোন্‌টা গুণ কি ক'রে ধরবে? অন্ধকার ঘরে কোন্‌টা ভাল ছবি কোন্‌টা মন্দ ছবি বাছবে কি ক'রে? আলো চাই। "জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে ঘরে ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখনা।" আলো না জ্বাললে ত তা হবে না।

আবার দেখ, জেনেও করবার যো নেই। অর্জ্জুন বলছেন, "এসব ত জানি, তবুও কেন করি? কোন্ পুরুষ বলে ধরে নিয়ে যায়?" ভগবান্ বলছেন, "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। অর্জ্জুন, এসব কাম-ক্রোধের কাজ।, রজোগুণে কাম, কামনা অপূরণে ক্রোধ। এদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।" ভাল কথা ত মনে করলেই জানা যায়। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু সমাজে দুটো একটা ভাল কথা কার জানা নেই? কিন্তু করে ক'জনা?

তুলসীদাসের কথা আছে,—

সত্য বচন, দীন ভাব, পরধন উদাস।
ইসমে নহি হরি মিলে তো জামীন তুলসীদাস॥

তা দেখ, **সত্য কথা** বলা উচিত সবাই জানে। ছোটবেলাই মাষ্টার পড়াচ্ছে—'সদা সত্য কথা বলো', আর ছাত্রের সামনেই মিথ্যা কথা বলছে। বাপ ছেলেকে শেখাচ্ছে—'সত্য কথা বলো', তা ছেলের সামনেই দু'শ'গণ্ডা মিথ্যা কথা বলছে। না হয় একটু পরেই বল, না তখনই বলছে। সত্য কথা কি ক'রে হবে? বাসনা থাকতে অভাব যায় না, অভাব থাকতে ভয় যাবেনা, ভয় থাকতে কখনও সত্য কথা বেরবে না। আর **দীন ভাব,** প্রণাম করলেই দীন ভাব হয় না। অনেকে আছে, প্রণাম না করলেও খুব ভক্তি করে। আবার কেরাণী বাবুরা আপিসে সাহেবকে সেলাম ঠোকে, বাইরে এসে কত কথা বলে। তা দীন ভাব মানে হ'চ্ছে মনের নম্রতা। অহঙ্কার থাকতে সে হবে না। আর **পর-ধন উদাস** মানে, আসক্তি আর লোভকে জয় করতে হবে; তা'হলে পরধনে উদাসীন থাকতে পারবে। রিপুর ধর্ম্মে উদাসীন থাকা চাই। দুটো ধর্ম্ম আছে, স্ব-ধর্ম্ম আর পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম হ'চ্ছে আত্মার ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম হ'চ্ছে রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নিতে হবে। তুলসীদাস ত সহজ কথা বলে দিয়েছেন। অথচ এর মধ্যে মস্ত কথা রয়েছে; কাজে করা ভয়ানক শক্ত।

আর না হয় তাঁর **শরণাগত হও।** দুর্ব্বল রোগী, ডাক্তারের শরণাগত হও। তাঁর শক্তিতে কাজ হবে। শরণাগতই বা কি ক'রে হবে? কোন্ মন নিয়ে শরণাগত হবে? ভাষা বললে ত হবে না। দেহ, স্ত্রী, ছেলে, মেয়েই যে সব মন দখল ক'রে বসে আছে। তাঁর শরণাগত হবে কি নিয়ে?

তাই দিয়েছেন, যদি তাও না পার তবে সঙ্গ কর। **সাধু, সদ্-গুরুর সঙ্গ কর।** তাঁদের শক্তি কাজ করবে, ভিজে কাঠ

উনুন-পাড়ে রাখলে জল আপনিই মরে যায়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সাধু-সঙ্গে গেলেই কাজ হবে। ভিজা কাপড় পরে ইচ্ছা থাক বা না থাক যদি আগুনের ধারে যাও তবে কাপড় শুকুবেই। আগুনের তাতএ আপনি কাজ হবে।

তবে কতক আছে, পূর্ব্ব সুকৃতিতে সৎদিকেই তাদের মতি। সংসারে মন তত থাকে না। তাদের ওপর স্বতঃই তাঁর দয়া হয়। আর কতক বদ্ধ সংসারী ; ছেলে-পরিবার নিয়ে মজে আছে। সংসার ঘেঁটে ঘেঁটে মন নীচু হ'য়ে গেছে। তারা সৎস্থানে, সৎসঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। সংসারই তাদের প্রিয়। সে সব ছেড়ে গেলে মন হাঁস ফাঁস করে। তারা গু মাখতেই ভালবাসে, চন্দনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আর ওদের চন্দনই প্রিয়। হয় ত ভ্রান্তি হ'তে পারে ; গু মেখে ফেলতে পারে। কিন্তু পরেই ভয়ানক কষ্ট হয়। ওর ভেতর বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। দেখ, মায়ার আকর্ষণ বড় ভয়ানক। চণ্ডীতেই বলেছে—মায়াবলে সব আকর্ষণ করছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম এখন উঠিবেন। ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, এঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, কত সৌভাগ্য। তাঁর ভালবাসা, তাঁর চিন্তা যাঁর মধ্যে আছে, তাঁকে দেখলে আনন্দ হয়। তিনি যে স্থানে আসেন সে স্থান পবিত্র হ'য়ে যায়।

শ্রীম। কাল সকালে একবার ওখানে (গদাধর আশ্রমে) যাবেন।

শ্রীম এবং ললিত মহারাজ প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল।"

তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উকীল বেচারাম লাহিড়ী কিছুক্ষণ আগে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

উকীল। মা ত আছেন শুনি। তাঁর উপলব্ধি কই হয়?

ঠাকুর। মার কাছে যেতে হবে, তবে ত মার উপলব্ধি হবে।

ঋিএর কাছে গেলে মার উপলব্ধি হবে কি ক'রে ? যাবার চেষ্টা করতে হবে ; সাধন করতে হবে।

উকীল। সে ত করতে হবে। তবে পেরে ত ওঠা যায় না।

ঠাকুর। আগেই ত পারে না। গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি চাই। তিনি যে সব নীতি দেন, সে অনুযায়ী চলতে চলতে তবে শক্তি বাড়ে। তা নইলে হবে কেন ? মুখে 'মা' বললুম, আর বিষয়েতেই ভুলে আছি, তাতে কি হবে ? যত তাঁর বোধ আসবে তত ভাবনা কমবে। গিন্নী যখন ঘরে আছে, তখন ঘরে কি আছে না আছে আমার দেখার দরকার নেই। তা নয় ; আমিই গিন্নী হ'য়ে বসেছি। তবেই ভাবনা হবে। বিষয়ে মন আবিষ্ট থাকলে কি ক'রে বিষ্টু-চিন্তা করবে ? তাই গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি রেখে তাঁর কথানুযায়ী চলতে হয়। তবে ক্রমে অবস্থা আসে।

আর নয় দেখছি, বাসনা, কামনা, রিপুরা কষ্ট দিচ্ছে, এদের মেরে ফেলব। এদের নাশ ক'রে তবে অন্য কাজ করব। নয় ত গুরুতে বিশ্বাস কর। আপনি কাজ হবে। কবীরের কথা আছে, 'গুরুতে বিশ্বাস কর, প্রাণ-মন সমর্পণ কর, তবে সর্ব্বদা অমর-লোকে বাস করবে। আমি গুরুতে বিশ্বাস রেখেছি, প্রাণ-মন সমর্পণ করেছি, তাই সর্ব্বদা অমর-লোকে বাস করছি।' ঠিক্ ঠিক্ গুরুতে ভক্তি হওয়া চাই। ও রকম বিশ্বাসে হবে না। সে এক গল্প আছে।

এই বলিয়া ঠাকুর ছিটের ব্যবসায়ী এবং তার গুরুর গল্প (৬৪ পৃষ্ঠা) বলিলেন। আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। তাঁতে বিশ্বাস শুধু ভাষা নয়। প্রাণের টান, আকর্ষণ দেখলে বোঝা যায়। তার ভাবই আলাদা। ভাষায় কি হবে ? ভাষা ত গ্রামোফোনেও বার করতে পারে। সে প্রাণের টান এলে গুরুতে বিশ্বাস আপনি হ'য়ে যায়। সর্ব্বদা গুরুর শক্তি তাকে রক্ষা করে, তা যেখানেই থাক। গুরুর একটু ভালমন্দে তার প্রাণ কাঁদে। সংসার আছে, কি করে ; তবু সে সব ছেড়ে দৌড়ুচ্ছে। আর এক আছে সংসারে ছেলে-

পরিবার নিয়ে বেশ আছে, ভুলেও গুরুর দিক মাড়াবে না। যখন কোন বিপদ এল, অমনি ছুটে আসে। এ হ'চ্ছে বেনিয়া বুদ্ধি, ব্যবসায়ী বুদ্ধি। ছেলে বিদেশে থাকলে তার যদি কোন বিপদ হয় তখন সংসার জ্ঞান থাকে না, সব ফেলেই দৌড়ুচ্ছে। এই হ'ল ভালবাসার টান। বিপদে পড়েছি, যেতে হবে, এ ত ভালবাসা নয়।

গুরুতে ভালবাসা বিশ্বাস রক্ষা করবে। তা হ'লে বিপদে তাঁর কাছে যেতে হবে না। **তিনি দূরে থাকলেও তাঁর শক্তি রক্ষা করবে।** তাঁকে জানাতে হবে কেন? ছেলে না জানালেও বাপ সর্ব্বদাই তার মঙ্গল চেষ্টা করেন। গুরু সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল চিন্তা করেন। **তিনি সর্ব্বদা তোমার কাছে।** তোমার অবস্থা তোমার চেয়েও বেশী বোঝেন। তুমি কি জানবে? তাঁতে ভক্তি বিশ্বাস রাখলে সব আপনি হবে।

উকীল। বিনা ভোগেও কি প্রারব্ধ যায়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে যায়। তাই অর্জ্জুনকে বলছেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার শরাণাগত হও। আমি তোমায় পাপ থেকে মুক্ত করব।" তাঁর নামে সব কেটে যায়।

তারা নামে পাপ কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা,
অনলে তৃণ যথা হয় ভস্ম রাশি রাশি।

উকীল। তাঁকে ডাকতে ত হবে, সেও ত হয় না।

ঠাকুর। কিছুই করবে না, কি ক'রে হবে? ঘরে বসে 'টাকা আসুক টাকা আসুক', করলেই কি টাকা পাওয়া যায়?

উকীল। ইচ্ছা করলেও ত হয় না।

ঠাকুর। ইচ্ছা করলে হয় না—এ কি হয়? সে চেষ্টা কই? দেখ তাঁকে মন কতটুকু দিচ্ছ। যা দাও ভয়ে বা দুঃখে। সেদিকে চেষ্টা বুদ্ধি নেই তাই দাওনি। সংসারের বেলা ত বেশ করছ। তাঁর বেলা তুলে নিচ্ছ।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তেরাও ধ্যান করিতেছেন। নানা কথা হইতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন,—

সংসার ভয়ানক জায়গা, **লোহা পেটার স্থান**। লোহা পেটার ওপর লোহা পেটা। রামপ্রসাদ বলেছেন,—

সংসারে আনিয়ে মাগো, করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু তোরে ছাড়িনি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের বেটা।
মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার, এর মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥

কিছুক্ষণ পরে কথায় ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। সাধুদের একটা অবস্থা হয় যখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কইতে পারে না। অপর কথা ভাল লাগে না। পরে সেটা যায়। সব সমন্বয় হয়; তখন বাক্য ব্রহ্ম। পরমহংসদেব একদিন মুখ খারাপ কথা কইলেন। ওতে লজ্জা আসে তাই সেটা করতে হবে। 'সবই ত তুমি? তবে ওটাকে কেন লজ্জা করব?'

অনেক রাত হইল। ৯॥টায় অনেকেই উঠিলেন। ১০টায় আরতি হইলে ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—সপ্তদশ অধ্যায়।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১৩ই মে, ১৯২৬ ইং ;
বৃহস্পতিবার, শুক্লা-দ্বিতীয়া।

কলিকাতা।

প্রাতে—গদাধর আশ্রমে ঠাকুর ; 'শ্রীম' ও ললিত মহারাজের সঙ্গে কথা।

পরমহংসদেবের কথা—ব্যকুল হ'য়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়—তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে কথা—সব ধর্ম্মেই ঠিক্ ঠিক্ গতি করলে ভগবান পাওয়া যায়—শাস্ত্রপাঠ—রাজা ও শ্লোক-পাঠক পণ্ডিতদ্বয়ের গল্প—হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম।

বৈকালে, মঠে—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষের সঙ্গে কথা।

সংসার ও তাতে আসক্তি—সুরথ রাজার কথা—পরোপকারার্থ সদনুষ্ঠান সংসারীর কর্ত্তব্য—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ—সংসারের দুই নীতি, সৎ ও অসৎ—অর্থে অনর্থ—রাজা, পরামাণিক ও যক্ষের ধনের গল্প—সুখ, দুঃখ ও সঙ্কল্প, বিকল্প—পরোপকার—পশুবুদ্ধি, মানববুদ্ধি, দেববুদ্ধি ও ব্রহ্মবুদ্ধি—কর্ত্তব্য—প্রেম ও দয়া—আত্মবিকাশ, বিশ্বপ্রেম ও পরোপকার—পাত্রভেদে ভালবাসায় বিভিন্ন নাম—সেবা—ঈশ্বরের দোষ ও নিষ্ঠুরতা—দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনাদি—ঈশ্বর দয়াল, ভয়াল, দুইই—দেশসেবা ও পাড়াগাঁর কৃষক।

আজ ঠাকু'রর গদাধর আশ্রমে যাইবার কথা। তাই গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় সেখানে যাইতেছেন। সঙ্গে ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, সত্যেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন, তারক আছে। মা, দিদি, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ভালবাসা দিদি আছেন। ললিত মহারাজ ঠাকুরকে উপরে পূজার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে মাষ্টার মহাশয় আগে থেকেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুরকে, মাকে এবং ভক্তদের সকলকে বসিবার আসন দেওয়া হইল। ঘরটী বেশ সুন্দর। বেদীর

উপর আসনে পরমহংসদেবের ছবি আছে ; নীচে শ্রীশ্রী মায়ের ছবি। দক্ষিণ পার্শ্বে স্বামিজীর বড় তৈল-চিত্র। বাম পার্শ্বে পরমহংসদেবের তৈল-চিত্র আছে। দেওয়ালে পরমহংসদেবের ভক্তদের ছবি আছে।

ঠাকুর ও মাষ্টার মহাশয়ের মিলনের অনুপম ভাব-গাম্ভীর্য্যই চিত্তা-কর্ষক। কয়েকটী কথার পরে ঠাকুর গান করিলেন।

সাধে কিগো তারা তোরে, আমি 'মা, মা' বলে ডাকি।
যে আনন্দ তোর নামে মা অন্যেকে তা বোঝাব কি॥
যখন তুমি মা আর আমি ছেলে,
ডাকি তোরে 'মা, মা' বলে ;
(আবার) দু'এতে এক হ'য়ে গেলে, আমাতেই মা তোমায় দেখি॥
(ও মা) যেদিকে ফেরাই আঁখি,
সকলই তোর রূপ দেখি ;
তোমা ছাড়া জানিনা মা,
(তোমা ছাড়া ভাবিনা মা), তোমাতেই মা সদাই থাকি॥
দীন বলে তোমার লীলা,
বুঝাতে যাওয়া বিষম জ্বালা ;
তুমি যারে বোঝাও সেই ত বোঝে মা,
(যারে জানাও সেই ত জানে মা), নয় ত সকলই ফাঁকি॥

গানের পরে কথা হইতেছে।

মাষ্টার মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা পরমহংসদেবের কথা। তাঁহার বড় কোমল মিষ্ট স্বর। তাঁহার মুখে পরমহংসদেবের কথা শুনিতে বড়ই ভাল লাগে।

তিনি বলিতেছেন,—ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, সচ্চিদানন্দ-প্রেম নিয়ে থাক। অপনি সচ্চিদানন্দ-প্রেম নিয়ে সর্ব্বদা আছেন। আপনাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়।

মাষ্টার মহাশয় ভক্তদের ছবি দেখাইয়া পরিচয় দিতেছেন।

ঠাকুর। আমার হরি মহারাজ, লাটু মহারাজ, ভূপতি মহারাজ আর রাখাল মহারাজের সঙ্গে আলাপ ছিল।

শ্রীম। তিনি রাখালকে খুব ভালবাসতেন। ভক্তরা সব আনা-গোনা করত। তিনি বলতেন, "আনাগোনা করলেই কাজ হবে।" তাঁকে কেউ সাধু বলে যেত, কেউ বা অবতার বলত, কেউ আবার সাধারণ লোক ভাবত। তিনি বলতেন, "অবতার জানুক আর নাই জানুক, এলেই কাজ হবে। লঙ্কা জেনে খাক আর না জেনে খাক, ঝাল মুখে লাগবেই। আমি দেখি আমাকে মিষ্টি লাগছে কি না, আসছে কি না।" আবার না আসলে কাঁদতেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ; ভালবাসা হলেই টান থাকবে; বিচ্ছেদে কষ্ট আসবে। এ ত যা তা নয়, আত্মযোগ।

শ্রীম। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, "ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। যারা আন্তরিক ভগবানকে ডাকবে তাদের এখানে আসতেই হবে।" (আসনে পরমহংসদেবের ছবি দেখাইয়া বলিতেছেন) এটী সমাধির ছবি। বলতেন, "এ ছবি ঘরে ঘরে পূজো হবে।" তা এখন হ'চ্ছে। ভারতবর্ষে ত হ'চ্ছেই। পৃথিবীর অপরাপর অনেক দেশেই হ'চ্ছে। আমি একদিন শুনলাম, এক মুদি তাঁর ছবি পূজো করছে। দেখতে ইচ্ছা হ'ল, কে ভক্ত তাঁর পূজো করছে, দেখে আসি। দেখলাম, বেশ পূজো হ'চ্ছে। তিনি বলতেন, "তোদের কিছু করতে হবে না, এখানে এলেই কাজ হবে।"

ঠাকুর। হ্যাঁ, সঙ্গেই কাজ হয়; যেমন সঙ্গ করে সে রকম প্রকৃতি হয়। সত্বগুণীরসঙ্গ করলে সত্বগুণ বাড়ে, রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ, তমোগুণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়ে।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, সব ধর্ম্মেই তাঁকে পাওয়া যায়। শাস্ত্রেও আছে; কিন্তু তিনিই সেটা জোর দিয়ে বলে গেলেন।

ঠাকুর। দেখুন, শাস্ত্র ক'জন বোঝে? তার ঠিক্ ঠিক্ অর্থ ক'জন ধরতে পারে? এর একটি গল্প আছে।

একজন পণ্ডিত একদিন রাজবাড়ী চলেছেন কিছু পাবার আশায়। তা ভাবলেন, এমনই যাব। একটি শ্লোক লিখে নিই। এই ভেবে

একটা কাগজে একটি শ্লোক লিখে নিয়ে গেলেন। রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে সেটা পাঠ ক'রে শোনালেন। রাজা পাঁচটা টাকা দিলেন, খুসী হ'য়ে চলে এলেন। পথে এসে ভাবলেন, 'এতে আর কি হবে? কাজ ত হয়ে গেল।' এই ভেবে কাগজখানা ফেলে দিলেন।

আর একজন পণ্ডিত সেই রাজার কাছে যাচ্ছিলেন। ভাবলেন, এমনি যাচ্ছি, একটা শ্লোক নিয়ে গেলেই ভাল হয়। এমন সময় সেই কাগজটা দেখতে পেলেন। কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন, একটি সুন্দর শ্লোক। ভাবলেন, 'বাঃ! এ ত বেশ শ্লোক; এটা নিয়েই যাওয়া যাক; আবার কে লেখে।' এ পণ্ডিতটী দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমার কাগজটাই ত কুড়িয়ে নিলে; পণ্ডিত বলে মনে হ'চ্ছে। বোধ হয় রাজবাড়ী যাচ্ছে। আচ্ছা দেখি, রাজা একে কত দেন। দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখেন, সেই পণ্ডিতটী আসছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?" তিনি বললেন, "রাজবাড়ী ভিক্ষা করতে গিয়েছিলুম।" "তা শ্লোক ট্লোক কিছু নিয়ে গিয়েছিলে?" "হ্যাঁ, এখানে এই শ্লোকটি পেয়েছিলুম, এটা নিয়েই গিয়েছিলুম।" তিনি কাগজটা নিয়ে দেখলেন তাঁরি শ্লোক। জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজা তোমায় কত দিলেন?" তিনি বললেন, "পঞ্চাশ টাকা।" পণ্ডিতটী বললেন, "আচ্ছা মুখ্যু রাজা ত! আমি শ্লোক লিখলাম, আমায় দিলে পাঁচ টাকা। আর তুমি আমারই পড়া শ্লোক নিয়ে শোনালে, আর তোমায় দিলে পঞ্চাশ টাকা। এ ত আচ্ছা বোকা রাজা। চল দেখি।"

দু'জনে গেলেন। গিয়ে রাজাকে বললেন, "দেখুন, আমি শ্লোক তৈরী করলাম, আমায় দিলেন পাঁচ টাকা; আর ইনি আমারই শ্লোক নিয়ে এলেন, এঁকে দিলেন পঞ্চাশ টাকা?" রাজা বললেন, "আচ্ছা, তোমার শ্লোক তুমি পড় দেখি।" পড়া হ'লে বললেন, "আচ্ছা, ব্যাখ্যা কর।" ব্যাখ্যা করলেন। রাজা বললেন, "হ'ল? আর কিছু নেই ত?" "না, এর আর কি আছে।" "আচ্ছা, এঁকে দাও।" সে পণ্ডিতটী সেই শ্লোক

পড়ে তার নানান ভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সবাই শুনে মুগ্ধ হ'ল। পণ্ডিতও বললেন, "ও বাবা! আমার শ্লোকের এত অর্থ আছে! এ ত আমি জানতাম না। তা এই পাঁচ টাকাও তুমি নাও।" এই বলে তাকে সে পাঁচ টাকাও দিয়ে দিলেন।

তা দেখুন, সব জিনিষের ভেতর বোঝা বড় কঠিন।

শ্রীম। সে ঠিক্; এসব বুঝলে ত এখন যে হিন্দু-মুসলমানে গোলমাল হ'চ্ছে, তা হ'ত না। সবেতেই ত তিনি আছেন।

ঠাকুর। এ ত আর কিছু নয়, প্রকৃতি নিয়ে বিবাদ। ধর্ম্ম ত নয়, এ সব গোঁড়ামি। তাদেরও ত আছে, সাধনা করতে হবে। মহম্মদের আয়েষা নামে স্ত্রী ছিলেন। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ত ঈশ্বরের পুত্র, তোমার আবার সাধনা কেন?" মহম্মদ বলছেন, "তাঁর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। আমি তাঁর পুত্র হ'লেও তাঁর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে আমারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। তাই সাধনা চাই।" এসব নিয়ে গৌহাটীতে কয়েকজন মুসলমান ভক্তের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তারা তাদের উপাসনা সম্বন্ধে আমায় বললে। * তাদের উপাসনা অতি সুন্দর। আমাদেরও সে রকম আছে। তবে মনে অনেক শক্তি হওয়া চাই। নয় ত সে অনুযায়ী চলা কঠিন। মূলে ত এক। যার যার ভাবে যায়।

শ্রীম। হ্যাঁ; কেউ ভক্তি, কেউ জ্ঞান, যার যা ভাব। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "সব পথে গিয়ে দেখেছি, কিন্তু ভক্তির মত জিনিষ নেই।"

আবার ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

শ্রীম। তিনি বলতেন, "এরা আমায় ভালবেসে আসে। আমার ঐশ্বর্য্য নেই তবু আসে। আমায় কত ভালবাসে।" শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "আমার যখন কিছুই ছিল না, ঐশ্বর্য্য ছিল না' তখন তারা আমায় কত ভালবেসেছে। এখন নানান

* ২২৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর।

দণ্ডায়মান—সোমদেব, ৺পচু, কালু, বারি, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদা, কানাই, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মৃত্যুন, সত্যবিজয় ঘোষাল, মনোরঞ্জন।

আসীন—গোকুল, জিতেন, বিনয়, পচু, পুত্তু, কুঞ্জ, ধীরেন।

আসীন—হরিমোহন, শশী, ডাক্তার সাহেব, বিজয়, অশোক, কালীবাবু, রাজেন, ললিত, শ্যাম।

কাজে আমি তাদের দেখতে যেতে পাচ্ছি না। তুমি যাও, তাদের দেখে এস।"

ঠাকুর। আবার একটা অবস্থা হয়। ঐশ্বর্য্য থাকলেও তিনি ভোগ করতে দেন না।

পূজার প্রসাদ চরণামৃত ঠাকুরকে দেওয়া হইল; ভক্তরাও গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর উঠিলেন; সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকালে ৫টায় সত্যেনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, এম-এ, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

অরবিন্দ বাবু। জীবন ত শেষ হ'য়ে এল, ভগবানে ত মতি হ'ল না।

বলিতে বলিতে অরবিন্দ বাবুর চোখের জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুর। ভগবানে মতি হ'ল না বলে যদি চোখের জল পড়ে' সেই ত মতি হওয়া। তার চেয়ে আর কি আছে? সংসারে মজে থাকলে ত তাঁকে পাওয়া যায় না। সংসারে যত আসক্তি তিনি তত তফাৎ থাকেন। কারও শক্তি আছে, পদ্মপাতার মত, পাঁকাল মাছের মত, সংসার করতে পারে। পদ্মপাতা জলে থাকলেও জল লাগে না; পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে থাকে, গায়ে পাঁক লাগে না। তেমনি কেউ সংসারে থাকতে পারে, মায়া থাকে না। আবার কতক সংসারের ভয়ানক আকর্ষণে থাকে, তাতে ডুবে থাকে। ঠিক্ ঠিক্ কান্না এলে তবে ছেড়ে যায়; কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ আসা চাই।

অ-বাবু। ঠিক্ ঠিক্ কান্না কই? এ ত ক্ষণিক উচ্ছাস।

ঠাকুর। ঠিক্ আসা চাই। সংসারে আসক্তি দেখলেই বোঝা যায়, কি পরিমাণে ভগবানে আসক্তি আছে। যার তাঁতে প্রবল আসক্তি, তার কি সংসার থাকে? এ দাঁড়িপাল্লার মতন, একদিক ভারি হ'লে

অপর দিক উঠে যাবে। কামিনী, পুত্র নিয়ে যারা মজে আছে, তাদের তাঁর দিকে যাওয়া কঠিন।

অ-বাবু। আসক্তি বলছেন, সে ভগবান চূর্ণ করেছেন। স্ত্রী ছেলে সবার সঙ্গে এমন হ'য়ে গেছে, সে সবে আসক্তি অতটা নেই।

ঠাকুর। দেখ, মনের ভেতর থেকে আসক্তি যাওয়া আলাদা কথা। এমনি গোলমাল হ'ল, বাইরে তফাৎ থাকতে পারে। কিন্তু মন থেকে যাওয়া সে আলাদা। সুরথ রাজা যাদের ছোট থেকে মানুষ করলেন, যাদের এত স্নেহ ভালবাসা দিলেন, তারা যখন বড় হ'য়ে শত্রুতা করলে, তখন তাঁর মনে বিরক্তি এল; 'এই আত্মীয়তা, এই ভালবাসা! চির-কাল যাদের জন্য প্রাণপাত করলুম, তারা শেষে শত্রুতা করলে!' এই ভেবে বনে গেলেন। বনে গিয়েও সেই চিন্তা। সেই সব কথা মনে উঠছে। 'আহা, এরা যদি একটু ভাল ব্যবহার করত তবে থেকে যেতুম, কেন বুঝলে না।' এই সব ভাব উঠছে। তারপর ভাবছেন, 'আমার এ কি হ'ল! তাদের ছেড়ে বনে এলুম, বনেও তাদেরই চিন্তা! বুঝলুম এই সংসার, এই ভালবাসা, এ সব বুঝে ছেড়ে ছুড়ে বনে এসেও নিষ্কৃতি নেই! তাদের জন্যেই প্রাণ কাঁদে! এ কি হ'ল!' এই ভেবে মেধস আশ্রমে গেলেন। মেধস মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যাদের অত্যাচারে অসহ্য হ'য়ে, রাজত্ব ছেড়ে বনে এলুম, বনে এসেও তাদেরই চিন্তা। এ কেন হয়?" ঋষি বলিলেন, "এ মহামায়ার মায়া। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত মহামায়ার উপাসনা কর।" তিন বৎসর কঠোরতা নিয়ে তাঁর পূজা করলেন। তিনি প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলেন; বললেন, "বর নাও।" তা সংসার বাইরে ছেড়ে গেছে বটে, কিন্তু আসক্তি রয়েছে। তাই চেয়ে বসলেন—রাজ্য, ভোগ, সুখ। তা হ'ল; আবার স্বয়ম্ভু মনু হ'য়ে জন্মালেন। সুরথ রাজার সেই পূজা থেকে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা (বাসন্তী) পূজার প্রথা আরম্ভ হয়েচে। সংসারীরা তিন বৎসর পূজা না ক'রে তিন দিন করে।

এ ভয়ানক আকর্ষণ। তাদের প্রকৃতিগত ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে

মানুষ তফাৎ থাকে বটে, কিন্তু আন্তরিক সে সব লেগে থাকে। মনে হয়, যদি সদ্ব্যবহার করত তবে ছাড়তুম না। এত ভয়ানক জিনিষ! "রমণীবচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বটী।" যারা তাতে মজে আছে, তারা ভগবান মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে অপর জিনিষ। যদি মন থেকে যায় তবে ঠিক্ ঠিক্ ছাড়া হ'ল। তা ছাড়া হবে না। পরমহংসদেবকে একজনা বলেছিল, "আমি আর সংসারে থাকব না।" তিনি বললেন, কেন, তোমার বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

অ-বাবু। আমি কি তা ত জানি না।

ঠাকুর। নিজের মনকে ত ধরতে পার। কি চাচ্ছ, কোন্ জিনিষের অভাবে মনে কষ্ট হয়, তা ত বুঝতে পার। যদি বোঝ ছেলে, মেয়ে, পরিবার ভেতরে নেই, এরা থাকুক আর না থাকুক ক্ষতি নেই, এদের জন্য প্রাণ ব্যস্ত হ'চ্ছে না, ভগবানের জন্যেই ব্যস্ত হ'চ্ছে; তবে এরা মনে নেই। আর যদি এদের জন্যেই মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, তাঁর জন্য নয়, তবে ভগবান মনে নেই।

অ-বাবু। মানুষ নিকে ত বঞ্চনা করে। আমি কতটা করছি জানি না।

ঠাকুর। একে ত বঞ্চনা বলে না। অন্ধকার ঘরে দেখতে পাচ্ছ না, সেটা ত বঞ্চনা নয়। আলো আছে, দেখে যদি 'না' বল, তবেই হ'ল বঞ্চনা। বুঝতে পারছি কি অবস্থা, কিন্তু স্বীকার করব না; এ হ'ল বঞ্চনা। বুঝতে না পারলে বঞ্চনা হবে কেন?

অ-বাবু। এই যে বলে ভগবানের প্রিয়কার্য্য-সাধন, পরের উপকার করা; কেউ নিজের পরিবারের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পরের উপকার করলে, হাঁসপাতাল ইত্যাদি করলে।

ঠাকুর। হাঁসপাতাল করা টরা, এ সব ত সংসারীদের জন্য। যারা পরিবার, ছেলে, মেয়ে নিয়ে ভোগ করবে তাদের ত এসব চাই; নইলে ত পশু। পশু যেমন নিজের বাছুরটাকে দুধ দেয়, অপর একটা এলে গুঁতিয়ে তাড়ায়। যারা নিজের ছেলে, পরিবারের রোগে কষ্ট মনে

করে, চিকিৎসা করায়, তাদের ত পরের ব্যবস্থা করাই উচিত। আর তাঁকে যে ধরেছে, সে জানে 'আমিও যাঁর, ছেলে-পরিবারও তাঁর, যদি ব্যামো হয় তিনি দেখবেন। আমার কি শক্তি দেখি।' তাঁর ওপর যে আছে, তার হাঁসপাতালের দরকার নেই। সে জানে, তিনি দরকার হয়ত সব করবেন। তাকে দিয়ে যদি তিনি করিয়ে নেন, করতে পারে; নিজের ওপর রাখে না।

অ-বাবু। মানুষকে কোন কর্ম্ম করতে হবে ত?

ঠাকুর। তুমি তোমার কর্ম্ম কি আছে জান?

অ-বাবু। তা ত জানি না।

ঠাকুর। তবে যা জান না তার কি চিন্তা করবে? যে জিনিষ জান না, তার মতে চলতেও পার না। তবে ত নিশ্চিন্ত। অবশ্য মানুষ তা পারে না। আমিত্ব বুদ্ধি থাকতে কর্ম্ম করবেই। সৎদিকে গেলে সৎকাজ হবে, অসৎদিকে গেলে অসৎকাজ হবে। জীবত্ব বুদ্ধিই এই। যতক্ষণ রজ থাকবে ততক্ষণ কর্ম্ম আছে। সত্ত্বের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে তমোগুণ আসবে। অশান্তি, উদ্যম, স্পৃহা রজোগুণের স্বভাব। নইলে কর্ম্মে যেতে পারে না।

অ-বাবু। সমর্পণের নাম কি সাত্ত্বিকতা?

ঠাকুর। সমর্পণ মানে ভেতরে বাসনা নষ্ট হওয়া চাই। ভেতরে বাসনা আছে, কাজে করি না, সে ত তমোগুণ। সত্ত্ব আর তম বাইরে দেখতে একরকম বটে। সত্ত্বে চিন্তা নষ্ট করে। সত্ত্ব জ্ঞান-প্রকাশক। ভেতরেই কষ্ট থাকে না। তম তা নয়। ভেতরে বাসনা-পোরা, আলস্য-জড়তায় কাজ করে না। সন্দেশ খেতে প্রবল ইচ্ছা, পেলে এখনই খাই; না পাওয়ার দরুণ প্রাণে কষ্ট হ'চ্ছে, অশান্তি আসছে। কিন্তু আলস্য; কে আনে, কে দোকানে যায়, কাজেই বসে আছে। আর রজ হ'চ্ছে, সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হ'ল, অমনি উঠলে, দোকানে গেলে, সন্দেশ নিয়ে এসে খেলে। সত্ত্বেতে সন্দেশের

চিন্তাই রাখে না। বাসনা হ'লেও জ্ঞানের দ্বারা তাড়িয়ে দেয়। অভাবে ভেতরে কষ্ট আসে না।

অ-বাবু। তিনি জীবকে যখন রাজসিকতা দিয়েছেন, তার কাজ ও করা উচিত।

ঠাকুর। হ্যাঁ; তিনি যতক্ষণ যেটা দিয়েছেন ততক্ষণ তার কাজ হবে। আবার যখন ঘোরাবেন তখন ঘুরবে। তবে দেখতে হয়, রাজসিক যেন তামসিকে যোগ না হয়। তা'হলে অন্যায় কাজ হবে। আর রাজসিক সাত্ত্বিকে মিশলে সৎকাজ হবে। বেড়াতে বেরিয়েছি, বেড়াই; যেন চোরের সঙ্গে ভাব না করি।

অ-বাবু। চোর, সাধু, কি ক'রে বুঝব?

ঠাকুর। সাধারণ বোধ ত আছে।

অর্থ সত্ত্বে যোগ হ'লে সৎকাজ হবে। রজ আর সত্ত্ব নিয়ে যে সংসার করে, সে সৎপথে থেকে যে টাকা আসে তাতেই সংসার চালায়। সেজন্য মিথ্যা কথা, অন্যায়, এসব করে না। আর তামসিক বৃত্তি নিয়ে সংসার করলে তার অর্থ কিসে আসে, সেই ভাবনা। ন্যায় অন্যায় বোধ নেই। সেজন্য সে খুন করতেও রাজী। সংসার চালাতে হবে, তা পাঁচ টাকা আসে, তাতেই চালাবে।

অ-বাবু। পাঁচ টাকা কেন, পাঁচ সিকায়ও চলতে পারে। পাঁচশত টাকা আসলেও হয়ত নিই না।

ঠাকুর। তা ত মানা করেনি। অসৎকে মানা করেছে। সৎপথে টাকা আসে আসুক। প্রালব্ধ থাকে আসবে। সেটা সৎদিকে ব্যয় করবে। ছেড়ে কি হবে? টাকা থাকা ত দোষের নয়।

জনক ত রাজা ছিলেন, রাজত্ব ক'রেও রাজর্ষি। আর ভরত রাজা সব ছেড়ে ছুড়ে বনে গিয়ে, হরিণশিশুর পাল্লায় পড়ে হরিণ জন্ম হ'ল। অর্থ থাকলেই কি দোষ হ'ল? অর্থে বদ্ধতা হ'চ্ছে দোষ। অর্থ থাকে ত সৎব্যয় করবে।

অ-বাবু। রজ থাকতে ত কামনা-বাসনা যায় না।

ঠাকুর। না, তা যায় না। রজোগুণে কাম, কামনা অপূরণে ক্রোধ। অর্জ্জুন বলছেন, "তুমি যা বলছ এসব ত বুঝছি। তবু বলে ধরে কোন পুরুষ আমাকে এতে নিয়ে যায়?" শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জুন, রজোগুণে কাম, কামনা অপূরণে ক্রোধ; সেই কামই জোর ক'রে কর্ম্মে নিয়ে যায়।" সেটা সত্ত্বে যোগ হ'লে নিশ্চিন্ত, সৎকাজ হবে। তমোতে গেলেই নীচতা আসবে, বদ্ধতা আসবে। টাকা খরচ করতেও কষ্ট হবে।

এক ব্রাহ্মণের কন্যাদায়। কিছু অর্থ-সাহায্যের জন্য এক বড়-লোকের কাছে গেছে। গিয়ে বলছে, "বাবু, আমার কন্যাদায়, আমায় কিছু সাহায্য করুন।" বাবুটী কৃপণ ছিলেন। প্রথম বললেন, "যা যা, কোথাকার কে, ওর কন্যাদায়ে টাকা দিতে হবে।" তবু ব্রাহ্মণ বারবার চাচ্ছে। তখন একটি পয়সা দিয়ে বললেন, "যা, এই নিয়ে যা।" ব্রাহ্মণ আরও ভিক্ষা করেছে, দু'চার টাকা পেয়েছে। সেগুলি বা'র ক'রে বাবুকে বললে, "দেখুন, আপনি এ টাকা ক'টা হাতে নিয়ে আমাকে দিন। আপনার হাতটা খুলে যাক (সকলের হাস্য)। হাতটা খুলে গেলেই যে বাঁচি।" আবার অর্থ থাকলেও বড় মুস্কিল। একটি গল্প আছে।

এক পরামাণিক রাজাকে কামাত, বেশ দু'পয়সা পেত, ভালই আছে। একদিন রাজবাড়ী থেকে বাড়ী ফিরছে, পথে কে যেন বললে, "সাত ঘড়া মোহর নেবে?" টাকার লোভ বড় ভয়ানক। সাত ঘড়া মোহর এক সঙ্গে কি ক'রে ছাড়ে? বললে, "নেব।" বাড়ী গিয়ে দেখে, সাতটী ঘড়া রয়েছে। তার ছটীতে মোহর পূর্ণ, একটী ঘড়া খালি। অমনি প্রাণে অশান্তি। 'অ্যাঁ! সাত ঘড়া মোহর বলে ছয়টা ঘড়া দিলে! একটা ঘড়া খালি!' মনে অশান্তি এল। ছয় ঘড়াতেও শান্তি নেই। লোভ বেড়ে গেল। তখন কিসে সেই ঘড়াটী পোরাবে সেই চিন্তা। রাজবাড়ী কাজ করত, কাজেই কিছু ছিল, স্ত্রীর গয়না টয়না ছিল। সব নিয়ে ঐ ঘড়াতে ঢালছে। ঘড়া কিন্তু কিছুতেই পোরে না। মহা ভাবনায় পড়ে গেল। যেখানে যা পাচ্ছে সব ঘড়াতে ঢালছে। খাওয়া

দাওয়া নেই, রাতদিন চিন্তা—কিসে ঘড়া পোরে। কিন্তু ঘড়া আর কিছুতেই পোরে না।

একদিন রাজার সঙ্গে পথে দেখা হ'ল। রাজা দেখলেন, পরামাণিকের শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি পরামাণিক! এ অবস্থা কেন?" সে বললে, "দেখুন, জিনিষপত্র সব মাগ্‌গি হ'য়ে গেছে, যা পাই তাতে আর চলে না।" রাজা বললেন, "তা আমায় বলতে হয়। সেজন্য কষ্ট করবে কেন? তোমার পাওনা বাড়িয়ে দিচ্ছি।" কিছু বাড়িয়ে দিলেন। পরামাণিক কিন্তু সেটা খরচ না ক'রে সেই ঘড়াতে ঢালছে। ঘড়া তবু পোরে না। তার সেই দুর্দ্দশা। রাজা তা দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, "এতেও কুলোয় না, কি করি।" রাজা আরও বাড়িয়ে দিলেন। পরামাণিক সবই ঘড়াতে ঢালছে। কাজেই অবস্থা পূর্ব্ববৎ। সে যত পায়, ঐ ঘড়াতে ঢালে। ঘড়াও পোরে না, তার দুর্দ্দশাও ঘোচে না। রাজা বললেন, "এ কি হ'ল তোমার? এত বাড়িয়ে দিলুম তবু তোমার সেই অবস্থা! আচ্ছা, তুমি সাত ঘড়া মোহর পেয়েছ নাকি?" পরামাণিক শুনেই অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। বললে, "হ্যাঁ, তা পেয়েছি বটে।" রাজা বললেন, "সেই সর্ব্বনাশের মূল। শীঘ্‌গীর বা'র কর। ও যক্ষের ধন কিছুতেই পূরবে না। আমায় দিতে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জমা না খরচ; শুনেই চলে গেল। এ থাকতে তোমার ভাগ্য নেই। বিদায় ক'রে দাও।" পরামাণিক শুনেই বললে, "তবে চলে যাক।" সব চলে গেল। বাড়ীতে গিয়ে দেখে ছয় ঘড়া মোহর ত গেছেই, সে ঘড়াটিও গেছে।

এ ঘড়ার উপমা দিয়েছে মন। মনের বাসনা যতই পোরাও, সন্তুষ্ট নয়। দশ বিশ দু'শ' হাজার, যত পায়, আরও আরও চাই, শান্তি নেই।

তা রজ সত্ত্বে মিশলে ধনে কত লোকের উপকার করা যায়। এক ধনীর দ্বারা বহু লোক প্রতিপালিত হয়। ধনী মানেই ত সেই, যে বহুলোককে প্রতিপালন করে। তা ছাড়া লোহার সিন্দুকে টাকার ওপর

টাকা ফেলছে; সে কি ধনী? তা হ'লে ত বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দারোয়ান-গুলোও ধনী। ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে, পাহারা দিচ্ছে।

অ-বাবু। ধনীর ত অন্য রকম ব্যাখ্যাও আছে; ধনতৃষ্ণা যার মিটেছে।

ঠাকুর। সে ত আলাদা জিনিষ। শঙ্করাচার্য্যেরই কথা আছে, **ধনী কে? যার যত বাসনা কম। দরিদ্র কে? যার যত বাসনা বেশী।** যত বাসনা ততই অভাব, যত বাসনা কম ততই অভাব-শূন্য। টাকার মায়া কি কম? সহজে ছাড়তে পারে? ভেতরের তৃষ্ণা কিছু না মিটলে দিতে পারে না। বুক কত বড় হওয়া চাই, তবে এর মায়া ছাড়তে পারে।

অ-বাবু। টাকা খরচের কষ্ট সব্বারই হয় না। সকলের পক্ষে এটা সত্যি নয়।

ঠাকুর। সকলের পক্ষে সত্যি হ'লে ও কথাটাই থাকত না। তা'হলে ত বলতাম টাকা কখনও খরচ করা যায় না (হাস্য)। তা ত বলিনি। কারও কারও আছে খরচ করতে পারে না।

অ-বাবু। মানুষের ওপর প্রীতি, ভালবাসা এলে খরচ করা যায়।

ঠাকুর। সেটা ত ভালবাসার নিয়মই। একটা আকর্ষণ থাকে। পুত্রের জন্য টাকা খরচ কর। আবার না করতে পারলে দুঃখ হয়। ভালবাসাও একটা বন্ধনের কারণ। টাকা খরচ করবে, তার ওপর মায়া রাখবে না। খরচ করতে হয় করি। আপিসে মাস-কাবারে মাইনে দিতে হয়, দিচ্ছে; কোন আকর্ষণ নেই, আর আকর্ষণ রাখলেই দুঃখ।

অ-বাবু। **সুখ-দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি** কেমন ক'রে হবে?

ঠাকুর। **সঙ্কল্প-বিকল্প শূন্য হ'লেই হবে।** যাঁর জগৎ তিনি দেখছেন, আমার কি ক্ষমতা? টাকা থাকে খরচ করি, না থাকলেও চিন্তা রাখবে না। ম্যানেজারের মত টাকা খরচ করবে।

ম্যানেজার কর্ত্তার হুকুমে খরচ করে ; নিজের কর্ত্তৃত্বও নেই, ভাবনাও নেই।

অ-বাবু। এতে ত পৃথিবী রসশূন্য হবে।

ঠাকুর। রসের আবশ্যক কি ? রসও চাচ্ছিনে, রসশূন্যও চাচ্ছিনে। এত চিন্তায় পড়তে যাই কেন ? টাকা থাকলে দাও। এর জন্য রস নিরসের চিন্তার দরকার কি ?

অ-বাবু। তবে মানুষের মনুষ্যত্বের অঙ্গ রইল কই ?

ঠাকুর। কি অঙ্গ ?

অ-বাবু। সুখ দুঃখ বোধ, পরের জন্য অনুভূতি।

ঠাকুর। মানুষ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সে সব থাকবে। মানুষের ওপর দেবতাও ত আছে। দেবতা হ'লে এসব থাকবে না। দেবতাও ত হ'তে পারে। মানুষই যে থাকবে তার মানে কি ?

অ-বাবু। আমি অবস্থাপ্রাপ্তের কথা বলছি না, সাধারণ মানুষের কথাই বলছি।

ঠাকুর। তাদের ত জীবত্ব বুদ্ধি ; সুখ দুঃখ বোধ থাকবেই। পুত্রশোক করো না বললেও কোন্ শুনবে ?

অ-বাবু। এটী যতক্ষণ পুত্র-পরিবারে বদ্ধ ততক্ষণ এর দুর্নাম মায়া, সকলের মধ্যে হ'লেই দয়া।

ঠাকুর। দয়াও যে বন্ধন। দয়া-মায়া নিয়ে লাভ কি ? দরকার তাঁকে পাওয়া।

অ-বাবু। আর একটু আছে, নিজের আত্মপ্রসাদ।

ঠাকুর। তাঁকে যে দেখেছে, আত্মপ্রসাদ ত তার হ'য়েই আছে। সে পরম আনন্দে আছে। তাঁর ভাবে আছে, শান্তি ত তার আছেই। সঙ্কল্প-বিকল্প যেখানে নেই সেখানে ত পরম শান্তি।

অ-বাবু। ওটা আমার কল্পনার অতীত।

ঠাকুর। সে অনেকেরই কল্পনার অতীত। অবস্থা না এলে বোঝা

যায় না। আর কাঁদলেই বা কি লাভ? তোমার পেটে ভাত নেই, আমি কাঁদলাম; তাতে তোমার কি হ'ল?

অ-বাবু। কেঁদে ভগবানের কাছে জানাতে পারে। তাতে নিজের তৃপ্তি।

ঠাকুর। সে ভাল; তার প্রাণের তৃপ্তি হয় সে ভাল। তবে ভগবানের কাছে পৌঁছুচ্ছে কিনা দেখতে হবে। আমি কেন বলি? সে কি ভগবানের কেউ নয়? তিনি তাকে দেখছেন না?

অ-বাবু। কারও জন্যে কেউ চিন্তা করবে না?

ঠাকুর। চিন্তা ক'রে কি লাভ? তবে মায়া রয়েছে,—চিন্তা ত থাকবেই। জীববুদ্ধিতে চিন্তা আপনিই আসে। দয়ামায়া সমস্তই বন্ধনের কারণ। তাই সাংখ্য বলেছে,—কর্ম্ম ত্যাগ কর, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। মীমাংসক বলছে,—কর্ম্ম কি বললেই ত্যাগ হয়? তাই সদনুষ্ঠান কর। কর্ম্মই যদি করতে হয় তবে সৎকাজ কর, তাতে অসৎএর ক্ষয় হবে। কুইনাইন খাও, জ্বর যাবে। মায়া যখন কাটবে, তখন বিশ্বময় এক বোধ হবে। আবার গীতায় ভগবান বলছেন, তুমি কর্ম্ম করব বা করবনা কি বলছ—তোমার প্রকৃতি তোমায় জোর ক'রে কর্ম্মে নিয়োজিত করবে।

আর পরোপকার, এ ত মানুষ করেই। নিয়ম আছে, পশুবুদ্ধিতে কেবল ছেলে-পরিবার নিয়ে থাকে, তাদেরটা দেখে; মানুষবুদ্ধিতে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের সবাইকে দেখে। দেববুদ্ধিতে জাগতিক মঙ্গল দেখে। আর ব্রহ্মবুদ্ধি এলে তখন বোধ হয় তিনি সর্ব্বময়। সবই ঠিক্ আছে, আমার চিন্তার কোন আবশ্যক নেই। একে বিশ্বপ্রেম বলে। বিশ্বপ্রেমে খুঁটিনাটি থাকবে না; সব এক। তা ছাড়া যখন ভেতরে সাংসারিক ভালবাসা আছে, সেটা কেবল ছেলে-পরিবারের ওপরই না দিয়ে অপরকেও দেওয়া। আর যখন সে বোধ আসবে, দেখবে তাঁর জগৎ, তিনি

সব দেখেছেন। তিনি আমাকে দিয়ে কারও উপকার করান, করব; নয় ত আমার কি ক্ষমতা আছে উপকার করি?

অ-বাবু। ভগবানের কাছে জানাব।

ঠাকুর। নিজে তৈরী হই তবে ত জানাব। ওকালতী পাশ করি তবে হাকিমের কাছে বলব। নিজের জিনিষই জানাতে পারছি না, পরেরটা কি জানাব? আর সেও ত তাঁর, তিনি তাকে দেখছেন না?

অ-বাবু। এক মায়ের পাঁচ ছেলে। জানি মা পাঁচ জনকেই সমান দেখেন; তবুও যদি মনে করি একজনকে সে রকম দেখছেন না, তখন কি বলিব না?

ঠাকুর। এ মাকে বলি, এ মায়ের ভুল হ'তে পারে। জগজ্জননীর তা হয় না। তাঁর ভুলভ্রান্তি নেই।

অ-বাবু। নিজের কর্ত্তব্য আছে ত?

ঠাকুর। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বোঝা বড় কঠিন। যেখানে পাঁচ ঘটী জল পড়েছে, সেখানে আরও এক ঘটী ঢেলে দিলুম, আর যেখানে মোটেই নেই, জলের দরকার, সেখানে হয় ত দিলুম না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ঠিক্ কি কর্ত্তব্য, তা বোধ আসে না। অনেক সময় আমরা মায়ার খাতিরে কার্য্য ক'রে কর্ত্তব্যের দোহাই দেই।

জিনিষ হ'চ্ছে—মাকে ধরতে হয়। মা কি দুঃখের কারণ? তিনি একেই বা দুঃখ দেন কেন, আর আমাকেই টাকা দেন কেন? তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেন। তবে সব বোধ আসে, নয় ত বাসনার ঠেলায় কি চাইব তাই জানি না। তিনি যদি বিশ্বপ্রেম ও জ্ঞান ঠেলে দেন, তবে কোথায় কি প্রয়োজন, কি কর্ত্তব্য, ঠিক্ ঠিক্ উপলব্ধি হবে। তা নইলে সৎইচ্ছা থাকলেও সাধারণ জীববুদ্ধির দ্বারা করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হবে।

প্রহ্লাদ তপস্যা করলেন। ভগবান সন্তুষ্ট হ'য়ে দেখা দিলেন। বললেন, "বর নাও।" প্রহ্লাদ বললে, "আমি কি বর নেব? আমি কি বুঝি? বাসনা-কামনার ঠেলায় যা খুসি চেয়ে বসব। আমি কি তোমার

চেয়েও বেশী বুঝি? আমি ত ব্যাপারী নই, ভক্ত।" ভগবান তবু বললেন, "যা হয় একটা নাও।" প্রহ্লাদ বললেন, "নেহাত যদি দেবে তবে এই বর দাও যেন তোমা ছাড়া আমি আর কিছু না জানি।"

দেখ, ভেবে চিন্তে কি করবে? তাতে কিছু হয় কি? যীশাস বলেছেন,—বাপু, তুমি ত পণ্ডিত; ভেবে একচুলও বাড়তে পার কি?

অ-বাবু। তবু তাঁর কাছে পরের কল্যাণ-কামনা করা উচিত।

ঠাকুর। সে ভাবের ওপর। এক ভাব আছে, চাওয়া ভাল। আর আছে, তা নয়। কর্ম্ম করেছে তার ফল ভোগ করবে। যা খুসী তাই করবে, তার সাজা হবে না?

অ-বাবু। সে ত নিজের কাছে চুরি করা হ'ল। নিজের সুখদুঃখ বোধ আছে। পরের বেলা কর্ম্মফল।

ঠাকুর। এ ত অবস্থাপ্রাপ্তের কথা নয়। সে যার আছে সে ত চাইবেই, নইলে ত পশুত্ব।

তবে এসব প্রেম টেম নয়; প্রেম মানে এক; খুঁটি নাটি থাকবে না। আর এ দয়া হ'চ্ছে সংসারীয় ভাব। চিত্তের কতক কোমল অংশ থাকে তারই কাজ হয়। যেমন বাজ ডাকলে অনেকে মূর্চ্ছা যায়। যাত্রায় করুণ রসে কাঁদে। এ ত প্রেমের কান্না নয়। প্রেম হ'লে সংসার থাকে কি? গোপিকাদের স্বামী ভুল হ'য়ে গেল। আর এসব হ'চ্চে সংসারীয় ভাব। সংসারে দেখছে, ভালবাসার পর বিচ্ছেদে শোক হয়। সে সব সংসারীয় ঘটনা সাজিয়ে গুজিয়ে দেখাচ্ছে; কাজেই দেখে চোখে জল এল। সে ত দুর্ব্বলতা। প্রেম আসলে কি এসব থাকে? সে ত সব ভগবতে আরোপ করবে। খেতে পাচ্ছে, না পাচ্ছে তার কি? খাওয়া না খাওয়াতে যার মন থাকে, সে কি, তাঁর দিকে যেতে পারে? প্রেম কি সোজা? প্রেম আর জ্ঞান এক।

তাই আছে,—প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। (২০৮ পৃষ্ঠা)।

আর দেখ, প্রেম, ভালবাসা, জিনিষ একই; পাত্রভেদে বিভিন্ন নাম।

যেমন, পুলিশেরা টাকা নিলে বলে ঘুষ নিচ্ছে। কেরাণী বাবুরা নিলে বলে উপরি পাওনা। গভর্ণমেণ্ট ত যা দেবার দিলেন, তার ওপর যিনি যত বুদ্ধিমান তাঁর তত উপরি পাওনা। আর চাকর বাকর নিলে বলে চুরি (সকলের হাস্য)। একই টাকা। তেমনি ভগবানে ভালবাসাকে বলে প্রেম। প্রেমে স্বার্থ থাকে না। বাপ-মাকে ভালবাসার নাম ভক্তি। ছেলে-মেয়েতে ভালবাসাকে বলে স্নেহ। আর, বন্ধু পরিবারে ভালবাসাকে ভালবাসা। এসব ভাষার মার-প্যাঁচ।

জগজ্জননীকে ধর। তাঁর কৃপা লাভ কর। তাঁর কৃপা ভিন্ন দুঃখ যায় না। আমি পাঁচ টাকা দিলে যদি দুঃখ যেত তবে ভাবনা কি ছিল? পুরুষকার যদি থাকে তবে তাই দিয়ে তাঁকে ডাক। তাঁকে পেলে সব দুঃখ যাবে। তিনি অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান ঠেলে দেবেন। তখন কি উপকার কি অনুপকার, বোধ আসবে। দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা, প্রকৃতি, আবশ্যক, অনাবশ্যক, সমস্ত তোমার চোখে ভাসবে। তখন তুমি বিশ্বপ্রেমের অধিকারী হবে। তোমাকে দিয়ে তিনি জীবের কল্যাণকর বহুকার্য্য করিয়ে নেবেন। নয় ত ভেতরে সৎ ইচ্ছা থাকতে পারে, পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদিতে পারে—এটাও ভাল, সৎপ্রকৃতির লক্ষণ—কিন্তু জ্ঞান, আত্মবিকাশ না থাকলে ঠিক্ রোগ ধরে ওষুধ দেবার ক্ষমতা থাকবে না। তাতে রোগ ত নষ্ট হবেই না, বরং বৃদ্ধি হ'য়ে যেতে পারে। তেমনি উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অপকার আসতে পারে। অন্ধ যদি ঘর পরিষ্কার করতে যায়, অনেক সময়, ঘর ময়লাই ক'রে বসে। আগে নিজের চোখ ফোটাও, নিজের দুঃখ দূর কর। তখন প্রকৃত সুখ কি, অনুভব হবে; তখন উপকার কি, বুঝতে পারবে। যে চিররোগী সে কি সুস্থতার মর্ম্ম জানে? এক কুইনাইন যদি সব জ্বরে দাও, অনেক স্থানে বিশেষ অপকার হবে। সেজন্য সাধনাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করা চাই। নইলে শুধু শুধু বোধশূন্য কার্য্যে পরিশ্রম হবে, দুঃখ আসবে; ফল কিছুই হবে না।

অ-বাবু। জ্ঞান, ভক্তি, দুটো আছে ; কর্ম্মও ত আছে।

ঠাকুর। কর্ম্ম না হ'লে ত এ দুটোই আসে না। দুটোতেই কর্ম্ম রয়েছে। তবলা বাজালে, শব্দ হ'ল। শুনলেই বুঝলে একটা ঘা পড়েছে। এই ঘা-টা কর্ম্ম, শব্দটা ফল। দুটোতেই কর্ম্ম আছে। এ কর্ম্মজগৎ, কেউ এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আপনিই সব চলছে, পীঁপড়েটিও চলছে।

অ-বাবু। কর্ম্মের ত একটা রাস্তা আছে।

ঠাকুর। গুণ অনুযায়ী কর্ম্ম। যেমন গুণ উঠবে, সে রকম কর্ম্ম করাবে। রজ সত্ব মিশ্রিত হ'লে সৎকর্ম্ম করাবে। তম রজ মিশ্রিত হ'লে অসৎদিকে নিয়ে যাবে। চোরের সঙ্গে ভালবাসা হ'লে চোর হবে। আবার সাধুর সঙ্গে মিশলে সাধু হবে।

ডাক্তার সাহেব। সংসারে থেকে তাঁকে কি আন্তরিক ডাকা হয় না?

ঠাকুর। কেন হবে না? সংসারেই ত বেশী সুবিধা। কেল্লার মধ্যে থেকে লড়া যায় ভাল ; ফাঁকা মাঠে ঢের গুলি খেতে হয়।

ডাক্তার সাহেব। বদ্ধ হ'লে হয় না।

ঠাকুর। না, বদ্ধ সংসারীর হয় না। তাদের মন রাতদিন সংসারে পড়ে আছে, ডাকবে কি নিয়ে? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে সে সরষেকেই ভূতে পেয়েছে। তা ছাড়া যারা সে রকম ভাবে থাকে, যা দরকার করে, বাকী সময় তাঁকে ডাকে ; সে ভাল। বদ্ধ হ'লে কি ক'রে হবে? বদ্ধ মানেই তারা, সংসার যাদের বেঁধে নিয়েছে।

অ-বাবু। মহম্মদের কথায় শুনেছিলাম, এক বৃদ্ধা তার নাতীকে নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, বলেছিল "এ বড় চিনি ভালবাসে। অত চিনি আমি যোগাতে পারি না। আপনি বলে দিন যাতে এর চিনি খাওয়া কমে যায়।" মহম্মদ বলেন, "আর তিন দিন বাদে এস।" তিন দিন পরে এলে বললেন "কেন অত চিনি খাও? কমিয়ে ফেল।" তিন দিন পরে বললেন, কারণ তিনি তখন চিনি খেতেন, নিজে না ছাড়লে বলতে পারছেন না। তা দেখুন, নিজে যেটা করি, পরকে সেটা করতে

বারণ করি কি ক'রে ? নিজের সুখদুঃখ থাকতে পরকে কি ক'রে বলি এ সব কিছু না।

ঠাকুর। দেখ, সব সময় তা নয়। একজন মদ খায়, খেয়ে বুঝলে খুব খারাপ জিনিষ, হয় ত ছাড়তে পারছে না। তা বলে তার ছেলে যদি মদ খেতে চায়, তাকে বারণ করবে না কি ? বরং বেশী ক'রে বলবে, 'এটা খেয়ে আমার কষ্ট হচ্ছে, তুই আর খাসনে।' যেটা উপলব্ধি সেটা ত বেশী ক'রে বলতে হয়।

অ-বাবু। সে রকম উপদেশে গুরুত্বের অভিমান আসে।

ঠাকুর। তোমার তা দেখার দরকার কি ? মনকে উচ্চদিকে নেবে, নীচদিকে নিতে নেই। যার যা অবস্থা তা থাকবেই। যতক্ষণ বালকত্ব আছে ততক্ষণ যৌবন আনতে পারবে না ; তবে যৌবনও আছে তাই বলে দিচ্ছি।

অ-বাবু। বালকত্বের জন্য ত লজ্জিত হওয়া উচিত।

ঠাকুর। লজ্জিত হ'লে ত বালকত্বই গেল।

দেখ, সব সময়ের ওপর নির্ভর করে। সময়-সংযোগে কাজ হয়। রত্নাকরের সঙ্গে নারদের দেখা হ'ল, ফিরে গেল। কিসের থেকে যে কি হবে, সে ত জানা নেই। কে কার উপকার করতে পারে ? এর হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারি হ'চ্ছে ; কই, মরার কামাই আছে কি ? নিজের ছেলে পরিবারকে লোকে ভালবাসা দিয়ে ভুলাতে পারছে না, অপরের কি করবে ? তবে কারও কোমল ভাব থাকে, পরের দুঃখে দুঃখ আসে। যেটুকু তাঁতে দেওয়া যায় সেই ভাল। তারপর ক্রমে বাড়বে।

অ-বাবু। আমি পরের সেবা ক'রে যাব।

ঠাকুর। সেবা ভাল। সেবাও দেহসুখ থাকতে হয় না। দেহসুখ থাকতে কোন উচ্চ কাজ হয় না। সেবারও অনেক ভাব আছে। কেউ দেখলে, অমুকের কেউ নেই তার সেবা করি। আর কেউ ভাবে, তার কেউ থাক না থাক সেবা করে যাব।

কেউ তাঁকে ধরে, নিজের কি ক্ষমতা আছে? নিজের দুঃখ দূর করতে পারলাম না, পরের কি করব? যাঁর জগত তাঁতে ধরি।

অ-বাবু। মানুষে বিশ্বাস না হ'লে কি ভগবানে বিশ্বাস হয়?

ঠাকুর। কেন হবে না? মানুষে দোষগুণ আছে, ভগবানের দোষ নেই।

অ-বাবু। তাঁর ভেতর যত দোষ আছে আর কারও তা আছে কি? তিনি বিধবার ছেলে কেড়ে নিচ্ছেন, দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনে অসংখ্য নর নারীর সর্ব্বনাশ করছেন।

ঠাকুর। তুমি তাঁর কি বোঝ? তোমার বুদ্ধি নিয়েই ত বিচার করছ? একসেরা ঘটিতে একসের জলই ধরে, তার ওপর একবিন্দুও ধরে না। তুমি শুধু লোকটার দুঃখই দেখলে। একজন ঘানি টানছে দেখলে, তার প্রকৃতিটা দেখলে না। কেন টানছে, দেখলে না। ছেলে মরা দেখেই তাঁর ঘাড়ে দোষ দিচ্ছ, ভেতরটা দেখলে না।

দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনের দরকার আছে, তুমি আমি না বুঝতে পারি। না বুঝে তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি। অথচ একটা লোকের জীবনের ভার নিতে পারি না। যিনি তাকে পৃথিবীতে আনলেন, যিনি এতকাল রাখলেন, তিনিই আবার জলপ্লাবন দিলেন, তাকে নিলেন। আমরা জলপ্লাবনটা দেখেই তাঁকে দোষ দিচ্ছি। এতকাল তার কোন খবরই রাখলুম না। এই ত আমাদের বিকাশ। বিকাশ না থাকলে ত বলবেই। তিনিও জানেন, এরা এতে দোষ দেবে।

অ-বাবু। তিনি যাকে পৃথিবীতে আনলেন তাকে যদি সুখী করতে পারতেন তবে ত বুঝতুম।

ঠাকুর। তা ত বুঝবে না; বুঝলে ত মিটে যায়। সে বোধ কই?

অ-বাবু। এই বিশ্বব্যাপী নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কে দায়ী? তিনি নয় কি?

ঠাকুর। তুমি কে হে বাপু তাঁকে দায়ী করবার? তাঁর জগৎ তিনি বুঝবেন। তুমি কতটুকু বোঝ?

অ-বাবু। কাছে যদি পাই তবে বোঝা-পড়া ক'রে নেব।

ঠাকুর। কাছে গেলে আর এক রকম হ'য়ে যাবে। বোঝা-পড়া করতে পার কই? চাবুক মেরে অন্য রকম ক'রে দেবেন।

অ-বাবু। তা'হলে বুঝলাম তিনি নিষ্ঠুর।

ঠাকুর। তুমি বুঝলে, অপর কেউ বুঝবে না। তোমার বোধ কতটুকু? অনন্ত যিনি, অনন্ত যাঁর সৃষ্টি, তাঁকে তোমার কথানুযায়ী চলতে হবে?

তিনি নিষ্ঠুরও বটে দয়ালও বটে। আবার ঠিক্ ঠিক্ বুঝলে নিষ্ঠুরতাও দয়াতে পরিণত হয়। দেখ, মাষ্টার, পড়া করে না বলে ছেলেদের বেত মারে। তখন মাষ্টারের ওপর রাগ হয়। মনে হয় মাষ্টারটি বড়ই দুষ্ট। যখন তার শাসনে বিদ্যাভ্যাস ক'রে অর্থ আনে, তখন সে ছেলেই মাষ্টারের সুখ্যাত করে, 'ভাগ্যিস্ শাসন করেছিল, তাইতো লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে পারছি। ঠিক্ উপলব্ধি হ'লে বেতও মিষ্টি লাগে।

দেখ, মায়ের হাতে বরাভয় আছে, আবার খড়্গ-মুণ্ডও আছে। তিনি দয়াল ভঁয়াল দুইই। প্রকৃতি বুঝে দয়াল, আবার প্রকৃতি বুঝে ভয়াল। জ্ঞান উপলব্ধি না এলে বোঝা বড়ই কঠিন। বিষ অমৃত দুইই তাঁর সৃষ্টি। যে যাতে ঠিক্ হয়। যে চাবুকের দ্বারা ঠিক্ হয়, চাবুকই তার পক্ষে অমৃত। যে সন্দেশের দ্বারা ঠিক্ হয়, সন্দেশই তার পক্ষে অমৃত। এক নিয়ে ত সৃষ্টি নয়; দুইই আছে। তিনি কখনও বজ্রাদপি কঠিন, কখনও কুসুমের চেয়েও কোমল। যেখানে যে রকম প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর। তোমার ভাব বেশ। যে ভাবে হয় তাঁকে ডাকলেই হ'ল। 'যে ভাবে যে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।' যে ভাবই হোক, মূল সৎ থাকলেই হ'ল। তাঁর জগৎ তিনি ঠিক্ বুঝিয়ে দেবেন। তবে যেটা বললুম সেটা আমার ভাব। দেখছি যে বাবা,

নিজের উপকার করতে গিয়েই পঞ্চাশটা অপকার ক'রে বসছি। তাই বলি যাঁর জগৎ তিনি দেখবেন। আমার কি? নিজে একটা কাঁটা ফুটলে প্রাণ ছটফট করে, দেহের ওপর এতখানি টান রয়েছে, তারই কিছু করতে পারলুম না, এটা সেটা লেগেই রয়েছে, অপরের জন্য কি করব? তবে তোমার এই রাজসিক ভাব খুব ভাল। পরোপকার ভাল; ব'লছে—পরোপকার পরম ধর্ম্ম। পরোপকার করতেও জ্ঞানের দরকার। শুনেছি গাছে জল দেওয়া দরকার, তাই দিয়ে যাচ্ছি। কোথায় কতটুকু দিতে হবে জানি না। হয় ত কোথাও পাঁচ ঘটি জল ঢাললুম, মেলা জলে গাছ মরেই গেল। আবার কোথাও বা মোটেই জল পেল না। এই ত চাষারা পাড়াগাঁয়ে এক রকম ছিল ভাল; কষ্টসহিষ্ণু ছিল। মেলা বাসনা-কামনার ধার ধারত না। শুনতে পাই তাদের লেক্‌চার দিয়ে মেলা বাসনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। লাভের মধ্যে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ; মামলা-মকদ্দমায় দিনদিন আরও তারা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। অরবিন্দ বাবু প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুন্তু, অচ্যুত, বিভূতি, হরিপদ, মহাদেব, তারক (গৌহাটীর), আশু, কানাই, রাজেন আছে। কিশোরী, শশী, সুরথ আসিয়াছে। ডাক্তার সাহেবের সেজ ভাই মোহনবাবু আসিয়াছেন। আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আছেন।

নানা কথা হইতে লাগিল। আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় আরম্ভ হইবে। যন্ত্রীরা সব যন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইতেছেন। পুন্তু এস্‌রাজ লইয়াছে। রাজেন বাঁশী, কানাই খোল, পচু হারমনিয়াম বাজাইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন।—কানাইএর যন্ত্রে বেশ সুবিধা, অনেক ধরবে। সে এক গল্প আছে। এক রাজবাড়ীতে গান হচ্ছিল। রাজা বললেন, "যার যার যন্ত্র ভরে টাকা দেব।" যাদের খোল, হারমনিয়াম, তাদের

বেশ সুবিধা। আর বাঁশীওয়ালাদের বিপদ (সকলের হাস্য)। তা কানাই আর পচুর সুবিধা, রাজেনের বিপদ।

কীর্ত্তন হইল। ঠাকুর কীর্ত্তন শেষ করিয়া বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ, তোমরা তাঁকে সমস্বরে ডাকছ, খুব ভাল। শরীর দুর্ব্বল, ভেবেছিলুম, আজ গাইতে পারব না। তোমাদের ভক্তিতে এসে গেল। অনেক সময় তোমাদের দেখলে শক্তি আসে। তাঁকে তোমরা ডাকছ; তোমাদের পবিত্রতা এসে লাগলেই শক্তি আসে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কথায় কথায় বলিতেছেন।

ঠাকুর। মানুষ ভাবে, নিজে যা খুসী তাই করি, আর ওপর থেকে ঝপ্‌ ক'রে কতকগুলো সুখ পড়ে যাবে। মনে করে, বিয়ে করেই সুখ হয়। খুব সদনুষ্ঠানে সৎনীতিতে থাকলে তাতে সৎপুত্র হবে, খানিকটা সুখ হ'তে পারে। খুব সৎ হ'তে হবে, নয় ত লোহাপেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। পাঁচ দিন সুখ হ'তে পারে, সাতদিন হবে না। সংসারী লোক যা খুসী তাই করবে, কিসে সুখ আসবে ?

প্রধান হ'চ্ছে লোকের অপকার চিন্তা করতে নেই। উপকার করতে পারি না পারি, হয়ত অপকার ক'রে দিলুম। সাধ্যে থাকে ত উপকার করলুম, নয়ত অপকার চিন্তা পর্য্যন্ত করতে নেই।

ভক্তরা অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—অষ্টাদশ অধ্যায়।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং; ১৪ই মে, ১৯২৬ ইং;

শুক্রবার, অক্ষয়-তৃতীয়া।

কলিকাতা।

মঠে—ভক্তগণ ও উকীল বেচারাম লাহিড়ীর সঙ্গে কথা।

ব্রহ্মচর্য্য—ঊর্দ্ধরেতা—সঙ্গঅনুযায়ী বৃত্তি—ভেড়ার পাল ও বাঘের ছানার গল্প—সাধু ও তাঁর আকর্ষণ—সাধুর কার্য্য বোঝা কঠিন—সদ্‌গুরু, শিষ্য ও তাহার স্ত্রীর গল্প—প্রারব্ধ ও জন্ম-মৃত্যু—প্রাক্তন মহাপুরুষের কৃপায় কাটে—মঙ্গল অমঙ্গল বোঝা শক্ত—পাখী ও সাধুর আশীর্ব্বাদ—আমিত্ব ও নির্ভরতা—অন্ধ গোপালের গান—সাধকের তৈরী গান ও সাধারণের গান—জীবন্মুক্ত অবস্থা—বীরাচার, দেবাচার ও পশ্বাচার—সাধনের সপ্তস্তর।

বৈকালে সব ভক্তরা আসিতেছেন। ভবানীপুরের ডাক্তার সাহেব, পুতু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছে। কালীবাবু আছেন। খিদিরপুরের বিভূতি, অচ্যুত আসিয়াছে। গৌহাটীর তারক আছে।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কথা উঠিয়াছে, কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালীবাবু। শাস্ত্রে ত আমাদের চারটী আশ্রমের কথাই আছে। কিন্তু এখন শুধু গার্হস্থ আশ্রমই আছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম কি রকম ছিল? আজকাল তার কোন বর্ণনা শোনা যায় না।

ঠাকুর। বর্ণনা ক'রে কি হবে। এখন সে সব নীতি-পদ্ধতি করবার লোক নেই। নিজে না রক্ষা করলে আর একজনকে চালাবে কি ক'রে? ঋষিদের আশ্রমে থাকতে থাকতে সে অবস্থা হ'ত।

ব্রহ্মচর্য্য মানে, ব্রহ্মেতে আচার্য্য; ব্রহ্মে যিনি আছেন। দেহ-সুখ সংস্কারাদি নষ্ট করতে হবে। যা কিছু ব্রহ্মেতে স্থাপন করতে হয়। শুধু বিবাহ না করলেই ব্রহ্মচারী হয় না। তা'হলে

খোজাগুলো সব ব্রহ্মচারী। জিনিষ হ'চ্ছে মনকে ফেরান। কাম ক্রোধ লোভের বস্তু থেকে মনকে ফিরিয়ে এমন জিনিষে দেওয়া, যাতে তাদের উদ্দীপনা না হয়। অগ্নিতে ইন্ধন না পড়ে। এক অবস্থা আছে **উর্দ্ধরেতা।** সে আলাদা; যোগের একটা অঙ্গ। ব্রহ্মচারী হ'তে হ'লে যে উর্দ্ধরেতা হ'তে হবে তার মানে নেই।

কৃষ্ণকে বাল-ব্রহ্মচারী বলেছে। কিন্তু সহস্র গোপিনী নিয়ে বিহার করেছেন। সঙ্গ রয়েছে, কিন্তু মন নেই। মনকে তুলে নিলে কামের কার্য্য থাকল না। হাতে হাত মিশালে, তাতে কি ? হাত ত দেওয়ালে, কাঠে ঠেকাচ্ছ, তাতে দোষ কি ? দোষ কামের কার্য্য হ'লে। স্পর্শে তাড়িৎ শরীরে আনিয়ে দেয়। কামের কার্য্য হয়। তাড়িৎ না এলে ত হবে না। যদি তাড়িৎ কাজ করে তবে সে সব বস্তু থেকে দূরে থাকতে হয়। এজন্য গুরুগৃহে বাস। সেখানে ইচ্ছা হ'লেও জিনিষ পাবে না। সংসারে তা নয়। অনেক সময় প্রবৃত্তি নেই, তবুও অপর একটা তাড়িৎ এসে বৃত্তিকে তুলে দেয়। এজন্য সঙ্গ। সঙ্গে বৃত্তিকে, বাড়তে দেয় না। ক্ষুধা আছে, খেতে পেলে না, আবার চলে গেল। তেমনি জিনিষ না পাওয়ার দরুণ ইচ্ছা চলে যায়।

দেখ, কঠোরতা না হ'লে রস শুষ্ক হয় না। রস শুষ্ক না হ'লে এরা দুর্ব্বল হয় না। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, এ ক'টাই না প্রধান। সঙ্গ করতে করতে ক্রমে কঠোরতা আসে। ফস্ ক'রে কঠোরতা করলে ব্যাধি হবে, বিশেষতঃ কলিযুগে।

ব্রহ্মচর্য্য মানে যে বীর্য্যকে ইচ্ছাধীন ধারণ করতে পারে। যে শক্তি দ্বারা সমস্ত রিপুকে অধীন করেছে। কোন ক্রিয়ার দ্বারা উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। অভ্যাস করতে করতে সে জিনিষ মরে যায়। আর ব্রহ্মচর্য্য হ'ল মনের শক্তিতে অধীন করা।

অচ্যুত। উর্দ্ধরেতা হ'লে কাম থাকে না ?

ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে মন তৈরী করতে হয়। শুধু উর্দ্ধরেতা হ'লে কাম যাবে না। ভেতরে নষ্ট হওয়া চাই। তা না হ'লে মনে কাম

থাকবে ; কার্য্যের শক্তি নেই। যেমন খাসিগুলো ; বাসনা আছে, শক্তি নেই। বৃদ্ধের অবস্থা।

যদি ব্রহ্মে আচার্য্য হ'য়ে ঊর্দ্ধরেতা হয়, তবে হয়। নয়ত এ একটা কৌশল। তাতে শরীরের তেজ থাকে। হাজার ব্যাধিতে শরীর নষ্ট করে না। কিন্তু রূপের মাধুর্য্য, কামিনী-রূপের চিন্তা থেকে যাবে। সেটা হ'ল বিন্দু রক্ষা ; মেধা বাড়ে, মেধা-নাড়ী হয়। আর ঠিক্ ঠিক্ ব্রহ্মচর্য্য হ'লে মনের শক্তি হবে, রিপু অধীন থাকবে। কামিনীসঙ্গ করবে, কাম থাকবে না। এ ভয়ানক জিনিষ। তা ছাড়া সাধারণ নীতি আছে। সে ভাবে থাকতে হয়।

কালীবাবু। আপনার একটা গল্প আছে না ?

ঠাকুর। হ্যাঁ ; সৌভরির গল্প। জলে ষাট হাজার বছর তপস্যা করে, দুটো মাছে খেলা করতে দেখে বাসনা উঠল। বলে, বনে যাওয়া। মাছের সঙ্গ দেখে যদি নিজের সঙ্গের উদ্রেক হয়, তবে বনে ত বাঘ বাঘিনী আছে, শৃগাল শৃগালী আছে, কত আছে ; সেখানে ত হবেই। বৃত্তি না ধ্বংস হ'লে সাধারণ উপদেশে কি হবে ?

কালীবাবু। ঠিক্ ঠিক্ চেষ্টা বা ইচ্ছাও ত নেই।

ঠাকুর। ক্রমে চেষ্টা আসে। মানুষ কি কেউ ইচ্ছা ক'রে অন্যায় করে ? বৃত্তিগুলো সে সব ভাল লাগিয়ে দেয়। অনেকের তারপর অনুতাপ আসে। কতক আছে পশুবৎ। যেমন গরু সিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিলে, অনুতাপ নেই ; সে যে অন্যায় করেছে বোধ নেই।

গদাধর আশ্রম হইতে কএকজন ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

ঠাকুর আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমরা এখানে থাক ?

জনৈক ভদ্রলোক। না ; এই গদাধর আশ্রমে এসেছিলাম। মাষ্টার মহাশয় আপনাকে দর্শন করতে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠাকুর। তিনি ভাল আছেন ?

জ-ভ। হ্যাঁ, ভাল আছেন।

ঠাকুর। বেশ, তাঁকে দেখলে বড় আনন্দ হয়।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন।—দেখ, সঙ্গ-অনুযায়ী বৃত্তি ধরে। একটা গল্প আছে।

এক বাঘিনী ভেড়ার পালে ভেড়া খেতে গিয়েছে। বাঘিনীটা পূর্ণ-গর্ভা ছিল। ভেড়া ধরতে যেমন লাফ দিয়েছে, প্রসব হ'য়ে বাঘিনীটা মরে গেল। ছানাটা ভেড়ার দলেই থেকে গেল। ভেড়ার ছানার সঙ্গে বাড়তে লাগল। তাদের খাওয়া, পালান, সেই 'ভ্যা, ভ্যা', ডাক, সব শিখল। কিন্তু চেহারাটা ত ভেড়ার নয়, সে বাঘেরই আছে। স্বভাব, সংস্কার সব ভেড়ার মত হ'য়ে গেছে। এখন একটা বাঘ একদিন সেই ভেড়ার পালে ভেড়া খেতে গেছে। তার চোখে ওই বাঘের ছানাটা পড়েছে। দেখলে, সেও ভেড়ার সঙ্গে পালাচ্ছে; অমনি ধরলে। ধরতেই 'ভ্যা ভ্যা' ডাকছে। তখন তাকে নিয়ে একটা নদীর ধারে গেল। জলে নিজের মুখ তাকে দেখালে; বললে, "এই দেখ, তোর মুখ ত আমারই মতন, তুই ত ভেড়া নস্। 'ভ্যা, ভ্যা' করে ডাকছিস কেন?" "তোর ডাক ত 'ভ্যা, ভ্যা' নয়," এই বলে, নিজের ডাক শোনালে। "তোর খাওয়া ত ঘাস নয়।" এই বলে, মুখে একটু মাংস দিয়ে দিলে। ক্রমে আবার বাঘের স্বভাব ফিয়ে এল।

মনের স্বভাব, সঙ্গ-অনুযায়ী সংস্কার ধরে। এই জন্যই দিয়েছে, **সঙ্গই প্রধান। বিশেষতঃ সংসারীর সাধু, সঙ্গই একমাত্র**

কালীবাবু। সাধুসঙ্গ করতেও তাঁর আকর্ষণ না হ'লে হয় না।

ঠাকুর। হ্যাঁ; তবে দেখ, তাঁর শক্তি যাঁর ভেতর থাকে তিনিই ত সাধু। তাই সাধুর স্থানের স্বতঃ আকর্ষণ হয়। সংসারীরাও সংসারের মিষ্টতা ছেড়ে সেখানে আসে। ভাল লাগে বলে ত আসে। স্থান জায়গা অনুযায়ী বুদ্ধির বিকাশ হয়। ভেতর পরিষ্কার হয়। ভালবাসা আসে, আপনি কাজ হয়। এক ঘটী ময়লা জল যদি বড় জলাশয়ে

ফেল, তবে বড় জলাশয়ের জলের রংই ধারণ করবে; ময়লা আর থাকে না।

কালীবাবু। ঢালারও ত তিনি কর্ত্তা?

ঠাকুর। দেখ, জাহাজ যদি আটকে যায়, তবে কাপ্তেন সাহেব কল যা টেপবার টেপেন; আবার হাতীও লাগান। দুটোতেই কাজ করে। নিজের যখন আমিত্ব আছে, সেটা ভালর দিকে লাগাতে হয়।

কালীবাবু। তবে সাধুসঙ্গও সময়-সংযোগের ওপর নির্ভর করে।

ঠাকুর। সময় দিয়েছে এই জন্যে, দেখামাত্র আকর্ষণ সব সময় হয় না। কৃষ্ণকে দেখে গোপিকারা গেল, কিন্তু জটিলা-কুটিলা গেল না। কৃষ্ণকে ত সবাই দেখেছিল। ভালবাসা বিশ্বাস যত থাকে তত নিজের প্রবৃত্তি কাজ করতে পারে না। আবার গুরুর কার্য্য বোঝাও মুস্কিল। একটি গল্প আছে।

স্বামী-স্ত্রী তারা দু'জন আছে। তাদের এক সদ্‌গুরু ছিলেন। তিনি তাদের কাছেই থাকতেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তাঁর সেবা করত। একদিন গুরু বললেন, "দেখ, আর আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব না। আমি এখন যাচ্ছি।" তারা শুনেই কাঁদতে লাগল। "কেন আমাদের ছেড়ে যাবেন? আমরা ত কোন অপরাধ করিনি। আমরা আপনাকে নিয়েই আনন্দে আছি। আপনাকে ছাড়া কি ক'রে থাকব? গুরু তাদের দুঃখ দেখে বললেন, "দেখ, আমি থাকতে পারি, কিন্তু একটা সর্ত্ত তোমাদের করতে হবে। আমি যা বলব তাই করতে হবে।" তারা বললে, "হ্যাঁ করব।" গুরু বললেন, "খুব অন্যায়ও যদি বলি শুনতে হবে।" তারা বললে "হ্যাঁ, আপনি যা বলবেন তাই করব।"

গুরু সেখানে আছেন। কিছুদিন পরে স্ত্রীর সন্তান-লক্ষণ হ'ল। পরে যথাসময় সন্তান হ'ল। হ'তেই তিনি শিষ্যকে ডেকে বললেন, "ছেলেটাকে পুঁতে ফেল।" তাদের বড় কষ্ট হ'ল, কিন্তু কি করে; গুরুর আদেশ অমান্য করতে পারে না; পুঁতে ফেললে। তাদের খুব দুঃখ হ'ল। গুরু সেটা নিবৃত্তি ক'রে দিলেন। কিছুদিন পরে অবার স্ত্রীর সন্তান

লক্ষণ। সেবারও একটি ছেলে হ'ল। তারা ভাবলে, এবার গুরু কিছু বলবেন না। সেটি প্রথম সন্তান তাই বলেছিলেন। কিন্তু গুরু শিষ্যকে ডেকে বললেন, "ছেলেটাকে পুঁতে ফেল।" পুঁতে ফেললে। তাদের খুব কষ্ট হল। গুরু সেবারও নিবৃত্তি ক'রে দিলেন। আবার সন্তান-লক্ষণ। সেবার একটি মেয়ে হ'ল। তারা ভাবলে—'এবার আর গুরুদেব কিছু বলবেন না। প্রথম দুটী ছেলে হয়েছিল। এবার মেয়ের বেলা কিছু বলবেন না।' গুরু ডেকেই বললেন, "মেয়েটীকে পুঁতে ফেল।" কি করে, গুরুর আদেশ পুঁতে ফেললে। সেবারও দুঃখ হ'ল। গুরু নিবৃত্তি ক'রে দিলেন। আবার স্ত্রীর সন্তান-লক্ষণ হ'ল। এবার ভাবলে—'এ কেন হয়? বারবার আমাদের এ দুঃখ কেন?' সেবার একটি ছেলে হ'ল। তারা মনে করলে—'এ ত যাবেই, এখনি পুঁতে ফেলতে হবে।' কিন্তু গুরু সেবার বললেন, "এটি থাক, এটিকে আর মের না। তোমাদের খুব দুঃখ হয়েছে। তিন তিনটি সন্তান গেছে। কিন্তু কেন বলেছি জান? এস শুনবে।" এই বলে প্রথম সন্তানকে যেখানে পুঁতেছিল সেখানে গিয়ে বললেন, "এখানে কান পেতে শোন।" শুনলে ছেলে বলছে, "এই গুরুটাই মুস্কিল করলে। নয়ত আর একটু বড় হ'য়ে বাপ মার সর্ব্বনাশ করতুম। সব নষ্ট করতুম। গুরুটার জন্যে পারলুম না।" তারপর দ্বিতীয়টীর কাছে গেল। সেখানেও শুনলে, সে বলছে, "একটু বড় হ'তে পারলে সব উড়াতুম। সব নাশ ক'রে, বাপ, মা, দুটোকেই খুন করতুম। তা এ গুরুটা থাকতে সুবিধা হ'ল না। এই সব আটকে রাখলে।" পরে কন্যার সেখানে গিয়ে শুনলে, বলছে, "গুরুটা থাকাতে সব মাটি হ'ল। নয় ত বড় হ'য়ে যা খুসী তাই করতুম। কুলে কলঙ্ক দিতুম। গুরুটাই করতে দিলে না।"

তারপর গুরু বললেন, "কেন পুঁতে ফেলতে বলেছিলাম, বুঝলে? এই সন্তানই তোমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, এমন কি মৃত্যুর কারণ হ'ত। তা তোমাদের কষ্ট হয়েছিল—গুরুদেব একি নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন।

তোমরা ত বোঝ না কিসে মঙ্গল কিসে অমঙ্গল। গুরু কখনও অমঙ্গলের কাজ করেন না। সংসারী জীব, তোমাদের সব বোঝা কঠিন। তা তোমাদের এটি সুসন্তান। এর দ্বারা তোমাদের সুখ হবে। একে নিয়ে তোমরা সংসার কর। আমার আর থাকার দরকার নেই। আমার অনেক কাজ করতে হয়, আমি এখন যাই।"

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

শান্তিপুরের উকীল বেচারাম লাহিড়ী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে। তাঁহার আত্মীয়ের একটি ছেলে মারা গিয়াছে। সে প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বেচারাম লাহিড়ী। এক এক সময় মনে হয়, জন্ম-মৃত্যু সবেতে তাঁরই হাত। চিকিৎসা টিকিৎসা এসব ভুয়ো। যা হবার হবে।

ঠাকুর। চিকিৎসাও তাঁরই দেওয়া। মূলই ভুয়ো কিনা। তার প্রালব্ধে যদি থাকে, চিকিৎসায় হবে, ত হ'য়ে গেল। চিকিৎসক ভাবলে—আমি বাঁচিয়ে দিলুম।

বে-লা। অকালমৃত্যুও প্রালব্ধে হ'ল? এক বছরের ছেলে মরে গেল।

ঠাকুর। কালাকাল ত সংসার-নীতিতে হয়। মূলে সবই এক রকম। প্রালব্ধে আছে এ সময় মরবে, মরবেই। ডাক্তারের সাধ্যি নেই রাখে। লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ছিল। লোহার বাসর তৈরী ক'রে তাতে রাখলে। সেখানেও সাপে কামড়াল। ভয়ানক রোগ; হয় ত প্রালব্ধে আছে, সর্পাঘাতে বাঁচবে। সর্পাঘাতে লোক মরে; সে কিন্তু বেঁচে গেল। আমরা সেটা ত ধরি না। ডাক্তারের 'ওপর বিশ্বাস রাখি। যার যখন যেটা সারবার সারবে।

এ জগৎটাই এই, কিসে যে কি হবে বলা যায় না। ভুয়ো সবই। সবই যাবে। তবু মানুষ মায়ায় আবদ্ধ; এতে মজে আছে। একটা কথা আছে না? তিনজন হাসে। এক পৃথিবী, আর এক যম, আর নষ্টা

স্ত্রী। পৃথিবী হাসে, যখন দেখে জমি নিয়ে ভাইএ ভাইএ মাথা ফাটাফাটি করছে। সে ভাবে, 'আমার কত মালিক হ'ল, কত গেল, যেখানকার সেখানেই ঠিক্ পড়ে আছি। এরা মিছিমিছি লাঠালাঠি করছে।' এই ভেবে হাসে। আর যম হাসে, যখন ডাক্তার রোগী দেখে বলে, 'ভয় কি ? আমি বাঁচিয়ে দেব।' ভাবে, 'ওরে তোকে যেদিন ধরব, তুই কোথায় থাকবি ? তুই অপরকে বাঁচাবি ?' আর হাসে নষ্টা স্ত্রী। যখন দেখে, স্বামী ছেলেকে 'আমার ধন, আমার বাছা' বলে আদর করে। সে ভাবে, 'কার ছেলে ঠিক্ নেই, ইনি আদর করছেন।' এই তিনজন হাসে।

বে-লা। প্রালব্ধ ত মহাপুরুষদের কৃপায় কাটে।

ঠাকুর। সে ত সবই হয়। কিন্তু মহাপুরুষের কৃপা নেওয়াও যে কঠিন। মঙ্গল কোন্‌টা, বোঝা শক্ত। কেউ চায় বাঁচা। হয়ত তার মরাতেই মঙ্গল। সেই একটি গল্প আছে। একজনার একটি পাখী ছিল। পাখীটাকে খুব যত্ন ক'রে পুষেছিল। সেটীকে নিয়ে এক সাধুর কাছে গেছে। সাধু ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ। লোকটি সাধুকে বললে, "আমি আর কিছু চাইনে। এই পাখীটী আমার বড় প্রিয়। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, এর মঙ্গল হোক।" সাধুটী বললেন, "অ্যাঁ, তুমি পাখাটীর মঙ্গল চাচ্ছ ? আচ্ছা বেশ; এর মঙ্গল হোক।" বলতেই পাখীটী মরে গেল। লোকটী বললে, "একি ! আমি বললাম পাখীটীর মঙ্গল করতে, একে মেরে ফেললেন ?" সাধু বললেন, "তুমি ত এর মঙ্গল চেয়েছ ? এর যা যথার্থ মঙ্গল তাই করেছি। শাপভ্রষ্ট হ'য়ে পাখী জন্ম পেয়েছিল। তাতে বড় দুঃখ পাচ্ছিল। এখন উদ্ধার হ'য়ে গেল।"

তা দেখ, মঙ্গল বোঝা ভয়ানক কঠিন।

বে-লা। তবে দুঃখ কষ্ট, রোগ শোকে, মঙ্গলও আসে। আমরা বুঝতে পারি না।

ঠাকুর। নিশ্চয় আসে। বুদ্ধের কথায় আছে,—যিনি রোগ, শোক আর অন্নকষ্টে স্থির থাকতে পারেন তিনিই মহাত্মা।

বে-লা। বড় শক্ত কথা।

ঠাকুর। মায়া-জগতের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে হবে না। তাই দিয়েছে সঙ্গ। সঙ্গে মনে শক্তি আসে। নয় ত মানুষ কি পারে? রোগ, শোক এলে আনন্দ রক্ষা ত দূরের কথা, ভাবতে গেলে প্রাণ খারাপ হয়। কত মাদুলী ধারণ করছে, পাছে রোগ আসে। রোগ এলে আনন্দ রক্ষা করা ত ভয়ানক।

কালীবাবুর বাদক বটুবাবু আর গোপাল নামে একজন অন্ধ ভদ্রলোক আসিলেন। গোপাল বাবু ভাল গায়ক। ঠাকুরকে গান শোনাইবেন।

ঠাকুর। এস; তোমরা সব বস।

আবার কথা চলিতেছে।

বে-লা। এক এক সময় মনে হয়, 'প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা, কর; আমি কিছু জানি না।' কিন্তু ঠিক্ বুঝতে পারি না। আমি করছি, এই বোধ থাকে।

ঠাকুর। আমিত্বের মধ্যে রয়েছ কিনা। **আমিত্ব না ছাড়ালে ত নির্ভরতা আসবে না। বাসনা কামনা না গেলে আমিত্ব যাবে না।** আমিত্ব বোধ গেলেই চিন্তাশূন্য। তখন নির্ভরতা। টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে জানা থাকলে আর ভয়ের কারণ নেই। যতক্ষণ ব্যাঙ্কে জমা দিইনি, নিজের কাছে রয়েছে, ততক্ষণ চিন্তা। সাবধান হচ্ছি, চাবি দিচ্ছি। ব্যাঙ্কে দিয়ে ফেললে নিশ্চিন্ত। এ ত সহজে হয় না। পূর্ব্ব-সংস্কার ফস্ ক'রে যায় না। পূর্ণ উপলব্ধি না হ'লে এ নির্ভরতার অবস্থা আসে না।

বে-লা। আমাদের জ্ঞানের অভাব, তাই তিনি করছেন বুঝতে পারি না। ভাবি আমিই করছি।

ঠাকুর। 'আমি করি' তাতে ক্ষতি নেই। মনে যেন বোধ থাকে—

কর্ত্তা তিনি। মন নিয়েই ত সব। যখন ঘুমালে, কোন চিন্তা নেই। পায়ের কাছে টাকাই যদি পড়ে থাকে কোন ভাবনা নেই। হয়ত পা দিয়ে ছড়িয়েই ফেলে দিলে। আবার যেমন উঠলে, অমনি টাকা আঁকড়ে ধরে আহ্লাদ করছ। এই ত মন।

এজন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। 'সব তোমার সৃষ্টি। তুমি যা করছ সবই মঙ্গলের জন্য। আমি না বুঝে যা তা ক'রে নিচ্ছি। আমার বোধের অভাব। আমার চক্ষু অন্ধ। তাই আলোতেও বলছি আলো নেই। তুমি সে বোধ দাও।'

বে-লা। এ ত সাধনার কথা।

ঠাকুর। নিজের অবস্থাটার যদি চিন্তা কর তবেই অনেক বিশ্বাস এসে যাবে। নিজে চেষ্টা ক'রে দুঃখের কি করতে পারলে। টাকাতে কি শান্তি হ'ল। এ ভাবলেই অনেক বিশ্বাস হবে।

আর সৎসঙ্গ। তাতে মনের বিকাশ হবে। যত মনের বিকাশ হবে, তত বাসনা কামনা কমে যাবে, তত জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। তখন আপনিই সব উপলব্ধি হবে। তখন নিজের আমিত্ব ঘুচে আসবে।

মানুষ যে ভাবে, এটা না করলে হবে না, সেটা না করলে হবে না, সে কেবল নিজের বদ্ধতার জন্য। যদি ভাবে ঢের চেষ্টা ত করলুম, কিন্তু হ'ল কি! তবে আর দুঃখ থাকে না। দেখ শাস্ত্রেই আছে, দশরথ রাজা কত চেষ্টা ক'রে যজ্ঞ ক'রে ছেলে পেলেন; পুত্র কর্ত্তৃক সুখী হবেন। রামের মত পুত্র হ'ল। সেই পুত্রই হ'ল মৃত্যুর কারণ! জনক, দেখে শুনে রামের মত সৎপাত্রে সীতাকে অর্পণ করলেন। সীতার রামের মত স্বামী পেয়েও, কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল। রাম মহাবীর। ধনুর্ব্বাণ হস্তে সীতাকে নিয়ে বনে গেলেন। রামের সীতাও হরণ হ'ল। রাবণ ভাবলে আমার মত বীর কে? ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সব আজ্ঞাকারী; মণি-মাণিক্যে লঙ্কাপুরী সজ্জিত করেছি; মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ ভোগ করছি; কোন অভাব নেই। এত বীর সব রয়েছে রক্ষা করার জন্য। 'এক লক্ষ

পুত্র যার, সওয়া লক্ষ নাতি।' এঁরা সব হলেন সেনাপতি। এখন কত সৈন্য বুঝে নাও। এত মহাবীর থাকতেও একটা সামান্য বাঁদর দিয়ে লঙ্কা পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল। এ সব দেখে শুনে বুঝতে পার চেষ্টা ক'রে কি হয়।

গোপালবাবু গান করিবেন। হারমনিয়াম লইলেন। বটুবাবু বাঁয়া-তবলা বাজাইবেন। গান আরম্ভ হইল।

১। উঠগো করুণাময়ী, খোলগো কুটীর-দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা, তোমায় বারে বার,
মা হ'য়ে সন্তানের প্রতি একি হেরি ব্যবহার॥
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
'মা মা, বলে কেঁদে কেঁদে হ'ল অস্থি-চর্ম্ম সার॥
খেলায় মত্ত ছিলাম বলে, বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাবনা আর॥
দীন রাম বলে ওমা কার কাছে যাব আর,
মা বিনে কে নিবে এই অকৃতী অধমের ভার॥

গোপালবাবুর খুব মিষ্টি গলা। শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার গাহিতেছেন,—

২। সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাইনে।

৩। মন তোর এত ভাবনা কেনে।

রামপ্রসাদী সঙ্গিত শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইয়াছেন। বলিতেছেন, "সাধকের গান সব ভাবের ওপর।"

গান চলিতেছে—

৪। মন কেন তোর ভ্রম গেল না।

৫। কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো।

শুধু তোমারি দুয়ারে, অন্ধেরি মত
অঞ্চল পাতি রহি গো।
শুধু তব ধন করি আশ, আমি পরিয়াছি দীনবাস,
শুধু তোমারি লাগিয়া করিয়াছি আশ,
মর্ম্মের কথা কহি গো।
মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য, আমি সকলি করেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে,
তাই রিক্ত হৃদয়ে রহি গো।

ঠাকুর। গানটা বেশ ; তবে ভাবের একটু গোলমাল আছে। পাপ-পুণ্য শূন্য করলে, আর কথা থাকে না। বাসনা-কামনা থাকতে পাপ-পুণ্য থাকবে। পাপ-পুণ্য গেলে বাসনা-কামনাও গেল। দুটো শূন্য হ'লে চাওয়াচায়ি থাকে না। ভাল-মন্দ, চাওয়াচায়ি, সুখঃদুঃখে কিছুই নেই। তখন তাঁর আনন্দে পড়ে আছে।

বে-লা। জীবন্মুক্ত অবস্থা।

ঠাকুর। এতে চাওয়াচায়ি নেই। সব অবস্থায় আনন্দ। শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু মানাপমানবর্জ্জিতম্। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, সব অবস্থায় আনন্দ। তার কোন অভাব নেই। অভাব থাকলেই না চাওয়া! জীবন্মুক্ত হ'য়ে প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে থাকবে কিন্তু সে তাকে বাঁধতে পারবে না। যেমন আঠাশূন্য খাম। জল দিয়ে এঁটে দিলে বেশ থাকল। দেখাচ্ছে যেন ঠিক্ লেগে আছে। আবার জল শুকিয়ে গেলেই খুলে গেল। জীবনে মুক্ত। জীবের ধর্ম্ম রয়েছে ; খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা, সব রকম আছে। কিন্তু তার জন্য কোন চিন্তা রাখে না। বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অথচ বিষয়ের চিন্তা নেই। সর্ব্বদা আনন্দে আছে। সংসারে থাকবে ; সংসার তাকে বাঁধতে পারবে না। সংসার থেকে দূরে থাকলে জীবন্মুক্ত হবে না। "হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি।"

গিন্নী হ'তে হবে, ব্যঞ্জনও বাটতে হবে, কিন্তু হাঁড়ি ছোঁবে না। দূরে থাকা মানে লোভ আছে। তা হবে না। সব রসের রসিক হবে।

"সবসে রসিয়ে সবসে বসিয়ে লিজিয়ে সবকা নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহ বৈঠকে আপন ঠাম॥"

সব ভাবের সঙ্গে মিশবে, সব রসের রসিক হবে। কিন্তু তোমার নিজের ভাব ঠিক্ আছে। "হাঁজি হাঁজি করতে রহ বৈঠকে আপন ঠাম"; নিজের জায়গা ছাড়বে না। এ ত সহজ নয়। সাধনের কথা।

এই ত আছে।

রসিক রসিক সবাই কহে, ক'জন রসিক হয়।
ভাবিয়া দেখিলে রসিক সুজন কোটিতে একটি রয়॥
গোপত পীরিতি গোপেতে করিবি, সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবে ত রসিকরাজ॥

সাপ ব্যাং একসঙ্গে থাকা চাই। সাপ দূরে, ব্যাং দূরে, আর সাপ ব্যাং খাচ্ছে না; তা হবে না। সাপ আর ব্যাং একসঙ্গে থাকবে তবু খাবে না।

বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, শ্রীগুরু চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি॥

তন্ত্রে বীরাচার সাধন দিয়েছে। পঞ্চ'ম'কার; এরাই দারুণ প্রলোভনের জিনিষ। অথচ এদের নিয়ে কাজ করতে হবে। পঞ্চ-'ম'কার হ'চ্ছে মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন আর মুদ্রা; এ ক'টাই বড় আকর্ষণের জিনিষ। এর জন্যেই মানুষ পাগল। সকলেই এই করছে। এ ছেড়ে দিয়ে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

"ঘুড়ী লক্ষের মধ্যে একটি কাটে, হেঁসে দাও মা হাত চাপড়ি।"

লক্ষের মধ্যে একটা এ ছেড়ে, তাঁর দিকে যায়। এ রেখে তাঁকে ডাকতে পারে; তা বরং হয়। কেউ বা এরই জন্য ডাকছে। কিন্তু তাঁর ভক্ত হ'লে এসব থাকবে না।

"যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, তার আর একরূপ হয় রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম আর মাথায় জটা॥"

তাঁর ভক্ত হ'লে সব যাবে। তখন তিনি ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। দেহ, টাকা, পরিবার এসব ভাববার সময় নেই।

তাই পঞ্চ'ম'কার নিয়ে সাধনা। এ সব রক্ষা ক'রে সাধন করতে পারলে তবে বীর হ'লে। তা ভিন্ন সদগুরু-সঙ্গ। তিনি ইচ্ছা করলে, সব ঘুরিয়ে দিতে পারেন। আবার তিনি সবটা সহ্য করবার জন্য এ সবের ভেতর দিয়েও গতি করাতে পারেন। কারণ যুদ্ধ না করলে ত বুঝবে না কতখানি শক্তি হ'ল? ঘরে বসে তলোয়ার ঘোরালে কি হবে?

আবার সদগুরু-সঙ্গে থাকলে ইচ্ছা থাকলেও করবার যো নেই। তিনি এসব থেকে দূরে রাখবেন, বুঝতেও দেবেন না। তারপর অবস্থা এলে বীরাচার। **সংসারের প্রলোভনে থাকতে বীরাচার হয় না। তখন পশ্বাচার।** পশুর প্রাণের ভয় আছে। শত্রু দেখলে, দূর থেকেই ভয়ে পালাচ্ছে। 'বাবা, এদিকে যাব না।' তেমনি সন্দেশে লোভ আছে; কাজেই যে দিকে সন্দেশ আছে, সে দিক মাড়াব না। কামিনী-কাঞ্চনে আকর্ষণ আছে; তার থেকে দূরে থাকব। সাধন ক'রে তৈরী হ'লে কাছে থাকতে ক্ষতি নেই।

আর আছে **দেবাচার,** এ পাঁচটী ভেতরে। বাইরে নয়। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী, সহস্রারে পরমাত্মা পরম শিব। এর একটা রমণ অবস্থা হয়। দ্বিদলে সুধাভাণ্ড আছে, সেখান থেকে সুধা স্খলিত হয়। তাতে সাধক পরমানন্দে থাকে। আর "জয়কালী জয়কালী বলে, বলি দাও ষড় রিপুগণে।" তখন আপনি রিপু অধীন হয়। আর মুদ্রা হ'চ্ছে আসন। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, বদ্ধ-পদ্মাসন প্রভৃতি চৌরাশি রকমের আসন আছে। তা ছাড়া স্থির সুখম্ আসনম্। যে ভাবে স্থির হ'য়ে বসা যায় সেই আসন। যে কোন আসনে বসে সাধন করা যায়।

কামিনী সেই জগজ্জননী। তাঁর সঙ্গে রমণ; মানে দুটোকে এক করা, আত্মযোগ। এ সব সাধনে ঠিক্ করতে হয়; তা ছাড়া হয় না।

প্রথমে পশ্বাচারই ভাল। বীরাচারে যেতে নেই। বীর না হ'লে দুর্ব্বলের তাতে যেতে নেই। অবস্থা লাভ ক'রে তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে, তাকে সংসার-আনন্দ ভুলিয়ে রাখতে পারে না। তা ছাড়া পড়ে যাবে।

রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গানের কথা আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। রামপ্রসাদ সিদ্ধপুরুষ। তাঁর গান সব, অবস্থানুযায়ী ভাবের সঙ্গে ঠিক্ আছে। এ সব গানও ভাল। প্রাণের ভাব, ভক্তি বেশ। কিন্তু অবস্থা জানা নেই কিনা, তাই সব ভাব ঠিক্ নেই। পাপ-পুণ্য গেলে যে কি হয়, সে উপলব্ধি নেই। পরমহংসদেব বলেছিলেন, "মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য। আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

আবার জীবন্মুক্তের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। 'সপ্তদ্বারে রাজা বৈঠত'। এক একটা দ্বারে পৌঁছিলে এক একটা বন্ধন ছাড়ছে। ষষ্ঠদ্বার যেই ছাড়ালে তখন সব ছেড়েছে। রাজাকে তখন হাঁ ক'রে দেখছে।

সে অবস্থা থেকে এসে তবে জীবন্মুক্ত অবস্থা। সংসার ক'রে অথচ সংসার বাঁধতে পারে না। যেমন পাঁকাল মাছ, পাঁক নিয়ে খেলছে, গায়ে পাঁক লাগছে না। পদ্মপাতা জলে আছে, জল গায়ে লাগছে না। তাই আছে, হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ, তবে আঠা লাগবে না। যদি, সংসার করতে হয় সাধন ভজন ক'রে তৈরী হও। তা ভিন্ন আঠা লেগে যাবে। বোঝা নেবে ত তৈরী হও। আর নয়ত তাঁকে ধর, তাঁর বিশ্বাস রাখ। "মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?" যার মা আছে তার কিসের ভয়? যাঁর জগত তিনি দেখবেন। আমার চিন্তা নেই। সে ত আমিত্ব থাকতে হবে না; সেজন্য সৎসঙ্গ।

সঙ্গ করতে করতে গুরুতে ভালবাসা এসে যায়। তাঁর কথা শুনে কাজ করতে পার। তাতে ক্রমে অবস্থা লাভ হয়।

আবার গান হইতেছে—

চরণ ধরে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস ওমা।
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা॥
একি খেলা খেলিস ঘুরে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে ডাকে 'মা মা' ॥
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গবেয়ে রক্তধারা॥
এতদিন ত কালী ভীমা, অরিপূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল এখনও তুই এলিনে মা॥
আয় মা, অভয়ারূপে, স্মিতমুখে শুভ্রপথে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে,
তারা ক্ষেমঙ্করী শ্যামা, অভয়ে অভয় দেগো,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলেতুলে নেমা শ্যামা॥

গান শেষ হইল। সকলেই গান শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। বটু বাবু অতি সুন্দর বাজাইয়াছেন। তাঁহারা বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিতেছেন, "তুমি বেশ গেয়েছ, সুন্দর হয়েছে। বটুও বেশ বাজিয়েছে। সমস্ত মঙ্গল হোক, সব মঙ্গল হোক।"

১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—উনবিংশ অধ্যায়।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১৪ই মে, ১৯২৬ ইং ;
শনিবার, অক্ষয়-তৃতীয়া।

কলিকাতা।

মঠে—কালু, অজয় প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

হিন্দুমুসলমান—সৃষ্টিতত্ত্ব—freewill (স্বাধীন ইচ্ছা)—পূর্ব্বসংস্কার রাণী-ভবানীর কথা—কর্ম্মভোগ ও নীচ যোনিতে জন্ম—miracle (দৈব ঘটনা) বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও পূর্ণব্রহ্মের গাছ—৺শশি (ময়রা)—রোগের দেবতা—মা মণি।

ঠাকুরের জ্বর আছে। শরীর দুর্ব্বল বোধ করিতেছেন। বিকালে ভক্তরা আসিতেছেন, খিদিরপুরের কালু, বিভূতি, হরিপদ, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানীপুরের অজয়, রাজেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, পুস্তু আছে। গৌহাটীর তারক আছে। সত্যেনের বন্ধু ভবেশ আসিয়াছে। শ্রীরামপুর হইতে মনোরঞ্জন আসিয়াছে।
হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। যতক্ষণ এই বোধ না আসবে। যে হিন্দুর দেবমন্দির বা মুসলমানের মসজিদ বলতে কিছু নেই; আমাদের ও যা, ওদেরও তাই—ভগবানের স্থান—ততক্ষণ গণ্ডগোল।

কালু। তারা তুর্কীকে বড় করেছে কি না। এখানকার কথা ধরে না।

ঠাকুর। যেখানকার সংস্কার সে সংস্কার, লেগে আছে। আমাদের কেউ যদি বিলাত যায়, তা হ'লে ত আমাদের সংস্কার সব ত ছাড়তে পারে না। খুব তাদের ভাবে পড়লে, তবে কিছু ছাড়তে পারে। এই দেখ, বরিশাল, ঢাকা, চাটগাঁ প্রভৃতি দেশের লোক ঝাল খায়। এখানে তারা

এলে কি সে সংস্কার ছেড়ে দেবে ? (সকলের হাস্য), তবে, একসঙ্গে বাস করতে হ'লে পরস্পর পরস্পরের ভাবে কিছু আসতে হয়। দেশীয় এবং স্থানীয় সংস্কার কিছু গ্রহণ করতে হয়। তা নইলে শান্তি থাকে না।

কালু **সৃষ্টিতত্ত্বের** কথা পাড়িল। সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রালব্ধ ও পুরুষকার এই তিনটি লইয়া, প্রায়ই ঠাকুর ও ভক্তদের সঙ্গে তাহার তর্ক চলে। মীমাংসা আর হয় না। সকলে ইহা লইয়া কালুকে খোঁটা দেয় এবং আনন্দ করে।

কালু। কীট-পতঙ্গাদি করে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে, মানুষ হয়, না ভগবান মানুষই সৃষ্টি করলেন ? এর কোনটা ঠিক্ ?

ঠাকুর। দুটোই ঠিক্। এক সময়ে এক রকম। সাধারণ ওই চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে বটে। সব তা নয়। কতক মানুষ হয়েই জন্মায়। সৃষ্টির, একটা Theory (মত) নয়। স্থান জায়গা বিশেষে নানারকম সৃষ্টি। নানারকম থিওরি। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, এই সৃষ্টি সব ঠিক্ আছে। কেউ যায়ও না, কেউ আসেও না। গোলাকার, ঘুরছে। যখন যে দিকটা আসে তাই দেখছি।

আবার, Free-will (**স্বাধীন ইচ্ছা**) এর কথা তুলিল।

কালু। আমাদের Free will আছে, সে ভাবেই কর্ম্ম হয়।

ঠাকুর। সে ত দিয়েছে। গেরস্থের গরু আর খোঁটা। যতখানি দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে, তার মধ্যেই Free (মুক্ত)। যদি ততটা না দেয় তবে পারে না। কাজেই একেবারে Free কোথায় ? Free-will ত আর কিছু নয়—যেমন তোমার মধ্যে জীবনী শক্তি আছে, হাত নাড়ছ, বলছ, আমার Free-will ; কিন্তু এত জীবের ধর্ম্ম, motion, (গতি)।

কালু। ভাল কাজ মন্দ কাজ করাও কি জীবের ধর্ম্ম ?

ঠাকুর। সে তোমার বুদ্ধির ধর্ম্ম। 'সু', 'কু', ব'লে জিনিষ নেই।

বুদ্ধির দোষে 'সু', 'কু', করছ। গুণে বদ্ধ আছ বলে, ভেদ দেখছ। কালো চশমা দিয়ে কালো দেখছ। ওত চশমার দোষ। মূল এক।

Free-will ব'লে কি আছে? এই motion তিনি দিয়েছেন। অগ্নি-সংযোগে জল ফুটবে। এ জিনিষের স্বভাব। সংযোগ না হ'লে হবে না। জলে অগ্নি সংযোগ হ'ল, ফুটছে। তাতে আলু, পটল লাফাচ্ছে।

চৈতন্য শক্তি তিনি দিলেন। তার কার্য্য হ'চ্ছে। তারপর যার যার বিকাশ। যার যতটা বিকাশ, সে ততটা বুঝতে পেরেছে। বালক সাপ ধরছে, বাপ কেড়ে নিলে। বালকের খারাপ বোধ নেই তাই ধরছে।

আফিসে গেছ, মাঝে একঘণ্টা ছুটী পেলে। সেটার মধ্যে বেড়াচ্ছ, জল খাচ্চ, যা কিছু করছ। তাই বলে কি বলবে তুমি Free? কাজের সময় যেই ঘণ্টা পড়ল, অমনি দৌড়ুচ্ছ। Free কই? সাহেবই ছুটী দিলেন। আর তুমি ভাবছ নিজে Free। Free-will যদি হবে, তবে ইচ্ছা করলেই সব করতে পার না কেন? যাঁরা Free-will বলছেন, তাঁদের দেশেই ত ধনী গরীব দুইই রয়েছে। গরীবেরা কেন ধনী হ'ল না? তারা কি সব কুঁড়ে?

কালু। বুদ্ধি কম।

ঠাকুর। কেন বুদ্ধি কম?

কালু। মার্জ্জিত করে নি।

ঠাকুর। কেন মার্জ্জিত করলে না? এরাও (ধনীরা) ত ছোট থেকে বড় হয়েছে। তারাও (গরীবেরা), ছোট থেকে বড় হয়েছে। মার্জ্জিত করলেই ত পার ত।

কালু। মূলে ত ভগবান ধরে নিতেই হয়। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। **পূর্ব্বজন্মের সংস্কার** সব থাকে। সে অনুযায়ী কাজ হয়। দেখ, দুটো শিশুর জন্ম হ'ল। যে পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ীতে শ্লেষ্মা থাকে সেই পর্য্যন্ত অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান এল। দুটোকেই শিক্ষা দিলে। একটার বুদ্ধি বেশী হ'ল। কেন হয়?

সেই ত রাণীভবানীর কথা আছে। ছোটবেলায় রাণীভবানী আর তাঁদের একটী পুরোহিতের মেয়ে, পূজোর সময় মন্দিরে গেছেন। পুরোহিত দুটোরই হাতে একটু ক'রে মিষ্টি দিলেন। রাণীভবানী নিজে সামান্য খেয়ে বাকীটা সব পিঁপড়ে ছিল তাদের খাওয়াচ্ছেন। আর পুরোহিতের মেয়েটী সবটা খেয়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে পিঁপড়েগুলোকে মারছে। রাণীভবানীর তাই দেখে কান্না এল। আর ও মেয়েটী হাসছে। এ কেন হয়? এরই বা চোখে জল আসে কেন? ওটীই বা হাসে কেন? এই পূর্ব্ব সংস্কার।

ভবেশের সঙ্গে কথা হইতেছে। ঠাকুর তাহাকে আর্য্য-সমাজী বলেন।

ভবেশ। কারও হয় ত কোন পাপের শাস্তিভোগের জন্য মানুষ থেকে নীচ যোনিতে জন্ম হ'ল। তার ত সেই বোধ রইল না যে সে মানুষ থেকে পশু হয়েছে। কাজেই শাস্তিভোগ কি ক'রে হবে?

ঠাকুর। এই বোধটা গর্ভে থাকতে হয়। গর্ভে অষ্টম মাসে সমস্ত অবয়বের পূর্ণতা হয়। তখন জ্ঞান আসে। পূর্ব্বাপর সব অবস্থার বোধ জন্মে। সে সময় দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে ও অনুতাপ হয়। পশু জন্ম হ'ল। পশু হ'য়ে শাস্তিভোগ করলে। আবার মানুষ হ'ল। আবার গর্ভে সে সব বোধ আসবে। তখন জোড় হাতে প্রার্থনা করে, যেন আর অন্যায় না করে।

অজয়। একবার ভোগ হয়, বারবার জন্ম কেন?

ঠাকুর। আরও ত কর্ম্ম আছে। সব ভোগ হয়নি। একটা অন্যায়ে দশ বৎসর জেল খাটলে। আবার অন্যায়ের জন্য খাটবে না?

অজয়। ভোগান্তে মানুষ হ'য়ে জন্মালেও জানতে পারি না যে ভোগ হয়।

ঠাকুর। মায়া-জগতের নিয়মই এই, পূর্ব্ব জন্ম জানতে দেয় না। মায়া যিনি কাটিয়েছেন তিনি জানতে পেরেছেন। বুদ্ধ কীট-পতঙ্গ থেকে, নিজের বহু জন্মের কথা বলে গেছেন।

আর জানবার ত দরকার নেই। মন্দ কাজ করলে দুঃখ আসবে, তাতে ফিরবে।

অজয়। দুঃখ এলেও ত কাজ করে।

ঠাকুর। সেটা প্রকৃতি। 'বলাদিব নিয়োজিত', বলপূর্ব্বক নিয়ে যায়। জ্ঞান নিয়েও কেউ কেউ জন্মায়। পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান থাকে। চন্দ্রাপীড়ের জ্ঞান ছিল। ভরতের হরিণজন্মে জ্ঞান ছিল।

জন্মের নিয়ম হ'চ্ছে এই :—তমোগুণাশ্রিত হ'য়ে মরলে পশু জন্ম হয়; রজোগুণাশ্রিত হ'য়ে মরলে মানুষ হয়; আর সত্ত্বগুণাশ্রিত হ'য়ে মরলে দেবতা হয়।

ভবেশ। যে সব miracle (দৈব-ঘটনা) আছে—যেমন, যীশু কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করলেন, ল্যাজারাসকে (Lazarus) বাঁচালেন; এসব কি ঠিক্? অনেকে ত বিশ্বাস করে না।

ঠাকুর। এ ত চাক্ষুস দেখছ, কেন বিশ্বাস করবে না? তবে এ সব যে ধর্ম্ম, তা নয়। এ সব অবস্থা হয়; ঋষিদের রয়েছে। বিশ্বাস করবে না কেন? যৌগিক ধর্ম্ম রয়েছে। কায়া-বূহ আছে। তুমি বহু হ'তে পার। অপরের রোগ নিয়ে নিতে পার।

ভবেশ। Immaculate conception (শরীর-সংযোগ ব্যতীত দৈবশক্তিতে গর্ভসঞ্চার) হয় কি?

ঠাকুর। কেন হবে না? তোমাদেরই ত আছে; দৈবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ দৈবশক্তিতে হলেন। তিনি কারাগারে। বসুদেবও পৃথক কারাগারে। দৈবশক্তিতে কি না হ'তে পারে? শুক্রাচার্য্যের পেটে কচ গেলেন। শঙ্করাচার্য্য নিজের আত্মা রাজার দেহে নিয়ে গেলেন। এ সব জীবত্ব বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। যা দেখছি, শুনছি, এই নিয়েই ত বুদ্ধি। ওতে দৈব জিনিষ কি বুঝব? আর একটা বুদ্ধি না এলে হয় না।

ভরত রামের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় ভরদ্বাজ-আশ্রমে গেলেন। সৈন্যসামন্ত সব দূরে রেখে গেলেন। ভরদ্বাজ গরীব

ব্রাহ্মণ, এত লোককে খেতে দিতে পারবেন না, তাই সেখানে নিয়ে গেলেন না। ভরদ্বাজ বুঝে বললেন, "ভরত, তোমার লোকজন নিয়ে এস; দূরে রাখলে কেন?" তারা সব এল। তাদের জন্য নানা রকম খাদ্য, পানীয়, সব প্রচুরপরিমাণে এসে গেল। পায়েসের নদী, দধি-দুগ্ধের সরোবর, সব ঋষির ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি হ'য়ে গেল। ফল-পুষ্প পরিপূর্ণ অসংখ্য গাছ উৎপন্ন হল। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য অপ্সরা সব এসে নৃত্যগীত আরম্ভ ক'রে দিলে। তারা ত দেখে অবাক। রামও অযোধ্যায় ফেরবার সময় ভরদ্বাজ-আশ্রম হ'য়ে এলেন। তাঁকে বললেন, "আমার অযোধ্যার যাবার পথের সব গাছ যেন নানাবিধ সুস্বাদু ফলে পরিপূর্ণ হয়; আমার বানর সৈন্যেরা খেতে খেতে যাবে।" ঋষির ইচ্ছা'য় তাই হ'ল। বানরেরা নানারকম ফল খেতে খেতে গেল।

ভবেশ। অনেক জ্ঞানী লোকে ত বিশ্বাস করেন না।

ঠাকুর। ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞানী কিনা দেখ। জ্ঞানীর লক্ষণ সব থাকা চাই। তা ছাড়া জ্ঞানপন্থী হ'তে পারেন; জ্ঞানী নন।

ভবেশ। দয়ানন্দ বলছে—

ঠাকুর।' আমি কারও নাম ক'রে চর্চ্চা করতে চাই না। তুমি তাঁকে ভালবাস, বিশ্বাস কর; তাঁর ওপর সন্দেহ আনবে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখালেন পূর্ণব্রহ্মের গাছ। এক ভাবে আছে, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলে পূজা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, "অর্জ্জুন, কাছে এসে দেখ।" অর্জ্জুন এলেন। "কি দেখছ?" "একটী গাছ।" কৃষ্ণ বললেন, "আরও কাছে এস। কি দেখছ?" অর্জ্জুন বললেন, "গাছে থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পূর্ণব্রহ্মের গাছ থেকে অসংখ্য অবতার আসছে যাচ্ছে। বহু কৃষ্ণ। তার একটা কৃষ্ণে কত কাজ ক'রে যাচ্ছে। তবে তুমি আমাকেই পূর্ণব্রহ্ম বলে জানবে। আমাতে স্থির বিশ্বাস থাকলে আমাতেই সব দেখতে পাবে।

Miracle (দৈব-ঘটনা) এর শক্তি থাকে, তবে ব্যবহার না করতে পারেন। সৃষ্টির সব দিক দেখলে তবে জানবে। জ্ঞানের পূর্ণতা

এলে চোখে সব ভাসবে। অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, এ সব রয়েছে। ঘরের সব দুয়োর বন্ধ। ঘরে মানুষ আসতে পারে। অণু হ'তে পারে। যদি অণু হ'তে পারে তবে পেটের ভেতর যেতে পারবে না কেন?

স্থূল শরীর পঞ্চ ভৌতিক। তা ছাড়া মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর আছে। দেহ ছেড়ে সে শরীরে কাজ করতে পারে। তুমি এখানে আছ, কাশীতেও তুমি বসে আছ। দেখ, কচ মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের জন্য শুক্রাচার্য্যের পেটে গিয়েছিলেন।

অজয়। দুটো স্থূল শরীর হবে?

ঠাকুর। তুমি তাই দেখবে। তোমার তাই ধারণা হবে।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তেরা ধ্যান করিতেছেন।

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর নিজের পূর্ব্বাবস্থার কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। আগে খুব খেতে পারতুম। দেড় টাকার কুলপী বরফ খেয়ে কিছুই হয়নি। এক টাকার কচুরী ত জলখাবার ছিল। বাড়ীতে তেলে-ভাজা খাওয়ার যো ছিল না। একজন ভাল ডালপুরী তৈরী করত। তার সঙ্গে কথা ছিল, একটা জায়গায় দাঁড়াতাম, সে এসে দিয়ে যেত। (সকলের হাস্য)। ভাত বেশী খেতে পারতুম না। লুচি, ঘি-ভাত আর মাংস, তা পাঁঠা নয়, খুব চর্ব্বিওয়ালা খাসী, এর ওপরই ঝোঁক ছিল। আর খেয়ে কখনও বাপু হাঁসফাঁস করিনি। বদ-হজম ব'লে জিনিষ জানতুম না। কলকাতায় ত ভাল খাবারই হয় না। কাশীতে বেশ ভাল খাবার হয়। তবে এখন শশী গিয়ে কাশীর খাবারের সুখও গেছে।

শশী যে রকম খাবার করত, সে রকম খাবার আমি খাইনি। কল-কাতায় সে রকম খাবারই পাওয়া যায় না। অতি সুন্দর খাবার সব তৈরী করত। তার আমার ওপর, একটা অত্যন্ত ভক্তি ছিল। অতি শুদ্ধাচারী। যত রাজা বড়লোক, সব ওর ওখান থেকে খাবার নিত।

যখন যা ভাল খাবার করত, আগে আমার জন্য তুলে রেখে দিত। নিজে এসে মঠে দিয়ে যেত। এঁদের (মাকে) সব খাবার করতে শিখিয়েছে। খুব শান্ত, অতি ভাল মানুষ। খুব একটা ভক্তি ছিল।

শান্তিপুরের উকীল বেচারাম লাহিড়ী আসিলেন। ঠাকুরের অসুখেরই কথা হইতেছে।

বে-লা। রোগের নিয়ম—ভাল দেহ পেলে বাসা করে।

ঠাকুর। সে যারা তার তোয়াজ করে। যারা গঙ্গায় ডুবিয়ে, যা তা খেয়ে অত্যাচার করে, তাদের কাছে অনেক সময় থাকতে পারে না।

বে-লা। রোগের সব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন বলে।

ঠাকুর। হ্যাঁ; এক এক জনার এক একটী power (শক্তি) আছে। দেবশক্তি সব কাজ করে। এখানে যেমন বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন লোক আছে, সেখানেও তাই।

ডাক্তার সাহেব। এ সব দেবতাকে কেউ ভালবাসে না।

ঠাকুর। কেন বাসবে না। যাদের সকলের ওপর ভালবাসা আছে তারা এদেরও ভালবাসে। সাধারণ ত রোগ চায় না। তাদের ভালবাসবে কেন?

নানা প্রসঙ্গ হইতেছে। কথায় কথায় ঠাকুর একটী চোরের গল্প বলিতেছেন।

ঠাকুর। এক গ্রামে একটী ব্রাহ্মণ ছিলেন। গরীব মানুষ। একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রী ঘুমুচ্ছেন। এক চোর ঘরে ঢুকেছে। ছিঁচকে চোর, লতাপাতা চুরি করে। ব্রাহ্মণ ধান রেখেছেন ওপরে তুলে। চোর ধান নেবে। কিসে ক'রে নেবে? সঙ্গে কিছু আনেনি। তাই নিজের কাপড়খানা খুলে মাটীতে পেতে ওপরে উঠেছে। ব্রাহ্মণ টের পেয়েছেন। তিনি কাপড়টা টেনে নিলেন। চোর তা জানে না, সে ওপর থেকে ধান ঢেলে ফেলছে। নীচে নেমে এসে বাঁধতে গিয়ে, কাপড়ের খোঁট আর খুঁজে পায় না। (সকলের হাস্য)। কি আর করে, অপ্রস্তুত হ'য়ে চলে গেল। গ্রামেরই চোর; পরদিন ব্রাহ্মণের

সঙ্গে দেখা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বললেন, "ছিরু, কি ব্যাপার?" সে বললে, "দা' ঠাকুর আমার অপরাধ হয়েছে। আমার কাপড়টা দিয়ে দিন।" (হাস্য)। ব্রাহ্মণ বললেন, "তা ধানগুলি তুলে দাও।" (সকলের উচ্চ হাস্য) ধান তুলিয়ে ছাড়লে।

মা-মণি আজ আসেন নাই। ঠাকুর কালীবাবুকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা-মণির সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। মা-মণির ভক্তি ভালবাসা অসীম। আমাকে ঠিক্ ছোট ছেলে বা পিতার ন্যায় সেবা করে। যেখানে যে ভাল জিনিষটি পাবে আমার জন্য নিয়ে ছোটে। তার প্রাণখোলা 'বাবা' বলে ডাকটি কন্যার চেয়েও মন আকর্ষণ করে। আমার ওপর একটা অগাধ বিশ্বাস এবং ভালবাসা। আমাকে দেখবার জন্য কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। আর এদিকে মা-মণি যে রকম পাকা গিন্নী, এরকম বুদ্ধিসম্পন্না গিন্নী বড় কম দেখেছি। সংসারনীতি এত বোধ, সংসারের যে বিষয়ে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলিয়ে দিতে পারে। অমন সরল, উচ্চমন ও শক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোক বড় কম চোখে পড়ে। মা-মণিকে দেখলে এতই আনন্দ হয় যে বলে ওঠা কঠিন।

মা-মণির ছেলে নির্ম্মলও অতি সৎ ছেলে; সরল, উচ্চমন, মুক্ত-হস্ত। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে। তাকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, বড়ই আনন্দ হয়।

নানা কথার পর অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—বিংশ অধ্যায়।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ১৬ই মে, ১৯২৬ ইং ;
রবিবার, শুক্লা-পঞ্চমী।

কলিকাতা।

মঠে—কিশোরী, কালু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা—প্রালব্ধ ও পুরুষকার—বেদান্তের ভাব—ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাব ও উপলব্ধির কথা।

আজ ঠাকুরের জ্বর ৯৯·৬ ; শরীর দুর্ব্বল ; পেটের গোলমাল আছে। বৈকালে ৪॥টায় শ্রীরামপুর হইতে অশ্বিনী, তাঁহার পিতা গোকুলবাবু, গতিকৃষ্ণ, আরও একটী ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ভবানী-পুরের ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন আছে। কলিকাতা হইতে বিনয় আসিয়াছে। খিদিরপুরের কালু, ললিত, বিভূতি, হরিপদ আছে। একটী ভক্ত বলিলেন, "একজনার চাকরী গেছে। বেশী টাকা মাইনে পেত। এখন কষ্ট হ'চ্ছে। চাল অন্য রকম হ'য়ে গেছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "টাকাতে চাল বাড়িয়ে দেয়। টাকা কমে গেলেই চাল কমে যাবে। সে এক গল্প আছে।"

এক গাঁজাখোর বসে আছে, খুব নেশা করেছে। এখন সেখান দিয়ে একটা হাতী নিয়ে যাচ্ছে। বললে, "এই, হাতী বেচোগে, ক্যা দাম ?" সে বললে, "লাখ রূপীয়া।" হাতীওয়ালা ঘুরে খানিক বাদে এসে জিজ্ঞাসা করছে "হাতী লেগা ?" এর ততক্ষণে গাঁজার নেশা ছুটে গেছে ; বললে "যো লেগা ও চলা গিয়া।" (সকলের হাস্য)।

তেমনি যতক্ষণ টাকা থাকে ততক্ষণ মানুষের আলাদা ভাব হয়। টাকা কমে গেলেই ভাব বদলে যায়।

থিয়েটার সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ঠাকুরের গান-বাজনার যেমন অনুরাগ ছিল, আগে থিয়েটার দেখবারও খুব ঝোঁক ছিল। প্রায়ই ভাল ভাল নাটক দেখিতে যাইতেন। পরে প্রায় বিশ বৎসর যান নাই। আর্টের সমালোচনা ঠাকুরের মুখে খুব সরল ভাষায় এবং অল্প কথায় বড় সুন্দর শুনিয়াছি। বাংলার বর্ত্তমান সাহিত্য সমন্ধে ঠাকুর বলেন, "ভক্তিরসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হাস্যরসে অমৃতলাল বোস, আর নায়ক-নায়িকা সম্মিলনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।" বাস্তবিক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের সাহিত্যিকদের মধ্যে এ তিন জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাহাদের বিশেষত্বটুকুও ঠাকুরের কথায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

কালীবাবু, জিতেন, আশু, অচ্যুত, কালীমোহন, অনুকূল, অজয়, কিশোরী ও তাহার ছেলেরা আসিয়াছে। কানাই, সুরথ ও তাহার ভাই আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর গান করিতেছেন। পরে ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। মায়ের নাম করা হইলে ঠাকুর গান ধরিলেন।

ও কার মূরতি মন চেননা কি উহারে।
সেইত করেছেন এই বিশ্বরচনা, হেনদৃশ্য আঁকিতে কে পারে?
দশভুজা রূপ দেখে ভেবেছ রূপেরি শেষ,
অন্তরে হেরিলে উঁহার পাইবে অনন্ত বেশ;
অনন্ত প্রেমলোলুপা, কদাচিৎ চিৎ স্বরূপা,
কচিৎ আকাশ, কচিৎ প্রকাশ অনন্ত হৃদয়াগারে॥
ধরেরে সহস্র বাহু, ধরেরে প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে, অজস্র বিচরণ;
সহস্র বদনে খায়, সহস্র লোচনে চায়,
সহস্র শ্রবণে কথা শোনেরে॥
সহস্র শির না হলে কি, ওরে আমার অবোধ প্রাণ,
শতই গরবে করে সহস্রধারাতে স্নান;

সহস্রভাবে বিভোরা, সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
সেইত করেন বাস অহরহ, তোমার ওই সহস্রারে॥
অজ্ঞানে ভুলাতে নরে পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কভু কালীরূপ ধরে করে ধরে করবাল;
কখনও বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি ছলনা যাঁর বুঝিতে নারে॥
আজ রে 'গোবিন্দ' দেখ, দুর্গারূপে এসেছেন,
কাল দেখিবে রাধা সেজে শ্যামের বামে বসেছেন;
তাই বলি রে মন এই যে কায়া, কায়া নয় সকলি মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় সে ওঙ্কারে॥

কালু ও কিশোরী দু'জনের তর্ক হইতেছে। কিশোরী বলে, "সৃষ্টির যা ভাল মন্দ সবই দেওয়া আছে। তিনি সব ক'রে দিয়েছেন। কারও হাত এতে নেই, ভগবানেরও হাত নেই। কর্ম্ম, তার ফল, সবই দেওয়া। যা যা হবে সব ঠিক্। কেউ কিছু করতে পারে না।" কালু বলে, "তা নয়; লোকের পুরুষকার আছে, তার বলে নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়।"

এ সব লইয়া খুব তর্ক চলিতেছে। ভক্তেরা ইহা লইয়া আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুরও শুনিতেছেন, মাঝে মাঝে হাসিতেছেন। কিছু-ক্ষণ পরে বলিলেন।

ঠাকুর। কিশোরী যা বলছে ঠিক্। সৎ অসৎ বলে কিছুই নেই। জিনিষ এক। তুমি নিজের বোধ অনুযায়ী দেখছ, যেমন ম্যাজিক দেখ। কাচে লাল, নীল, নানা রং দেখ। সাপ নয় সাপ দেখছ, এ হ'চ্ছে প্রপঞ্চ, মায়া। তার মধ্যে থাকলে এ রকম বোধ থাকবে। সে স্তর ছাড়ালে ঠিক্ বোধ আসবে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। কাজেই তাঁর হাত নেই বললে তাঁকে ছোট করা হয়। হাত আছে বলেই বিশ্বাস করবে। তবে তিনি হাত দেবেন কেন? তিনি ত অসম্পূর্ণ বা ভুল সৃষ্টি করেন নি।

যেটা করেছেন তাতে কোন ভুল নেই। হাত দেয় কারা, যারা ভুল সৃষ্টি করে। নির্ভুল বলেই ত ভগবান।

আর ভালমন্দ নেই এটা বেদান্তের ভাব। এ কখন বলব, যখন মায়াতীত হব। প্রপঞ্চের মধ্যে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ অন্ধ। চলতে লাঠি খুঁজছি। তখন সুখদুঃখ বোধ থাকবে। সত্য-মিথ্যা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। 'শূন্যেতে পাপ-পুণ্য গণ্য, মান্য ক'রে সব খোয়ালি।'

পাপও নেই, পুণ্যও নেই, এটা বেদান্তের অবস্থা। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম নেই তখন ওই অবস্থা। যখন তা আছে তখন সব বোধ থাকবে। এ কথার ওপর সাধারণ দাঁড়াতে পারবে না। দাঁড়াবে ত স্বভাব নিয়েই। যদি বল ভালমন্দ নেই, তবে ত চিন্তাশূন্য। গীতাতে আছে, হন্যমান হনন্তে, কে কাকে হনন করে। কাকেও মারতে কোন চিন্তা নেই। তোমাকেও কেউ মারতে এলে চিন্তা থাকবে না। অপরকে মারবার বেলা বেশ আছি আর নিজের বেলা তাড়া দিচ্ছি, তা হ'লে হবে না। তা ছাড়া যতক্ষণ মায়ার মধ্যে আছ ততক্ষণ সে জিনিষ বললেও হবে না।

কালু। এ অবস্থার জন্মান্তর নেই ?

ঠাকুর। না ; ওখানে গেলে আর জন্ম কোথায় ? কর্ম্মই নেই আর জন্ম কি ক'রে হবে ?

কালু। অন্ধ, খঞ্জ, এ সব বিভিন্ন অবস্থা দেখছি।

ঠাকুর। এ সব ত উপাধি। এ ত তুমি নও। অন্ধেই বা তোমার কি, চোখ থাকলেই বা কি ? যতক্ষণ প্রপঞ্চে আছ ততক্ষণ ভেদ দেখছ।

কিশোরী। অন্ধ হওয়াও তাঁর ইচ্ছা।

ঠাকুর। বিচারশূন্য হ'লে ইচ্ছা বলবে। তাঁর ইচ্ছা তিনি করেছেন, কেন জানি না। ইচ্ছা বললে আর বিচার থাকবে না। অন্য চিন্তাই নেই।
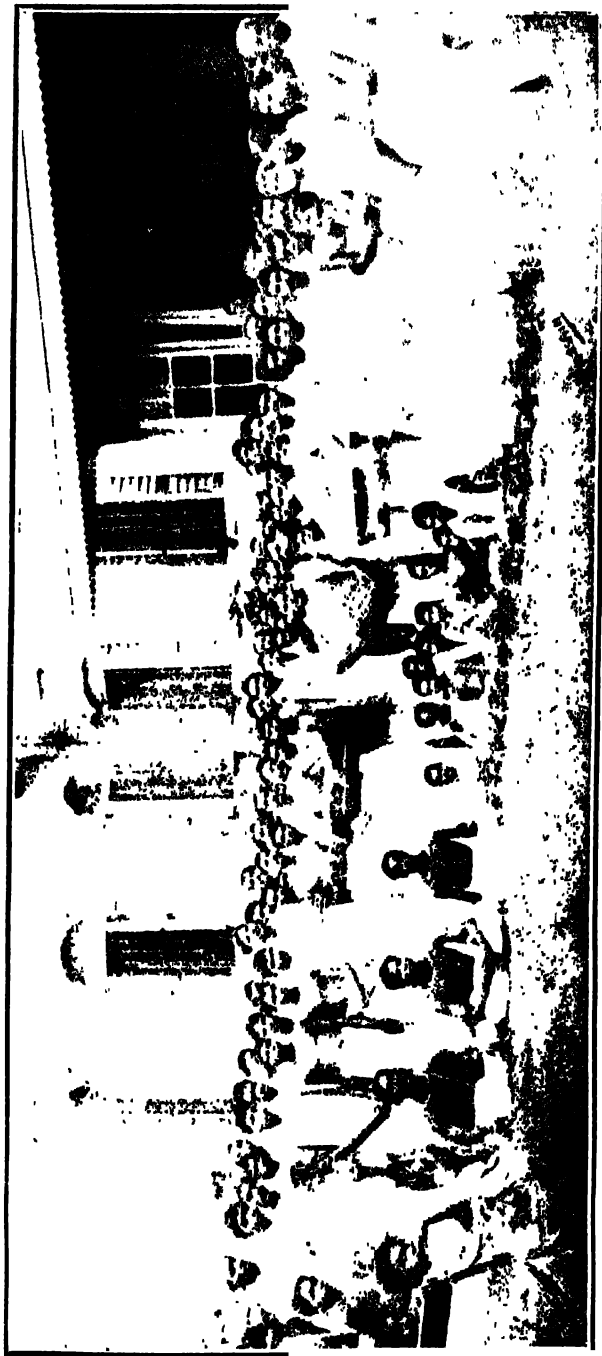
ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামপুরে, ভক্তসঙ্গে নগর-সঙ্কীর্ত্তনে।

(অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ৩০২ পৃষ্ঠার সম্মুখে)

কালু। 'কু' 'সু' কতক্ষণ থাকে ?

ঠাকুর। রিপুর অধীন যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ প্রপঞ্চ মায়া; এটা 'কু' এটা 'সু', বোধ থাকে। রিপুর হাত থেকে মুক্তি পেলে তখন মন চিত্তে লয় হবে। তখন আর্শিতে ছায়ার মতন সব দেখবে।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥ টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তরা স্তোত্র গাহিলেন। তারপর ঠাকুর কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন শেষ করিয়া বলিতেছেন।

ঠাকুর। কিশোরী, তোমার এ ভাব খুব সুন্দর। কিন্তু দেখ, আমার যা অনুভূতি বলছি। ডাকলে উপকার হয়। ওপর-শক্তি আছেন। তিনি এসে কাজ করেন। যদি বল এও লেখা আছে, তা থাক। আমি অত চিন্তা রাখব কেন ? ডাকলে যদি তিনি এসে খেতে দেন, আমি তাই ধরে থাকব। খাচ্ছি, খেতে মিষ্টি লাগে, সেই ধরব। অত ভেবে মাথা খারাপ করব কেন ?

ঠাকুরের স্বর কোমল হইয়া আসিল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। ডাকলে তিনি আসেন। ছেলের দুঃখ তিনি দেখতে পারেন না। আমি এই ভাবে চলেছি। এই ভাবে উপকার পেয়েছি। তাই তোমাদের বলছি, তোমরা নির্ভরসা হইও না। অপর বলতে পারে, তোমরা সে ভাব ধরবে না। আমি এ ভাবে ফল পেয়েছি। ওপর-শক্তি আছেন, তিনি এসে কাজ ক'রে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন।

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা। (৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা' বলিতে বলিতে অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইলেন। নিষ্পলক নেত্রে উপরদিকে তাকাইয়া আছেন। পরে 'মা মা' করিয়া অস্ফুট ধ্বনি করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া গদগদ বচনে বলিতেছেন—

সন্তানের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনাহারে কষ্ট পেলে তিনি এসে খাইয়ে দেন। এমন অবস্থা হয়েছে—অনাহারে কষ্ট পেয়েছি, মা এসে খাইয়ে দিয়েছেন। অন্য ভাব থাকতে পারে, আমার তা নিয়ে দরকার নেই।

বলিতে বলিতে ঠাকুরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। আর কথা বলিতে পারিলেন না। অপূর্ব্ব জ্যোতিতে শরীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে; শরীর কাঁপিতেছে; উপরদিকে তাকাইয়া আছেন। অস্ফুট 'মা মা' শব্দ করিতেছেন। ভক্তরা চমৎকৃত হইয়া এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিতেছেন; কাহারও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সকলে নীরব। প্রায় পনের মিনিট পরে ঠাকুর আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমায় একটু জল দাও।"

ডাক্তার সাহেব জল দিলেন। একটু খাইলেন; চোখ-মুখ জল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

অনেক রাত্রি হইয়াছে। ভক্তরা উঠিতেছেন। ঠাকুর সকলকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। করুণা-মাখা স্বরে সম্ভাষণ করিতেছেন।

১০টার পর আরতি হইতেছে। তখনও ভাব রহিয়াছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে আনন্দিত হইয়া অস্ফুট 'মা মা' ধ্বনি করিতে করিতে উপর দিকে তাকাইতেছেন। আরতি শেষ করিলেন। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—একবিংশ অধ্যায়।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ১৭ই মে, ১৯২৬ ইং ;

সোমবার, শুক্লা-ষষ্ঠী।

কলিকাতা।

মঠে—শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও কয়েকজন মাড়ওয়ারীর সঙ্গে কথা।

হিন্দু-মুসলমান—ব্যাঘ্ররাজ, তাহার মন্ত্রী ও ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের গল্প—গোহত্যা—চুনী বর্ম্মণের ছেলের অসুখ—জগৎ অনিত্য—অভিমন্যুর মৃত্যু ও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের কথা—মাড়ওয়ারীদিগকে হিন্দীতে উপদেশ—রাজর্ষি জনক—মৃত্যুর পর আত্মার গতি—বুদ্ধ—তারক, রল্লারাম প্রভৃতি গৌহাটীর ভক্তগণ।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ, ভাল হজম হয়নি। জ্বর সন্ধ্যার দেখা গেল, ৯৯'৬। রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে ১০০°।

বৈকালে ৪টায় কালীবাবু শ্যামলাল ক্ষেত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রী ভাল হারমনিয়াম বাজাইতে পারেন। তিনি একজন শিক্ষিত বাদক। ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন। তাঁহার বাজনা শুনাইয়াছেন। অজয়, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু প্রভৃতি ভক্তরা আছেন।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী ঠাকুরের শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্যামলাল। আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে? চেহারা যেমন দেখেছি তাই আছে।

ঠাকুর। বেশ আছি। তোমরা সব ভাল থাকলেই আমার আনন্দ। আমার আর কি? হাতে যদি বেদনা হয়, অঙ্গে এসে লাগবে। হাত ভাল থাকলে অঙ্গও ভাল থাকে। তোমার হারমনিয়াম ভাল ক'রে আমার শোনা হয়নি।

শ্যামলাল। সে একদিন আলাদা শোনাব। এ ত ঘরেরই কথা, যেদিন বলবেন হবে।

সাম্প্রদায়িক গোলমালের কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গে একটী গল্প বলিতেছেন।

ঠাকুর। এক বাঘ, সে এক বনের রাজা ছিল; তার মন্ত্রী ছিল রাজহাঁস। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু খেতে পায়নি। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রে ভিক্ষার জন্য বেরিয়েছে। শুনলে, বাঘ এ বনের রাজা। তার কাছে গেছে। ব্রাহ্মণ সামনে পড়তেই,—বাঘের স্বভাব মানুষ খাওয়া, সে ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলে ছেড়ে দেবে না; প্রকৃতি কাজ করবে;—ব্রাহ্মণকে সামনে পেয়ে লোভ হয়েছে। আহারের জন্য প্রস্তুত। মন্ত্রী রাজহাঁস বললে, "মহারাজ! তুমি বনের রাজা। এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু খেতে পায়নি; অন্নকষ্টে পড়ে তোমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে। তোমার শরণাগতকে হত্যা করা উচিত নয়। কিছু দিয়ে দাও।" বাঘ তাতে রাজী হ'ল; কিছু দিলে। রাজহাঁস তখন ব্রাহ্মণকে বললে, "দেখ ব্রাহ্মণ, আর এদিকে এস না। আমি ছিলাম মন্ত্রী, তাই রক্ষা পেলে। বাঘ তোমাকে বধ করত। আমি বরাবর মন্ত্রী থাকব না। যা হোক, তুমি আর এদিকে এস না।" ব্রাহ্মণ অর্থ নিয়ে আনন্দে চলে গেল। কিছুদিন পরে অর্থ ফুরিয়েছে। আবার ভিক্ষায় বেরিয়েছে। লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ। ভাবলে, 'একবার যখন বাঘ খায়নি, এবারও খাবে না। সেবার কিছু যখন পেয়েছি, এবারও পাব না কেন?' এই ভেবে সেই বাঘের কাছে আবার গেছে। সেবার রাজহাঁস নাই; পারাবত মন্ত্রী। যেতেই বাঘ খেতে প্রস্তুত হয়েছে। তার স্বভাব কোথায় যাবে? পারাবত বারণ করলে; বললে, "তুমি রাজা, এ গরীব ব্রাহ্মণ, কিছু চাইতে এসেছে। তোমার উচিত নয় এর অনিষ্ট করা। তোমার ঢের আহারীয় আছে। আশ্রিতকে নষ্ট করবে কেন? কিছু দিয়ে দাও।" সেবারও কিছু পেল। পারাবত বলে দিলে, "ব্রাহ্মণ, এবার

আমি ছিলাম, বেঁচে গেলে। বাঘের স্বভাব মানুষ খাওয়া; আবার এলে তোমার রক্ষে নেই। এদিকে আর এস না। বাঘ ফি বার তোমায় ছাড়বে না।" কিছু দিন পরে আবার অর্থের আবশ্যক। সেবারও ভাবলে,—দু'বার যখন বাঘ খায়নি, আর খাবে না। এই ভেবে গেছে। এবার মন্ত্রী দাঁড়কাক। রাজহাঁসও নেই পারাবতও নেই। যেমন দূর থেকে ব্রাহ্মণকে আসতে দেখেছে, বাঘ ত খেতে প্রস্তুত। কাকও উত্তেজিত করছে,—"মহারাজ, উত্তম আহার সামনে। মানুষের মাংস বহুদিন আহার করা হয়নি, এমন উত্তম মাংস আর পাবেন না। একে সংহার করুন।" একে ত বাঘের প্রকৃতিই মানুষ খাওয়া, মন্ত্রী আবার চাগিয়ে দিলে। যেমন ব্রাহ্মণ কাছে এসেছে, বাঘ তাকে বধ ক'রে ফেললে।

তা দেখে, প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই। কোন্‌বার যে কাক মন্ত্রী হবে তা জানা নেই। তাই তফাৎ থাকা ভাল। সৎপ্রকৃতিকে মন্ত্রণা দ্বারা অসৎএ নিয়ে যায়। অসৎপ্রকৃতিকে মন্ত্রণা দ্বারা সৎএ আনতে পারে। এজন্য সর্ব্বদা মন্ত্রী ভাল রাখা উচিত। তাই শাস্ত্র বলছে, সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করবে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। প্রথমে এই জিনিষ দেখ। এটী ত মুসলমানের দেশ নয়। এ হিন্দুস্থান, হিন্দুর দেশ। এখানে যখন এসেছ, যদি এদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হয়, তবে এদেশের আইন কিছু নিতে হবে। এই নিয়ম। যে দেশে বাস করতে হয় সে দেশের আইন নিয়ে চলতে হয়। ইংরাজ এদেশে রাজত্ব করছেন। এ দেশেরই মনু প্রভৃতির আইন চালাচ্ছেন। সব বিলাতের আইন চালাতে পাচ্ছেন কি? যে দেশে থাকবে সে দেশের নীতি মানতে হয়। যদি হিন্দুরা হিংসা করে কোন গোলমালের চেষ্টা করে, তবে সেটা হিন্দুদের দোষ। আমরা যদি তাদের দেশে যাই তবে তাদের নীতি কিছু আমাদের মানতেই হবে। তা না হ'লে সদ্ভাব বা শান্তিতে থাকা যায় না।

শ্যামলাল। ওরা বলে খৃষ্টানরা গোহত্যা করে, তোমরা ত কিছু বল না।

ঠাকুর। গোহত্যা ত আর কিছুই নয়। হিন্দুরা যাকে মানে, তোকে যদি সামনে হত্যা করে তা'হলে প্রাণে লাগবে না কি? এখন একজনকে একজন খোঁচা মেরে মেরেছে শুনলে, তাতে কষ্ট হ'ল। কিন্তু যদি কেউ সামনে মারে, তা'হলে সেটা প্রাণে বিশেষভাবে লাগবে না কি?

বাইরে ত কত গরু মারছে; তাতে কে কি করছে? সামনে যদি গাহত্যা হয়, তাতে স্বতঃ মনকে উত্তেজিত করে। যাকে আমরা মা বলে মানি, যার থেকে এত উপকার পাই, যার দুগ্ধ খেয়ে বাঁচি, যার পরিশ্রমে শস্য হয় সে শস্য খেয়ে আমরা জীবনধারণ করি, তাকে সামনে মারতে দেখলে স্বতঃ মন উত্তেজিত হয়। এটা মনের স্বভাব। আমি যে জীবহিংসার জন্য বলছি তা নয়। সে হিসাবে গরু মারাও যা ছাগল মারাও তাই। তবে গরু থেকে উপকার পাই বলে একে এত মানি। মানি বলেই বলি, হিংসাদ্বেষ ক'রে বলি না। হিন্দুদের এই সংস্কার বহু পূর্ব্বে থেকে আছে। বহু পূর্ব্বে থেকে তারা গরুকে মেনে আসছে। একসঙ্গে পরস্পরের থাকতে হবে, উভয়ে উভয়ের সুবিধা দেখা উচিত। যদি ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-দ্বেষ নিয়েই বাস করতে হয়, তবে সে বাসে শান্তি কি?

শ্যামলাল বাবুর আত্মীয়ের ছেলের অসুখ। কাছেই বাড়ী। একবার দেখিয়া আসিবেন তাই উঠিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। বড় ভাল প্রকৃতি।

শ্যামলাল। আপকা আশীর্ব্বাদ, আপকা কৃপা।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামলালবাবু, সেই ছেলের বাপ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বর্ম্মণ এবং আরও দুইজন মাড়ওয়ারীকে লইয়া আসিলেন। ছেলেটীর টাইফায়েড, আজ বিয়াল্লিশ দিন খুব শঙ্কটাপন্ন অবস্থা। ডাক্তার নীল-

রতন সরকার দেখিতেছেন। কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ঔষুধও পেটে যাইতেছে না। ঠাকুরকে চুনীবাবু বলিতেছেন।

চুনী। আপনার আশীর্ব্বাদ চাই, তবেই নিশ্চিন্ত হব।

ঠাকুর। দেখ, সংসার ত সুখের জায়গা নয়। রোগ, শোক আছেই; এ 'অনিত্যম্ অসুখকর লোকম্।' এ অনিত্য অসুখকর লোক। তবে এর থেকে মনকে তুলে নিলেই যা কিছু শান্তি পেতে পার। যার যার কর্ম্ম নিয়ে এসেছে। ভোগ ক'রে চলে যাবে। মায়া থাকে, তাই দুঃখ। **যা যায় তার নামই ত জগৎ।** এ ত সব যাবেই।

অভিমন্যুকে যখন সপ্তরথী ঘিরে মারলে, অর্জ্জুন শোকে অধীর হ'য়ে কৃষ্ণকে বলছেন, "আমার এই দুঃখ, তুমি থাকতে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে মারলে।" শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জুন, তুমি শোকে অধীর হ'য়ে যা মনে আসছে, বলছ। তার কি অবস্থা হ'ল না হ'ল সে চিন্তা তুমি করছ না। মায়ায় অন্ধ হ'য়ে আছ। নিজের দুঃখ হয়েছে তাই বলছ। জান, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে ছিল? শাপ ভ্রষ্ট হ'য়ে জন্মেছিল। এখন আবার চন্দ্রলোকে চলে গেছে।" তবু অর্জ্জুন খুব অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়ে চন্দ্রলোকে গেলেন; দেখেন, অভিমন্যু বসে আছে। অর্জ্জুন ছুটে গিয়েই আলিঙ্গন করতে চায়। শ্রীকৃষ্ণ বারণ করলেন। অভিমন্যু উঠে এসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, অর্জ্জুনকে করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "কি, ইনি তোমার পিতা, এঁকে প্রণাম করলে না? আমাকে প্রণাম করছ।" অভিমন্যু বললেন, "কে কার পিতা? ইনিও কতবার আমার পিতা হয়েছেন, আমিও কতবার ওঁর পিতা হয়েছি। উনি এখন শোকে, মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে ছুটেছেন। তুমি জগৎপিতা তাই তোমায় প্রণাম করলুম।"

চুনী। একটু প্রসাদ দিয়ে দিন, লাগায়ে দিই, ভাল হোয়ে যাবে।

কালীবাবু। একটু আশীর্ব্বাদ ক'রে দিন।

ঠাকুর 'মা মা' করিতে করিতে ভাবস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটু চরণামৃত দিয়া বলিলেন, "একটু খাইয়ে দিও, একটু মাথায় পেটে দিও।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর পরে বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, আমার শরীরও ভাল নয় যে পরের সব ঘাড়ে নিই। আর দেখলাম, তিনি৫ প্রসন্ন নন।

ওদের মধ্যে এই গোলমাল। রোগ ভাল করা, অর্থলাভ করা, এই বোঝে। তাঁকে ডাকব, সে সব ভাব নেই।

বিভূতি, আশু, রাজেন, অচ্যুত আসিয়াছে। আর একজন মাড়ওয়ারী আসিয়া বসিলেন। চুনীবাবুর বন্ধু, নাম বৈজনাথ প্রসাদ। বড়বাজারে কাপড়ের ব্যবসা আছে। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কাপড়ের দোকানের কথা শুনিয়া বলিলেন।

ঠাকুর। কাপড়ের দোকান থাকা ভাল। খুব কাপড় পরা যায়।

কালীবাবু। তা যার যা ব্যবসা, সে সেটা বড় ভোগ করে না।

ঠাকুর। কি ক'রেই বা করে? টাকা চাই ত। সে এক গল্প আছে। একজনকে, একজন জিজ্ঞাসা করছে, "তোমার ছেলে কি করে?" সে বললে, "দশ টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে"। ও বললে, "বেশ ত, কোথায়?" সে লোকটী বললে, "সে শ্বশুর বাড়ী খায়।" খেলে যে দশ টাকা খোরাকি লাগত, সেটা বেঁচে গেল। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর মাড়ওয়ারী ভদ্রলোককে হিন্দিতে বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব পরমেশ্বরকো নাম লেনা। যো যাতা হ্যায়, এহি ত জগৎ হ্যায়। দুনিয়ামে যো আয়া, সব চলা যায়গা। দুনিয়ামে, শান্তি নেহি হ্যায়। পয়সা ত ভাগ্য হ্যায়। যেইসান ভাগ্য হ্যায়, এইসান মিলেগা। লেকিন, শান্তি দোসরা চিজ হ্যায়। পয়সা মে শান্তি নেহি হোতা হ্যায়। লড়কাসে বি শান্তি নেহি হোতা। রাজা দশরথ কো রামকো মাফিক লড়কা মিল গিয়া। লেকেন, যব রাম বনমে গিয়া,

দশরথ লড়কাকো ওয়াস্তে রোকে রোকে মর গিয়া। জনক, রামকো মাফিক মহাত্মাকো সীতাকো দে দিয়া। তব বি সীতাকো, রোকে রোকে জনম গিয়া। শান্তি এক চিজ, রূপীয়া দোসরা চিজ। ঈশ্বরকো নেই ভজনেসে, শান্তি নেহি হোতা হ্যায়।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। তারপর গান করিলেন।

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে,
মোহিত করেছ জগতজন।
রবি, শশী, তারা আজ্ঞাকারী তারা,
তোমারি আদেশে করে বিচরণ॥
সংসার খেলনা দারাসুত দিয়ে,
রেখেছ মা আমার মোহিত করিয়ে,
তুমি দিয়েছ যে খেলা, খেলি মা সে খেলা,
তাই হেলায় হারাই নিত্যধন॥
ইচ্ছাময়ী তারা তোমার ইচ্ছায় সকলি হয়,
আমি জানিনা মা কিছু মহিমা তোমার,
আমায় নে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে,
আমার মোহে অন্ধ দু'নয়ন॥

ছেলেটার রোগের কথা উঠিয়াছে।

মাড়ওয়ারী। লড়কাকো বহুৎ বিমারি হ্যায়।

ঠাকুর। উসকো বড়া সঙ্কট হ্যায়। ব'ড়া মুস্কিল হ্যায়। মাই উসকো বাঁচায় দে তো আচ্ছা হ্যায়।

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন।

ঠাকুর। উসকো মরনেকা গ্রহ আগিয়া হ্যায়। আজ তিন রোজসে মৃত্যুগ্রহ আয়া। আদমিকা কুছ হাত নেহি।

মাড়ওয়ারী। আপকা আশীর্ব্বাদ।

ঠাকুর। হাম তো আশীর্ব্বাদ করতে হেঁ। সব কোইকো আশীর্ব্বাদ করেংগে।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী আবার আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। ছেলেটীর তিন দিন হ'ল মৃত্যুগ্রহ এসে গেছে। মানুষের হাত নেই। মরবার যা যা হবার সব এসে গেছে। আজ রাত্তির যদি টেঁকে যায়, তবে কাল সকালে মা কালীর (কালীঘাট হইতে) পায়ের জবা একটী এনে, মাথায় ছুঁইয়ে বালিশের নিচে রেখে দেবে।

ঠাকুর মাড়ওয়ারীদের হিন্দিতে বলিতেছেন।

ঠাকুর। সংসার করনা হ্যায়, তব মন তৈরী করনা চাইয়ে। কাঁটাহার তোড়নে হোয় ত হাতমে তেল লাগায়কে তোড়নেসে আঠা নাহি লাগতা হ্যায়। ইস্‌লিয়ে সাধনা। জীবন্মুক্ত নেই হোনেসে সংসার আচ্ছা করনা মুস্কিল হ্যায়।

শ্যামলাল বাবু। জনকাদি জীবন্মুক্ত থে।

ঠাকুর। জনক বহুৎ সাধন কিয়া। জনক তো একঠো অবস্থা হ্যায়। জনকাদি, পৃথিবী পর আয়া আদমিকো ভরসা দেনেকে লিয়ে। 'হাম্ সাধন করকে এইসান অবস্থা পা গিয়া, তোমকো বি সাধন করনেসে মিল যায়গা'। এক জনম কা বাত নেহি, বহুৎ জনম তক তপস্যা। দেহ ত চল যায়গা। তব্ ক্যা, দোসরা দেহ পকড় লেগা।

আত্মাকো বহুৎ ভাব হ্যায়। এক হ্যায় আত্মা, দোসরা দেহ লেকে এহি দেহ ছোড়তা হ্যায়। যব এ দেহ ছোড়েগা, তব দোসরা, দেহ লেকে জনম হোগা। আওর হ্যায়, আত্মা, বহুৎ লোক ভোগ করতা হ্যায়। লোক ভোগ করকে ফিন মর্ত্তলোকমে আতা হ্যায়। 'ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে ভবন্তি'। হিঁয়াসে, সাধন করকে ফিন যায়েগা। আওর তিসরা হ্যায়, আত্মা, দেহ ছোড়কে শান্তি লোকমে যাতা হ্যায়। তপস্যা করনে লগা তব ঊর্দ্ধগতি হোতা।

দেখিয়ে, মন মে ত সব হ্যায়। মন ঠিক্ হোনেসে, পুত্র পরিবার,

হোনেসে কুচ হরজ নেই। লড়কা, স্ত্রী ছোড়নেসেবি সাধন নেই করনেসে ক্যা হ্যোগা। লড়কা ত সব কোইকো থা।

শ্যামলালবাবু। এ তো মহা সাধনকী বাৎ হ্যায়। হামসে ক্যা সাধন হোগা?

ঠাকুর। কেঁও নেই হোগা? বুদ্ধ ক্যা থা। বুদ্ধকো স্ত্রীকী ওপর এইসান মোহ থা, কি নেই দেখনেসে মুহূর্ত্তবি রহনে নেই সেকা। উনকা লড়কা হোনেকা বখত স্ত্রী সৌৎমে (আঁতুড় ঘর) থা। নেই দেখনেসে রহনে নেই সেকা। লড়কা হুয়া, সৌৎমে চলা গিয়া। বড়াঁয়া লড়কা হুয়া। দেখনেসে মোহ আ গিয়া। আঁখ নেই ফিরতা হ্যায়। তব উনকা ভিতর বিবেক আ গিয়া। 'ক্যা! হামকো এতনা মোহ আ গিয়া! দেখনেকে লিয়ে হাম সৌৎমে চলা আয়া! আঁখ নেহি ফিরানে সকতেহেঁ! এহি লড়কা, এহি স্ত্রী, অগর মর যায়।' উসিবখত জ্ঞান আ গিয়া। সবকোইক ত মরতা হ্যায়, ইসকো মর গিয়া, উনকো মর গিয়া। হামকোবি মর যায়গা। তব নেই দেখনেসে কেইসে রহঙ্গে? কোন্ এহি দুখকা মালিক হ্যায়? 'জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, এই তিন দুঃখ দেতা হ্যায়। ইসকো হাম ঠিক্ করেঙ্গে।' বাস্, নিকাল গিয়া। এই ত হ্যায়। লড়কা সব কইকো থা। জনক, অম্বরিশ, শিখি, শিখিধ্বজ, সব কইকো ত আউরাৎ, আওর লড়কা থা। ধরম ঠিক্ রাখনেসে সব ঠিক্ হোতা হ্যায়। একঠো গল্প হ্যায়।

এই বলিয়া রাজা ও অলক্ষ্মী প্রতিমার গল্প বলিলেন। (১৯৭ পৃষ্ঠা)। গল্প শেষ করিয়া বলিতেছেন।

তব দেখিয়ে ধরম ঠিক্ হোনেসে, সব ঠিক্ হোগা।

কিছুক্ষণ পরে মাড়ওয়ারীরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কালীবাবু সকালে উঠিতে চাহিলে, ঠাকুর নানা কথায় ভুলাইয়া রাখিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমারা থাকলেই ত আনন্দ হয়।" ঠাকুরের অপার করুণা। ভক্তদেরই মঙ্গলের জন্য নানা কথায়, গল্পে, গানে, তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া নিজের কাছে টানিয়া রাখেন।

তারক শুক্রবার গৌহাটি যাইবে। ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে। তারকের ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি। ঠাকুরের জন্য প্রায়ই লেবু, আনারস ইত্যাদি ফল পাঠায়। মঠে মশা, তাই ঠাকুরের জন্য মশারি তৈরী করাইতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। তারক মেলা খরচ করছে। ওর কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার করতে হবে। কেন মেলা খরচ করছে? আমার ত কোন অভাব নেই। এরা বেশ রেখেছে। আবার একটী বড় মশারী তৈরী করিয়েছে। আমি কখনইবা মশারিতে শুই। মিছিমিছি খরচ করছে।

এই প্রসঙ্গে রল্লারামের কথা উঠিল। রল্লারামের পাঞ্জাবে বাড়ী। আগে গৌহাটীর ষ্টেশনমাষ্টার ছিল। এখন সেখানে ও আসামের বহু জায়গায় কারবার আছে। গত বৎসর ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছে। ঠাকুর তাহার কথা অনেকবার বলিয়াছেন, আজও বলিতেছেন।

ঠাকুর। রল্লারাম খুব সরল; সদা হাস্য বদন। দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। সৈনিক ছিল কিনা; খুব সাহস। বলে, "আপনি হুকুম করলে আমি কূয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারি; ছাত থেকে লাফাতে পারি।" ৫০।৬০ বছর বয়স, এখনও শরীরে কি ক্ষমতা! একদিন গৌহাটীতে রাত্তিরে ১০।১১টায় আমি সোডা খেতে চাইলুম। রল্লারামের কল আছে; সেই দিত। সেদিন বুঝি তার লোক সোডা দিতে ভুলে গেছে। ডাক্তার সাহেব বললে, 'সোডা নেই'। অমনি সে উঠছে। আমি বুঝেই বললুম, কেন যাচ্ছ? আমি ত এখন বড় খাই না; না হ'লেও হবে। সে বললে, "না, আমায় মাপ করবেন। আমি যতক্ষণ সোডা এনে না দেব, ততক্ষণ আমার প্রাণে শান্তি থাকবে না।" বলেই এক লাফে বাইরে পড়ে সেই বাজারে চলে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি হ'চ্ছে। বাজার প্রায় আধক্রোশ দূরে; সেখান থেকে নিজেই ঘাড়ে করে সোডা বরফ নিয়ে এসেছে। এনে বলে, "এবার শান্তি পাব, যা বলবেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুনতে পারব।" আমায় বলে, "হুকুম করুন, আমি সব ছেড়ে আপনার সঙ্গে চলে যাই।" খুব ভাল ভাব।

আমায় দেখেই তার কেমন লাগল। গৌহাটীতে এসে আমার ঝুলিটা টেনে নিলে। বলে, "আমি প্রায় তিনশ' সাধুর সেবা করেছি; ভাণ্ডারা দিয়েছি। তারা মন্ত্র দিতে চাইলে নিইনি। আমার মা বলেছিলেন, 'মন্ত্র নে, তোর দেহ পবিত্র হবে।' আমার ইচ্ছা হয়নি। আপনাকে দেখে আমার কেমন হ'য়ে গেল। সারারাত ঘুম হয়নি, আপনাকে দেখছি সামনে।" ওর বেশ একটা ভাব। গৌহাটীর সকলেরই আমায় দেখে খুব আনন্দ। তারা খুব যত্ন করেছে। মহাদেব মহাদেবের স্ত্রীরও আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। তারা খুব যত্ন করেছে। তারক, কেষ্ট, মহম্মদ, এরা সকলেই আমার খুব সেবা করেছে।

রাত প্রায় ১০টা হইল। অনেকেই উঠিলেন। আরতির পর সকলে বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—দ্বাবিংশ অধ্যায়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ১৮ই মে, ১৯২৬ ইং ;

মঙ্গলবার, শুক্লা-সপ্তমী।

কলিকাতা।

মঠে—কালীবাবু, সোমদেব, যুগল ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কথা।

দেহধারণ ও মায়া—বর্ত্তমান সমাজ—খাদ্যের দোষগুণ—হোমধেনু ও কামধেনু—বিভিন্নশ্রেণীর ঋষি—আকাশ-বৃত্তি, অজগর-বৃত্তি ও গোগ্রাস-বৃত্তি—তুলসীদাসের কথা—সাধু ও গৃহী—সংসারী ও শুকদেব—নির্ভরতা—শ্রীকৃষ্ণ-নাটক ও কৃষ্ণ-চরিত্র—সীতা-নাটক এবং বাল্মিকীর রাম-চরিত্র—নাটক ও শাস্ত্র।

বৈকালে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। খিদিরপুর হইতে বিভূতি, হরিপদ, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানীপুরের সত্যেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, ডাক্তার সাহেব, রাজেন, শশী, অজয় ও গৌহাটীর তারক আছে। কলিকাতা হইতে মা-মণি, কালীবাবু আসিয়াছেন। ঠাকুর আপন মনে গান করিতেছেন :—

আনন্দে ভাসল রে ধরা, গোরাচাঁদ এল নদীয়ায়।

ঠাকুরের দেশে (মাঝের গাঁ) যাওয়া হইবে। সে সব কথা উঠিয়াছে।

ঠাকুর রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "ও সহর জায়গা ; কত বড় কাণ্ড কারখানা, ওর মধ্যে গিয়ে কি থৈ পাবে ? (সকলের হাস্য)। ও ত আর ছোট সহর (কুড়ুলগাছি) নয়।" কুড়ুলগাছি মার দেশ ; ঠাকুর ঠাট্টা করিয়া প্রায়ই বলেন, "ওকি জায়গা ; এত টুকুন।"

অসিতা এবং তাহার মা ও মেয়েরা আসিয়াছেন। তাঁহারা পুরী

হইতে ফিরিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। পুরীর প্রসাদ ঠাকুর গ্রহণ করিলেন। ভক্তরাও পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল; আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। আশু, বিজয়, কিশোরী, কানাই আসিল। পরে নানা প্রসঙ্গ হইতেছে।

যাত্রায় দেবতাদের যা তা সাজান হয়, সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। শিবের মোহিনী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়ার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। এ শিব (মায়ায় বিমুগ্ধ শিব) দেবশক্তি। এখানে শিবের সোহং ভাব নয়। গুণাত্মক শক্তি। একটা গুণের খেলা করছেন।

দেখ, বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে, তিনি নিজের দেহখানা নিয়ে এত মুগ্ধ হ'য়ে রইলেই যে, শিবকে এসে ত্রিশূল দিয়ে দেহটা ছিন্ন ক'রে মায়া কাটিয়ে দিতে হ'ল। এতে দেখাচ্ছেন, মায়ার রাজত্বে দেহ ধারণ ক'রে এলে অবতারদেরও এ সব লেগে যায়। রামচন্দ্র কাঁদছেন। তখন সাধারণ ভাবে আছেন। সাধারণ মানুষের মত কাজ করছেন। দেখাচ্ছেন, দেহ এত ভয়ানক, আমাদেরও ভ্রান্তি আনিয়ে দেয়। দেহ ধারণ করলেই ত সীমা হ'ল। সীমা হ'লেই তাতে একেবারে পূর্ণতা পাওয়া মুস্কিল। মায়া-জগৎ; এখানে মায়ামুক্ত অবস্থায় রীতিমত থাকা ভয়ানক।

কথায় কথায় ঠাকুর আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। আগে ছিল, ধনীরা বহুলোক প্রতিপালন করত। ক্রিয়া-কলাপ সব ছিল। এখন সব অন্নব্যয় উঠে গেছে; সে সব ভাব নেই। শুধু পুত্র-পরিবার নিয়েই আছে। মানুষের ঈশ্বরচিন্তা গেছে। অর্থ অর্থ ক'রে দৌড়ুচ্ছে; অর্থও তেমনি অনেক দুঃখের পর আসছে। শান্তি আনন্দে কেউ থাকতে পারে না। ভোগের বাসনা প্রবল; ভোগের জিনিষ সে রকম নেই। আবার ভোগ ক'রেও সহ্য করতে পারে না। শরীর মনের সে ক্ষমতা নেই।

খাদ্যের দোষগুণ সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য ও মাংসে কাম বৃদ্ধি করে। ঝালে ক্রোধ বৃদ্ধি করে। তেতোতে লোভ বৃদ্ধি করে। এ সব অতিরিক্ত নিলেই দোষ। মাপ ক'রে খেতে হয়, তাতে দোষ নাই। আগে সব খাঁটি জিনিষ ব্যবহার করত। যে জিনিষ দেব-উদ্দেশ্যে নিবেদিত হ'তে পারবে না, তা ব্রাহ্মণেরা খেত না। এখন প্রবৃত্তি নীচগামী। প্রায় লোকই সে সব নিয়ম মেনে চলে না। আর কালপ্রভাবে খাঁটি বস্তু পাওয়াও কঠিন।

আগে নিয়ম ছিল, হোমধেনু থাকত। তারা আপনি এসে দুধ দিত। কোন্ সময় আসতে হয় তা তারা জানত। সে সময়ই আসত। বাছুর খেয়ে গেলে যে দুধ আপনি পড়বে, তাই নিয়ে, শালিধান্যের চা'ল দিয়ে চরু তৈরী হ'ত।

কালীবাবু। কামধেনু আর হোমধেনু কি এক?

ঠাকুর। না; কামধেনু হ'ল, যাতে কামনা করলে সব পাওয়া যায়; দুগ্ধ কি অর্থ আদি যা চাইবে পাবে। হোমধেনু তা নয়; তারা ঠিক্ সময়ে এসে দুধ দিত। তাতে চরু এবং হোমঘৃত তৈরী হ'ত। সে ভয়ানক বলকারক। ঋষিরা তাই খেয়ে ধ্যান, উপাসনা করতেন।

আর রাজারা সব রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। রাক্ষস প্রভৃতি হিংস্র জন্তু যেন ঋষিদের অনিষ্ট করতে না পারে; তাঁদের আহারের জন্য চিন্তা না করতে হয়, এ সব দেখতেন।

নানা শ্রেণীর ঋষি ছিলেন। এক ছিলেন, তাঁরা সংসারী, বিবাহ করতেন। সকালে সাধনায় বেরিয়ে যেতেন। স্ত্রীলোকেরা সংসারের সব কাজ করত। শালিধান্যের অন্ন হ'ত; আর খাঁটি দুগ্ধ। নিজের আহার আর একজন অতিথির সৎকারের জন্যে অন্নরক্ষা করতেন। ঋষিরা উপাসনা সেরে আহারের সময় আসতেন। মেয়েরা দেখতেন, স্বামীর উপাসনায় যেন বিঘ্ন না হয়; তাঁকে সংসারের কোন চিন্তা

করতে না হয়। তিনি আহারের সময় এসে জিজ্ঞাসা করতেন, অতিথি-সৎকার হয়েছে কি না।

আর এক ছিলেন, তাঁরা বিবাহ করতেন না, উপাসনায় থাকতেন। ফলমূল আহার ক'রে অথবা বায়ু আহার ক'রে থাকতেন। এক রকম আছে, খেচরী মুদ্রা বলে; তা'দ্বারা নিজের রসে নিজের পুষ্টি হয়; বাইরের আহারের আবশ্যক হয় না।

কালীবাবু। আকাশ-বৃত্তি প্রভৃতি কি আছে না?

ঠাকুর। হ্যাঁ আছে। আকাশ-বৃত্তি, অজগর-বৃত্তি, গোগ্রাস-বৃত্তি। **আকাশ-বৃত্তি** হ'চ্ছে, চাষা যেমন চাষ করেছে, কবে জল হবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি জল হ'ল তবে ধান হ'ল; নয় ত হ'ল না। আকাশের ওপর নির্ভর ক'রে আছে। তেমনি যাঁরা আকাশ-বৃত্তিতে আছেন, তাঁরা যখন যা এসে পড়ে আহার করেন। তার জন্যে কোন চিন্তা রাখেন না। আপনি এসে যা জোটে আহার করেন, আর ভগবৎ চিন্তায় থাকেন। আর **অজগর-বৃত্তি** মানে, অজগর যেমন পড়ে আছে, সামনে যা আসে মুখ দিয়ে নেয়। আহারের জন্য ছুটোছুটি করে না। তেমনি তাঁরা ভগবৎ চিন্তায় আছেন। যা সামনে এসে পড়ে, তুলে নেন। **গোগ্রাস-বৃত্তি** হ'চ্ছে, গরু যেমন মুখ মাটিতে দিয়ে আহার করে, তেমনি তাঁরা মুখ দিয়ে আহার তুলে নেন। হাত ব্যবহার করেন না।

তাই সাধুদের দিয়েছে, কোন চিন্তা রাখবে না; কালকার চিন্তা করবে না। যীশাস বলেছেন, 'কাল কি হবে, তা আজ ভেব না।' তুলসীদাসের আছে, 'পঞ্ছী আওর দরবেশ, এরা সঞ্চয় করে না'। পাখীরা আহার কালকার জন্য রাখে না; যা পায় নিজে খায় আর ছানাকে খাইয়ে ফেলে! কাল আবার আহরণ করে। দরবেশও কালকার চিন্তা রাখে না; যা পেল খেয়ে নিলে। কাল কি খাবে, সে ভাবনা রাখে না।

কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। তোমরা কোত্থেকে এসেছ?

জনৈক আগন্তুক। গদাধর আশ্রমে এসেছিলাম। মাষ্টার ম'শায় আপনাকে দর্শন ক'রতে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠাকুর। মাষ্টার ম'শায় ভাল আছেন?

জ-আ। হ্যাঁ, ভাল আছেন।

মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরকে খুব ভালবাসেন। প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে লোক পাঠান। ঠাকুরও মাষ্টার মহাশয়ের কথা প্রায়ই বলেন। সন্ন্যাসীদের কথা আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। সন্ন্যাসীদের আছে, কেউ কেউ আহারের জন্য বহু বাড়ী ভিক্ষা করে; নিজের উপযুক্ত পেলে আর করে না। আর আছে, দুই তিন বাড়ী ভিক্ষা করবে, তাতে যা পেল তাই খেল; না পেল ত হ'ল না। আবার আছে, তাঁতে নির্ভর ক'রে থাকে; চাওয়াচায়ি নেই, যা এসে জোটে, খায়।

ঠাকুর অস্ফুট 'মা মা' বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক হইলেন। খানিক বাদে বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, একদিন বেলুড় মঠ দেখে আসতে হবে। ২০।২৫ বছর আগে গেছি, আর যাইনি।

আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান, ইচকা ভিতর পূরা ভাণ।

মায়া থাকতে জ্ঞানের কথা বলা ঠিক্ নয়। জ্ঞান উপলব্ধি হয়নি, কথা দুটো মুখস্থ থাকতে পারে। কিন্তু অবস্থার উপলব্ধি হয়নি। তুলসীদাসের কথা আছে, **সাধু হ'য়ে স্ত্রীতে আসক্তি, সন্ন্যাসী হ'য়ে সঞ্চয়-বুদ্ধি, গৃহী হ'য়ে জ্ঞানের কথা, এ তিনই ভয়ানক।** সাধুর স্ত্রীতে যদি আসক্তি থাকল, সাধুত্ব থাকবে কি ক'রে? যার ভাবে আছে, তারই ছাপ লাগবে। সন্ন্যাসী মানে, সম্যকভাবে ত্যাগী; অথচ তাতে থাকল সঞ্চয়। কাজেই ত্যাগী কি ক'রে হবে? আর গৃহী, স্ত্রী পুত্র, অর্থ, দেহের মায়ার মোহিত

হ'য়ে আছে। বললে, 'সব অনিত্য' ; অথচ তাতে নিত্যতা বোধ রয়েছে। এ তিনই বড় ভয়ানক অবস্থা। অবশ্য অবস্থা আছে, 'কামিনী সঙ্গ করবে, না হইবে কাম'। সে সাধারণের জন্য নয়। ভেতর থেকে অবস্থা এলে তখন। তখনই অবস্থার পূর্ণতা হ'ল। এ ভাব না আসলে পূর্ণতা আসবে না। নয় ত দুর্ব্বল, ভয় আছে। বালক, তার কামিনী দেখে কাম হয় না। কারণ, কামের বৃত্তি নেই। বৃত্তি থাকতে কামিনী-সঙ্গ ভয়ানক জিনিষ।

তবে সংসারীদের পক্ষে তা নয়। তাদের নিয়ম করতে হবে। তাঁর শরণাগত হ'লে তিনি সব ক'রে দেন। শরণাগতও ত সংসারী হ'তে পারে না ; বহুর শরণাগত হ'য়ে আছে যে। তাই কিছু নীতি নিতে হয়।

এক সংসারী শুকদেবের কাছে উপদেশ নিতে গিয়েছিল। বললে, "আপনি বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে কিছু হবে না। তবে আমাদের কি উপায় ? আমাদের ত স্ত্রী-পুত্র রয়েছে ; উদর আছে, খেতে হবে ; লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র চাই ; শয়নের শয্যা চাই, সবই ত অর্থ।" শুকদেব বললেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ চাই বটে, কিন্তু তোমাদের জন্য সে নিয়ম নয়। সংসারীর পক্ষে সে নিয়ম খাটবে না। সহধর্ম্মিণী যে স্ত্রী, সে কামিনীর মধ্যে নয় ; আর উদরান্ন নির্ব্বাহের জন্য যে অর্থ, সে কাঞ্চনের মধ্যে নয়। কামিনী মানে, যার আকর্ষণে রিপুর উত্তেজনা করে ; যে স্বামীকে অধীন ক'রে তার বাসনা পোরাবার চেষ্টা করে ; অভাব বাড়িয়ে দেয় ; কোন অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকে না ; দেহি দেহি পুনঃপুনঃ ; এটার পর সেটা লেগেই আছে ; যে ঈশ্বরোপাসনার বিঘ্নকারিণী ; সেই হ'চ্ছে কামিনী। আর উদরান্নের জন্য, স্ত্রী-ছেলে প্রতিপালনের জন্য যে অর্থ, তা কাঞ্চন নয়। কিসে তাদের সুখে রাখব, বাসনা-কামনা পোরাব, কিসে বেশী টাকা আসবে, এই চিন্তা ঠিক্ নয়। এতেই অশান্তি।

তবে অর্থ না হ'লেই যে চলে না, তা নয়। সংসার থাকে ত সামান্য রোজগার কর। নয় ত অর্থ ছাড়াও চলে। যদি বল ক্ষুধা

আছে, আহার্য্যের অর্থ চাই। তা রসনা-তৃপ্তির জন্য যদি আহার কর, 'অমুকটী খাব না, তমুকটী খাব;' তবেই পয়সা চাই। কারণ, নইলে ঠিক্ জিনিষ পাবে না। আর যদি ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য আহার কর, যা তা দিয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তি ক'রে নাও। ভাল এসে যায়, খাও। না আসে, সে জন্য ব্যস্ত হবে না। আর নয় তাঁতে নির্ভর কর। তাঁতে ঠিক্ থাক, তোমার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জিনিষ এসে যাবে। তাও না পার, সামান্য আহারের চেষ্টা কর। পশুপক্ষীরা ত আহার করছে। তাদের কে দিচ্ছে? তাও না জোটে, গাছের পাতা আছে, খাও; বৃক্ষের ফল আছে, এর কেউ মালিক নেই, আহার কর। নদীর জল আছে, পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ কর। আর তাঁতে মন রেখে দাও।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, সোমদেব, যুগল আসিলেন।

ঠাকুর। এস, তিনকড়ি এস; সোমদেব, যুগল এস; বস সব। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। কথা চলিতেছে।

ঠাকুর। আর লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র; যশ, মান, দেহসুখ, এ সব থাকতে অবশ্য অর্থ চাই। 'ভাল কাপড় ভিন্ন পরতে পারব না।' তার জন্য অর্থ রোজগার করবে। শুধু লজ্জা-নিবারণের জন্য যদি হয়, তা'হলে যা তা দিয়ে লজ্জা-নিবারণ করতে পার। ভাল বস্ত্র যদি জোটে, পর; না জোটে, চিন্তা রাখবে না। আর নয় শ্মশানে মড়ার বস্ত্র ফেলে যায়, তাই দিয়ে কৌপীন কি যা হয় একটা পরে থাক। তাও না জোটে, দিগম্বর থাক; না হয় সংসারী তোমার কাছে আসবে না। তা সংসারীর সঙ্গে ব্যবহার তিনি যদি রাখতে চান, তবে বস্ত্র জুটিয়ে দেবেন।

আর শয্যা; যতক্ষণ দেহসুখ আছে, রোজগার কর, শয্যার ব্যবস্থা কর। নয় ত যা জোটে তাতেই শুয়ে পড়। তা ছাড়া ভূশয্যা রয়েছে, ঘুমিয়ে নাও। নিদ্রার জন্যেই ত শয্যা; তাতেই হবে। দেহকে মেলা বাড়াবার কি দরকার? যদি সাধন করতে যাও তবে ঠিক্ ঠিক্ ভাব নিলে অর্থের আবশ্যক হয় না।

তবে এ সব ত সাধনার কথা। তোমাদের তা নয়। **তোমাদের চাই সঙ্গ। সদ্‌গুরুর সঙ্গ।** তাতে বৃত্তি সব শক্ত হবে। কামনা-বাসনা নষ্ট হবে। শুধু তাই নয়; ছোট বালক যেমন পিতার কাছে থাকলে তার বোধ না থাকলেও, পিতা তাকে দেখেন, সর্ব্বদা সতর্ক করেন, 'এদিকে গর্ত্ত আছে, যেওনা, পড়ে যাবে'; তেমনি গুরু সর্ব্বদা লক্ষ্য রেখে সব বিপদের মধ্যে চালিয়ে নেন।

তিনকড়িবাবুর সঙ্গে কথা হইতেছে। তিনি একজন বড় অভিনেতা। ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করেন। ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন। মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন। তাঁহার অভিনয় ঠাকুরের খুব ভাল লাগে। তাঁহাকে বলিতেছেন,—

ঠাকুর। এত লোকের মন মুগ্ধ করছ, এ সোজা কথা নয়। গীতাতেই আছে—

দশে যারে মানে গণে, দশে যারে জানে,
তার ভেতরে তাঁর বিভূতি অধিক পরিমাণে।

মানুষের মনকে আকর্ষণ করা, এও একটা শক্তির জিনিষ। সব আধারে তা হয় না।

খিদিরপুরের পচু, সুরথ ও তাঁহার ভাই আসিয়াছেন। তিনকড়িবাবু ভাল গায়ক; তাঁহার গান হইতেছে।

১। দুরন্ত বালকে কিগো মা হ'য়ে কি পায়ে ঠেলে।
অশান্ত হবে মা শান্ত তোমার ওই রাঙ্গা চরণ পেলে॥
তুমি যে আমারি মা, তুমি গো জগতের মা,
একবার কোলে তুলে নে মা,
আমি যে তোর আব্দারে ছেলে॥

গান শেষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, "একটাতে ত হবে না।" আবার গান হইতেছে।

২। জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত করেছ জগতজন।
—(৩১১ পৃষ্ঠা)।

আরও একটী গান হইল। ঠাকুর বলিলেন, "তুমি একটী কাজ অন্যায় ক'রে ফেললে; তিনটী গেয়ে ফেললে।" (সকলের হাস্য)।

তিনকড়িবাবু আবার হারমনিয়াম নিলেন। গাহিতেছেন।

৪। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে—ইত্যাদি।

বেশ ভাবের সঙ্গে গান করেন। ঠাকুর প্রশংসা করিতেছেন। সকলেরই আনন্দ হইল।

ষ্টারে শ্রীকৃষ্ণ নাটক হইতেছে। সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন;—

ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ তিন গুণের খেলা দেখিয়েছেন। কখনও তামাসিক বৃত্তিতে ধ্বংস করছেন; রাজসিক নিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করছেন; আবার সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে বসে আছেন। যখন যে বৃত্তি নিচ্ছেন, তখন ঠিক্ সে অনুযায়ী কাজ করছেন।

তিনকড়ি। সবটাতেই কামনা-শূন্য।

ঠাকুর। সে ত বটেই। কামনা ত থাকবেই না; গুণে লিপ্ত নন। "হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি।" গুণ নিয়ে খেলা করছেন কিন্তু গুণ স্পর্শ করতে পারছে না; নির্লিপ্ত।

এই ত বৃন্দাবন থেকে যখন মথুরায় যাচ্ছেন, এত যাদের ভালবাসতেন, যারা তাঁর জন্য কাঁদছে—গোপিকারা কাঁদছে—তা ফিরেও তাদের দিকে তাকাচ্ছেন না। যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তাতেই মজে আছেন। যেই ছেড়ে গেলেন, আর তার চিন্তা নেই।

তিনকড়ি। কুরুক্ষেত্রের সিন (Scene-দৃশ্য) বেশ দিয়েছে।

ঠাকুর। ওখানে রজোগুণের কাজ করছেন। 'উত্তিষ্ঠ, বধ।' অর্জ্জুনের শোক, মোহ এসেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরদের দেখে ভাবছেন, স্বজনগণকে বধ ক'রে কাদের নিয়ে রাজত্ব করব। এদের বধ করলে বংশ নাশ হবে। তাতে কুল-স্ত্রী নষ্ট হবে, বর্ণসঙ্কর হবে। কাজেই যুদ্ধ ক'রে দরকার নেই। আমি রাজত্ব চাই না।

বনেই যাব।' এই শোক, মোহ এসেছে। তখন কৃষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে, অজ্ঞান তোমায় ছেয়ে ফেলেছে। সত্ত্বগুণীর মত বাক্য ব্যবহার করছ, কিন্তু তোমাকে তমোগুণে অধিকার করেছে; শোক, মোহ এসেছে। এখন বলছ সব ছেড়ে বনে যাবে, কিন্তু তোমার প্রকৃতি কাজ করবে। যখন দুর্য্যোধনাদি কাপুরুষ বলে নিন্দা করবে তখন থাকতে পারবে না। তাই বলছি, রজোগুণ তোমার ধর্ম্ম, তার কাজ কর। উত্তিষ্ঠ, বধ। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহ।' সত্ত্বগুণ তোমার ধর্ম্ম নয়। সে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তুমি ক্ষত্রিয়। রজোগুণই তোমার ধর্ম্ম। সে অনুযায়ী কাজ কর।" এর আবার অন্য মানে আছে। স্বধর্ম্ম মানে আত্মার ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম হ'চ্ছে রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্ম ছেড়ে আত্মার ধর্ম্মে এস।

তা এ গীতা বোঝা, তার ভাব নেওয়া ভয়ানক শক্ত। তবে এ ভাল, তোমরা যা আছে তাই রেখেছ, জিনিষটাকে বিকৃত করনি। আর ত সব যা তা করছে। ঠিক্ ভাব ছেড়ে দিয়ে একটা অপর জিনিষ নিয়ে আসছে। এই ত সীতা দেখতে গেলুম, তার ভাবই পেলুম না। আমাদের হিন্দুস্থানে বাস। এখানকার যে রকম চাল-চলন, হাসি-কান্না, হাব-ভাব, সে সব দেখে আমাদের সে রকম অভ্যাস। বিলিতী ভাব আমরা বুঝতে পারি না। হ'তে পারে সে ভাব ভাল। রামকে আমরা আমাদের ছাঁচেই গড়েছি। তাঁর মধ্যে যদি ঠিক্ সে ভাব আমরা দেখতে না পাই তবে ভাল লাগবে কেন? বিদেশী ভাবে অভিনয় খুব ভাল হ'চ্ছে। তা একটা ঐতিহাসিক চরিত্র নিলেই হ'ত। তাতে হয়ত ভাল লাগতে পারত। কিন্তু রামকে নেওয়ার দরুণ ভাল বলে বোধ হ'ল না। কারণ, রামকে যে অন্য ভাবে প্রাণের মধ্যে গড়া রয়েছে।

আর যে একটা ধর্ম্মনীতি বা উপদেশ গ্রহণ করবে, তারও কিছু নেই। বরং বিরুদ্ধ ভাব সব লেখা রয়েছে। গুরু-শিষ্যের ব্যবহার উল্টো হ'য়ে গেল। দেখ, বশিষ্ঠকে কি ভাবে সাজিয়েছে। যে বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্র মানছেন;—বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বধ করবেন বলে বশিষ্ঠ-মেধ

যজ্ঞ করবেন। তার হোতা কেউ হ'তে চায় না। বশিষ্ঠের ধ্বংসের জন্য কে হোতা হবে? বশিষ্ঠকেই বললেন। বশিষ্ঠ রাজী হলেন; বললেন, "তোমার যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকবে? আমিই হোতা হব।" যজ্ঞ হ'চ্ছে, বশিষ্ঠ মন্ত্র পড়ছেন; বিশ্বামিত্র প্রথম আহুতি দিলেন। দ্বিতীয়বার বশিষ্ঠ মন্ত্র পড়ছেন; বিশ্বামিত্র আহুতি দিলেন। তৃতীয় আহুতি দিলেই বশিষ্ঠের মুণ্ড খসে পড়বে। তখন বিশ্বামিত্রের প্রাণ কেঁপে উঠল। বিশ্বামিত্র বারণ করলেন। বললেন, "বশিষ্ঠ, তোমার হিংসা করছি, তুমি তবু আমার মঙ্গল চিন্তা করছ, যথার্থ তুমিই ব্রাহ্মণ, আমি ব্রাহ্মণ নই। যজ্ঞ থাক, আমি তোমার অনিষ্ট করতে পারব না।"

তা দেখ, এই যে অবস্থার লোক, তাঁকে কি সাজিয়েছে। দশরথ, রাম প্রভৃতি যে বশিষ্ঠকে কত সম্মান ক'রে গেছেন, সেই বশিষ্ঠকে, সাধারণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যেমন আজ কালকার ধনীরা ব্যবহার করে, সেই ভাবে গড়েছে। ঋষিদের সঙ্গে রাজারা কি ভাবে ব্যবহার করতেন? যাঁদের আইন, দায়ভাগ প্রভৃতি রাজশাসন এখনও চলছে, যে বশিষ্ঠ এক কথায় রামকে তীব্র বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে রাজত্বে নিয়ে এলেন, যাঁর বুদ্ধিতে রাজকার্য্য পরিচালনা হ'ত, সেই বশিষ্ঠের সঙ্গে রামচন্দ্রের যথেচ্ছা ব্যবহার। আজ কালকার সাধারণ ব্রাহ্মণের সঙ্গেও লোকে যে ব্যবহার করে না, আর রামচন্দ্রের মত মহাত্মা, যাঁকে তুলসীদাস প্রভৃতি উপাসনা করে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রে গেছেন, সেই রামের বশিষ্ঠের সঙ্গে এ ভাবে ব্যবহার দেখে প্রাণে বড়ই অশান্তি হয়। তা দেখ, কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হয়েছে।

এইখানে একটা কথা উঠিল। অনেকেই বলিলেন, "সীতা নাটকে রামকে কি রকম নীচু করেছে! শম্বুক তাঁরই তপস্যা করছে, আর রাম জেনে শুনে তাকে নিষ্ঠুরের মত মেরে ফেললেন। কি রকম বিকৃত করেছে!"

তখন ঠাকুর শম্বুক বধ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর। শম্বুক বধের সেখানে বাল্মিকী রামায়ণে আছে, ব্রাহ্মণের

ছেলের অকালমৃত্যু হ'ল ; ব্রাহ্মণ এসে রামকে ধরলে, "কেন তোমার রাজ্যে অকালমৃত্যু হ'ল ? চারটী কারণে এর অকালমৃত্যু হ'তে পারে। এক, পুত্রের পাপে তার অকালমৃত্যু হ'তে পারে ; নয়ত পিতার পাপে পুত্রের অকালমৃত্যু হ'তে পারে অথবা রাজার পাপে অকালমৃত্যু হ'তে পারে ; কিংবা কোন প্রজার পাপে অকালমৃত্যু হ'তে পারে। তা আমার পুত্র ত বালক, তার আর কি পাপ হবে ? আমিও খুঁজে দেখলুম, আমার কোন পাপ নেই। হয় তোমার পাপে আমার পুত্রের অকালমৃত্যু হয়েছে, নয়ত তোমার রাজ্যের কোন প্রজার পাপে হয়েছে। কোন রাজার রাজ্যে অকালমৃত্যু নেই, তোমার রাজ্যে কেন হ'ল ? যদি আমার পুত্রের জীবন না পাই, আমি অনাহারে তোমার এখানে প্রাণ ত্যাগ করব। তুমি এর ব্যবস্থা কর ; নয় ত ব্রাহ্মণ-হত্যা হবে।"

তখন তিনি নারদ-বশিষ্ঠাদি সবকে ডাকালেন। বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিদের করজোড়ে অভিবাদন ক'রে সম্মানপ্রাপ্ত আসনে বসালেন। তাঁদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নারদ যুগ হিসাবে চতুর্ব্বর্ণের ক্রিয়ার কথা বলতে লাগলেন।

"দেখ, সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করতেন। সে সময় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতি তপস্যা করত না। সত্যযুগ তাঁদের তপঃ-প্রভাবে জাজ্বল্যমান এবং অজ্ঞানরহিত ছিল। সে সময় ব্রাহ্মণগণেরই একাধিপত্য ছিল। তাঁরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিকালজ্ঞ এবং অমর ছিলেন। সত্যযুগের অবসানে মানবগণের ব্রাহ্মণত্ব-বুদ্ধি শিথিল হওয়ায় ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হ'ল। তখন পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল-সমন্বিত হ'য়ে ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করলেন। যে সকল মহাত্মারা ত্রেতাযুগে তপস্যানুষ্ঠানে রত ছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা সত্যযুগে তপোনিরত মহাত্মারা বীর্য্যবল এবং তপোবলে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। সত্য এবং ত্রেতা যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তপস্যা ও বীর্য্যে ক্ষত্রিয় হীন ছিলেন। কিন্তু ত্রেতাযুগে, কি তপোবল, কি

বাহুবল, সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমান। তবুও ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপোবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সর্ব্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করলেন। ধর্ম্মবহুল পাপরহিত ত্রেতাযুগ ধর্ম্মদ্বারা প্রদীপ্ত হ'লে অধর্ম্ম পৃথিবীতে একপাদ স্থাপন করলেন। সে জন্য লোকসকল অধর্ম্ম প্রাপ্ত হ'য়ে বর্ণাশ্রম প্রাপ্ত হ'ল, এবং তাদের রজোগুণমূলক দ্বেষের উৎপত্তি হ'ল। বৈশ্য আর শূদ্রের অপর বিষয় নেবার শক্তি না থাকায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবাই তাদের ধর্ম্ম হ'ল। এতেই তাদের উন্নতি হ'ত। দ্বাপরে অধর্ম্ম পৃথিবীতে দ্বিপাদ স্থাপন করলে ক্ষত্রিয় শক্তির খর্ব্বতা হবে। তখন বৈশ্যরা তপস্যায় নিরত হবে। কলিতে অধর্ম্মের ত্রিপাদ পৃথিবীতে স্থাপিত হ'লে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হবে। তখন শূদ্রের তপস্যায় অধিকার হবে। তা এখন ত্রেতা ; এখন ত শূদ্রের উপাসনার অধিকার নেই। কারণ, শূদ্র উপাসনা করলেই তাতে হিংসাযুক্ত কামনা থাকবে ; অপরের ধ্বংসকারী কামনা নিয়ে উপাসনা করবে। দেখ, তোমার রাজ্যে কোন শূদ্র উপাসনা করছে। সে জন্য এই অকালমৃত্যু হয়েছে। দুর্ম্মতি মানব যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম্ম বা অকার্য্য করে, সে নগরে অথবা রাজ্যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় এবং অকালমৃত্যু ঘটে। কাজেই সে রাজা এবং প্রজা উভয়েই নরকে যান। রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করলে, অধ্যয়ন, তপস্যা ও পুণ্যকাজের ষষ্ঠভাগ লাভ করেন। যে রাজা প্রজারক্ষা করেন না, তিনি কি ক'রে ষষ্ঠভাগ পাবেন ?" তাই রামকে বলছেন, "তুমি নিজ রাজ্যমধ্যে অনুসন্ধান কর। যেখানে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে দেখবে, তা যত্নপূর্ব্বক নিবারণ কর। তা'হলে তোমার ও তোমার প্রজাগণের ধর্ম্ম এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। এ বালকও জীবিত হবে।"

তখন রাম বিমানগামী রথে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করতে বেরুলেন। ঘুরতে ঘুরতে দেখেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতে এক জটাজূটধারী তপস্যা করছে।

সেখানে গিয়ে তাঁকে সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? কোন্ বর্ণ? কি জন্য তপস্যা করছেন, বলুন। আমি রাম, এ রাজ্য আমার অধিকারে; আমার জানবার অধিকার আছে।" তখন তিনি বললেন, "আমি শূদ্রবর্ণ। দেবতাদের নষ্ট ক'রে সশরীরে স্বর্গে গিয়ে রাজা হব, এই কামনায় তপস্যা করছি।" এ হিংসাযুক্ত-কামনাপূর্ণ তপস্যা হ'তে পারে না। শূদ্রের তপস্যায় সেই যুগে অধিকার নেই। কারণ, শূদ্র তপস্যা করলে সেটা কামনাযুক্ত হিংসাপূর্ণ তপস্যা হবে। তাতে অপরের অনিষ্ট হবে; প্রজার অমঙ্গল হবে। এজন্যই ঋষিরা রামকে এ উপদেশ দিয়েছেন। রাম তাই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য শম্বুককে বধ করলেন। তখন দেবতারা এসে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন, পুষ্পবৃষ্টি করলেন। এদিকে যেই এর প্রাণ গেছে, অমনি ব্রাহ্মণ-বালক বেঁচে উঠেছে।

এঁরা করেছেন, সীতার বনবাসের সময় রাম শোকে বিহ্বল। কিন্তু দেখ, সীতাহরণের সময় রাম শোক করেছিলেন বটে, কিন্তু সীতার বনবাসের সময় রামের সে ভাব মোটেই ছিল না। বাল্মিকী রামায়ণে আছে,—রাম মন্ত্রী, পরিষদ্ প্রভৃতি সকলকে আহ্বান ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজ্যের প্রজারা আমার সম্বন্ধে, সীতা ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কি বলছে?" তাঁরা প্রথম চুপ ক'রে রইলেন। তার-পর তিনি বললেন, "তোমরা নিঃসঙ্কোচে বল, প্রজাদের আমাদের সম্বন্ধে কি রকম ভাব?" তখন একজন বললে, "আপনার কিংবা লক্ষ্মণ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলছে না বটে, কিন্তু সীতা সম্বন্ধে অনেকেই বলছে।" রাম বললে, "কি বলছে আমায় বল। কোন সঙ্কোচ ক'রো না।" সে বললে, "প্রজারা বলছে,—সীতা এতদিন একাকিনী রাবণের গৃহে রইলেন, আর রাম কোন দ্বিধা না ক'রে তাঁকে ঘরে আনলেন। যে নারী এতকাল পরগৃহে থাকলেন, তাঁকে ঘরে আনতে যদি দোষ না হয়, তবে এ দেখে ত আমাদের স্ত্রীরাও কোনও শাসন মানবে না। রাজা যদি এ ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমরাই বা কি ক'রে

তাদের বলি। তিনি রাজা, ধনী, যে রকম ইচ্ছা করতে পারেন; কিন্তু এতে যে আমাদের বিপদ।" রাম সব শুনলেন। শুনে ভাবলেন, 'যথার্থই ত; আমারই অন্যায় হয়েছে। আমি না হয় সীতাকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু প্রজারা কি ক'রে বিশ্বাস করবে? তারা ত জানে না। এ আমারই অন্যায়। এতে পিতৃপুরুষরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। নিজের স্ত্রীর জন্য প্রজাদের অসন্তুষ্ট করছি।' এই ভেবে তিনি লক্ষ্মণকে ডাকালেন। লক্ষ্মণ আসতেই বললেন, "দেখ, লক্ষ্মণ, তোমাকে যে আদেশ করব, দ্বিরুক্তি না ক'রে তা পালন করবে। যদি কোন আপত্তি কর বা অমান্য কর, তবে আর তোমার মুখদর্শন করব না।" তারপর লক্ষ্মণকে প্রজাদের কথা বললেন। আর বললেন, "সীতাকে বনবাস দেব। তাঁকে গঙ্গাতীরে রেখে এস। তিনি ঋষিদের আশ্রম দেখতে চেয়েছিলেন; সেই কথা বলেই নিয়ে যেও। রেখে আসবার সময় বলো যে, আমি জানি তিনি সতী; আমি কলঙ্কিনী বলে তাঁকে বনবাস দিচ্ছিনে। তবে প্রজার মনোরঞ্জন রাজার কর্ত্তব্য, কাজেই সেজন্য আমাকে এ কাজ করতে হ'চ্ছে। আমার বিশ্বাস আছে তিনি সাধ্বী সতী।

সীতাও আসবার সময় লক্ষ্মণকে বলছেন, "আমার আর কিছু দুঃখ নেই। তবে ঋষিরা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, রাম তোমায় কেন ত্যাগ করলেন?' তখন আমি কি বলব? আমি এখনই গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করতাম, কিন্তু আমার পেটে তাঁর সন্তান রয়েছে; কাজেই সে উপায় নেই। তিনি যে নিন্দা-ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তিনিই আমার পরমগতি। তাঁর যাতে নিন্দা বা অপবাদ হয়, এ রকম কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য নয়। তাঁকে বলো, তিনি ভাইদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেন, প্রজাদের সঙ্গেও যেন সর্ব্বদা সে রকম ব্যবহার করেন। প্রজাদের ধর্ম্মরক্ষাই তাঁর ধর্ম্ম। তাতেই তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করবেন। লক্ষ্মণ, আমি প্রজাদের নিন্দাবাদ এবং তাঁর জন্য যেরূপ অনুশোচনা

করি, নিজের দেহের জন্যও সেরূপ করি না। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, পতিই গতি, পতিই বন্ধু, এবং পতিই গুরু। কাজেই সর্ব্বতোভাবে প্রাণ দিয়েও পতির প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। তাঁকে বলো, আমার শোকে অধীর হ'য়ে যেন রাজকার্য্যে শৈথিল্য না করেন। রাজকর্ত্তব্য যেন ঠিক্ ঠিক্ পালন করেন। আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন জন্মে জন্মে তাঁরই মতন স্বামী পাই। তাঁর চরণে যেন অটুট ভক্তি থাকে।"

লক্ষ্মণ ফিরে এসে দেখলেন, রাম একটু অধীর হ'য়ে বসে আছেন। অমনি বললেন, "একি! আপনার এ ভাব! প্রজারা টের পেলে কি বলবে? স্ত্রীর শোকে রাজকর্ত্তব্যে অবহেলা! এ ত আপনার উপযুক্ত নয়। দেখুন, কালের গতিই এই। অসীম ঐশ্বর্য্য হ'লেও কালে তা নষ্ট হ'য়ে যায়; অতিশয় উন্নতি হ'লেও পতন হয়; সংযোগ হ'লেই শেষে তার বিয়োগ ঘটে; জীবের জীবনও কালে বিলয় পায়। সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, ধনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সকলেরই অবশ্যম্ভাবী। আপনি মনোবৃত্তিকে সাংসারিক দুঃখ থেকে নিবৃত্তি করতে পারেন। আপনি যখন সমস্ত লোককেই শিক্ষা দিতে সক্ষম, তখন যে নিজের শোক দূর করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আপনার ন্যায় মহাপুরুষরা এরূপ শোকে অধীর হন না। আপনি যে অপবাদ-ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করেছেন; যদি সেই পরগৃহ-বাসিনী পত্নীর জন্য সর্ব্বদা শোক করেন, তা'হলে আপনার অপবাদ দূর হওয়া দূরে থাকুক, তা আবার প্রকারান্তরে নগরে ঘোষিত হবে। সুতরাং আপনি ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক এ শোকবুদ্ধি ত্যাগ করুন; আর বিলাপ করবেন না।" রাম তখনই সে ভাব ত্যাগ ক'রে বললেন, "ঠিক্ বলেছ লক্ষ্মণ, রাজকার্য্যে ত্রুটী অমার্জ্জনীয়।" এ বলে একটী গল্প বললেন।

"এক ব্রাহ্মণের একটী গরু, নৃগ নামে এক রাজা দান ক'রে ফেলে-ছিল। ব্রাহ্মণ সেটা খুঁজতে খুঁজতে আর এক ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে পেল। সেই ব্রাহ্মণ বললে, রাজা তাঁকে সেটা দান করেছেন।

এ নিয়ে দু'জনে ঝগড়া। মীমাংসার জন্য নৃগ রাজার কাছে এসে, রাজদ্বারে অনেকদিন অপেক্ষা ক'রেও রাজার দেখা পেল না। তাই রাজাকে অভিশম্পাত করলে। তা এ আমারই অন্যায়। সব মন্ত্রী অমাত্যদের ডাক।" এই বলেই আবার রাজকার্য্যে মন দিলেন। তা দেখ, এ জিনিষকে কি রকম বিকৃত করেছে!

রামকে নিয়ে এ সব না করাই ভাল ছিল। যাঁকে বহুলোক মানছে, অনেকে পূজা করছে, তাঁকে নিয়ে যা তা করা কেন? একেই ত হিন্দুদের আজকাল এমন দুর্দ্দশা, রামায়ণ, মহাভারত কি জিনিষ তার খোঁজই রাখে না। তার ওপর থিয়েটারে (theatre-রঙ্গালয়) গিয়ে যদি এ রকম ধারণা নিয়ে আসে, তবে আর কি হবে?

এ সব দেখতে আমার ত মোটেই ইচ্ছা হয় না। সেবার এঁরা (ভক্তরা) পার্শী থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, রাম, বাগানে সীতাকে দেখে তাকিয়ে আছেন, আর লক্ষ্মণ তাঁকে ঠাট্টা করছে। দেখ, কি অবস্থা! বিশ্বামিত্র রামকে জনকের সেখানে নিয়ে গেলেন। আলাদা বাড়ীতে আছেন। সীতার সঙ্গে দেখাও নেই। এখন রাম সকালে বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সীতাও সখীদের নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছেন। রাম সীতাকে দেখে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন। সীতাও তাঁকে দেখছেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ একটা ফুল নিয়ে রামকে শুঁকিয়ে ঠাট্টা করছে। বোঝ ব্যাপার। যে লক্ষ্মণ বড় ভাইকে কি ভাবে সম্মান করতে হয় তার আদর্শ-স্বরূপ, তাঁকে কিরূপ ভাবে যেন এয়ার ভাইদের মতন সাজিয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রটা ত শুধু থিয়েটার বা গল্পের জিনিষ নয়। এর মধ্যে পদে পদে শিক্ষা, এবং সমাজে চলতে হ'লে, দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী কি কি ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হয়, সে সবই দেওয়া আছে। তাই মনে হয়, থিয়েটারটা যা খুশী তা না হ'য়ে, শুধু একটা রং তামাসা বা অর্থাগমের পন্থামাত্র না হ'য়ে, এখানে যদি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঠিক ঠিক বজায় রেখে কার্য্য হ'ত, তবে অনেক উপকার হ'ত। লোকে থিয়েটার

দেখার ছলে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হ'তে পারত। শাস্ত্রকে কখনও বিকৃত করতে নেই। শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় পুস্তক খুব বিবেচনা ক'রে লিখতে হয়। যাঁকে বহুলোক মানে, নিজের বিশ্বাস না থাকলেও যা তা লিখে তাদের প্রাণে আঘাত দিতে বা তাদের ভাব ভঙ্গ করতে নেই। থিয়েটার হিসাবে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের বিকৃতি এবং ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ বলেই এ সব দেখে প্রাণে অশান্তি হয়।

রাত প্রায় ১০টা হইল। তিনকড়িবাবু, সোমদেব, যুগল উঠিল।

ঠাকুর তিনকড়িবাবুকে বলিতেছেন, "বেশ; তোমার অ্যাক্টিং (acting-অভিনয়) আমার খুব ভাল লাগে।

তিনকড়িবাবু। আপনি একবার পায়ের ধুলো দিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবেন; তাতেই আমার ভাল হবে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ক'টা জায়গায় কি রকম ভাব নিয়ে বলতে হবে, আমায় একটু বুঝিয়ে দেবেন। আমি বই নিয়ে আসব।

ঠাকুর। আচ্ছা বেশ, নিয়ে এস। (সোমদেব ও যুগলকে) কি, তোমরাও উঠছ? তোমাদের জু-গার্ডেন একবার দেখে আসতে হবে।

তাহারা জু-গার্ডেনে কাজ করে। সোমদেব জু-গার্ডেনের সহকারী পরিদর্শক (Asst. Superintendent)। তাহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। ঠাকুর পরে বলিতেছেন।

ঠাকুর। আমি ইদানীং যত থিয়েটার দেখেছি, তার মধ্যে তিনকড়ির অ্যাক্টিং আমার সবার চেয়ে ভাল লাগে। আর থিয়েটারে থেকে ওরকম চরিত্র রাখা, এ বড় দেখা যায় না। খুব শক্তির কথা।

ঠাকুর কথায় কথায় সোমদেব ও তাহার ভাইদের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। সোমদেবের ভাব বড় সুন্দর। আমার ওপর খুব ভক্তি বিশ্বাস। আমাকে দেখবার জন্য সব কাজ ফেলে ছুটে আসে। শান্ত, সরল স্বভাব। মঠের ওপর তার বড়ই লক্ষ্য। সকলের ওপরই তার একটা ভালবাসা আছে। এ রকম সৎছেলে বড় কম দেখা যায়।

তারা সব ক'টী তাই-ই ভাল। সুরদেবের আমার ওপর খুব ভক্তি। অসুস্থ শরীরেও আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসে। বড় সরল স্বভাব। গণদেব খুব বুদ্ধিমান। তারও আমার ওপর খুব ভক্তি। কাশীতে গিয়ে পর্য্যন্ত আমায় দেখে এসেছে। এদের দেখলে বড় আনন্দ হয়।

১০টার পরে আরতি হইলে, সকলে বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ২০শে মে, ১৯২৬ ইং;
বৃহস্পতিবার, শুক্লা-অষ্টমী।

কলিকাতা।

প্রাতে মঠে—'শ্রীম'র সঙ্গে কথা।

পরমহংসদেবের কথা—ঠাকুরের অসুখের কথা—পরমহংসদেবের বেদান্ত শ্রবণ—সমাধি অবস্থা—সংসারীর প্রতি উপদেশ—শুকদেব ও গৃহী—গুরু ছাড়া উপায় নাই—পরমহংসদেবের অসুখের কথা—ভক্তদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা—ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে ঠাকুর সম্বন্ধে কথা।

বৈকালে মঠে—ডাক্তার অমিয়মাধব ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ঠাকুরের অসুখের কথা—কীর্ত্তন—সঙ্গীত ও ভাব।

সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় পথে মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীম) সঙ্গে দেখা হয়। মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার কাছে আসিলেন। দুইজনে কথা কহিতে কহিতে মঠের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। মাষ্টার মহাশয় বিদায় লইতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন—

"চলুন না, ওপরে একটু বসবেন।"

দোতলায় ঠাকুরঘরে আসিয়া শ্রীম ঠাকুরের আসনকে প্রণাম করিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে দুইজনে কথা হইতে লাগিল।

শ্রীম। আপনার শরীরের জন্য ভাবি। মাঝে মাঝে আসব মনে হ'লেও, পাছে আপনার কষ্ট হয় তাই ইতস্ততঃ করি।

ঠাকুর। আপনার যখন ইচ্ছা আসবেন। এ আপনার নিজের জায়গা মনে করবেন।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "উকীল দেখলে জজ মনে পড়ে।" এই খোঁজে বেড়াই কোথায় তাঁর চিন্তা হ'চ্ছে। গদাধর আশ্রমে যারা আসে, তাদের বলি 'ওখানে (ঠাকুরের কাছে) যাও। সেখানে রাতদিন কেবল ঈশ্বরের চিন্তা হ'চ্ছে। সেখানে গেলে প্রাণ শীতল হবে।' ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "যাঁরা সব ত্যাগ ক'রে ভগবৎ চিন্তা করেন, এমনতর লোক না হ'লে প্রাণ শীতল হবে কেন?"

ঠাকুরের অসুখের কথা হইতেছে।

শ্রীম। ডাক্তারেরা কি বলে?

ঠাকুর। তারা ত আমার ধাত বোঝে না। আর ওষুধ খেলেও কোন কাজ হয় না, বরং বেড়ে যায়।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, ঈশ্বরচিন্তা যাঁরা করেন, তাঁদের ধাত সব আলাদা। রক্তের গতি আলাদা হ'য়ে যায়। আপনি যেমন বলেন, 'ওষুধ খেলেই গরম হ'য়ে যায়।'

ঠাকুর ডাক্তার সাহেবকে পরিচিত করিয়া দিলেন। "ইনি একজন বড় ডাক্তার। বড় সরকারী কর্ম্মচারী।" (Asst. Director of Public Health). তারপর বলিলেন।

"ডাক্তারের বাড়ী আছি, তবু ত কিছু হ'চ্ছে না।" (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার সাহেব। ঠাকুর যদি ইচ্ছা করেন সারাতে, তবেই সারে।

শ্রীম। রক্তের গতি আলাদা কিনা, পুঁথির সঙ্গে মিলবে না। ঠাকুর দেওয়ালে পরমহংসদেবের বড় ছবিটী দেখাইয়া বলিলেন,—

ঠাকুর। এই ছবিটী বড় ভাল। এইটী আমার বেশ লাগে।

শ্রীম। ভক্তরা যেখানে থাকেন সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়।

ঠাকুর তাঁহার পার্শ্বস্থ সিংহাসনের ছোট ছবি দেখাইয়া বলিলেন,—

ঠাকুর। এখানে একটী ছবি আছে। তিনি (পরমহংসদেব) আছেন, আর মা কালী।

শ্রীম। হ্যাঁ, মা আশীর্ব্বাদ করছেন।

মাষ্টার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ, গতবার গিয়েছিলুম। বছরে একবার ক'রে যাই।

শ্রীম। (ডাক্তার সাহেবকে) বেলুড় মঠে একদিন নিয়ে যাবেন। শরীর খারাপ; বুঝে সুজে নিয়ে যাবেন। অনেকে তাঁকে সেখানে ডাকছে। সবই যে আমাদের সঙ্গে মিলবে তা ত নয়। নানা পথ আছে; ভক্তি, জ্ঞান-বিচার। ঠাকুর সকলকেই ভালবাসতেন। ব্রাহ্মসমাজেও যেতেন।

ঠাকুর। গীতাতেই ত আছে। 'যে ভাবে যে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।' ভাব ঠিক্ ঠিক্ রাখতে পারলেই হ'ল। বিশ্বাস যদি হয়, এ ভাবে তাঁকে পাব, সে বিশ্বাসই পাইয়ে দেয়।

শ্রীম। প্রকৃতি ত আলাদা হবেই। পেনেটীতে বৈষ্ণবদের সঙ্গে গিয়ে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। আবার তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত শুনলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনবেন কি না; মা বললেন, "শোন।" 'মা মা, ক'রে ডাকতেন, শুনে তোতাপুরী কাঁদত। সে বলত, "এ কি হ'ল। এত বিচার করি, তবু 'মা মা' শুনে কান্না আসে কেন?" দক্ষিণেশ্বরে একবার এক সাধু এসেছেন। তিন চার দিন থাকার কথা, তা দশ এগার মাস হ'য়ে গেল। যেতে চাইলে বলতেন, "দাঁড়াও, আমার বেদান্ত বোধ হোক।" বেদান্তের সার সংগ্রহ হ'য়ে গেল; 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' যতক্ষণ দেহাত্ম-বুদ্ধি আছে ততক্ষণ সে বোধ কি ক'রে হবে।

ঠাকুর। বেল পাকলে বোঁটা আপনি খ'সে যায়।

শ্রীম। এমন সহজ ভাবে বলতেন! লোকে কিন্তু শাস্ত্র পড়ে পড়ে হয়রাণ। আবার বলতেন, "একবারে কি ধারণা হবে? শুনে রেখে দাও। পরে তাঁর কৃপায় ধারণা হবে।"

ঠাকুর। গীতায় বলেছেন, 'সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়। যারা ভক্তিভাবে আমার সেবা করে, আমি তাদের উদ্ধার করি।' দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

শ্রীম। 'আমি'ত যায় না। তাই বলতেন, "থাক শালা দাস আমি হ'য়ে।"

ঠাকুর। মূল এক; তবে যতক্ষণ আমিত্ব-বুদ্ধি ততক্ষণ তুমিত্ব-বুদ্ধিও থাকবে।

শ্রীম। সমাধি হ'লে সে বোধ আসে।

ঠাকুর। ওই যে মিশে গেল। সমাধিতে মন মিশে গেল। আমিত্ব-বুদ্ধি আনে ত মন? মনেরই লয় হ'য়ে গেল। সে বোধ যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকবে।

শ্রীম। বলতেন, "সমাধির পর নেবে এলে বেদ-বেদান্ত সব খড় কুটো মনে হয়।"

ঠাকুর। জগৎই তখন চলে গেল। বেদ-বেদান্ত ত জগতের মধ্যে। তিনি ত বেদান্তের পার।

সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধায়।
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত, অদ্যাপি তথাপি জানিতে পারেনি।

মনের সেখানে লয় হ'য়ে যায়। সে গুণাতীত অবস্থা। কিছু বলতে গেলেই গুণের মধ্যে আসতে হয়।

শ্রীম। হ্যাঁ; বাক্য-মনের অতীত। আবার তিনি রূপ ধারণ ক'রে আসেন; কথা ক'ন। বিজয় গোস্বামীকে সমাধির পর বলছেন, "এই দেখ, কথা কচ্ছি; তিনি রূপ ধারণ ক'রে এসেছেন। মাইরি বলছি।" আবার বলতেন, "রসুনচৌকীতে যেমন একজন পোঁ ধরে থাকে, আর একজন নানা রাগ-রাগিণী বাজায়; আমি তেমনি নানা

রাগ রাগিণী বাজাব। কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি। কেন আমি শুধু 'সোহং সোহং' পোঁ ধরে থাকব ?"

ঠাকুর। হাঁ ; বলতেন, "একঘেয়ে হব না।"

শ্রীম। বলতেন, "মা, যদি ভক্তি না দাও তবে কি ক'রে থাকব ? দিন কাটবে কেমন ক'রে ? শরীর ত থাকবে না।" তাই ভক্তি ভক্তের জন্য শরীর রেখে দিয়েছিলেন। "কামিনীকাঞ্চন নিয়ে কি ক'রে থাকব মা। তা মা বলেছেন, তা নয়, শুদ্ধ ভক্ত আসবে ; যাদের কেবল ঈশ্বরের দিকে মন, এমন ভক্ত আসবে ; তাতে প্রাণ শীতল হবে।" গৃহী সন্ন্যাসী সকলকেই উপদেশ দিতেন। সন্ন্যাসীদের ত বলতেন, 'মেয়েদের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না।' গৃহীদের কত উপদেশ দিতেন, 'দুটী একটী ছেলে হ'লে ভাই বোনের মত থাকবে।' একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, "বেশী টাকা রোজগারের চেষ্টা করব কি ?" বলেছিলেন, "হ্যাঁ, করতে পার, যদি বিদ্যার সংসার কর। ভগবানের সেবা, দরিদ্রের সেবা, এ সব করবে।" দরিদ্রের সেবা বলতেন, দয়া বলতেন না। দয়া, সে ঈশ্বরের।

ঠাকুর। শুকদেবের কাছে এক গৃহী উপদেশ নিতে গিয়েছিল। বললে, "আপনি বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ; আমাদের সে কি ক'রে হবে ? আমরা ত ওরই মধ্যে আছি।" শুকদেব বললেন, "গৃহীর জন্য সে ধর্ম্ম নয়। সহধর্ম্মিণী যে স্ত্রী সে কামিনীর মধ্যে নয় ; আর উদরান্নের জন্য যে অর্থ সে কাঞ্চনের মধ্যে নয়।" যার আকর্ষণে কোন অবস্থাতেই কুলোয় না, 'দেহি দেহি পুনঃপুনঃ' রব ; এই আনছি, আবার আনতে হবে ; থাকল, আবার চাই ; কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট নয় ; সেই হ'ল কামিনী। যার আকর্ষণে তাঁকে ভুলিয়ে দেয় সেই কামিনী। তা ছাড়া সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়কারিণী। আর ভোগ-বিলাসের জন্য যে অর্থ, যাতে দিন দিন কামনা-বাসনা বেড়েই যায়, সেই হ'ল কাঞ্চন।

যতক্ষণ বাসনা আছে, কিছু রোজগার করতে হবে বই কি। তবে

টাকা ছাড়াই যে চলেনা তা নয়। খেতে যে অর্থ চাই তার মানে নেই। যদি রসনা-তৃপ্তির জন্যে খাও তবেই অর্থ চাই। ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য হ'লে অর্থের আবশ্যক হয় না। যাতে তাতে পেট ভরিয়ে নাও। যদি ভাল খাবার আসে, খাও; না আসে ত যদৃচ্ছা লাভের ওপর থাক। তাঁতে মন রেখে দাও। ক্ষুধা-নিবৃত্তির অন্ন আপনি এসে জুটবে। যদি তাও না পার, গাছের পাতা আছে, নদীর জল আছে, বৃক্ষে ফল আছে, এর কেউ মালিক নেই, তাই দিয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর। আর বস্ত্র; যশ, মান, দেহসুখের জন্য হ'লে, পোষাকের জন্য অর্থের প্রয়োজন। লজ্জা-নিবারণের জন্য যদি হয়, তা'হলে আপনি যা আসে তাই পর। চিন্তা রাখবে না। নয় ত শ্মশানে মড়ার কাপড় ফেলে যায় তাই নিয়ে কৌপীন ক'রে পর, অথবা দিগম্বর থাক। না হয় সংসারী তোমার কাছে আসবে না। চিন্তা-শূন্য হও; তাঁকে ডাক।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "বিদ্যার সংসারের জন্য টাকা রোজগার করবে, নিজের ভোগের জন্য নয়। ছেলেপিলে যেই একটু লায়েক হবে আর তাদের দেখবে না। পাখী যেমন ছানা হ'লে প্রথম এনে খাওয়ায়। যেই খুঁটে খেতে শেখে আর কাছে ঘেঁসতে দেয় না। এলে ঠুকরে দেয়। বাছুর বড় হ'লে কাছে এলেই গাই গুঁতিয়ে দেয়। নয় ত চিরকাল ওই করবে।" গৃহীদের জন্যই বেশী ভাবতেন। অপরদের কথা বলতেন, "ওদের কি, ওদের অতটা ঝঞ্ঝাট নেই। এদের জন্যই ভাবনা।" একজন সংসারী বলেছিল, "যা অবস্থা, এক এক সময় ইচ্ছা করে আত্মহত্যা করি।" ঠাকুর (পরমহংসদেব) বললেন, "কেন তা করতে যাবে গো? সদ্‌গুরুর কৃপা হ'লে সব দুঃখ যাবে। বাজীকর বাজী দেখায় না? হাজার গাঁট পাকান দড়ি। একে ওকে খুলতে দিলে, পারলে না। পরে বললে, 'তুমি একদিক ধর, আমি একদিক ধরি।' ধরে বললে, 'এবার ঘোরাও।' তখন সব খুলে গেল। গুরুর শরণাগত হও; এখনই সব যাবে। সে বাজীকর ধরলে সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে।" সেই গৃহী বললে, "তবে এত

ভাবছিলুম কেন মিছিমিছি।" আপনি বেশ একটা কথা বলেন; "বাছুরকে ধরলে গাই আপনি আসে।" গুরুর সেবাও তেমনি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুরের খুব আনন্দ হইয়াছে। চোখ মুখ ভাবপূর্ণ। কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মহাশয় আবার বলিতেছেন।

শ্রীম। গুরু না হ'লে উপায় নেই। Through Jesus (যীশাসের সাহায্যে); তিনি আর গুরু এক। যীশাসের কথা আছে, I and my father are one (আমি এবং আমার পিতা একই)। বেশ বলতেন, "যেমন গঙ্গা আর খাল, গঙ্গায় জোয়ার হ'লে খালেও হ'ল। গঙ্গায় ইলিশ মাছ, খালেও ইলিশ মাছ।" আবার বলতেন, "হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সবটাই যে ছুঁতে হবে তার মানে নেই। যে কোন একটা জায়গা ছুঁলেই হ'ল। যেখানে ভাল ঘাট টাট আছে সেখানে খানিকক্ষণ থাক।" ইংরাজি-শিক্ষিত দু'এক-জনকে বলতেন, "পা টা একটু টিপে দাও ত।" প্রথম বলতেন, "পা কামড়াচ্ছে, একটু দয়া ক'রে টিপে দাও।" পরে আস্তে আস্তে বলতেন, "এর (নিজের দেহের) ভেতর যদি কিছু থাকে তবে পায়ে হাত বুলুলে ভাল হবে।" মণিলাল মল্লিক যেত। ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিত শশধর যেতেন। উনি মণিলালকে বেদান্ত বলতেন। ঠাকুর বলতেন, "ওগুলো কি বলছ? তুমি হাজার বল, ও যাতে আছে সেই ভাল। দেখ, এক ব্রাহ্মণকে জোর ক'রে মুসলমান করেছিল। তাকে বললে, 'বল্ আল্লা।' সে আল্লা বলছে; কিন্তু মাঝে মাঝে 'জগদম্বা' বেরিয়ে পড়ে। তখন ওরা বলে, 'কি, জগদম্বা বলছিস্?' সে বললে, 'জগদম্বা আমার গলা পর্য্যন্ত আছে কিনা; তাই তোমাদের আল্লাকে যত ঢুকাচ্ছি, যাচ্ছে না, জগদম্বা ঠেলে ফেলে 'দিচ্ছে। (সকলের হাস্য)। পণ্ডিত শশধর খুব কর্ম্মকাণ্ডের কথা বলতেন। তিনি বারণ করতেন। "অত কর্ম্ম করতে বলো না। ল্যাজা মুড়া বাদ দিয়ে বলো। কলিতে অন্নগত প্রাণ; সব সংক্ষেপ করবে। তাঁর নামেই ফল হবে।" একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বীজমন্ত্র না হ'লে কি সিদ্ধ হয়?" তিনি তাকে

শুনিয়ে এক তান্ত্রিক সাধুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, "হয়; গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করলে সব হয়। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্।" তখন ওকে বললেন, "শুনে নাও।"

ঠাকুর আনন্দচিত্তে শুনিতেছেন। আবার ঠাকুরের অসুখের কথা উঠিল। মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের শরীরের জন্য খুব চিন্তিত। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন।

ডাক্তার সাহেব। (দেওয়ালে বড় ছবি দেখাইয়া) দুই বছর আগের ছবি দেখুন। আর এখন শরীর কি রকম হয়েছে।

শ্রীম। হ্যাঁ দেখছি, খুব খারাপ হয়েছে।

পরমহংসদেবের কথা আবার বলিতেছেন।

শ্রীম। ওঁর ভাগনে (হৃদয় মুখুজ্যে) যখন চলে গেল, তখন বলতেন, "আমার শরীর রক্ষা করবে কে মা ?, নিজে ত পারব না।" তখন যারা কাছে থাকত তারা সব ছেলে মানুষ। তারা ভাবত, 'তিনিই আমাদের দেখবেন। ক্রমে শরীর ভাঙ্গতে লাগল। বলতেন, "হৃদে যদি থাকত, এত লোক আসতে দিত না।" আমরা যেতুম, দুপুরে একটু শুয়েছেন, দেখেই অমনি উঠে বসলেন। আমরা বলতুম, "একটু বিশ্রাম করুন, তবে ত শরীর থাকবে।" তা শুনতেন না। যারা সব এসেছে তাদের দেখে ভাব উথলে উঠত। শেষকালে বলতেন, "শরীর আর থাকবে না; মা রাখবেন না। মা যদি শরীর রাখতেন, আরও গোটা কতক লোকের চৈতন্য হ'ত। তা মা রাখবেন না।" বলতেন, "মা, এখন কে দেখবে মা ? ওরা দেখবে ? ওদের সময় কই মা। নিজেদের সংসার রয়েছে; ওদেরই বা দোষ কি।" রাখাল মহারাজ কাছে থাকতেন। ঝাউতলায় বাহ্যে যেতেন। রাখাল গাড়ু নিয়ে যেতেন। গাড়ু বাইরে রেখেছেন।—ভাবে বিভোর হ'য়ে আসতে আসতে তারে লেগে পড়ে ঠাকুরের (পরমহংসদেবের) হাত ভেঙ্গে গেল। কলকাতা থেকে ডাক্তারেরা সব গেছে। মুহুর্মুহু সমাধি হ'চ্ছে। বলছেন, "মা, রাখালের ত দোষ নেই মা, ওর ত তার পর্য্যন্ত

যাবার কথা নেই। ওর দোষ নেই মা।” মার কাছে রাখালের দোষ কাটিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে সব অবস্থা আছে—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ—সব অবস্থা হ’তে দেখেছি। কলকাতা থেকে কুলপী বরফ নিয়ে যেত; তাই খেয়ে গলার অসুখের সূত্রপাত হয়। বলতেন, “মা, কুলপী আর খাব না, মা। এবার ভাল ক’রে দাও। আর কখনও খাব না মা।” একেবারে বালক। সেবাশ্রমে সাধু-ভোজন হ’চ্ছে। সাধুরা সব খেতে বসেছেন। উনিও গেছেন। ওঁকেও খাবার দেওয়া হয়েছে। উনি বসেই খেতে আরম্ভ ক’রে দিলেন। সাধুরা সব বলে উঠল, ‘এ ক্যা করতা হ্যায়।’ তিনি বেঁকে বসেছেন। বললেন, “আমি ত বাপু তোমাদের লাইনে বসিনি।” (সকলের হাস্য)। বালক যেমন খাবার পেলেই খেতে আরম্ভ করে।

বলতেন, “কেউ কেউ সাধু আছে, ছেলেপিলে নিয়ে বেশ থাকে। যেই কেউ এল, অমনি ছেলে কোল থেকে ফেলে দিয়ে গোঁপে চাড়া দিয়ে, আসন ক’রে বসলেন; বললেন, “কুচ প্রশ্ন হ্যায়।” (সকলের হাস্য)। ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করতে হ’ত না। গিয়ে বসলেই উপদেশ শুনছে। ফুলের যেমন কাছে গেলে আপনিই গন্ধ পাবে। আর, এই তথা কচ্ছেন, এই সমাধি।

আবার ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কথা বলিতেছেন।

শ্রীম। (ডাক্তার সাহেবকে) এঁর খুব বিশ্রাম দরকার, কেমন? আপনি ত ডাক্তার।

ডাক্তার সাহেব। তা ত বটেই। তবে সময় কই? সব ভক্তেরা আসে। তাদের নিয়ে থাকেন।

শ্রীম। সে ত ঠিক্। ভক্ত না হ’লে থাকার যো নেই। ঠাকুরও (পরমহংসদেব) যে দিন ভক্তরা আসত না, গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, নৌকা আসছে কিনা। বলতেন, “কই, কেউ ত এল না।” কাঁদতেন, “কেউ না এলে কি ক’রে থাকব?”

ডাক্তার সাহেব। ওষুধে ত কাজ হয় না।

শ্রীম। Nerve-System (স্নায়ু-সংস্থান) সব আলাদা কিনা। শরীর আলাদা। Common Sense (সাধারণ বোধ) এই টের পাওয়া যায়। বৈদ্যরা ত জানে না। এ রকম ত দেখেনি। ঠাকুরের (পরমহংসদেবের) চিকিৎসা করত, মধু ডাক্তার। ওর ওষুধ বেশ লাগত, খেতেন। হাত ভেঙ্গে গেল, মধু ডাক্তার এসেছেন। বলতেন, "আমার বিপদের মধুসূদন।" (হাস্য)। তাঁকে কত যত্ন ; কাছে বসাতেন, আলাপ করতেন ; যেমন হরিহরাত্মা। ঠাকুরের (পরমহংসদেবের) বালক অবস্থা। একদিন রাত্রি ১০।১১টা হবে, হঠাৎ শরীর খারাপ বোধ করলেন। প্রাণ আইটাই করতে লাগল। রাম, আরও দু'একজন আছেন। বলেছেন, "তা'লে শরীর ত্যাগ হবে। ওকে (মা-ঠাকুরুণকে) ডাক।" মা-ঠাকুরুণ নহবতে ছিলেন। তাঁকে ডাকা হ'ল। বললেন, "শরীর ত্যাগ হবে।" মা বললেন, "ডাক্তার ডাকুক না।" তা বলছেন, "এত রাত্তিরে আবার আমার জন্য কে ডাক্তার ডাকতে যাবে ?" রাম বললেন, "কি খেয়েছ ?" তখন বললেন, "হালুয়া খেয়েছি।" "ওই হয়েছে। ঘি খেয়েছে কিনা ; গাওয়া ঘিতে হয়েছে। সেরে যাবে।" ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলে উঠলেন "ও তাই ?" বলে নাচতে আরম্ভ করলেন। (সকলের উচ্চহাস্য)।

এইবার মাষ্টার মহাশয় প্রণাম করিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিতে ডাক্তার সাহেবের পূজার ঘর দেখিতে গেলেন। পূজার ঘরটী বেশ। আসনের মাঝখানে ঠাকুরের বড় তৈলচিত্র। দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে যুগলমূর্ত্তির ছবি আছে। সম্মুখে একটী গোপাল-মূর্ত্তি আছে।

মাষ্টার মহাশয় ও ডাক্তার সাহেব সে ঘরে গেলেন।

ডাক্তার সাহেব। (ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া) এই আসনে বসে দেখুন, ছবিটী কেমন সুন্দর। আপনি আসনে বসলে আমার আসন পবিত্র হবে।

মাষ্টার মহাশয় বসিয়া দেখিতেছেন। (জপ করিতেছেন। তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল। প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। কথা হইতেছে ;—

শ্রীম। আপনার সঙ্গে ওর (ঠাকুরের) দেখা হয়, কতদিন হ'ল ?

ডাক্তার সাহেব। প্রায় চার বছর আগে। আপনি যে সব ভাব বললেন, ঠাকুরের মধ্যে সব দেখেছি।

শ্রীম। তা ত হবেই। এঁর কোন সন্ন্যাসী ভক্ত আছে ?

ডাক্তার সাহেব। না ; সন্ন্যাস ত কাকেও দেন নি।

শ্রীম। আপনারা গুরু পেয়েছেন, আবার কি ; ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "গুরু পেলে, তাকিয়া পেয়ে গেলে।"

ওঁর শরীরের ওপর যত্ন রাখবেন। ওঁর সাক্ষাতে বলতে পারলুম না ; একটু rest এর (বিশ্রামের) ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তার সাহেব ঠাকুরের কথা বলিতেছেন।

ডাক্তার সাহেব। কীর্ত্তন ক'রে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত সমাধিতে থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে একবার খুব ভাব হ'ল। মায়ের মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলেন। প'ড়ে যান ব'লে আমরা ঘিরে দাঁড়ালুম। চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল পড়ছে। মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগলেন।

দুই একটী কথার পর মাষ্টার মহাশয় উঠিলেন। যাইবার সময় ঠাকুরকে বলিতেছেন, "এঁরা আবার প্রসাদ খাইয়ে দিলেন।"

ঠাকুর। আপনি যখন ইচ্ছা হয় আসবেন।

মাষ্টার মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকাল ৫টা। ঠাকুরের শরীর দুর্ব্বল। জ্বর ৯৯'৪ আছে।

ঠাকুর গান করিতেছেন :—

ওমা, কতই ছলনা, করিবে বলনা,
মা হ'য়ে সন্তানে মহেশ-ললনা।
আশামাত্র দিয়ে, এনে খেলাঘরে,
দিয়েছ, দিতেছ কতই যাতনা॥

দিয়েছ যে হাতে' বিষয় চুষিকাঠি,
দিবারাত্র চুষি, কতই কাঁদি কাটি,
রস নাই মা তাতে, শুধু গালে ভেজা মাটি,
লালনাঠি, জমিদারি, বালাখানা॥

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রিয় সহচর,
সুতাসুত, দারা, খেলনা সুন্দর,
বসন-ভূষণ, রঙ্গিণ ঝালর,
মনোমুগ্ধকর বিচিত্র খেলনা॥

যদি কভু ডাকি, 'মা মা' বলিয়ে,
ওমা সংসার দোলাটি দাও মা দোলায়ে,
জগত-জননী, ভুলিয়ে ভুলিয়ে,
কাঁদিয়ে কাদিয়ে, পাই মা সান্ত্বনা॥

যদি কেহ হয় দুষ্ট কিম্বা আব্দারে ছেলে,
সাধের খেলনায় সে কি কভু ভোলে,
দেয় টেনে ফেলে, ডাকে 'মা মা' বলে,
মা সোহাগী ছেলে মা বিনে বাঁচেনা॥

ভক্তেরা আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, রাজেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু ডাক্তার সাহেব, কালু ও আশু আছে। কালীবাবু আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার (মাতাঠাকুরাণীর ভাই) আসিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয়মাধব মল্লিক আসিয়াছেন। গতবার ঠাকুরের বাতের সময় প্রথম আসেন; ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন ও ভাল বাসেন। ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়াছেন খবর পাইয়া এবং তাঁহার শরীর খারাপ শুনিয়া, দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর। অমিয়মাধব এস।

অমিয়মাধব। আপনি কেমন আছেন?

ঠাকুর। রোজ বিকালে একটু জ্বর হ'চ্ছে। একটার পর থেকে হয়। আবার, রাত ১২টায় কমে যায়।

প্লীহার কথা হইতেছে। অমিয়মাধব বাবু সেটা পরীক্ষা করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বলিতেছেন, "এ record spleen; কিন্তু চেহারা দেখে এ জিনিষ যে ভেতরে আছে বোঝা যায় না। শরীর দুর্ব্বল হ'তে পারে কিন্তু বাইরে যা দেখেছি, তার কোন পরিবর্ত্তনই টের পাচ্ছি না। তা আপনার সাধারণ নিয়ম খাটবে না।"

ঠাকুর। কালাজ্বর বলে সন্দেহ করছে। তাও ঠিক্ বলতে পারছে না।

অমিয়মাধব। কালাজ্বরের একটা লক্ষণও নেই। পুরণো ম্যালেরিয়া থেকে হয়েছে; মজ্জাগত জ্বর হ'তে পারে।

ঠাকুর। এঁরা (ভক্তরা) বিন্ধ্যাচল নিয়ে গেলেন। দু'তিন দিন বেশ ছিলুম। খুব ক্ষিদে হ'ল। আবার কিন্তু জ্বর হ'তে লাগল।

অসুখের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে।

কালীবাবু। আমাদের কথা হ'চ্ছে, ঠাকুর ইচ্ছা করলেই সারাতে পারেন; এখন ইচ্ছাটা যদি হয় তবেই বাঁচি।

ঠাকুর। যদি সারাতে পারতুম তবে কি আর রোগ ভোগ করি? তবে তোমাদের বিশ্বাসে যদি সেরে যায়। যীশাস বলতেন, faith cure (বিশ্বাসবলে আরোগ্য করা)। আমার ত অত বিশ্বাস নেই।

কালীবাবু। ওষুধেও ত কাজ হ'চ্ছে না।

ঠাকুর। না, অমিয়মাধবের ওষুধে সেরে যাবে।

অমিয়মাধব। আমি ত একটা উপলক্ষ।

কালীবাবু। দেখুন না কম কি ভুগছেন?

অমিয়মাধব। তিনি ভুগছেন না; ভুগছেন আপনারা।

কালীবাবু। বাইরে থেকে কেউ এসে যদি দেখে, দু'ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টা কথা বলছেন, তবে বিশ্বাসই করবে না যে অসুখ।

অমিয়মাধব। সাধারণ ডাক্তারী আইন চলবে না, একটু ভেবে একটা ওষুধ দেব।

ঠাকুর। অমিয়মাধব ভক্ত লোক ; ওর ওষুধ খেটে যাবে।

অমিয়মাধব। সারাবার মালিক যদি আমি হতুম, তবে আর ভাবনা থাকত না। চিকিৎসা কি ? একটা আরাম করতে গিয়ে দশটা না আসে। আমরা ত একটা আরাম করতে গিয়ে পঞ্চাশটা নিয়ে আসি।

নানা কথার পর ডাক্তার রবিবারে ওষুধ পাঠাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

বিভূতি, অচ্যুত ও হরিপদ আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। জোড়াসাঁকর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র। ঠাকুরের ওপর তাঁহার ও তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের খুব ভক্তি ভালবাসা। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। ঠাকুরও তাঁহাদিগকে দেখিলে বড়ই আনন্দিত হন। বলেন, "ও রকম সৎপ্রকৃতির ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ পরিবার আজকাল বড় কম দেখা যায়।"

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তেরা মায়ের নাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে, বিজয়চন্দ্র সিংহের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কথা হইতেছে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কেমন আছেন ?"

ঠাকুর। দেখছ, বেশ আছি। তোমাদের দেখলে কি খারাপ থাকি ? তোমাদের দেখলে বেশ থাকি। আমাকে দেখলে রোগা বোধ হয় কি ?

—হ্যাঁ।

ঠাকুর। ওই, শুনেছ কিনা ; কেউ দেখে ত বলছেনা রোগা।

—পীলেতে পেট উঁচু দেখাচ্ছে।

ঠাকুর। ওই সব শুনেছ। পেট উঁচু ত ভুঁড়িতেও হ'তে পারে। (সকলের হাস্য)।

বিজয়বাবুর (মাখমবাবুর) অসুখ। ঠাকুর সেজন্য বড় চিন্তিত হইয়াছেন।

ঠাকুর। মাখম খুব ভুগছে। কাশীতে বেশ সেরেছিল; দু'দিন থাকলেই পারত। শরীরটাও ত দেখতে হবে।

—আপনাকে ওষুধ খেতে হবে।

ঠাকুর। মাখম আগে বেশ ক'রে সারুক। এখন তাকে ভাবাব না; বেশ ক'রে সুস্থ হোক। আমার কি, আমি বেশ আছি।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাহিতেছেন।

কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে। (১৯ পৃষ্ঠা)

আবার গাহিতেছেন। এই গানটী ঠাকুরের স্বরচিত।

আমি তাই ডাকি 'মা মা' বলে।
মা যে আমার সর্ব্বময়ী, আমি মায়ের ছেলে॥
প্রভাতে উঠিয়ে যবে, ডাকি 'মা মা' বলে,
মা আসিয়ে আমার মোহের আবরণ দেন তুলে॥
নিদ্রাবেশে অচেতন যবে থাকি নিশাকালে,
আমি স্বপ্নযোগে দেখি যেন, মা নিয়েছেন কোলে॥
গর্ভ-বাসে ছিলাম যবে পড়ি নাই ভূতলে,
আমার খাবার তরে হৃদয়ে ক্ষীর, মা রেখেছেন তুলে॥
মার কৃপায় মরুমাঝে সুশীতল জল মিলে,
মা যে আমার সকলের মা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে।
দীন বলে অন্তপান্তে থাকব মায়ের কোলে,
দেখি কালে কেমনে লয় মায়ের কোলের ছেলে॥

পচু, কানাই, শশী, সুরথ, সোমদেব, যুগল ও জিতেন আসিল।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া, ঠাকুর সঙ্গীতের ভাব, সুর ও লয়ের কথা বলিতেছেন,—

ঠাকুর। ভাবই হবে জিনিষ। সমস্ত মনটাকে এক ক'রে নেওয়া। কথা ত সবাই জানে। ভাব নিয়েই কাজ। তবে সুর, তাল এ সবে সাহায্য করে। সমস্বরে একমনে ডাকলে অপর চিন্তা ভুল হ'য়ে যায়। মন এক হয়। নানারকমে মন এক করা যায়। সংসারীরা

গল্প নিয়ে এক করে। আর কেউ তাঁর জিনিষ নিয়ে এক করে। সঙ্গীত হ'চ্ছে শব্দ-ব্রহ্ম। প্রণবের কাজ করে। গান করতে করতে অপর চিন্তা ভুল হ'য়ে যায়। তা নইলে 'রাধাকৃষ্ণ'ত অনেকেই বলে। 'রাধাকৃষ্ণ' বলে চুরিও করছে। আসল হ'চ্ছে মনের সঙ্গে সম্বন্ধ। একটা অবস্থা হয়, গান করতে করতে নিজের বোধ থাকে না; চিত্ত লয় হ'য়ে যেতে পারে, মিশে যেতে পারে।

এজন্য তাঁর নাম সমস্বরে করা খুব ভাল। নিজে ত ডাকতে পারে না। নানা চিন্তায় মন থাকে। তবে এক স্থানে এসে সবাই মিলে ডাকলে, অপর জিনিষ ভুলে যায়। মন এক হ'লে অপর জিনিষ ভুলে যাবে। জ্ঞান-পন্থা সংসারীদের জন্য নয়। মায়ার বন্ধনে থাকতে তা হয় না। এজন্য ভালবাসা প্রধান জিনিষ। ভালবাসা দিয়ে যত কাজ করান যায়, তত 'অমুক কর, তমুক কর' বললে হবে না। করবে কে? মনের শক্তি কই? সংসারীদের সঙ্গই প্রধান।

ঠাকুরের 'Travelling (ভ্রমণে সঙ্গে লইবার জন্য) সিংহাসন' আসিয়াছে। ঠাকুর কাশীতে প্ল্যান দিয়াছিলেন। ছোট জার্ম্মাণ সিলভারের সিংহাসন, যেন কোথাও যাইতে ভেঙ্গে ভাঁজ ক'রে ঝুলিতে নেওয়া যায়। সেইখানে একটা তৈরী করা হইয়াছিল। ঠাকুরই নাম দিয়াছেন 'ট্রাভেলিং সিংহাসন'। এইখানে সোমদেব সেইটা দেখাইয়া আরও ভাল করিয়া একটা তৈরী করাইয়াছে। বেশ ভাল হইয়াছে। ঠাকুরের খুব পছন্দ হইয়াছে। সোমদেবকে বলিতেছেন,—

ঠাকুর। সোমদেব, তোমার সিংহাসন বেশ হয়েছে। খুব সুন্দর সিংহাসন হয়েছে।

নানা কথা হইতেছে। পুত্তু ঠাকুরের খুব সেবা করে। ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে তাহার কথা বলিতেছেন,—

ঠাকুর। পুত্তু বড় ভাল ছেলে। অল্প বয়সে এ রকম ধর্ম্মের দিকে টান বড় কম দেখা যায়। অথচ লেখা পড়াতেও খুব ভাল। আমার ওপর একটা অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। আমার যথেষ্ট সেবা করে।

এ বয়স থেকেই তার সর্ব্বদা চিন্তা, কিসে মনের উন্নতি করবে। কিসে ঠিক্ ঠিক্ সৎ হ'তে পারবে। বালকের এ রকম ভাব বড় কম দেখা যায়।

রাত প্রায় ১০টা হইল; অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ২১শে মে, ১৯২৬ ইং ;

শুক্রবার, শুক্লা-নবমী।

মাঝের গ্রাম।

ঠাকুরের পূর্ব্ববাসস্থান মাঝের গ্রামে—ভক্তগণসহ ঠাকুরের আগমন।

ঠাকুরের বাড়ী—ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুরের আগমন—প্রজাদের প্রতি উপদেশ—আহ্নিক ও নারায়ণ দর্শন—ঠাকুরদালানে কথাবার্ত্তা ও গান—আহার।

আজ মাঝের গ্রাম যাইবার দিন, মাঝের গ্রাম ঠাকুরের পূর্ব্ব বাসস্থান ; নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে বনগ্রামের বড় রাস্তা দিয়া, বনগ্রাম হইয়া যাইতে পারা যায় ; বনগ্রাম হইতে দশ বার মাইল উত্তরে। অথবা ই, বি, রেলওয়ের রাণাঘাট কিংবা বনগ্রাম জংশনে ট্রেণ বদলাইয়া মাজির গ্রাম ষ্টেশনে যাওয়া যায়। মাজির গ্রাম ষ্টেশন হইতে ঠাকুরদের বাড়ী আধ মাইল উত্তর দিকে।

অনেকদিন হইতে ভক্তরা ঠাকুরের বাড়ী দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। ঠাকুর যাইতে রাজী হ'ন নাই। এইবার যাইবেন বলিয়াছেন। সকলের খুব আনন্দ হইয়াছে। আজ যাওয়া হইবে। দুই তিন দিন আগে হইতে বন্দোবস্ত হইতেছে। এখান হইতে মোটরে যাওয়া হইবে।

আমরা কয়েকজন ট্রেণে যাইব। এগারটায় বনগাঁর গাড়ীতে উঠিলাম। খানিকদূর গিয়া দেখিলাম, একটা খুব উঁচু এবং প্রশস্ত

গাছের সারি আঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঐ নাকি বনগাঁর রাস্তা; ঐ রাস্তায় ঠাকুর আসিবেন। দুই ধারে বৃক্ষ-সুশোভিত রাস্তাটী বড় সুন্দর। বনগাঁয় ট্রেণ বদলাইয়া আমরা ঠিক্ সময়ে মাঝের গ্রাম আসিলাম। ৩টার সময় ঠাকুরদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। সকলে আমাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। বিশ্রামের পর বেশ জলযোগ হইল। বাড়ীর এবং গ্রামের সকলে আসিয়া ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর অন্যান্যবার আসিবেন কথা থাকিলেও আসিতে পারেন নাই। এবারও তাঁহাদের বিশেষ ভরসা ছিল না। আমাদিগকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন; বলিলেন, "আপনারা যখন এসেছেন তখন 'মেজদা' আসিবেন আশা করতে পারি"। গ্রামের সকলে আসিয়া একত্র হইল; অনেকদিন পরে তাহাদের মেজবাবুকে দেখিবে। লেঠেলরা মেজবাবুকে লাঠি খেলা দেখাইবে। তাহাদের আজ খুব আনন্দ। বাড়ীর সকলেই ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহার শরীর খারাপ শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। উপরে যে ঘরে ঠাকুর বসিতেন, গান বাজনা হইত, সেই ঘরেই ভক্তদের থাকিবার জায়গা করা হইয়াছে। স্থান নির্দ্দেশ খুব সুন্দরই হইয়াছে। বাড়ীর রাস্তাঘাট সব পরিষ্কার করা হইয়াছে।

প্রকাণ্ড চক-মেলান বাড়ী, সম্মুখে দোতলায় অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি স্তম্ভ সুশোভিত বারান্দা ও তদুপরি ত্রিকোণ pediment (পেডিমেণ্ট) বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। নীচে ভিতরে যাইবার পথ। ভিতরে বড় উঠান। তার উত্তর দিকে ঠাকুরদালান। এইখানে দুর্গাপূজা হইত। খুব বলি হইত। বলির রক্ত যাইবার জন্য নর্দ্দমা এখনও আছে। উঠানের অপর তিনদিকে উপরে ও নীচে ঘর এবং বারান্দা। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ঘর পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের ঘরেই ঠাকুরের বৈঠকখানা ছিল। দিবারাত্র গান-বাজনায় ঐ ঘর মুখরিত থাকিত। সেই ঘরে ঠাকুরের আগেকার একখানা ফটো আছে। তার নীচেও

বৈঠকখানা। সেখানে ঠাকুরের এখনকার ছবি আছে। বাহিরের মহলের উত্তরে ভিতরের মহল। সেখানেও চক-মেলান ঘর। দক্ষিণে পূজার দালানের চকটা ভগ্ন অবস্থায় আছে। আর তিন দিকে, উপরে নীচে বড় বড় ঘর। দক্ষিণ দিকের উপরের ঘর পড়িয়া গিয়াছে। নীচে মাঝখানে নারায়ণের ঘর। উপরের তলায় ঠাকুরের শুইবার ঘর ছিল। সে সব পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বড় বড় ঘর। উত্তর দিকের বড় হলঘর এবং বাড়ীর খানিক অংশ ঠাকুরের গৃহত্যাগের পর পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ী এবং জমিদারীর অর্দ্ধেকের মালিক ছিলেন ঠাকুর। এখন সব জ্ঞাতিরা ভোগ করিতে-ছেন। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বাড়ী; অনেক অংশ পড়িয়া গিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় এক সময়ে খুব জাঁকজমক ছিল। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, দোলের সময় উপরে নীচে সব জোড়া থাম গোলাপী দেয়ালগীরের আলো দিয়া সাজান হইত। জানালা দিয়া বস্তা বস্তা আবির ফেলিয়া দেওয়া হইত। লাল আভায় সমস্ত বাড়ী ভরিয়া যাইত। সকলেই বলিতেছেন, ঠাকুর থাকিতেও এক রকম ছিল; তিনি যাইবার পরে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী দেখিয়া বৈকালে রাস্তায় বেড়াইতে হইলাম। কয়েক-জন মুসলমানের দেখা পাইলাম। ঠাকুরের কথা বলিতে তাহাদের খুব আনন্দ; বলিল, "আমাদের জমিদার মেজবাবু আসবেন। আমরা কি সহজে ছাড়ব! জোর ক'রে রেখে দেব।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঠাকুর শীঘ্রই আসিবেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। রাস্তায়, পুকুর পাড়ে সকলে একত্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মোটরের বাঁশী শুনিতেই সকলে অগ্রসর হইয়া গেল। গাড়ীর সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল; চারখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। ঠাকুর, মা, দিদি, মা-মণি, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ও তাঁহার মেয়ে আনা আসিয়াছেন। কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, পুস্তু, অশোক, অজয়, রাজেন, শশী, পচু সাহেব, কিরণবাবু, অপূর্ব্ব, নৃপেন,

অজয়ের ছেলে শচীন আসিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঠাকুরের সারথী। ঠাকুর যেখানে যান সে-ই প্রায় মোটর চালায়; সে একজন বড় মোটর ইঞ্জিনিয়ার। ঠাকুরের ওপর তাহার খুব ভক্তি বিশ্বাস। তাহার মনটীও বড় সরল। কানাই, সত্যেন, অচ্যুত, মৃত্যুন আগে আসিয়াছে।

গাড়ীর কাছে ভিড় জমিয়া গেল। বাড়ীর ও গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর উপরে উঠিয়া গেলেন। বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় চেয়ার দেওয়া হইল; সেখানে বসিলেন। সকলে আসিয়া একে একে দেখা করিতে লাগিল। নীচে গ্রামের সব প্রজারা দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। ঠাকুর তাহাদের কয়েকজনকে ডাকাইলেন। তাহারা আসিয়া প্রণাম করিলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা অপরিচিত (অনেকদিন দেশে যান নাই, তাই অনেককে জানেন না) তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পেঁচো, হিমসাগর ইহারা ঠাকুরের প্রিয় অনুচর ছিল। তাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। রসিক ঠাকুরেব একান্ত প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে মারা গিয়াছে, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। "রসকেকে বড্ড ভাল বাসতুম; সেও নেই। সাবেকী লোক সব মরে গেছে। এদেরও শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে দেখছি।" ঠাকুরের শরীরের জন্য সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। তাতে কি? শরীর খারাপ হয়েছে কিন্তু আমি ভাল আছি। তোমাদের দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তোমরা সব সন্তান। আমার এ বাড়ীতেও যা তোমাদের বাড়ীতেও তাই। তোমাদের বাড়ীতেও উঠতে পারতুম, তবে এদের এখানে একটা সংস্কার আছে; এরা দুঃখিত হবে। এই সব গাড়ী টাড়ী দেখে ভেব' না সব আমার। আমার কাল খাবার সংস্থাপন নেই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এঁরা (ভক্তেরা) আমায় যত্ন করেন। ছেলের চেয়েও

বেশী দেখেন। ছেলে থাকলেও এত করতে পারত না। এঁরাই সব নিয়ে এসেছেন। আমার এই এক কাপড় সম্বল। আমি অবশ্য সে দরিদ্র নই। দরিদ্র দু'রকম আছে। এক, ভোগের জিনিষ নেই দরিদ্র ; আর, বাসনা আছে, পোরাবার উপায় নেই, সেই এক দরিদ্র। আমার বিষয়ও নেই, বাসনা পোরাবার ইচ্ছাও নেই, অভাবও নেই। এঁরাই আমায় নিয়ে এসেছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের সব মঙ্গল হো'ক ; তোমরা সব আপন, সন্তান ; তোমাদের সমস্ত মঙ্গল হো'ক।

কিছুক্ষণ পরে ভক্তদের হাত মুখ ধোওয়া হইলে, সকলে ঠাকুরের থাকার জন্য যে ঘর ঠিক্ করা হইয়াছে সেইখানে গেলেন। ঠাকুর সেই 'ট্রাভেলিং সিংহাসন' পাতিয়া পূজার ছবি রাখিলেন। সন্ধ্যা ও আরতি করা হইল। তারপর বাড়ীর ভিতরে নারায়ণ দর্শন করিতে যাইতেছেন। ভক্তরা সকলে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। দোতলার পূর্ব্বদিকের ঘরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন ; যাইতে যাইতে বাড়ীর ঘর সব দেখাইতেছেন। নীচে নারায়ণের ঘরে আসিয়া ঠাকুর নারায়ণ দর্শন করিলেন, ভক্তরাও দর্শন করিলেন। ঠাকুরকে জলখাবার দেওয়া হইল। ভক্তরাও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বদিকের র'কে ঠাকুর বসিলেন, ভক্তরা সব ঘিরিয়া বসিয়াছেন। সকলেরই আজ খুব আনন্দ। ঠাকুরের বাড়ীতে সকলে একত্র হইয়াছেন। মা, মা-মণি, দিদি, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ইঁহারা আসিয়াই রান্না লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে খাওখাইয়াই তাঁহাদের আনন্দ।

কিছুক্ষণ পরে পূজার দালানে সকলে আসিয়া বসিলেন। সুরেন বাবু কয়েকটা গান করিলেন। ভাল গায়ক। গান শুনিয়া সকলেরই আনন্দ হইল।

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর সকলের সঙ্গে বেশ তাহাদের ভাবে মিশিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা বলিতেছেন। তাহাদেরও খুব

আনন্দ। কথায় কথায় বলিতেছেন, "তিনজন বড় প্রিয় ছিল। জ্যাঠাইমা, ডাক্তার ম'শায় আর রসকে; তা তিনজনের একজনও নেই। মনটা কেমন করছে।"

জনৈক ভদ্রলোক। এদের নিয়ে বেশ আনন্দে আছ। ভগবান সাঙ্গ পাঙ্গ বেশ জুটিয়ে দিয়েছেন। বেশ আছ। দর্শন করলে পাপ ক্ষয় হয়।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর আহার করিতে গেলেন। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা ও অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভিতরের মহলের পূর্ব্ব ও উত্তর র'কে খাইবার জায়গা করা হইয়াছে। অনেক লোক বসিয়াছে; দুইদিক ভরিয়া গিয়াছে। আহারের বেশ পরিপাটী ব্যবস্থা। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে যাহারা পারদর্শী, যেমন অপূর্ব্ব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মামা (কিরণবাবু), নৃপেন, ইহারা দিস্তার পর দিস্তা লুচি শেষ করিয়া আনন্দটাকে বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। ডাক্তার সাহেব, কালী বাবু, কানাইও বড় কম করেনি। ঠাকুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। পশ্চিমদিকে রান্নাঘর। মা রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছেলেদের খাওয়া দেখিতেছেন। আজ সকলেরই আনন্দ। ঠাকুরবাড়ীতে আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে। আহারের পর কুলপী বরফ খাওয়া হইল। কালীবাবু সঙ্গে কুলপী বরফ ওয়ালা একজন নিয়াছিলেন। আমরা আর কুলপী বরফ খাইবার জায়গা রাখি নাই। সেখানকার সকলে খাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখন সকলেই শুইবার জন্য ব্যস্ত। প্রকাণ্ড বাড়ী; যে যার সুবিধামত শুইয়া পড়িলেন।

প্রথম ভাগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ২২শে মে, ১৯২৬ ইং;

শনিবার শুক্লা-দশমী।

মাঝের গ্রাম।

ঠাকুরের বাড়ীতে ভক্তদের ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ।

প্রাতে স্নানের পর গ্রাম দর্শন—মুক্তজীব, বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব ও নিত্যজীব—ঠাকুরের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—ভক্তদের জলযোগ—লাঠিখেলা—গ্রামের সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—কালীবাবু ও ডাক্তারসাহেব—আহার—স্থরেন চাটার্জ্জি মহাশয়ের সঙ্গে কথা—ঠকুরের পূর্ব্বকথা—ঠাকুরের উপদেশ—সংসারত্যাগ—ভক্তদের সম্বন্ধে কথা—গৌহাটির মুসলমান ভক্তগণ—মুসলমানের হাতে আহার—গ্রামের মেয়েদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ—ঠাকুরের ও ভক্তদের কলিকাতা আগমন।

ভোরে ৫॥ টায় ঠাকুর সকলকে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। কিছু দূরে পুকুর, বেশ স্থন্দর বাঁধান ঘাট। সে পুকুরে স্নান শেষ করিয়া গ্রাম দেখাইতে বাহির হইলেন। ভক্তরা সব সঙ্গে আছেন। প্রথমতঃ ষ্টেশনের দিকে কিছুদূর যাওয়া হইল। ঘুরিয়া আসিয়া বাড়ীর উত্তরদিকে যাইতেছেন। দুই ধারে বাগানের মাঝখানে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। রেল লাইন পার হইয়া একটী পুকুরের ধারে গেলেন। সে পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে। পুকুরে বেড় দিয়া মাছধরা সহর-বাসী অনেকের পক্ষেই নূতন। মাছ লাফাইয়া পলাইতেছে দেখিয়া সকলে বেশ আনন্দ অনুভব করিলেন। অপূর্ব্ব ত আনন্দে চিৎকার

করিয়া উঠিল। ঠাকুর মাছের উদাহরণ দিয়া মুক্তজীব, বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব ও নিত্যজীবের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। মাছের সব রকম দেখ। এরা, যারা পালাচ্ছে, সব হ'চ্ছে **মুক্তজীব**, জাল ফেলে ঘিরে ধরছে, তারা লাফিয়ে পালাচ্ছে। এদের আটকাইতে পারবে না। তেমনি মুক্তজীবদের সংসারে আটকে রাখতে পারে না; পালাবেই। আর কতক আছে, ঢুঁস মারছে পালাবে বলে, কিন্তু পারছে না। এরা হ'চ্ছে **মুমুক্ষুজীব**। ইচ্ছা আছে বেরিয়ে যাবে, পেরে ওঠে না। আর আছে বদ্ধ; তারা বেশ জালশুদ্ধ মুখটী পাঁকে গুঁজে বসে আছে। ভাবলে বেশ আছে। এদিকে জেলে হিড়হিড় করে টেনে তুলে ফেলছে। তেমনি **বদ্ধজীব** বেশ সংসারে মজে থাকে, শেষে কি হবে তা ভাবে না। আর **নিত্যজীব**, তারা জালেই পড়ে না। যতই ঘের, তাদের ধরতে পারবে না। তারা জলেও থাকবে, জালও তাদের ওপর দিয়ে যাবে; কিন্তু তাদের ধরতে পারবে না। তেমনি নিত্য আত্মা সংসারেই পড়ে না। তারা তার ওপরে আছে।

পরে পশ্চিমদিকে আম-বাগান দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন। এসব জায়গা, বাগান ঠাকুরদের। দুই ধারে বিস্তৃত বাগান। ঘুরিতে ঘুরিতে এক পুরাতন পুকুরের ধারে যাওয়া হইল। সেখানে বহুপূর্ব্বে খুব বড় বাজার ছিল। বিদেশী পথিকেরা আসিয়া বিশ্রাম করিত। বাগান দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে আসিলেন। সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তার কাছে চৌরাস্তায় আগে পণ্ডিতদের বিচার হইত। আসিতে পথে একটা জায়গা দেখিলাম, সেখানে আগে হাতী, ঘোড়া সব থাকিত।

গ্রাম দেখিয়া প্রায় ৭॥টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। নারায়ণ দর্শন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করা হইল। তারপর ভক্তদের খুব জলযোগ হইয়া গেল। সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। ঠাকুরের পণ্ডিতমহাশয় আসিয়াছেন। তাঁহার কাছে প্রথম

শিক্ষারম্ভ হয়। তিনি খুব সৎব্যক্তি, শাস্ত্রস্বতার এবং নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছে। ঠাকুরের জ্যেঠা মহাশয় (শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায়) আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া আদর করিলেন। তাঁহার খুব সরল আনন্দপূর্ণ ভাব। কথাবার্ত্তা হইতেছে। তিনি বলিলেন, "আমরা জিতুকে ত পাবই, কারণ তার বাড়ী, সে ত আসবেই। তোমাদের পাওয়াই সৌভাগ্য।" তাঁহার সৌজন্যে সকলে মুগ্ধ হইল। ঠাকুর মাটীতে বসিয়াছেন দেখিয়া, মা-মণি আসন দিতে বলিলেন; ঠাকুর বারণ করিলেন। জ্যেঠা মহাশয়ের সামনে আসনে বসিবেন না। বলিলেন, "তোমাদের সেখানে তোমাদের ভাব। এখানে আমি তাঁর ছেলে।" কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উপরে আহ্নিক করিতে গেলেন। তারপর সকলে আসিয়া ঠাকুরদালানে বসিলেন। লাঠিখেলা হইবে। পেঁচো, হিমসাগর প্রভৃতি কয়েকজন বেশ লাঠিখেলা দেখাইল। ডাক্তার সাহেব ও কালীবাবু তাহাদিগকে বখসিস্ দিলেন। তাহারা আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীতে খুব নারকল গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব ঝুলিতেছে। কালী-বাবু ও ডাক্তার সাহেব বন্দুক দিয়া কয়েকটী শিকার করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার পরিচয় দিলেন। তিনি একজন বড় গায়ক। আগে প্রায়ই গান বাজনা লইয়া ঠাকুরের কাছে এ বাড়ীতেই থাকিতেন। সতীশবাবু ও নরেনবাবু সম্পর্কে ঠাকুরের ভাই। তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। কথায় কথায় ঠাকুর বলিতেছেন, "গোপেনটী এলেই বেশ হ'ত। তার বড় ইচ্ছা ছিল; বলছিল, 'আমি যেন যেতে পারি। তা বড় case (মকদ্দমা) পড়ে গেছে আসতে পারলে না।"

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। এরা (ভক্তেরা) সব নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিন্ধ্যাচল,

হরিদ্বার ঘুরিয়ে আনলে। কালী আবার বলছে 'নৈনীতাল চলুন'। সেবার চাটগাঁ যাবার কথা ছিল। (সত্যেনকে) তুমি চাটগাঁর বলে লজ্জিত হয়ো না; (সকলের হাস্য)। চাটগাঁ যাবার কথা ছিল, তা হ'য়ে উঠল না।

চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। তিনি আমাদের বলিতেছেন;—

চাটুয্যে মহাশয়। এখানেই ত সব সময় থাকতুম। হয় খেলা ধূলা না হয় গান-বাজনা নিয়ে।

ঠাকুর। গান বাজনার কাছে আর জিনিষ নেই। মনকে সুস্থির করে; কুচিন্তা আসতে দেয় না। সঙ্গীত বেদের অঙ্গ। সামবেদ থেকে নিয়েছে। আগে এ সব ঋষিদের ছিল। ইদানীং মুসলমানেরা নেয়।

ঠাকুর। কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের ঠাকুরের ওপর অসীম ভক্তি ভালবাসা।

ঠাকুর। এরা অত সম্পদের মধ্যে থাকে, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম ভাবে ঘুরছে। যেখানে সেখানে শুয়ে থাকে। মহাধনী সব, অথচ ধনের অহঙ্কার নেই। কালীর প্রকাণ্ড বাড়ী, জমিদারী, আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা আয়, অথচ কি রকম চলে। এই ডাক্তার সাহেব, সাত বছর বিলাতে থেকে পড়েছে। সে সব সাহেবী চালে ছিল। কিন্তু এখন দেখ কি পরিবর্ত্তন! আমার সঙ্গে সঙ্গে নাইতে যায়। আমার কাপড়টি নিয়ে যায়, ভিজে কাপড়টি নিজে কাচে। এরাই শুধু নয়, সব ছেলেই খুব ভাল। প্রত্যেকটি ছেলে বড় সুন্দর।

কালীর ভোগের জিনিষ আছে, অথচ ভোগ নেই। যার প্রায় দেড়শত দুইশত আমলা, সে কি রকম কাশীতে থাকে। একখানা ছোট কাপড় পরে আমার সঙ্গে নাইতে যায়। নিজে নিজের কাপড় কাচে, আবার আমার কাপড়টিও কাচে। নিজের পাঁচখানা গাড়ী, দামী দামী

সব ; দু'খানা রোলস্ (Rolls Royce)। অথচ নিজে হয় ত ট্রামেই আসছে। গাড়ী অপরে চেয়ে নিয়েছে। একদিন ট্রামে আসছে, খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে, ভিজতে ভিজতে এসেছে। চটিটা পথেই ফেলে দিয়েছে। নীচে থেকে চাকরের একটা কাপড় পরে আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি ত ময়লা কাপড় দেখে বললুম, তোমার কাপড় এত ময়লা কেন? তা বললে "এ আমার নয়, আমারটি ভিজে গেছে। গোবিন্দর কাপড়টা পরে এসেছি।" তার সরল বালক-ভাব ও প্রাণখোলা ভালবাসা দেখলে মনের বড়ই আকর্ষণ হয় ; প্রাণের মধ্যে একটা ভাবের উদয় হয়। মনের খুব উচ্চতা, মুক্তহস্ত ; অর্থের মধ্যে থাকে কিন্তু অর্থে আসক্তি নেই। তা দেখ, শাস্ত্রে বলেছে, মহামহিমাশালীনের লক্ষণ, 'হেতুরেকে ফলাভাব।' অহঙ্কারের হেতু থাকবে, অহঙ্কার থাকবে না। হেতু নেই, অহঙ্কার, সে ত যা তা। হেতু আছে, অহঙ্কার আছে, এই স্বাভাবিক। হেতু নেই, অহঙ্কারও নেই, এও স্বভাব। কিন্তু যার অহঙ্কারের হেতু আছে অহঙ্কার নেই, সেই মহাত্মা।

এদের সেবা, ভক্তি ভালবাসার কি তুলনা আছে? কেউ ভালবাসে ভক্তি করে, স্বার্থ নিয়ে। কিন্তু এদের সে সব বোধ নেই। ছেলের অসুখ ; কাশীতে আমার কাছে গিয়ে পড়ে আছে। একটী বলে নয়, প্রত্যেকেরই এই ভাব। ডাক্তার সাহেব চাকরী করে ; তবু দু'মাস ছুটী নিয়ে কাশীতে বসে আছে। প্রায়ই কাশীতে দৌড়ুচ্ছে। আমাকে না দেখে থাকতে পারে না। সংসার, জগৎ, কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। আমাকে দেখলে, আমার কাছে থাকলে যেন এর মহা শান্তি। আমার উপদেশগুলি তার অন্তরে গাঁথা আছে। তা পালন করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সর্ব্বদাই আমার চিন্তা নিয়ে আছে। জগতের আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। কেবলমাত্র উদরান্নের জন্য চাকরিটী করে, নচেৎ আর কোন চিন্তা রাখে না। এ রকম ভক্তি বিশ্বাস এবং ভালবাসা সংসারীদের মধ্যে দেখা যায় না। এর আর কালীর ভাব ও ভক্তি বিশ্বাসের বিষয় যখন ভাবি, তখন

চোখে জল আসে। সংসার জগতে এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থেকে এ রকম ভক্তি ভালবাসা রক্ষা করা, এ তাঁর খেলা ছাড়া হ'তে পারে না। এজন্য এদের দেখলে আমার তাঁর উদ্দীপনা হয়; একটা মহা আনন্দের ভাব ভেতরে ওঠে। এদের না দেখলে মন চঞ্চল হয়, দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়। এরা দু'জন আমার কাছে থাকলে নিশ্চিন্ত ও মহা শান্তিতে থাকি।

জনৈক ভদ্রলোক। আমি ভাবি এ সব কি ক'রে হয়! এঁরা সব কি ক'রে এলেন!

ঠাকুর। আমি কি জানি? তিনি করিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মের যোগ ছিল।

ওদের ভক্তি অসীম। কোথায় কলকাতা, কোথায় কাশী, এক ক'রে রেখেছে। আমার অসুখ; কেঁদে ভাসাতে লাগল! কালী ত তারকনাথে গিয়ে ধন্না দিলে। এতটা ভক্তি বিশ্বাস।

জ-ভ। কি ক'রে হয়? এঁরাও বেশ; সব ভাই ভাইএর মত আছেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ; ঠিক্ নিজেদের ভাইএর মত। হয়ত নিজের ভাইএর সঙ্গে অত মিল নেই, যতটা এদের মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আহার করিতে গেলেন। ঠাকুরের খাওয়া হইলে ভক্তরা সকলে এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ঠাকুরদালানে জায়গা করা হইয়াছে। সকলে খুব আনন্দ করিয়া খাইতেছেন। পুকুর হইতে প্রচুর মাছ ধরা হইয়াছে। খুব সুস্বাদু মাছ। অন্যান্য নানারকম আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। মা নিজে সব রান্না করিয়াছেন; অতি চমৎকার হইয়াছে। ঠাকুর খাওয়া দেখিতে আসিলেন। ঠাকুরের জ্যেঠামহাশয়ও আসিয়া বসিলেন। অমূল্যবাবু, বীরেনবাবু, মণিবাবু (ঠাকুরের জ্যাঠতুত ভাই) ইঁহারা খুব যত্ন করিয়া সকলকে আহার করাইতেছেন। পাড়ার ছেলেরা পরিবেষণ করিতেছে। খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

'মাছের মুড়ো, মাছের মুড়ো' রব পড়িয়া গেল। প্রত্যেকেই মুড়ো খাইতেছেন। অনেকে দু'টি তিনটি করিয়া লইলেন। কিরণবাবু, অপূর্ব্ব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, নৃপেন প্রভৃতি ভক্তরা এ বিষয়ে (আহারে) বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। শশী, কানাই, তাহারাও কম করিলেন না।

আহারের পর আবার উপরে ঠাকুর, সুরেন চাটুয্যে মহাশয়, সতীশ, বাবু, নরেনবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া গল্প করিতেছেন। একটু বিশ্রাম করিতে বলিতে বলিলেন, "না; আবার কখন আসব না আসব, এঁরা সব এসেছেন, একটু কথাবার্ত্তা হো'ক।"

সুরেন চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। কালীবাবু, সত্যেন, আরও কয়েকজন আছে।

ঠাকুর। চাটুয্যে ম'শায় ত শুধু দুবেলা খেতে বাড়ী যেতেন; আর সব সময় এখানে থাকতেন।

চাটুয্যে ম'শায়। ওঁর খুব গানবাজনার ঝোঁক ছিল। ওঁর পিতারও খুব ঝোঁক ছিল। অনেক জায়গার গাইয়ে সব এখানে আসত।

কালীবাবু। ঠাকুরও খুব গাইতে পারতেন।

চা-ম। হ্যাঁ; উনিও বেশ গাইতেন। আর বাঁয়া-তবলা বাজাতেন। গান-বাজনায় ওঁর পিতারও সখ ছিল। তিনি আমাদের চেয়ে ঢের বড় ছিলেন। তবু আমরা গাইতাম, তিনি বাজাতেন।

কালীবাবু। ঠাকুরের গলার খুব জোর; খুব উঁচু পর্দ্দায় গাইতেন।

চা-ম। হ্যাঁ; ওঁর গলার খুব জোর ছিল। এখান থেকে সব ছেড়ে কাশীতে গিয়েও গান ক'রে বেড়িয়েছেন আমরা শুনেছি। যারা দেখে আসত, বলত, মেজবাবুকে দেখলুম অমুক ঘাটে, কেদারে এত রাত অবধি, বসে গান করছেন। আর খুব ভক্তির ওপর গান করেন। তাতে গলা এক রকম খুলে যায়; উঁচুতেই ওঠে, নীচে আসে না।

কালীবাবু। শুনেছি, আগে কাশীতে বা খিদিরপুর মঠে গান ধরলে

রাস্তায় ভিড় জমে যেত। আপনি ত ঠাকুরকে ছোট বেলা থেকে দেখছেন, সে সময়কার কথা কিছু বলুন, শুনি।

চা-ম। হ্যাঁ; সে সময় থেকেই একটা নীতিবল ছিল। ঠাকুর দেবতার ওপর খুব একটা ভক্তি ছিল। হয়ত পাঁজি দেখছেন, তাতে যে সব ঠাকুর দেবতার ছবি আছে, এক এক ক'রে সে সব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখছেন; প্রণাম করছেন। কতবার ওসব দেখেছেন, তবু পাঁজি হাতে করলেই প্রত্যেকটী দেখা চাই। আর দেবমন্দির, কালী মন্দির পেলে শতকাজ ফেলেও সেখানে যাচ্ছেন, ব'সে আছেন, গান করছেন। খুব বাবু ছিলেন, দামী পাম্প-সু ছাড়া পায়ে দিতেন না। সে অনুযায়ী সব কাপড় চোপড়। আর এবাড়ীর জাঁগজঁমক কি রকম ছিল! ফট ক'রে সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কালীবাবু। আমি এই বাইরের ঘরটী এবং ভেতরের চক প্রত্যক্ষ স্বপ্নে দেখেছি। বাইরের দক্ষিণের ঘরে সব রূপোর বাসন সাজান আছে।

ঠাকুর। তা দেয়ালটা দেখতে পার। ঐ সব যা তা দেখছ। (হাস্য)

চা-ম। উনি সব ছেড়ে গেছেন বটে; কিন্তু এখনও লোকে বলে মেজবাবুর বাড়ী, মেজবাবুরই সব। এদেশের চাষাভুষো সব ওঁকেই জানে। উনি ত কোন সম্পর্কই রাখেন নি। ছেলেবেলা সৌখিন ছিলেন। নিজে খাওয়া দাওয়া যেমন করতেন, তেমনি পাঁচ জনকে ডেকে খাওয়ান, এসব খুব ছিল। এটা তাঁর পিতারও ছিল। যে আসছে, অবারিত দ্বার।

ঠাকুর। চাটুয্যে মশায় আমাকে খুব ভালবাসেন। কুড়ুলগাছি যেতেও তাঁকে সঙ্গে নিতুম। চাটুয্যে মশায়ের বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তা আমার সঙ্গেও খুব আপনত্ব। আমার কাছ ছাড়া থাকতেন না। অতি শান্ত, সৎ লোক। আর পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, পাঁচু মামা, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মন্মথ দা এঁরা কেউ নেই, আমাকে এঁরা বড় ভালবাসতেন।

কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন। ঠাকুর তাহাদিগকে বলিতেছেন। "এস, তোমরা সব বস।" সকলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা বলিতেছেন।

কালীবাবু। খিদিরপুর থেকে আমাদের এক গুরুভাই * কাশী গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গেছেন। দোর পর্য্যন্ত গিয়ে শুনেন, যেন বলছে "বিশ্বনাথ ত তোর কাছেই রয়েছে। এখানে কেন?" দু'বার এরকম শুনলেন; তবু, ওসব কিছু না মনে ক'রে, জোর ক'রে ঢুকতে গেলে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তখন তিনি ফিরে এলেন।

আর এক গুরুভাইএর স্ত্রী, তাঁর অসুখের জন্য তারকেশ্বরে ধন্না দিলেন। পরে শুনলেন, বলছেন, (ঠাকুরের শরীর দেখাইয়া) ওঁর চরণামৃত খাও তবে সারবে। তাই হ'ল।

ঠাকুর। ও সব কি জান? পড়ে থাকতে থাকতে একটা যা তা দেখে।

কালীবাবু। অপর কাকেও দেখলেন না কেন?

অপর প্রসঙ্গ উঠিল। সংসার ত্যাগের কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, সংসার ছাড়া ত বললেই হয় না। মনের সে অবস্থা না এলে কাজ হয় না। যখন যে ভাবে আছে, সে ভাবে কাজ করতে হয়। তাই অর্জ্জুন যখন বললে, "এই যুদ্ধ ক'রে কি হবে? সব স্বজনগণ বধ হবে; কাদের নিয়ে রাজত্ব করব? এ সব গুরুজন এবং জ্ঞাতি বধ ক'রে রাজত্ব আমি চাইনে। আমার বনই ভাল। আমি বনেই যাব।" তখন ভগবান বলছেন, "দেখ অর্জ্জুন, তুমি বেশ পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে, নিজের অবস্থা বুঝতে পারছ না। তোমার অজ্ঞান এসেছে; শোক, মোহ এসেছে। এখন বলছ, 'বনে যাব' কিন্তু তোমার প্রকৃতি কাজ করবে। যখন দুর্য্যোধনাদি এরা কাপুরুষ

---

* খিদিরপুরের যুগল।

বলে ঠাট্টা করবে, তখন আর ধৈর্য্য থাকবে না। তাই বলছি তোমার যা প্রকৃতি, সে অনুযায়ী কাজ কর। 'স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ'। তোমার যা ধর্ম্ম সে ভাবে চল। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম্ম। তাই কর। আত্মধর্ম্ম পালন কর। যেটা তোমার নয়, তাতে যাবে কেন?" এর আবার অন্য মানে আছে। স্বধর্ম্ম হ'চ্ছে আত্মার ধর্ম্ম; পরধর্ম্ম হ'চ্ছে রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্ম ছেড়ে আত্মার ধর্ম্মে এস। আত্মা নিত্য; তার কি ধ্বংস হয়? পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, তুমি কেন নিচ্ছ; সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও; নিজের কাজ ক'রে যাও।

তা দেখ, মনের স্বভাব, বুদ্বুদের মত নানা ভাব ঠেলে উঠে। আবার মিশে যায়। এজন্য সদ্‌গুরু। তিনি অবস্থা বুঝে কাজ করেন। ফস্ ক'রে সন্ন্যাস দেন না। মনের অবস্থা তৈরী না হ'লে বাইরে গিয়ে ঠিক্ থাকতে পারে কি? দুই তিন দিন হাওয়া খেতে যেতে পারে। পরেই দুঃখ কষ্ট দেখে দৌড় মারবে। মনে যতক্ষণ তাঁর আনন্দ না আসছে, ততক্ষণ এসব জিনিষ ছাড়বে কি ক'রে? ঠিক্ ভাব না এলে হয় না। যতক্ষণ অভাব থাকে ততক্ষণ স্বভাব আসে না। আর এক হয়, যেমন লোকের সঙ্গে ভালবাসা হয় সে রকম স্বভাব হয়। কেউ হয়ত একটা বেশ্যাকে ভালবেসে স্ত্রী, পুত্র, সব ছেড়ে দিলে। সেখানে হয়ত খুব দুঃখ পাচ্ছে; তবু পড়ে আছে। তবে যাতে ভালবাসা হয়, তার যে প্রকৃতি সেই রকম প্রকৃতি হয়। অসৎকে ভালবেসে সৎ কি ক'রে হবে? তার যা প্রকৃতি তাই হবে। আর সৎএ ভালবাসা হ'লে, সৎ হয়।

তা দেখ নেশা এমন জিনিষ: পরমহংসদেব বলতেন, 'আফিং খাইয়ে দেওয়া হয়েছে।' ঠিক্ মৌতাতের সময় আসতে হবে। লেগে গেলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ না লাগে ততক্ষণ গণ্ডগোল। এত সোজা কথা নয়। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, এদের তাড়না আছে। সব বুঝি, তবু জোর ক'রে নিয়ে যায়। রোগীর তেঁতুল খেলে অনিষ্ট হবে, ডাক্তার বারণ করেছে, তবু খেতে চায়। তাই বলেছে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥

জেনেও করবারও জো নেই। এজন্য সঙ্গ, তাতে আপনি সব নিবৃত্তি হয়।

আর এক আছে, দেখছি এ সংসারে দুঃখ কষ্ট আছেই। কাজেই সব সহ্য করতে হবে, শক্তি করতে হবে। তবে এ পথে যাওয়া কঠিন। অনেক ধাক্কা খেতে হয়। ভালবাসায় সেটা সোজা হ'য়ে যায়। আর ফেরবার যো নেই, আপনি গতি করে। এ জন্য সঙ্গ, স্থান; এতে বড্ড কাজ হয়।

এই যে এরা (ভক্তরা) আমার জন্যে এত করছে। এদের সঙ্গে ত কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই। আগে কখনও দেখা শোনাও নেই, তবু যেখানে যাচ্চি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। কোথায় কলকাতার ইলেক্ট্রিক পাখার নীচে থাকত, আর এই পাড়াগাঁ জায়গায় এসে ভাঙ্গা বাড়ীতে গরমে মরছে; এ কেন ? ভালবেসে ফেলেছে বলেই না! কাজেই গরম হো'ক, যাই হো'ক দৃকপাত নেই; গতি করছে। পরমহংসদেব বলতেন, "সাধুর কাছে লোক আসে ওষুধ নিতে, হাত দেখাতে, নয়ত গ্রহ শান্তি করাতে। উঠে যাবার সময় বড় জোর দুটো একটা মুক্তি মোক্ষের কথা বলে যায়। ওরে তোরা যে আসিস, আর আমায় ছাড়িস না; কেন জানিস ? পূর্ব্বজন্মের সব সম্বন্ধ আছে। দেখা মাত্র আপন হ'য়ে যায়।" এদের ত আমি কিছু দিইনি। বরং ওরাই আমাকে খাওয়াচ্ছে। যেখানে যা ভাল পাচ্ছে, নিয়ে ছুটছে। ছেলে পরিবারের মুখে না দিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসছে। না খেলে কেঁদে ফেলছে। এমনি এদের ভালবাসা।

ওরা গুরু বলে, পুণ্যের লোভে বা ভয়ে ভালবাসে না। গুরু এলে ত লোকে দু' একদিন ছানা চিনি খাইয়ে দু' পাঁচ টাকা দিয়ে, বিদায় ক'রে দিতে পারলেই বাঁচে। এদের সে বোধ নেই। আমার কষ্ট দেখলে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলছে। কি বেটাছেলে কি

মেয়েছেলে সকলেরই এই ভাব। এ ত অতিরিক্ত ভালবাসা না এলে হয় না। দেখ, আমি এখন খেতেও পারি না; তবু যেখানে যা পাচ্ছে এনে জোটাচ্ছে।

কালীবাবু। ঠাকুর ত বহুদিন কিছুই খাননি। খাওয়া ত ছিল না।

চা-মা। তা সব জানি; কাছে না থাকলেও আমরা সব খবর রাখি।

ঠাকুরের অসুখের কথা হইতেছে।

কালীবাবু। ঠাকুর আমাদের ব্যাধি সব টেনে নিয়েছেন। একজন এসে প্রণাম করছেন, আর আশীর্ব্বাদ করছেন; তাতেই অসুখ বেড়ে গেল। আমাদের বেশ সেরে গেল। পীলেটা আপনাদের এখানকার জিনিষ। এখানে রেখে যেতে বলুন।

সতীশবাবু। আমাদের ত আন্তরিক ইচ্ছা সেরে যাক।

ঠাকুর প্লীহাটা টিপিয়া দেখিতেছেন, বলিতেছেন, "দেখছি কমছে কি না।" (সকলের হাস্য)। নানা কথা হইতেছে।

ঠাকুর। আমাদের সব ঘোরবার কথা হ'চ্ছে। বিলাত যাওয়া হবে। একটী জাহাজ থাকবে, তাতে সব গঙ্গাজল টল থাকবে। তা আমাকে খালি পায়ে খালি গায়ে নামতেই দেবে না।

কালীবাবু। একটা আলখাল্লা পরলে বেশ Clergy-manএর (পাদ্রী সাহেব) মত দেখাবে। ঠাকুর বলেন বেশ, হিন্দু এলে 'হরি কালী' বলব, মুসলমান এলে 'আল্লা আল্লা' বলব। কিছু ধরতে পারবে না; দাড়ী রয়েছে।' (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। গৌহাটিতে মুসলমান ভক্ত আছে। তারা খুব ভাল লোক, নিজেদের ছেলেকে হরিনাম শিখিয়েছে। আমাকে ধরেছিল তাদের হাতে খেতে। আমায় প্রথম বললে, "আপনাকে ভক্তি পূর্ব্বক যে খেতে দেবে খাবেন?" আমি বল্লুম, ভাত ছাড়া সব খেতে রাজী আছি। ভাত আমি এমনি কারও হাতে খাই না। এ ছাড়া ভক্তি ভাবে দিলেই খাব।

সে বললে, "আমার স্ত্রী যদি ব্রহ্মপুত্রে চান ক'রে, নতুন কাপড় পরে, নতুন বাসনে, কোন হিন্দুর জায়গায় পবিত্র ভাবে রেঁধে দেয়, খাবেন ?" আমি বললুম, খেতে পারি ; তবে একটী সর্ত্ত আমার সঙ্গে করতে হবে। যেখানে গোমাংস রন্ধন হবে, বা তার কোন সংশ্রব থাকবে, সেখানে তুমি এবং তোমার স্ত্রী কখনও খাবে না। কুসংস্কারই হো'ক আর সুসংস্কারই হো'ক, আমরা গরুকে মানি। গরুর দুগ্ধে শিশুরা বাঁচে। তার চাষে যে শস্য হয়, তা খেয়ে আমরা দেহ ধারণ করি। যার কাছ থেকে এত উপকার পাই, তাকে আমরা মানি ; ভগবতী বলে পূজা করি। যেখানে তার হত্যার সংশ্রব আছে, সেখানকার জিনিষ খেতে রাজি নই। সে বললে, "আমি কিংবা আমার স্ত্রী কেউ ত গোমাংস খাই না।" আমি বললুম, তোমরা না খেতে পার ; কিন্তু যেখানে গোমাংস হয় সে সংশ্রবে খাওনা কি ? কুটুম-বাড়ী খেতে যাও, সেখানে গোমাংস রন্ধন হয় না ? সে সংশ্রবে তোমরা খাও না ? তোমাদের কি আলাদা রেঁধে দেয় ? হোটেলে তোমরা খাওনা ? আবার বললে, "আমাদের মসজিদে যে জবাই হয়, সে মাংস খেতে পারেন ?" তা বললুম, খেতে পারি যদি সে মসজিদে কখনও গরু কাটা না হয়।

তারপর তাকে বললুম, দেখ, দুঃখিত হয়োনা। তোমাদের ধারণা, খেলেই বুঝি ভালবাসা হয়। তা নয় ; তা'হলে বাপ ছেলেতে, ভাইএ ভাইএ ঝগড়া হয় কেন ? তোমাদের মোগল পাঠানে বিবাদ কেন ? তা ত নয়। আসল ব্যাপার হ'চ্ছে স্বার্থ আর হিংসা। আমাদের ত আছে, সে কালের বৃদ্ধারা অনেকে ছেলের বউএর হাতেও খায় না। তা বলে কি তাকে ভালবাসে না ? ভালবাসা আলাদা জিনিষ।

নানা কথা হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। ধীরেন এলেই বেশ হ'ত। সে এল না। ধীরেন বড় ভাল ছেলে। খুব কঠোরী, কষ্ট-সহিষ্ণু। আর বোধশোধ খুব

পরিষ্কার ; যেখানে যা করবার, ঠিক্ জানে। খুব সংক্ষেপে থাকতে পারে। বড় সুন্দর ছেলে।

ঠাকুর সাড়ে চারটায় আবার কলিকাতা রওনা হইবেন। সে ব্যবস্থা হইতে লাগিল। পাড়ার মেয়েরা সব ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে বলিতেছেন ;—

ঠাকুর। তোমাদের যত্ন, ভালবাসা আমি ভুলিনি। সে ত ভোলবার নয়। তবে সে ভাবে ব্যবহার করতে পারি না। কারণ, তিনি এখন আর এক ভাবে রেখেছেন, সে ভাবেই আছি। তা বলে তোমরা ভেবনা যে তোমাদের ভালবাসা আমি ভুলেছি। তোমাদের কথা আমার সর্ব্বদা মনে আছে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সব মঙ্গল হো'ক।

চারটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ভিতরে নারায়ণ দর্শন করিয়া আসিলেন। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। সকলেরই খুব কষ্ট হইতেছে ; তাঁহারা কাঁদিতেছেন।

বাড়ীর সকলেই ঠাকুরকে এবং ভক্তদিগকে খুব আদর যত্ন করিয়াছেন। অমূল্যবাবু, মণিবাবু, বীরেনবাবু, বাড়ীর সব ছেলেরা খুব ভালবাসার সহিত ঠাকুরও ভক্তদের যত্ন করিয়াছেন। পিসীমা এবং বাড়ীর মেয়েরাও ঠাকুরের সেবা করিয়াছেন ; সকলকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়াছেন।

প্রায় ৪৷৷টায় গাড়ী ছাড়িল। বেশ সুন্দর রাস্তা ; রাত ৮৷৷টায় মঠে আসিয়া পৌছিল। ১০টায় আরতি হইল। তারপর ভক্তরা বিদায় লইলেন।

প্রথম ভাগ—ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ২৩শে মে, ১৯২৬ ইং;

রবিবার, শুক্লা-একাদশী।

কলিকাতা।

মঠে—কালু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ডাক্তার (মতিলাল)—মাঝের গাঁ সম্বন্ধে কথা—ডাক্তার ম'শায়—ভাবানুযায়ী ব্যবহার—রামায়ণ গান—কীর্ত্তন—উপদেশ—সমস্বরে 'মা' ডাক—সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সাধুকে নষ্ট করা—সাধুদের ভালবাসা—ধনী—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—কর্ম্ম ও তার ক্ষয়।'

আজ ঠাকুরের জ্বর ৯৯.২। কাল ভাল ঘুম হয় নাই। শরীর ক্লান্ত। অমিয়বাবুর ওষুধ আজ খাইয়াছেন। বৈকালে ভক্তরা সব একে একে আসিতেছেন। খিদিরপুরের ললিত, বিভূতি, অচ্যুত, কালু আসিয়াছে। ভবানীপুরের পুত্তু, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন, সুরথ, জিতেন, কানাই ও তাহার ছেলে আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি, নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী, কালীবাবুর স্ত্রী, ধ্রুব, প্রতাপ, কানু আসিয়াছে। যতীন বোস্ আসিয়াছে। শিবপুরের দুইজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মৃত্যুন, অপূর্ব্ব, পচু সাহেব, সত্যেন আছে।

ডাক্তার (মতিলাল) আজ কাশী হইতে আসিয়াছে। সে আগে নিজেদের গ্রামে (হাওড়া, শেয়াখালায়) ডাক্তারী করিত। ভাল ডাক্তার ছিল। ঐ অঞ্চলে তাহার খুব নাম ছিল। টাকাও বেশ রোজগার করিত। ছয় সাত বৎসর হইল, ব্যবসা ইত্যাদি সব ছাড়িয়া ধর্ম্মকার্য্য লইয়া থাকিবে বলিয়া সস্ত্রীক কাশীতে যায়।

সেখানে কিছুদিন পরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়। ডাক্তার খুব ভাল লোক; ঠাকুরের উপর তাহার খুব ভক্তি ভালবাসা। পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও খুব কঠোরী; জুতা, জামা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে; সামান্য বস্ত্র ও আহারের উপর থাকে। পূজা, আহ্নিক, দেবদর্শন ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া সমস্ত দিন থাকে। আফিং, তামাক প্রভৃতি চল্লিশ বৎসরের সংস্কার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

তবে তাহার কতকগুলি অদ্ভুত খেয়াল আছে। সাধু বা ব্রহ্মচারী হইবে, লোকে তাহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করিবে, এ সব ইচ্ছা বেশ আছে। সাধুদের অনুকরণ করিতে ভালবাসে। সাধুরা এক কাপড়ে থাকেন, কাজেই ডাক্তারের গায়ে দ্বিতীয় বস্ত্র সহ্য হয় না। সাধুদের দাড়ী আছে, সুতরাং ডাক্তার আর দাড়ী কামাইবার সুযোগই পায় না। কাজেই শুধু দাড়ী নয়, চুলগুলিও বেশ দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া উঠে। ঠাকুরের অনুকরণ করিতেও ডাক্তার বড় ভালবাসে। ঠাকুর দেবস্থানে যে জায়গায় বসেন, ডাক্তারও একটু সেখানে বসিয়া লইল। ঠাকুর যে ভাবে হাত নাড়েন, দেবদর্শন করিতে করিতে ডাক্তারের হাতও সে ভাবে নড়িয়া যায়। ডাক্তার বেশ প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারে, কিন্তু সেটা কাহারও কাছে স্বীকার করিবে না; বলিবে, "আমার একমুষ্টি অন্ন হইলেই যথেষ্ট।"

হঠাৎ ডাক্তারের বিবেক উপস্থিত হইল, কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রবে আর থাকা হইবে না। তৎক্ষণাৎই স্ত্রীকে কাশী হইতে একেবারে বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় (শ্বশুরালয়ে) রাখিয়া আসা হইল। পরদিনই স্বহস্তপক অর্দ্ধদগ্ধ অন্ন আর অর্দ্ধসিদ্ধ আলু পেটে পড়াতে উপলব্ধি হইল, 'সর্ব্বময়ং খল্বিদং ব্রহ্ম'; কে স্ত্রী, কেই বা পুরুষ? সুতরাং সেই মুহূর্ত্তেই—বিলম্ব আর সহিবে না—তাঁহাকে আনিবার জন্য ট্রেণ ধরিতে ষ্টেশনে ছুটিল। ডাক্তার দেখিল যে নির্ভরতা দ্বারা সাধনে অগ্রসর হইতে ঢের বিলম্ব; পুরুষকার ছাড়া হইতেই পারে না;

স্বাবলম্বী হইতে হইবে;, পরের উপর নির্ভর করা অন্যায়। সুতরাং ঘরের মাঝখানে পর্দ্দা পড়িয়া গেল। একদিকে ডাক্তার 'একমুষ্টি' মাত্র চা'ল আলু-সংযোগে সিদ্ধ করিতে লাগিল। অপরদিকে মৎস্য ভর্জ্জিত হইতে লাগিল। মৎস্যের গন্ধ বারবার নাসিকাতে প্রবেশ করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতেছে দেখিয়া, আর স্বপাক ব্যবস্থায় সাধনার বিঘ্ন হয় বলিয়া, ঠিক্ করিল যে—নির্ভরতাই ঠিক্। 'অহং'কে নাশ করিতে হইবে। কাজেই পর্দ্দা আবার উঠিয়া গেল। এ রকম খেয়াল সব মাঝে মাঝে হয়। তাতে একটু দুঃখকষ্টও পায়। এজন্য ঠাকুর তাহার উপর একটু কড়া নীতি লইয়াছেন। কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে দেন না। প্রায়ই বুঝান। আজও বলিতেছেন,—

ঠাকুর। দেখ ডাক্তার, একটা নীতি নিয়ে চল। আর এ ভাবে থেকে নিজেও কষ্ট পেয়ো না, আমাকেও অসুস্থ শরীরে বিরক্ত করো না। সাধু হবে ত ঠিক্ ঠিক্ সাধু হও। সে রকম কঠোর নীতি নিয়ে চল, সাধন-ভজন কর, দুঃখকষ্টে স্থির থাক। নয় ত সংসার কর, তাঁকেও ডাক। বেশ ডাক্তারি করতে, তাই কর। খাও দাও, ভগবানের নামও কর। একটা পথ ধর। না এদিক না ওদিক ক'রে কি হবে? কোন সাধুকে দেখেছ তোমার এ নীতিতে সাধনা করতে? কতকগুলি চুলদাড়ী রাখলেই কি সাধু হয়? যাও, একটা নীতি নিয়ে চল। এলো মার্কণ্ডি ক'রে কিছু হয় না। হয় বাড়ীতে যাও কাজকর্ম্ম কর, ভগবানের নামও কর; নয় ত সামান্য যা আয় আছে তাতে কাশীতেই থাক। তিনি ত তোমাকে খুব সুখে রেখেছেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জন, আর কেউ নেই। কোম্পানী-কাগজের মাসিক কিছু বাঁধি আয়ও আছে। এ অবস্থায় কেন চালাতে পার না? তোমার ত কোন চিন্তা থাকা উচিত নয়। ধার ক'রে দুঃখ আনছ। কাশীস্থানে থাকবে, মন্দ কি? তাঁর নাম করতেই ত থাকবে। একটু কষ্ট ক'রেই না হয় থাকলে? যা হো'ক একটা নীতি নাও।

ডাক্তার প্রণাম করিয়া বিদায় লইল,। তারপর ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

ঠাকুর। দেখ দেখি, মিছিমিছি কষ্টভোগ করছে। এমনি বেশ ভাল। সব ছেড়েছে, বেশ কঠোরভাবে আছে। সৎ, শান্তপ্রকৃতি, চরিত্রবান, এসব কতকগুলি গুণ ওর মধ্যে খুব আছে। শুধু খেয়াল দোষে কষ্টভোগ করছে। আর দেখ, সরলতা নেই; বলবে এক আর কাজে করবে আর একরকম। মঠে থাকতে চায়। তা এ সব খেয়াল আর এখন সহ্য করতে পারব না। তার স্ত্রীর আমার ওপর তার চেয়েও বেশী ভালবাসা। তারও এমনি বেশ কঠোরতা আছে। তবে বোধশোধ বড় কম; মঠে থাকা হ'তে পারে না।

ডাক্তার ভক্তদের সকলকে খুব ভালবাসে। ভক্তরাও তাহাকে লইয়া প্রায়ই আনন্দ করে। ধীরেন, কালীবাবু, পুতু, অপূর্ব্ব, তারাপদ, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সত্যেন প্রভৃতি ভক্তরা তাহাকে লইয়া কাশীতে গঙ্গায় নৌকা করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। ডাক্তার কাহাকেও পায়ের ধূলা দেয় না। কিছুক্ষণ পরে ধীরেন বলিয়া উঠিল, "আজ শুভ পূর্ণিমা তিথিতে, শনিবারে, মঘা নক্ষত্রে, এই মাহেন্দ্র ক্ষণে, পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে গঙ্গাবক্ষে যে সৎব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করবে, তার বহু বৎসর অক্ষয় স্বর্গবাস।" অমনি সকলে ডাক্তারের পায়ের ধূলা লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ডাক্তার কিছুতেই দিবে না। তাহারাও ছাড়িবে না। একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নৌকা ডুবে আর কি! ডাক্তার চটিয়া লাল; "কি তোমরা ব্রাহ্মণকে বিপদগ্রস্ত করছ; তোমাদের কি মঙ্গল হবে?" অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, "কি ডাক্তারদা, আমাদের অভিশাপ দিলেন? আমরা আপনার গুরুভাই!" ডাক্তার তখনই জল। "না ভাই, না ভাই, তোমাদের কি শাপ দিতে পারি? তোমরা সব আপন। সব ত আপন। তবে আমায় বিরক্ত কর কেন ভাই।" এই সব খেয়াল থাকাতে তাহাকে লইয়া সবাই আনন্দ করে।

মাঝের গাঁর কথা হইতেছে।

মা-মণি, কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, সকলে বলিতেছেন, সেখানে খুব আনন্দ হইয়াছে।

ঠাকুর। দেখলে ত, কি রকম মোটরে চড়লে আর বাড়ীর দোরে গিয়ে নামলে। আর ওখানে যেতে হ'লে (অর্থাৎ কুড়ুলগাছি, মার দেশে) কোথাও বা হাঁট, কোথাও সাঁতার কাট, কোথাও বা গরুর গাড়ীতে চল। আর এ কেমন সহর জায়গা। (সকলের হাস্য)।

এই ভাবে নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। পাড়ার মেয়েরা সব এসেছিল; বললে, "থেকে যান।" আমি বললুম, সে ত হবার যো নেই। তোমাদের সঙ্গে যে ভাবে ছিলুম এখন সে ভাবে থাকা আর পোষাবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকতে গেলে, হয় তোমাদের আমার ভাবে আসতে হবে, নয়ত আমার তোমাদের ভাবে যেতে হবে। কোনটাই হবার যো নেই। তোমরাও আমার ভাবে আসতে পারবে না, আমিও তোমাদের ভাবে বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। আর তোমাদের সঙ্গে থাকতে হ'লে অর্থ চাই। সেও ত আর হবে না; তিনি ত সে অবস্থায় রাখলেন না। ডাক্তার মশায়ের মেয়ে এসেছিল; বললে বাবার মুখে সর্ব্বদা আপনার নাম। আপনি যখন আসতেন, আবার চলে যাবেন শুনলে বাবা কাঁদতে থাকতেন। আপনি ভুলিয়ে চলে যেতেন।" এই আকর্ষণেই যেতুম। তিনজনার একজনও নেই। রসিক চাকর আমার ছেলের মত ছিল, আমার জন্য জীবন দিতে কুন্ঠিত হ'ত না। এত ভক্তি ভালবাসা ছিল। সেও গেল। জ্যেঠাইমা নিজের ছেলের চেয়েও আমায় ভালবাসতেন; তিনিও নেই। আর ডাক্তার ম'শায়ও (যদুনাথ ভট্টাচার্য্য) নেই; তিনি একজন যোগী, ত্যাগী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ রকম সৎব্যক্তি, অত বড় পণ্ডিত ওদিকে ছিল না। খুব নিষ্ঠাচারী, কঠোরী ছিলেন। পূর্ব্বে ডাক্তার ছিলেন, এজন্য ডাক্তার ম'শায় বলতাম। তিনি আমাকে সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। আমি আসব শুনলে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতেন। গরীবপুর যাচ্ছি বলে

ভুলিয়ে আসতুম। এঁরা কেউ নেই। তবে পূর্ব্বের সেই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দর্শন করব, আর ছেলেদেরও প্রবল ইচ্ছা একবার যাওয়া, তাই গেলুম।

আর জ্যাঠাম'শায়ের (শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায়) সঙ্গেও দেখা হ'ল। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। খুব ভাল লোক; ভেতরে কোন রকম কুটিলতা নেই; বুদ্ধিমান, সৎ, ন্যায়পরায়ণ। কাশীতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দেখা হ'লেই অনেকক্ষণ বসে গল্প করতুম।

কালু। এ মিলন বড় সুন্দর।

ঠাকুর। হ্যাঁ; যদি তাতে ভগবদ্ভাব থাকে। তা ভিন্ন স্বার্থ উঠবে। আর এর মাধুর্য্য থাকবে না। ভগবদ্ভাব এলে স্বার্থ-শূন্য হয়। প্রাণ থেকে ভালবাসা হয়।

তাদের সঙ্গে তাদের ভাবে বেশ ব্যবহার করলুম; তারাও সন্তুষ্ট হ'ল। তাদের কা'কেও আলাদা করিনি, সবকে নিয়ে বসলুম। তারা বেশ খুসী হ'ল। যারা ভয়ে কাছে আসত না, তাদেরও সাহস হ'ল। ভয় গিয়ে ভালবাসা এল। যদি গম্ভীর হ'য়ে ওপরে বসে থাকতুম তবে তাদের সে আনন্দ হ'ত না। তাদের মেয়েদের 'মা-লক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করলুম। শাস্ত্রে আছে 'অমানীন মান দেনা।' মানী যে তাকে ত মান দেবেই, অমানীকেও মান দেবে। তাদের প্রাণটা গলে গেল। বললে, "আর কিছু চাই না; আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, এই চাই।" যদি চুপ ক'রে বসে থাকতুম, তারা কোন আনন্দই পেত না।

কালু। যেখানকার যে ভাব।

ঠাকুর। হ্যাঁ; যে ভাবে দেখেছে, তার পরিবর্ত্তন হ'লেই কষ্ট হয়। এই দেখনা, তোমাদের খিদিরপুরে একভাবে ছিলুম; এখানে তিনি আর এক রকম রেখেছেন। ঠিক্ সে ভাবটা না পাওয়াতে তোমাদের প্রাণটা খারাপ হ'চ্ছে। তা বহুকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। সব সময় ত এক রকম চলে না।

অশোক, আশু, কিশোরী, গুরুপদ আসিল। শশী, অসিতা, অনুকূল, কানাই, পচু সাহেব, ফকির এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন। নানা প্রসঙ্গ হইতেছে। রামায়ণ পাঠের কথা উঠিতে ঠাকুর একটী হাসির গল্প বলিলেন ;—

ঠাকুর। জয়রাম কামার বলে একজনা, তার ছেলের অসুখ হওয়াতে একজন বললে, "দৈব কিছু করুন, সেরে যাবে।" কি করে ; রামায়ণ গান দিলে। মূল গাইন পোষাক টোষাক পরে, চামর টামর ঢুলিয়ে গান করছে। এখন গান করতে করতে হনুমানের নাম ভুলে গেছে। মহা মুস্কিল। সবাই জানতে পারলে কি বলবে! তাই করলে কি, সঙ্গে সঙ্গেই সুর করে বললে,

'লম্ফ দিয়ে ঝম্প মারে, তার নাম কি ?'

দোয়ারকিরা বুঝলে যে হনুমানের নাম ভুলে গেছে। মূল গাইনই ভাগ বেশী নেয়, তারা কম পায়। ভাবলে, এই সুযোগে তাকে জব্দ করা যাক। বললে,

'ভাগের বেলা বাড়াবাড়ি, আমরা জানি কি ?' (সকলের হাস্য)। গাইন দেখলে, 'সর্ব্বনাশ, এরা ত বিপদে ফেলবে'। অমনি চট ক'রে বলে দিলে,

'এবার হইবে ভাগ সমানে সমান।'

তখন দোয়ারকিরা বললে,

'তবে বুঝি তার নাম বীর হনুমান।' (সকলের হাস্য)।

গান চলছে। জয়রাম কামারের ছেলেটাকে সেখানে এনেছে। গাইন গাচ্ছে, 'শক্তিশেল বাণে পড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ' ইত্যাদি। দোয়ারকিরা শুধু ধরে আছে, 'সে ত বাঁচবে না, সে ত বাঁচবে না।' এমন সময় জয়রাম কামার বললে, "ছেলেটিকে একটু আশীর্ব্বাদ করুন।" গাইন বললে, "হ্যাঁ"; বলেই চামর ঢুলিয়ে গাইলে, 'জয়রাম কামারের পুত্রের করহ কল্যাণ'; দোয়ারকিরা ঠিক্ ধরে আছে, 'সে ত বাঁচবে না, সে ত বাঁচবে না।' (হাস্য)। জয়রাম কামার

বললে, "ওরে বেটা, বাঁচবে না! রামায়ণ দিলাম ছেলের জন্য, আর সে বাঁচবে না!" (সকলের উচ্চ হাস্য)।' দোয়ারকিরা ঠিক্ তাদেরটা ধরে আছে, ওদিকে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সে সব দেখবে না।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তেরা ধ্যান করিতেছেন।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। তোমরা সমস্বরে তাঁকে 'মা মা, বলে ডাকছ, খুব ভাল। বিশ্বাস রাখবে, বিশ্বাসই প্রধান। এটা মনে ভেব' না যে এ সব কিছু নয়। এই যে সমস্বরে 'মা মা' ডাক, এতে অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। চিত্তশুদ্ধি হয়, সৎএ বিশ্বাস হয়; এতে দিন দিন উন্নতি হবে। 'মা মা' বলে যে সর্ব্বদা ডাকে, মা সর্ব্বদা তার কাছে থাকেন। একবার তাঁকে 'মা' বলে ডাকলে তিনি থাকতে পারেন না, এসে কোলে নেন। তাঁর এত দয়া। যে তাঁকে ডেকেছে তাকেই তিনি কোল দিয়েছেন। কিছু সময় তাঁকে দেবে। সংসার ত করলে। সংসার এমনি ভাবে গড়া, একে ভাল রাখতে কেউ পারেনি। মন এটা সেটা ধরে নেয়; একটা হয় ত হ'ল আর একটা হ'ল না; তাঁকে ছাড়বে না। তাঁকে ধরে যদি অর্থ আসে তাতে মঙ্গল হয়। পরমহংসদেব বলতেন, ভক্তের যদি অর্থ হয় তাতে সদ্ব্যয় হয়। খাওয়া দাওয়া, ঘুমান, এ ত আছেই; পশুতেও করে। এর আর বাহাদুরি কি? কিছু সময় তাঁর ভাবে থাকবে, তাতে নিজেরও মঙ্গল হবে, পাঁচজনারও উপকার হবে।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ যে করতেই হবে তার মানে কি? শুকদেব বলেছেন, সংসারীদের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ নয়। সহধর্ম্মিণী যে স্ত্রী, যার সাহায্যে আত্মোন্নতি হয়, সে কামিনীর মধ্যে নয়। সে সঙ্গে থাকলে অনেক বিষয়ে সাহায্য হয়; তাতে উপকারই আছে। আর, যে অর্থে বহু লোক প্রতিপালিত হয়, যে অর্থ নিজের ভোগসুখের

জন্য নয়, সে অর্থ কাঞ্চন নয়। তাতে বহু লোক উপকৃত হয়। সে ধনী ভাবে, 'এ অর্থ' আমার নয়। আমাকে দিয়ে তিনি বহু লোকের উপকার করাচ্ছেন। আমি তাঁর দাস মাত্র।'

এজন্য শাস্ত্রে আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আগে ধর্ম্ম পরে অর্থ। ধর্ম্মের ভিত্তি থাকলে তবে অর্থের ব্যবহার বুঝবে, অর্থের তার পাবে। উন্মাদ কি কিছুর তার পায়? তাকে ভালই খেতে দাও আর মন্দই খেতে দাও সে কোন তারই পাবে না। সে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য; কিসে অর্থ হবে রাতদিনই এই চিন্তা। কামনা-বাসনার তাড়নায় অস্থির। তার 'দেহি দেহি পুনঃপুনঃ' রব, সে অর্থের কি তার পাবে? মানুষ 'ভোগ ভোগ' করে, ভোগ করা কি সোজা কথা? সে যে মহাশক্তির কাজ; তার ধাক্কা কে সামলাবে? যার ধর্ম্ম সহায় নেই, সে ধনীর চেয়ে দরিদ্র কে আছে? তার সর্ব্বদা অশান্তি, কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। তার চেয়ে ধার্ম্মিক দরিদ্র ঢের সুখী। তার বাসনা-কামনার জ্বালা অতটা নেই। সে ত আনন্দে আছে। অর্থের পর কাম; কাম মানে কামনা। ধর্ম্ম সহায় আছে, যে কামনা আসবে তা সৎই হবে। কামনা পূরণ হ'য়ে গেল। বৃত্তি পূরণ হ'লে মোক্ষ আসবে। বৃত্তি পূরণ না হ'লে 'মোক্ষ এস, মোক্ষ এস' বলে চেঁচালেও আসবে না। এ ত বললেই হয় না। তাই দিয়েছে সাধুসঙ্গ। সদ্‌গুরুর সঙ্গে কাজ হয়।

বলে, "সাধুকে নষ্ট ক'রে ফেলে।" শুনতে পাই, কেউ কেউ নাকি বলে, "অমুক সাধুকে ভক্তেরা নষ্ট ক'রে ফেললে।" তারা জানে না, সাধু কি অবস্থা। সাধু কি অবস্থায় বসে আছে, তাকে তার মা ধরে আছেন, নষ্ট করবে কে রে? ওর নষ্ট ফষ্ট কি রে? নির্ব্বোধ, তোরা বুঝিস না, যা খুসী বলিস। সাধু খারাপ হ'য়ে যাবে? তাকে মা ধরে আছেন, কে তার ধারে যাবে? যারা নিজেকে চালাতে পারে না, দুর্ব্বল, তারা সাধুকে নষ্ট করবে কি ক'রে? সাধুকে নষ্ট করতে কত শক্তির কাজ; সাধুর ওপর শক্তি না হ'লে সাধুকে নষ্ট করতে পারে? অন্ধ তোরা, নিজের কামনা-বাসনার তাড়নায়

সর্ব্বদা পাগলের মত ছুটোছুটি কচ্ছিস, নিজের কি অবস্থা জানিস না, তোরা সাধুর অবস্থা ধরে ফেলবি? সাধু কোন্ ভাবে কখন কাজ করবে, কোন্ প্রকৃতি নিয়ে কখন চলবে, তুমি যদি তা ধরতে পারতে, তবে ত তুমিই সাধু হ'য়ে যেতে। সাধু কারও কথায় চলবে না; তারা তোমাদের আপন সন্তানের চেয়েও বেশী দেখে। কিসে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাদের এই চিন্তা। কোন স্বার্থের আশা রাখে না। বাড়ী, ঘর, টাকা, কোম্পানীর কাগজের চিন্তা তারা রাখে না। কেন রাখবে? তাদের অভাব কি? যাদের সর্ব্বদা অভাব, কামনা-বাসনায় ডুবে আছে, কখন কি হবে জানে না, তারা চিন্তা রাখবে। যারা দেখছে, যখন যেখানে থাকে, তাদের খাবার নিয়ে ছুটেছে, পাছে কষ্ট হয়, তাদের ভাবনা কি? তাদের তিনি ভাঁড়ারী রয়েছেন। তারা আবার নিজে ভাঁড়ারী হবে?

তোমাদের তারা ছেলের চেয়েও বেশী দেখে। কিসে তোমাদের মঙ্গল হবে তাই ভাবে। তাদের শান্তি অশান্তি তোমাদের জানতেও দেবে না। দেহ গেলেও তারা ভাবে না। তোমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। তাদের কি স্বার্থ? তারা আপনের চেয়েও আপন। পরমহংসদেব ডাকতেন, ওরে তোরা আয়, তোরা যে আমার বড় আপন; তোদের না দেখলে যে প্রাণ কেমন করে, তোরা না এলে কাদের নিয়ে থাকব? কেঁদে ফেলতেন। গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসেন। মানুষ ভাবে, এ স্বার্থ ছাড়া কি ক'রে হয়? কারণ তারা ত নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখেনি; কখনও তাদের কেউ নিঃস্বার্থ ভালবাসেনি, তারাও কখনও কা'কে স্বার্থ ছাড়া ভালবাসেনি। কাজেই ভালবাসায় তাদের সন্দেহ হয়। সে অবস্থায় পড়েনি, সে সঙ্গ করেনি; তারা কি ক'রে বুঝবে? সাধুদের প্রাণের টানে, প্রবল ভলেবাসায় মানুষ পাগল হ'য়ে যায়।

বলিতে বলিতে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল, চোখ মুখ অপূর্ব্বভাবে মণ্ডিত হইল। গান ধরিলেন :—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা। (৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া 'আনন্দম্, আনন্দম্, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, মা মা, ওঁ ওঁ' মুহুর্মুহু এই সকল আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন। বলিতেছেন, 'ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন জগদানন্দময়ী মাকে জানে।' সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "সব মঙ্গল হো'ক, আনন্দ হো'ক, সমস্ত মঙ্গল হো'ক!"

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। ধনীরা যদি সৎ হয় তবে বহু লোকের উপকার হয়। এই দেখ গীতাতে আছে, যোগভ্রষ্টরা উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে বা পবিত্র ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। দেখ, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—আমার কাছে প্রায়ই আসে—খুব সৎ লোক, বহু লোকের উপকার করে, অনেক অর্থ দান করেছে, বহু লোক তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়। অত বড় রাজা, তা অভিমান নেই। তবে সংসার এমন জিনিষ, এখানে ত কেউ সুখী নয়, এজন্য শুধু অর্থে শান্তি হয় না, সর্ব্বদা তাঁতে লক্ষ্য রাখতে হয়।

অনেকে বিদায় লইলেন। ঠাকুর সকলকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

একজন মাড়ওয়ারী আসিয়াছে; গজাননবাবু নাম। গঙ্গার ঘাটে ঠাকুরের সঙ্গে রোজই দেখা হয়।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাক?"

গজানন। এই চেলোপটীতে।

ঠাকুর। বেশ, খুব ভজন করবে। তাঁর নাম নেবে। সংসার ত আছেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিষও আছে। সংসার জায়গা ত ভয়ানক।

গজানন। সবই ত বুঝি, কিন্তু মন ত বোঝে না।

ঠাকুর। এজন্য সঙ্গ। ভুলিয়ে দেয় কা'রা? ছেলে পরিবারের মায়াই না ভুলিয়ে দেয়? তাই সর্ব্বদা সে সঙ্গে থাকতে নেই। ময়লা নিয়ে থাকলে ময়লার গন্ধই পাবে; ফুলের কাছে এলে ফুলের

গন্ধ পাবে। তাই সৎসঙ্গই প্রধান। সংসারে অভাব ত লেগেই আছে, কত পোরাবে? যত আন, আরও চাই।

গজানন। আমাদের তা লেগেই আছে; সংসার নিয়েই আছি।

ঠাকুর। সংসার ভাল। সংসারও কর, তার মধ্যে তাঁকেও রাখ। পিতাকে বলে যেমন সব কাজ কর, তেমনি তাঁকে মনে রেখে সব কাজ করবে। সবাই ত আর সংসার ছেড়ে কৌপীন নিয়ে বনে যাবে না। বেশ ত, ভগবতে মন রেখে সংসার কর, তাতে যে অর্থ আসবে তাতে সদ্ব্যয় হবে। সংসারও ধর্ম্ম; এও ত তাঁর। শুধু ধনী হ'লেই ত সুখী হয় না। ধর্ম্ম ভিক্তি হ'লে ধনে বহু লোকের উপকার হয়। কবীর বলেছেন, "অহঙ্কারে বিপদ আসে, পাপে দুঃখ আসে, দানে ঐশ্বর্য্য আসে, আর উপেক্ষায় ভগবান আসেন।" অর্থ থাকে ত দান করা ভাল।

গজানন। খারাপ ভাবে যদি কখনও অর্থ আসে তবে মনে বড় অশান্তি হয়। বেশী পয়সা বেরিয়ে গেলে তবে শান্তি হয়।

ঠাকুর। এজন্যই আমাদের দিয়েছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁর ভজনা করবে। তাঁর দাস মনে ক'রে থাকবে, ম্যানেজারের মতন থাকবে। নিকেশের সময় ঠিক্ নেবে, তহবিল ভাঙ্গলেই জেল দেবে।

সেই গান আছে না,—

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ওই যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম-জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকীর জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি, খরচ বেশী, তরব কিসে রাজার কাছে।
রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কেবল কালীনাম ভরসা আসে॥

জমায় কমি, খরচের ভাগই বেশী। তা'হলে হবে না। তা হিসেব নিকেশ ঠিক্ রাখবে। ম্যানেজার এমনি বেশ আছে; বাবুর সঙ্গে

খুব ভাব, বাবুর জুড়ী গাড়ী সবই ব্যবহার করে। প্রজারা বাবুর চেয়েও তাকে বেশী মানে। কিন্তু ম্যানেজার প্রাণে প্রাণে জানে, জমিদারের কাছে হিসেব দিতে হবে। কাজেই যতই প্রজারা সম্মান করুক আর যাই করুক, নিজের কাজ ঠিক্ রেখেছে।

অসিতা। পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম এ জীবনের সুকর্ম্মে ক্ষয় হয় কি।

ঠাকুর। হ্যাঁ; হয় বই কি? কর্ম্মে কর্ম্মক্ষয় হয়। এই নীতি।

অসিতা। আর সে জন্য পরিতাপ হয় না?

ঠাকুর। কর্ম্ম ত ক্ষয় হ'য়ে গেল। আর পরিতাপ কি? দেখ, কর্ম্ম ত হ'য়ে যায়। যতক্ষণ বৃত্তি সব ঠিক্ না হয়, কর্ম্ম হবেই। এজন্য এমন স্থানে, এমন সঙ্গে থাকতে হয়, যেখানে ইচ্ছা থাকলেও করবার যো নেই। পাড়াগাঁয়ে বাস কর, সন্দেশ খেতে লোভ হ'ল; সেখানে পাওয়া যায় না; কি ক'রে খাবে? সঙ্গে করতে করতে বৃত্তি কমে যায়। সঙ্গ প্রলোভনের বস্তু থেকে দূরে রাখে। আর লোভ আছে, অথচ সন্দেশের দোকানে বসে আছি; এ সন্দেশ ছাড়বার লক্ষণ নয়। দূরে থাকতে হবে। একে বিকারে রোগী, তার ওপর আচার তেঁতুল আর জলের জালা ঘরে থাকলে কি বিকার কাটবে?

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর ছোট ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কালীবাবুর ছেলে ধ্রুব কাছে গেছে। তাহাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ঠাকুর। কি রকম, প্রসাদ খেয়েছ?

সে মাথা নাড়ছে।

ঠাকুর। তুমি কি হবে? জজ হবে না জমিদার হবে? তুমি ঘোড়ায় চড়তে শিখেছ?

ঘোড়ার প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। পরমহংসদেবকে একজনা বলেছিল—ব্রহ্ম নীরস। তিনি বললেন, একজনা বলে, আমার মামার গোয়ালে মেলা ঘোড়া আছে। মানে, সে গরুও দেখেনি, ঘোড়াও দেখেনি। গোয়ালে যে ঘোড়া

থাকে না, তা সে জানে না। (সকলের হাস্য)। ব্রহ্ম কি, তাই জানে না, তার কি বুঝবে।

কালীবাবু, মা-মণি উঠিতেছেন। বাড়ীর মেয়েরা উঠিতেছে।

ঠাকুর কালীবাবুর স্ত্রীকে বলিতেছেন—ভাল আছ ত? খুব তাঁর নাম নেবে। তাঁর নামে থাকলে মঙ্গল হবে।

নির্ম্মলবাবুর স্ত্রীকে বলিতেছেন—বৌমা উঠছ? তোমাদের কথা আমার সর্ব্বদা মনে আছে। তোমাদের ভক্তি ভালবাসা ত ভোলবার জিনিষ নয়।

সত্যেন ঠাকুরের কথা লিখিতেছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম, সব লিখে ফেললে?"

ডাক্তার সাহেব। সত্যেন আমাদের সকলকে আশ্চর্য্য করেছে। আপনি এত তাড়াতাড়ি সব কথা বলেন যে সাধারণের লিখে ওঠা অসম্ভব। সত্যেন কিন্তু সব কথাগুলো অবিকল লিখেছে। তবে তার Rough (খসড়া) খাতা বিন্দু বিসর্গও পড়া যায় না। Short handএর বাড়া!

ঠাকুর। হ্যাঁ দেখছি, সত্যেনের স্কন্ধে যেন মা চেপেছেন। এই সমস্ত কথা লেখা বড় সোজা ব্যাপার নয়। এর ভেতরে যেন তাঁর একটা অদ্ভুত শক্তি খেলা করছে। আমি যে ভাবে কথা বলে যাই, সে সব সঙ্গে সঙ্গে লেখা সাধারণ শক্তির কাজ নয়। তার ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় অসীম; আর আমার ওপর ভক্তি বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় খেলছে। বুদ্ধিমান, সৎপ্রকৃতির ছেলে। এ রকম ছেলে বড় কমই দেখা যায়। এতদিন ধরে অনেক চেষ্টা ক'রে যে কার্য্য সমাধা করতে পারেনি, এর ভক্তির জোরে ও তাঁর ইচ্ছায় সে কাজে সে অনেকটা সফলতা লাভ করেছে। এতেই বোঝা যায়, সত্যেনের ভেতর খুব একটা ভাব খেলছে। আর খুব কঠোরী, লোভশূন্য। সামান্য অর্থের ভেতর নিজেকে চালাচ্ছে, অথচ বেশীর জন্য আকাঙ্ক্ষাও রাখে না। লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র ও ক্ষুধানিবৃত্তির আহার পেলেই সন্তুষ্ট। কাশীতে এ আর অচ্যুত আমাকে দেখবার

জন্য যায়; সামান্য অর্থের মধ্যে নিজে রেঁধে খেয়ে থাকে। যা কিছু কাজ, সব নিজের হাতে করে। এমন কি বাসনাদি সব নিজ হাতে মাজে, নিজেরা জল তোলে। অথচ এতে কষ্ট বা নিজেকে অসুখী মনে করে না। বালকের এ রকম সব অবস্থায় সন্তুষ্টতা দেখলে বড় আনন্দ হয়।

রাত দশটা হইল। অনেকে উঠিলেন। আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম ভাগ—সপ্তবিংশ অধ্যায়।

কলিকাতা।

খিদিরপুর মঠে—ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা। *

সদ্‌গুরু কে?—সংসার—জনক—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম—শবসাধকের কথা—নির্ভরতা—বিশ্বাস—ভগবান, নারদ ও বিশ্বাসী চাষার গল্প—সংসার মনে—'কৌপীনকাওয়াস্তে'র গল্প—সংসারীর উপায়—সৎসঙ্গ—সংসারীর উপর তাঁর বেশী দয়া—ভগবান, নারদ ও সংসারী চাষার গল্প—বিবেক, বৈরাগ্য—সাধনা—তীব্র ব্যাকুলতা—অনিত্য বোধ—কালের কথা—উপায় সদ্‌গুরু-সঙ্গ।

ডাক্তার সাহেব। সদ্‌গুরু কে? তাঁকে কি ক'রে চিনব?

ঠাকুর। যাঁকে দেখলে আপন বোধ হবে, যাঁর কাছে গেলে মনে শান্তি আসবে, এবং যার কোন অভাব নেই, সর্ব্বদাই আনন্দে বসে আছেন, তোমরা এ তিনটে অবস্থা দেখেই বুঝবে। সদ্‌গুরু ত সেই সচ্চিদানন্দ। তবে যাঁর ভেতর দিয়ে তিনি কার্য্য করেন। যেমন বৃষ্টির জল ছাতে পড়ে সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। তোমরা মনে করছ সিংহের মুখ থেকেই পড়ছে, কিন্তু তা নয়; আকাশ থেকেই পড়ছে। তা ভিন্ন তুমি সাধুকে কি ক'রে চিন্‌বে? নিজের ছেলেকে, নিজের চাকরকে চিনতে পার? আর অত চেনার দরকারই বা কি? যাঁতে মন মজে তাঁকেই গুরু ভাববে। শুঁড়ির বাড়ীতে কত মদ আছে জানবার কি দরকার? তোমার ত এক গেলাস খেলেই নেশা হবে।

---

* প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে প্রথম ঠাকুরের দেখা হইলে যে সকল কথোপকথন হয়, তিনি সেগুলি তখন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই এইখানে দেওয়া হইল।

একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একদানা চিনি খেলেই পেট ভরে যায়, আর এক দানা মুখে ক'রে বাড়ী নিয়ে আসে; আর মনে করে, এবার এসে সব পাহাড়টি বাড়ী নিয়ে যাব।

ডাঃ সাঃ। ভগবানের দিকে সব মন দিলে সংসার চলে কি?

ঠাকুর। তুমি কা'কে ডাকছ? 'রামা' মেথরকে না 'হরে' চাকরকে? 'রাজরাজেশ্বরী মা' বলছ, কিন্তু বিশ্বাস কোথায়? যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, তিনি তোমার পুত্র-পরিবারকে দুটো খেতে দিতে পারবেন না? তা ছাড়া, এই সংসারটা কার? তোমার না তাঁর? ছেলে কি ইচ্ছা করলেই একটা আনতে পার? পুত্র, পরিবার, পরিজন, তারাও ত তাঁর। কাজেই তুমি তাঁকে ধরলে, তিনি কি তাদের দেখবেন না?

ডাঃ সাঃ। তিনি যদি সর্ব্বভূতে সচ্চিদানন্দরূপে আছেন, তা'হলে আমরা আনন্দ উপভোগ করি না কেন?

ঠাকুর। তুমি মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে গেলে, তোমার মুখে যদি সন্দেশ দেয়, তুমি কি তার পাও? এই মূর্চ্ছারূপ মায়াকে তাড়াও। মেঘ সরাও, সূর্য্য আপনি দেখা দেবে। উপায়—সদ্‌গুরু-সঙ্গ। তাঁতে বিশ্বাস; তাঁর কথানুযায়ী কার্য্য।

ডাঃ সাঃ। ভগবান আমাদের এই মায়ায় ফেলেন, আবার তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ডাকতে বলেন কেন? আমাদের দোষেই ত আমরা মায়ায় জড়াইনি, তবে আমরা ডাকব কেন?

ঠাকুর। কেউ ত ডাকতে বলছে না বাপু। তুমি যদি সংসারে বসে শান্তি আনন্দ পাও, সে ত খুব ভাল কথা।

ডাঃ সাঃ। কেন? জনক রাজা ত সংসার করতেন?

ঠাকুর। সকলেই কি জনক হ'তে পারে? জনক ছিলেন রাজর্ষি। সংসারে থেকে মুক্ত। তিনি সংসারটাকে অধীন ক'রে সংসার করতেন। আর বদ্ধজীবেরা সংসারের অধীন হ'য়ে সংসার করে।

অনেক তফাৎ। তাঁর পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যা ছিল। তাই রাজা হ'য়েও জীবন্মুক্ত হ'য়ে সংসার করেছিলেন।

দেখ, একজন সাধক রাত তিন প্রহর ধরে শ্মশানে বসে শব-সাধনা করলে। চতুর্থ প্রহরে অর্ঘ্য দিলে তার সিদ্ধি লাভ হবে। এমন সময় একটা বাঘ এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল। একটা লোক গাছের ওপর বসে এ সব দেখছিল। সে নেমে এসে শেষ অর্ঘ্যটি দিলে। যেমন দেওয়া, মা প্রসন্ন হ'য়ে তাকে দেখা দিলেন। সে লোকটী বললে, "মা, তোমার এ কি রকম বিচার? সে বেচারী সমস্ত রাত ধরে তোমার পূজা করলে, শেষ অর্ঘ্যটি দিলেই তার কার্য্য শেষ হ'ত। কিন্তু তাকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। আমি কিছুই করিনি, শুধু ওই শেষ অর্ঘ্যটি দিলাম; আর তুমি আমার ওপর প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলে!" মা বললেন, "বৎস, কোন অবিচার হয়নি; ঠিক্ই হয়েছে। তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা কিছুই স্মরণ নাই; তাই তোমার মনে এরূপ ভাব উঠছে। পূর্ব্বজন্মে তোমার সব কার্য্য করা ছিল। শুধু ওই শেষ অর্ঘ্য দেওয়াটি বাকী ছিল। তাই এবার সেটি দেওয়ায় আমার সাক্ষাৎ পেলে। আর এর কিছু কামনা বাসনা রয়েছে; আসছে জন্মে সে সব পূর্ণ হবে। তারপর শেষ অর্ঘ্যটি দিলেই আমার দেখা পাবে।"

তা দেখ, জনক একটা অবস্থা। পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতি না থাকলে তা হয় না।

ডাঃ সাঃ। সবই যদি তিনি করছেন, আর কর্ম্মফল যদি মানতে হয় তবে আর তাঁকে ডেকে কি হবে? যা হবার তা ত হবেই।

ঠাকুর। সে ত সবই ঠিক্। ঘাসের পাতা পর্য্যন্ত তাঁর ইচ্ছা না হ'লে নড়ে না। কিন্তু তোমার সে বোধ কোথায়? সে বিশ্বাস কোথায়? তোমার স্ত্রীকে যদি কেউ রাস্তার লোক এসে অপমান করে, কিংবা তোমাকে একটা গালাগাল দিয়ে যায়, অমনি তোমার রাগ হয় কেন? তিনিই যখন সব করছেন, তবে তোমার আবার রাগ

কেন ? সে উপলব্ধি, সে বিশ্বাস যদি ঠিক্ ঠিক্ থাকে, তা'হলে ত তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে ; কোন ভাবনা থাকবে না। যেমন ছোট ছেলে, সে মা ভিন্ন কিছুই জানে না। মা দু'টো চড় মারলে 'মা মা' ক'রেই কাঁদে ; মার কোলেই মাথা লুকাতে যায়। সে রকম বিশ্বাস আন। তা ভিন্ন নিজে কর্ত্তা সেজে বসে আছি, 'আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার পরিবার, আমি তাদের খেতে দিচ্ছি, আমি তাদের সুখী করব', এসব বোধ রেখেছ ; আর ঈশ্বরকে ডাকবার বেলাই বলবে 'যা হবার তা হবে।' এ রকম কপটতা থাকতে তাঁর দয়া আসে না।

ডাঃ সাঃ। তাঁর উপর বিশ্বাস কি রকম ক'রে আসে ?

ঠাকুর। দেখ, বিশ্বাস বললেই আসে না। বিশ্বাস একটা অবস্থা। যার এসে গেছে সে ত জগৎ মেরে দিয়েছে। পূর্ব্বসুকৃতি অনুযায়ী বিশ্বাস আপনি আসে। যীশাস বলেছিলেন, 'এক তিল বিশ্বাস তাঁর ওপর এলে পাহাড় টলে যায়।' বিশ্বাস আনবার উপায়—তাঁকে একাগ্রচিত্তে ডাকা, তাঁর নামগুণকীর্ত্তন করা, সদ্‌গুরু-সঙ্গ করা এবং সদ্‌গুরুর কথানুযায়ী কার্য্য করা।

ডাঃ সাঃ। বইএতে আছে, তাঁকে একবার ডাকলে তিনি আসেন। এটা কি ঠিক্ ?

ঠাকুর। সবই ঠিক্ ; তাঁকে ডাকবার মত ডাকতে পারলে একবারেই তিনি কাছে এসে উপস্থিত হবেন। গান আছে না ? "ডাক দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকতে পারে।" সমস্ত মন তাঁকে দাও, ষোল আনা বিশ্বাস নিয়ে ডাক, তিনি ঠিক্ দেখা দেবেন। প্রহ্লাদের স্থির বিশ্বাস ছিল, স্তম্ভের ভেতর হরি আছেন ; তিনি সেখান থেকেই দেখা দিলেন। এর একটা গল্প আছে।

নারদ একদিন ভগবানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারায়ণ, বৈকুণ্ঠের কাছে একটা অতি সুন্দর প্রকাণ্ড অট্টালিকা কার জন্য নির্ম্মাণ হ'চ্ছে ?" নারায়ণ বললেন, "নারদ, ভারতবর্ষের অমুক গ্রামে একটী

চাষা তার পরিবার সহ বাস করে। সে আমার পরম ভক্ত। তার জন্য এই সুন্দর ইমারৎ তৈরী হ'চ্ছে।" নারদ ভাবলেন, "কে ওঁর এত বড় ভক্ত! গিয়ে দেখতে হবে।" এই ভেবে সে গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন যে চাষাটি প্রত্যহ সকালে উঠে লাঙ্গল নিয়ে চাষ বাস করতে মাঠে যায়, বিকালে ফিরে আসে; আর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করে। দিনান্তে একবারও সে হরিনাম করে না। নারদ তিন দিন ধরে দেখলেন, প্রত্যহ এই রকম সংসারের কাজ করে, একবারও হরিনাম মুখে আনে না। কিন্তু 'নারায়ণ যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তার ভেতর কিছু আছে।' এই ভেবে একদিন সকাল বেলা চাষা যখন লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে, তখন তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন; বললেন, "তুমি সমস্ত দিন সংসারের কাজ কর, কই একবারও ত ভগবানের নাম নাও না?" চাষা অমনি বলে উঠল, "চুপ চুপ, আমি একটা নাম জানি, সে নাম কিন্তু মুখে কখনও আনব না। সে নাম উচ্চারণ করলেই আমার দেহ থাকবে না। অমনি তাঁর কাছে চলে যাব।" নারদ একটু হেসে বললেন, "একবার সে নামটি করই না কেন?" চাষা বললে, "সে নাম আমি করতে পারি, যদি তুমি আমার স্ত্রী, পুত্র, সংসার, এসবের ভার নাও।" নারদ স্বীকৃত হওয়ায় চাষাটি বটতলায় যোগাসনে বসে তিনবার 'হরিবোল' বলাতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

কি রকম বিশ্বাস দেখ।

ডাঃ সাঃ। আমাদের সংসারীর পক্ষে তাঁকে ডাকা ত হয় না। তা'হলে সংসারীদের কি উপায়? সংসারে থেকে হবে না কি?

ঠাকুর। তোমাদের সংসার ছাড়তে হবে কেন? সংসার কি তাঁর নয়? রামচন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য, বনে যাচ্ছেন; দশরথ রাজা তাঁকে ফেরাবার জন্য বশিষ্ঠকে বললেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রাম, কোথায় যাও?" রাম বললেন, "বনে।" বশিষ্ঠ বললেন, "কেন? সংসারটা কি তাঁর নয়?" রামচন্দ্র ভাবলেন,

'তাই ত, যাঁরই বন তাঁরই সংসার, তবে যাই কোথা ?' আর দেখ, সংসার ছাড়ার কথা যা বলছ, তা ছাড়বে কে ? সংসারটা কি বাইরে ? সংসার ত তোমার ভেতরে, মনে। মনে যদি সংসার থাকে, তা'হলে বনে গেলেও সংসার তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

দেখ, একজনা সংসার ছেড়ে কৌপীন পরে তপস্যা করতে বনে গেল। সেখানে একটী গাছতলায় বসে তপস্যা করে। এ রকম ক'রে কিছুদিন যায়। পরে একদিন দেখে ইঁদুরের বড় উপদ্রব হয়েছে। তার কৌপীনটা ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করছে। কি করে; ভেবে চিন্তে স্থির করলে যে, একটা বেড়াল পুষলে ইঁদুরের উপদ্রবটা যায়। তাই একটা বেরাল ধরে কাছে রাখলে। এখন বেরাল রাখতে হ'লে তাকে ত দুধ খেতে দিতে হবে। তাই একটা গরু পুষলে। কিন্তু গরুকে কি খেতে দেয় ? কোথায়ইবা রাখে ? সেজন্য একটা গোয়াল ঘর তৈরী করলে, আর চাষবাস আরম্ভ করলে। ক্রমে একটী কুঁড়ে ঘর তৈরী হ'ল। এ ভাবে সাধুটি বনের ভেতরই বেশ একটী সংসার পেতে বসল।

কিছুদিন পরে একদিন তাঁর গুরু ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে করলেন, 'শিষ্যের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে যাই।' এসে দেখেন, শিষ্য একটী প্রকাণ্ড সংসার ফেঁদে বসেছেন। জিজ্ঞাসা করাতে শিষ্য উত্তর দিলে, "গুরুজী! এ সব কৌপীনকাওয়াস্তে।" (সকলের হাস্য)।

তা হ'লেই দেখ, মন থেকে সংসারকে না দূর করতে পারলে, বাইরে সংসার ত্যাগ করলে কোন লাভ নেই। **বাইরে গেরুয়া পরলে কি হবে ? মনকে গেরুয়া পরাও।** আর এক রকম আছে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের তাড়নায় তাড়িত হ'য়ে, হয়ত বা কারও সঙ্গে ঝগড়া করে, হঠাৎ একদিন বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু এ বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। কারণ মন থেকে ত সংসার যায়নি। হয়ত কাশী চলে গেল। কিন্তু দিন কতক বাদে বাড়ীতে চিঠি লিখলে,

'তোমরা আমার জন্য ভেবনা, আমি বেশ আছি। একটা চাকরীর যোগাড়ে আছি। চাকরী ঠিক্ হ'লে বাসা ঠিক্ ক'রে তোমাদের নিয়ে আসব।' (সকলের হাস্য)। কথা হ'চ্ছে, সংসারে থেকেই মন তৈরী করতে হবে; বিবেক বৈরাগ্য আনতে হবে। তখন সংসারটা অনিত্য বোধ হবে। হাতে যদি তোমার কেউ জ্বলন্ত আগুন রেখে দেয়, সেটা ফেলে দেবার জন্য তুমি যেমন ব্যস্ত হও, বিবেক বৈরাগ্য এলে সংসারটা ছেড়ে যেতেও সে রকম ইচ্ছা হবে। বিবেক বৈরাগ্য না এলে ব্রহ্মতেজ ঢুকে না। কামনা বাসনা থাকতে বিবেক বৈরাগ্য আসে না। কামনা বাসনাই অনর্থের মূল। তারা গেলে মন স্থির হয়। যেমন হাঁড়ির ভেতর চাল, ডাল, আলু, পটল সব লাফাচ্ছে; কিন্তু তারা নিজের শক্তিতে লাফালাফি করছে না। অগ্নি সংযোগেই লাফাচ্ছে। এই অগ্নি হ'চ্ছে বাসনা। আগুন যদি নিভিয়ে দাও, তখন আলু, পটল, সব স্থির হ'য়ে যাবে। বাসনার তাড়নায় মন তোলপাড় করছে। বাসনা ছাড়, মন স্থির হবে, শান্তি পাবে।

ডাঃ সাঃ। ভোগে কি বাসনার অবসান হয় না?

ঠাকুর। তা কি হয়? আগুনে যত কাঠ দেবে, যত ঘৃতের আহুতি দেবে, তত আগুন বেড়েই যাবে। নিবৃত্তিতে বাসনার অবসান হয়, শান্তি আসে।

ডাঃ সাঃ। তা'হলে আমাদের সংসারীর উপায়?

ঠাকুর। সংসারীদের পক্ষে প্রধান হ'চ্ছে সাধুসঙ্গ। যেমন স্থির বায়ুর কাছে চঞ্চল বায়ু এলে, চঞ্চল বায়ুও স্থির হয়ে আসে; সে রকম সাধুসঙ্গে মন আপনি স্থির হ'য়ে যায়। সঙ্গ করতে করতে সাধুর ওপর যদি ভালবাসা এসে পড়ে, তা'হলে আপনি কাজ হ'তে থাকে। কারণ মন কখনও দুটো জিনিষ একসঙ্গে ধরে না। যে জিনিষের ওপর ভালবাসা জন্মায়, মন স্বভাবতঃ সেদিকে যায়, বলতে হয় না। মন ক্রমান্বয়ে যে যে বস্তুর চিন্তা করে, তত্তৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। যেমন তেলাপোকা কাচপোকার চিন্তা করতে করতে কাচপোকাই

হ'য়ে যায়। তেমনি সাধুতে যদি ঠিক্ ঠিক্ বিবেক, বৈরাগ্য, আনন্দ ও শান্তি থাকে, যে তাঁর চিন্তা করে, তার মনেতেও ওই সব জিনিষ ঢোকে। সাধুর ওপর যদি ঠিক্ ভালবাসা হয়, তা'হলে আপনিই কাজ হয়। কিন্তু তা ত বললেই হয় না; সেজন্যে ক্রমান্বয়ে সাধুসঙ্গ করতে হয়; তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়। সংসার কর; কেউ ত সংসার ছাড়তে বলছে না। কিন্তু তার ভেতর থেকে যতটুকু সময় পার মন দিয়ে তাঁকে ডাক, এবং সাধুসঙ্গ কর। দেখবে ধীরে ধীরে শান্তি আসছে, শক্তি বাড়ছে। শক্তি না নিয়ে সংসার করতে গেলেই লোহা-পেটা হবে; দুঃখের ইতি থাকবে না। যেমন একটা সবল মুটে বড় বোঝা মাথায় ক'রে কেমন হাসতে হাসতে পথ দিয়ে চলে যায়; কিন্তু একজন আয়েসী বাবু একটা হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে করে খানিকটা দূর হাঁটতে গেলেই কষ্ট মনে করে। তেমনি এই সংসার একটা প্রকাণ্ড বোঝা। সেরূপ শক্তির সঞ্চয় কর, দেখবে সংসারেই শান্তি পাবে। সংসারে থাক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সংসারকে তোমার মধ্যে থাকতে দিও না। নৌকা জলে থাকে থাকুক, কিন্তু নৌকায় যেন জল না ঢোকে। সংসারের দাস হ'য়ে থেক' না। সংসারটাকে দাস ক'রে রাখ।

ডাঃ সাঃ। তাঁকে কতক্ষণ ডাকা উচিত?

ঠাকুর। দেখ, ঠিক্ ঠিক্ সরলভাবে ডাকলে, সংসারীদের ওপর তিনি একটুতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি ত জানেন, 'আহা, এরা কি করবে; মাথায় মস্ত বড় সংসারের বোঝা রয়েছে, তার তাড়নাতেই অস্থির।

এই বলিয়া ঠাকুর রাজকার্য্যরত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের গল্প বলিলেন। (২২৩ পৃষ্ঠা)। আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। তাঁকে অল্প সময়ের জন্য ডাকলেও তাঁর দয়া আসতেই হবে। বিশেষতঃ সংসারীদের ওপর তাঁর বিশেষ দয়া। তাঁর দিকে এক পা অগ্রসর হ'লে, তিনি একশ' পা অগ্রসর হ'য়ে আসেন। একটা গল্প আছে, শোন।

নারদ একদিন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব চেয়ে বড় ভক্ত কে?" ভগবান বললেন, "অমুক গ্রামে একটী চাষা বাস করে, সে-ই আমার প্রধান ভক্ত।" নারদের মনে মনে ভারী অভিমান হ'ল। বললেন, "কি রকম! আমি সমস্ত দিন তোমার নাম-গুণ-কীর্ত্তন করছি, আমি তোমার ভক্ত হলুম না? আর কে এক চাষা, ঘোর সংসারী, সে হ'ল গিয়ে তোমার বড় ভক্ত!" নারায়ণ বললেন, "নারদ, তুমি আমার খুব ভক্ত বটে; কিন্তু সেই চাষাটী তোমার চেয়েও বড় ভক্ত।" নারদ ভাবলেন, 'চাষাটী কি রকম ভক্ত একবার দেখে আসতে হবে।' এই ভেবে নারদ সেই গ্রামে গিয়ে সেই চাষার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখেন যে, চাষাটি সকল বেলা যখন লাঙ্গল নিয়ে কাজে যায়, তখন একবার হরিনাম করে; আবার সন্ধ্যার সময় যখন মাঠ থেকে লাঙ্গল নিয়ে ফেরে, তখন আর একবার হরিনাম করে। বাকী সময় সংসারের কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এই দেখে নারদের মনে আরও অভিমান এবং ক্রোধ হ'ল।

নারদ ভগবানের কাছে গিয়ে বললেন, "তোমার ভক্তটিকে দেখে এলুম। সে সকাল বেলা যখন মাঠে যায়, তখন একবার তোমার নাম করে; আর সন্ধ্যাবেলা যখন মাঠ থেকে ফেরে তখন একবার তোমার নাম করে। বাকী সময়টা তোমার কোন ধারই ধারে না। দিব্যি সংসারের কার্য্য নিয়ে মজে আছে। এই তোমার বড় ভক্ত! তোমার বিবেচনারও বলিহারি।" নারায়ণ বললে, হ্যাঁ নারদ, সেই আমার বড় ভক্ত। দেখ নারদ, এক কাজ কর। তুমি এই তেলের বাটিটা নাও; নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডটা প্রদক্ষিণ করে এস। আর সংখ্যা রেখ', কতবার আমার নাম জপ করলে। কিন্তু দেখ' নারদ, যেন এক ফোঁটা তেলও ভুঁয়েতে না পড়ে।"

নারদ তেলের বাটিটা নিয়ে প্রদক্ষিণ করতে বেরুলেন। তেলের বাটির দিকে নজর থাকাতে,—পাছে এক ফোঁটা তেল মাটিতে পড়ে,—ভগবানের নাম নিতে ভুলে গেছেন। প্রদক্ষিণ ক'রে ভগবানের কাছে

আসলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "কি নারদ, ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ ক'রে এলে?" নারদ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"। "তেল মাটিতে পড়েনি ত?" "না, এক ফোঁটাও পড়েনি।" ভগবান বললেন, "বেশ, বেশ; আমার নাম কতবার করছে সংখ্যা রেখছ?" নারদ বললেন, "ঠাকুর, যা তেলের বাটি দিয়েছিলে, সেদিকে মন থাকাতে—পাছে তেল পড়ে যায়—তোমার নাম নিতে ভুলে গেছি।" তখন ভগবান বললেন, "নারদ, তোমার মত ভক্ত, যার সমস্ত ভার আমি নিয়ে নিয়েছি, তারও যদি সামান্য একটা তেলের বাটির বোঝায় আমার নাম করতে ভুল হ'য়ে যেতে পারে, তা'হলে দেখ দেখি নারদ, সে চাষাটির ঘাড়ে কত বড় সংসারের বোঝা রয়েছে। তার ভেতর থেকেও সে নিয়ম ক'রে দু'বার আমাকে ডাকে। এখন বল দেখি, কে বড় ভক্ত?"

তা দেখ, সংসারীদের ওপর তাঁর অশেষ দয়া। তিনি ত জানেন, সংসারের বোঝায় এরা পীড়িত। তার ভেতর থেকে, যে কিছু সময় তাঁকে মন দিয়ে ডাকে, তার ওপর তাঁর কৃপা আসতেই হবে।

ডাঃ সাঃ। বিবেক এবং বৈরাগ্য কা'কে বলে?

ঠাকুর। হিতাহিত জ্ঞানকে **বিবেক** বলে। ঠিক্ ঠিক্ বিবেক চিত্তশুদ্ধি না হ'লে আসে না। তবে কিছু বিবেক-বুদ্ধি সকলের ভেতরই আছে। যে পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি হয় সে পরিমাণ বিবেক আসে। **সংসারীদের বুদ্ধি** কি রকম? যেমন প্রদীপের আলো; তাতে শুধু ঘরের ভেতরের জিনিষই দেখা যায়। বাইরের জিনিষ মোটেই দেখা যায় না। তেমনি এ বুদ্ধিতে শুধু টাকা রোজগার করা, ছেলেপিলে মানুষ করা, এই অবধি চলে। এর বাইরে আর ভালবাসতে জানে না। **ভক্তের বুদ্ধি** যেমন চাঁদের আলো। ভেতর বা'র দুইই দেখা যায়, কিন্তু স্থূল। দেওয়াল দেখা যাবে; তার ওপর পিঁপড়ে চলছে তা দেখা যাবে না। সে বুদ্ধিতে আত্মীয়, স্বজন, গ্রাম, দেশ, এ সবের ওপর ভালবাসা থাকে। আর **জ্ঞানীর বুদ্ধি** যেমন সূর্য্যের আলো। ভেতর,

বা'র, স্থূল, সূক্ষ্ম সব দেখা যায়। এতে সর্ব্বজীবে ভালবাসা এবং প্রেম আসে। পূর্ণজ্ঞান এবং শুদ্ধাভক্তি একই জিনিষ।

আর **বৈরাগ্য** হ'চ্ছে সংসারীয় বস্তুতে অশ্রদ্ধা। **বিবেক বৈরাগ্য হ'ল, ঠিক্ ঠিক্ অনিত্য বোধে সংসার বস্তুতে অশ্রদ্ধা।** বৈরাগ্য তিন প্রকার। এক মর্কট বৈরাগ্য, অর্থাৎ সংসারের রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্টে জর্জ্জরিত হ'য়ে রাগ ক'রে 'দূর ছাই' বলে বাইরে চলে যাওয়া। এ বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী এবং নিরানন্দজনক ; বাইরে গিয়ে বেশী দিন থাকতে পারে না। দিনকতক পরে ফিরে আসে। কারণ, মনের বাসনা কামনা ইত্যাদি থেকে নিষ্কৃতি না পেলে ত বাইরে থাকতে পারে না। আর হ'চ্ছে **তীব্র বৈরাগ্য**, হঠাৎ সংসার অনিত্য বোধ হয়, এবং ত্যাগ করে। এ পূর্ব্বজন্মের খুব সাধনা না থাকলে আসে না। আর এক আছে, সদ্‌গুরু সঙ্গে হয় ; সাধনা করতে করতে সংসারীয় বস্তুতে ক্রমে অশ্রদ্ধা এবং অনাসক্তি আসে। সে সব জিনিষ মন থেকে ত্যাগ হ'তে থাকে। কিন্তু এতেও পূর্ব্বজন্মর সুকৃতি চাই। তা না হ'লে সদ্‌গুরু লাভ হয় না।

একজন তার স্ত্রীর কোন বিষয়ে যত্নের ত্রুটি দেখলে বলত, "আমার বৈরাগ্য এসেছে, আমি সংসার ছেড়ে চললুম।" স্ত্রী বেচারী ভয়ে ভয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে তার মন যোগাত এবং যত্ন করত। কিন্তু যত্নের একটু ত্রুটি হ'লেই স্বামী অমনি বলত, "আমি চললুম।" আর সে বেচারী কেঁদে ভাসিয়ে দিত। এ ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও যখন মন যোগাতে পারে না, তখন স্ত্রীটি বিরক্ত হ'য়ে একদিন খাবার সময় বললে, "আমি আর এর চেয়ে যত্ন করতে পারব না, তুমি বেরিয়ে যেতে চাও, যাও।" স্বামী বললে, "অ্যাঁ, দেখবে ? চলে যাব ? আচ্ছা ; এই চললুম।" বলে বাইরের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে এসে বললে, "যাক, এবারটা তোমাকে ক্ষমা করলুম।" (সকলের হাস্য)। এ এক প্রকার বৈরাগ্য। আর একজনার বাড়ীতে স্ত্রী তার স্বামীকে খাওয়াতে বসেছে। স্বামীটী হঠাৎ বলে উঠল, "দেখ, আমার

কেমন যেন মনে হ'চ্ছে।" স্ত্রী বললে, "তোমারও ওবাড়ীর বাবুর মত বৈরাগ্য এল নাকি ?" সে বললে, "না ; মনটা কেমন করছে।" এই বলে সে উঠে পড়ল ; যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই চলে গেল ; আর ফিরে এল না। এই হ'ল ঠিক্ বৈরাগ্য।

ডাঃ সাঃ। এমন ত শোনা যায় যে, লোকে সাধন ভজন ক'রেও তাঁকে পায় না ; শেষে সাধন ছেড়ে দেয়।

ঠাকুর। যারা ও কথা বলে, তাদের সাধন ভজন কি রকম জান ? তাদের সব বিষয়েই পূর্ণমাত্রায় আসক্তি রয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, টাকা, বাড়ী, চাকরী ইত্যাদি সব বিষয়েই আকর্ষণ আছে। তারই মধ্যে একটু বসে তাঁর নাম করে। যতক্ষণ নাম করে, ততক্ষণই কি তাঁকে ঠিক্ ঠিক্ ডাকে ? মুখে 'হরি হরি, কালী কালী' করে বিড় বিড় করছে বটে, কিন্তু মনের ভেতর নানারকম সংসারের চিন্তা *ঘুরছে। তাতে কি হয় বাপু ? অল্প সময়ের জন্যও ঠিক্ ঠিক্ তাঁকে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই শোনেন। অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের এক বিন্দু জলের তার পেলে কি আর রক্ষে আছে ? তার ছাড়তে পারবে কেন ? ক্রমেই আনন্দ বেড়ে যাবে, চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে আসবে। সংসারের জিনিষের ওপর আসক্তি ছেড়ে যাবে। এই দেখনা কেন, ছোটবেলায় 'অ, আ' থেকে আরম্ভ করে, কতবৎসর স্বদেশে এবং বিদেশে কঠোর পরিশ্রম ক'রে তবে ডাক্তারী পাশ দিয়েছ। এখন তার জোরে টাকা রোজগার করছ। এত বৎসর ধরে এত পরিশ্রম, এত সাধনা, এত কঠোরতা ক'রে কি হ'ল ? না, কিছু টাকা উপার্জ্জন করতে পারলে। আর দু'বার 'হরি' কি 'কালী' বলেই ভগবান পেয়ে যাবে ? তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না। সূতোর আগায় একটু ফেঁসো থাকতে ছুঁচে ঢোকে না। একটু বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকতে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঠিক্ ঠিক্ ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকলে, তিনি দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না। একবার তাঁকে দেখলে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হ'য়ে যায়।

ডাঃ সাঃ। ঠিক্ ঠিক্ ব্যাকুল হ'য়ে ডাকা কি রকম ?

ঠাকুর। কি রকম জান? যেমন ধর, মার একটী মাত্র সন্তান: ভারি আদরের। সে হঠাৎ একদিন বাইরে খেলা করতে করতে কোথায় চলে গেল; কেউ খোঁজ পেলে না। তার মা ছেলেকে না পেয়ে পাগলের মতন হ'য়ে গেছে। অনেক খোঁজ করা হ'ল, কোথাও পেলে না। পরদিন একজন লোক এসে খবর দিলে যে, তার ছেলে বাইরে অমুক জায়গায় রয়েছে। তখন তার মা যেমন ব্যাকুলভাবে তাকে দেখবার জন্য ছুটে যায়, শ্বশুর ভাসুর বোধ নেই, গায়ে কাপড় আছে কিনা নজর নেই; যে কখনও স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে মুখের কাপড় খোলেনি সে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, মনে সেই এক লক্ষ্য এবং ব্যাকুলতা পুত্রকে দেখবে বলে; সে রকম ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকলে নিশ্চয়ই দেখা দেবেন।

ডাঃ সাঃ। মনে ব্যাকুলতা আসে কি ক'রে?

ঠাকুর। সাধুসঙ্গ এবং তাঁর উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করলে।

ডাঃ সাঃ। কিন্তু সদ্‌গুরু ইচ্ছা করলে ত কৃপা ক'রে উদ্ধার করতে পারেন।

ঠাকুর। সে ত সবই ঠিক্। কিন্তু কৃপা নেবার উপযুক্ত পাত্র হওয়া চাই ত। দেখ, মলয়পবন বইলে সারীগাছ চন্দনগাছ হ'য়ে যায়, কিন্তু পেঁপেগাছ আর বাঁশগাছ হয় না। ভেতরে একটু কিছু থাকলেই সঙ্গে কাজ হবে। সৎসঙ্গ করতে করতে মনের বিকার, সংস্কার ইত্যাদি কাটতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৃপা আসে ও আনন্দ উপলব্ধি হয়।

ডাঃ সাঃ। কিন্তু সদ্‌গুরু যদি এ আনন্দটা মনে ঢুকিয়ে দেন, তা'হলে ত শীঘ্রই কাজ হয়।

ঠাকুর। দেখ, ঘুমন্ত অবস্থায় যদি তোমার মুখে সন্দেশ পূরে দেয়, তুমি কি সন্দেশের তার পাও? বিকারী রোগী কি সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ করতে পারে। আগে বিকার কাটাও।

ডাঃ সাঃ। সংসারটা যে অনিত্য এবং দুঃখজনক, তিনি কেন সেটা আমাদের বুঝিয়ে দেন না?

ঠাকুর। তিনি ত ক্রমান্বয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা বোঝ কই। যতক্ষণ বদ্ধতা থাকে ততক্ষণ বোধ আসে না। এই দেখনা, মায়ের একটী ছেলের অসুখ হ'ল। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে, টাকা খরচ ক'রে রাখতে পারলে না; ছেলেটী মারা গেল। মার কি তাতে বোধ এল যে ছেলে অনিত্য? সে আর একটী ছেলেকে আরও বেশী আদর যত্ন ক'রে রাখতে লাগল। মনে করে, এটাকে বাঁচিয়ে রাখব। এ রকম তিনি কত ধাক্কা দেন, কিন্তু সংসার কি অনিত্য বোধ হয়?

দেখ, একজন, 'কাল'এর সঙ্গে দেখা হ'লে, তাকে বলেছিল, "দেখ কাল, যখন আমার যাবার সময় হবে, তার কিছু পূর্ব্বে আমাকে খবর দিও। তা'হলে সমস্ত মনটা আমি ভগবানের দিকে দেব।" কাল বললেন, "তথাস্তু।" এখত তার অনেক বৎসর কেটে গেল। অন্তিম সময় কাল গিয়ে হাজির। তখন সে লোকটা বলে উঠল, "এ কি কাল! তুমি যে বলেছিলে, আমার অন্তিম দিনের পূর্ব্বে এসে খবর দিয়ে যাবে। তা তুমি তোমার কথা রাখলে না কেন?" কাল উত্তর করলেন, "তোমাকে আমি একবার নয় তিনবার খবর দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করলে না। এখন সময় হয়েছে, তাই নিতে এসেছি।" লোকটী বললে, "কই, তুমি কবে এলে?" কাল বললেন, "তুমি যখন তোমার সুন্দর কাল চুলে সুগন্ধি মাখিয়ে তারই বিন্যাস করছ, তাতে মজে আছ, তখন তোমার চুল সাদা ক'রে দিলুম; জানিয়ে দিলুম, 'এতে ভুলে থেকো না, এ স্থায়ী নয়; তুমি শুনলে না। সেই সাদা চুলে কলপ মাখিয়ে দিব্যি পরিপাটি ক'রে বেড়াতে লাগলে। তখন তোমার চোখের জ্যোতিঃ নষ্ট ক'রে দিলুম। তুমি রূপের নেশায় ভুলে আছ; জানিয়ে দিলুম যে, এ সব স্থায়ী নয়, এতে মন রেখ' না; তাঁকে ডাক। তুমি তাও শুনলে না। হাত দিয়ে নাতী-নাতনীদের টেনে নিয়ে তাদের আদর করতে লাগলে। তাতেই ভুলে রইলে। যখন তুমি নানারূপ সুস্বাদু আহারে রসনা

তৃপ্তি ক'রে, তাতে মজে আছ, তখন একে একে তোমার দাঁতগুলি ফেলে দিতে লাগলুম। বোঝালুম, 'এ রসে ভুলে থেকোনা; তাঁর দিকে মন দাও।' তবু তুমি শুনলে না। মাড়ী দিয়ে যতদূর পার চিবিয়ে রসনা তৃপ্তি করতে লাগলে। বারবার তিনবার তোমায় সতর্ক করেছি; তুমি শোননি; এখন সময় হয়েছে চল।

তা দেখ, এততেও সংসারীদের অনিত্য বোধ হয় না। অনিত্য বোধ ত দূরের কথা; তা চট ক'রে হয় না। সংসারে প্রবল আকর্ষণ। অনিত্য বোধ হওয়া কি সোজা? সে জন্য দিয়েছে সঙ্গ, **সদ্গুরুর সঙ্গ; সদ্গুরু সব চেয়েও আপন।** তিনি ভালবাসা দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। নইলে মানুষের কি সাধ্য আছে মায়ার হাত এড়ায়? গুরুতে ভক্তি ভালবাসা রাখবে, তাঁতে মন রাখবে; তবেই সব হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন। এই গানটি ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন।

গুরুপদে মন রাখ ভাই, অন্য কিছুই ভেব' না।
ও তোর দুঃখ যাবে, শান্তি পাবে, ভবভয় আর রবে না॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে, হঠাৎ সদ্গুরু মিলে,
গুরু ভালবেসে, প্রেম বিলায়ে উদ্ধার করেন তাও জান না॥
যার কাছেতে শান্তি পাবে,
(যার কাছেতে শক্তি পাবে), গুরু বলে জানবে তাঁরে,
তাঁরে দেখলে পরে মন ভুলে যায়, বড়ই আপন বলে হয় ধারণা!
এই কথাগুলো মনে রাখিস, আর সরল মনে তাঁরে ডাকিস,
গুরু দূরে রইলেও দেখবি কাছে, এমনি প্রেমের কাণ্ডখানা॥
স্বীয় কার্য্য উদ্ধারিতে, আসেন জীবে শান্তি দিতে,
কার্য্যশেষে যায় গো চলে, তখন তাঁরে যায় গো জানা॥

পরিশিষ্ট।

কাশী, কলিকাতা, ভবানীপুর, খিদিরপুর ও শ্রীরামপুর, এ কয় স্থানেই ঠাকুরের অধিকাংশ ভক্ত বাস করেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালায় ও বাহিরে অনেক স্থানে তাঁহার অনেক ভক্ত আছে। সকল স্থানের নাম দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া কয়েকটি স্থানের নাম দেওয়া হইল।

পশ্চিমবঙ্গে—শিবপুর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, কোন্নগর, বল্লভপুর, জনাই, শেয়াখালা, গোপালপুর, হরিনাভি, উলো, কৃষ্ণনগর, বনগ্রাম, খুলনা, তারকেশ্বর, কালনা, শ্রীখণ্ড ইত্যাদি। পূর্ব্ববঙ্গে—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গে—বগুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি। আসামে—গৌহাটি, লামডিং। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে—পুরুলিয়া, গয়া, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, সম্বলপুর। যুক্তপ্রদেশে—এলাহাবাদ, কানপুর, গোরক্ষপুব, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী। মধ্যপ্রদেশে—সিন্ধুবারা, জব্বলপুর, নাগপুর, রায়পুর। রাজপুতানায়—জয়পুর, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ইত্যাদি।

ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা প্রায় সময়ই ঠাকুরের কাছে আসেন এবং থাকেন, তাঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুস্তকে প্রদত্ত নাম।	পরিচয়।
কালীবাবু।	শ্রীযুক্ত রায় অনাথনাথ বসু। রায়বাহাদুর স্বর্গীয় পশুপতিনাথ বসুর পুত্র। জমিদার; কলিকাতা, বাগবাজার।
ডাক্তার সাহেব।	ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, বি; সি, এইচ, বি (এডিন); ডি, পি, এইচ, (ম্যাঞ্চেষ্টার)। Asst. Director of Public Health (Bengal). স্বর্গীয় রাজরাজেশ্বর মিত্র, O. B. E.

পুস্তকে প্রদত্ত নাম।	পরিচয়।
	A. M. I. C. E., K. I. H., Supdt. Engineer, C. P.-এর পুত্র, কলিকাতা, ভবানীপুর।
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব	ইঁহার ভাই শ্রীযুক্ত হরিকেশব মিত্র, Automobile Engineer ; ও
পুত্তু।	শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মিত্র।
গোপেন।	শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী, বি, এ ; ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কলিকাতা, শ্যামবাজার।
দ্বিজেন।	ইঁহার ভাই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী, বি, এ ; বি, এল ; Advocate, সিন্ধুবারা।
তপেন।	ইঁহাদের ভাই শ্রীযুক্ত তপেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী, বি, এ ; Supdt. of Police (Imperial Service).
সোমদেব।	শ্রীযুক্ত সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায় ; স্বর্গীয় বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ; Supdt. Zoo Garden (retired), Calcutta.
সুরদেব।	ইঁহার ভাই শ্রীযুক্ত সুরদেব গঙ্গোপাধ্যায়
গণদেব।	ও শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায়, Proprietors, The Emerald Printing Works, কলিকাতা।
অজয়।	শ্রীযুক্ত অজয়নাথ মিত্র। স্বর্গীয় ত্রিপেন্দ্রেশ্বর মিত্রের পুত্র। ভবানীপুর, কলিকাতা।
অশোক	ইঁহার ভাই শ্রীযুক্ত অশোকনাথ মিত্র।

পুস্তকে প্রদত্ত নাম।	পরিচয়।
কৈলাসচন্দ্র বসু।	রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু ; আলিপুরের সরকারী উকীল। কলিকাতা, শ্যামপুকুর।
অসিতা।	শ্রীযুক্ত অসিতারঞ্জন ঘোষ, এম, এ; বি, এল; উকীল, কলিকাতা হাইকোর্ট। ভবানীপুর।
প্রভাস।	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, B. Sc,; হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ভবানীপুর।
কানাই।	শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন ; ভবানীপুর।
কালীমোহন।	শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন ; উকীল, আলিপুর ; ভবানীপুর।
রাজেন।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু ; Contractor, Public Works Dept.
শশী।	শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টে কাজ করেন। ভবানীপুর।
আশু।	শ্রীযুক্ত আশুতোষ হালদার ; Sub-Inspector, Calcutta Police.
কিশোরী।	শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখার্জ্জি, C. I. D. Inspector, Calcutta Police.
ধীরেন।	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঢাকা।
যতীন বোস।	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ; ডকে Stevedore, গোয়াবাগান।
বিজয়।	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ পাল ; মার্চ্চেণ্ট ; Chemist and Druggist খিদিরপুর।

৪

পুস্তকে প্রদত্ত নাম।	পরিচয়।
কালু।	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের পুত্র, খিদিরপুর ; মেডিকেল কলেজে কাজ করেন।
জিতেন।	রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; Deputy Supdt. of Police এলাহাবাদ।
ব্রজরাখাল।	রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজরাখাল সান্ন্যাল ; Supdt. of Police (retired.) কাশী।
নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র। কাশী।
কেষ্ট।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী শীল ; মার্চ্চেণ্ট ; Colliery Proprietor ; শ্রীরামপুর।
মৃত্যান।	শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শীল ; শ্রীরামপুর।
মহাদেব।	শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষ ; গৌহাটির ষ্টেশন মাষ্টার। খুলনা।
কিরণ।	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ ; B. E. Dist. Engineer. বগুড়া।
যুগল।	শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রায় ; Zoo Gardenএ কাজ করেন ; Chairman, Madanpur Union Board ; Hony. Magistrate, Madanpur.